ইসলাম শিক্ষা

দ্বিতীয় পত্র

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি

• অধ্যাপক ড. এ আর এম আলী হায়দার • ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল
• ড. মোঃ রেজাউল করিম • ড. মুহাম্মাদ আল আমীন

অক্ষর-পত্র প্রকাশনী

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত
সিলেবাসের আলোকে রচিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত সিলেবাসের আলোকে
একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক হিসেবে রচিত

ইসলাম শিক্ষা

দ্বিতীয় পত্র

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি

রচনা

অধ্যাপক ড. এ আর এম আলী হায়দার
দাখিল ও আলিম (১ম বিভাগে ১ম)
ফাজিল ও কামিল (১ম শ্রেণিতে ১ম)
বিএ (অনার্স), ইসলামিক স্টাডিজ (১ম শ্রেণিতে ১ম)
এমএ (১ম শ্রেণিতে ১ম), পিএইচডি (ঢাবি)
অধ্যাপক ও প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান,
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল
ফাজিল (১ম শ্রেণি), কামিল (১ম শ্রেণি)
বিএ (অনার্স), ইসলামিক স্টাডিজ (১ম শ্রেণিতে ১ম)
এমএ (১ম শ্রেণিতে ৪র্থ), পিএইচডি (ঢাবি)
সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
প্রাক্তন সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা মহানগর মহিলা কলেজ, ঢাকা

ড. মোঃ রেজাউল করিম
সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
দনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ঢাকা

ড. মুহাম্মাদ আল আমীন
বিএ অনার্স (প্রথম শ্রেণি)
এমএ (প্রথম শ্রেণি), দাওরায়ে হাদিস
কামিল (হাদিস, প্রথম শ্রেণি) এমফিল স্কলার
পিএইচডি (ঢাবি)
সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা
পাঠ্যপুস্তকের ইংরেজি অনুবাদক, এনসিটিবি, ঢাকা

অক্ষর-পত্র প্রকাশনী
৪৩, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক
(পুরাতন ১৬ শান্তিনগর), ঢাকা

প্রকাশনা
অক্ষর-পত্র প্রকাশনী
৪৩, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক
(পুরাতন ১৬ শান্তিনগর), ঢাকা ১২১৭
ফোন: ০৯৬৬৬-৭৮৭৯৮০
ই-মেইল: info@akkharpatra.com
ওয়েবসাইট: www.akkharpatra.com
ফেসবুক: facebook.com/AkkharPatraProkashoni

© লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

পরিবেশনা : পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি.
৩৮/৮ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন: ০২-৯৫১১৭২৭, ০১৩১৩৭৭০৯৫৭

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০১৪
একাদশ সংস্করণ : আগস্ট ২০২৫

গবেষণা : ধর্ম দপ্তর
গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ

পণ্য ব্যবস্থাপনা
ও সমন্বয় : সাবিকুন নাহার আনিকা

প্রচ্ছদ : মানব

গ্রাফিক্স : নকশা দপ্তর

অঙ্কন : অঙ্কন দপ্তর

অঙ্গসজ্জা : প্রি-প্রেস দপ্তর

বর্ণবিন্যাস : অক্ষর-পত্র কম্পিউটার সিস্টেমস

মুদ্রণ ও বাঁধাই : বারতোপা প্রিন্টার্স লি.

বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি নির্ধারিত
সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয়মূল্য (MRP):
২৪০.০০ (দুই শ চল্লিশ) টাকা

ঘরে বসে বই পেতে অর্ডার করুন
pbs.com.bd
অথবা কল/হোয়াটসঅ্যাপ করুন
01313 770 770

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার। দরুদ ও সালাম বিশ্বমানবতার দিশারি মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সা.), তাঁর পরিবার-পরিজন এবং সব সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর প্রতি। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের নতুন সিলেবাস অনুসরণে 'ইসলাম শিক্ষা দ্বিতীয় পত্র' পাঠ্যপুস্তকটি বের করা সম্ভব হলো।

দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে অক্ষর-পত্র প্রকাশনী থেকে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির ইসলাম শিক্ষা দ্বিতীয় পত্র বইটি প্রকাশিত হলো। প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে– বিষয়বিন্যাস ও উপস্থাপনায় আধুনিকতা, তথ্য ও তত্ত্বগত বর্ণনায় নির্ভুলতা এবং ইসলামি জীবনদর্শন ও মূলনীতি ব্যাখ্যায় সহজ-সমৃদ্ধ এমন একটি বই রচনা করা, যা একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ভালো ফলের দাবি পূরণ করবে। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো– ইসলাম সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কৌতূহল মেটানো।

বইটি রচনা করতে দেশি-বিদেশি অনেক সম্মানিত লেখকগণের বই ও বিভিন্ন ওয়েবসাইটের সহায়তা নেওয়া হয়েছে। এজন্য তাঁদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা রইল। সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে বইটি মুদ্রিত হয়েছে এবং মুদ্রণের ব্যাপারে কম্পোজ থেকে শুরু করে সম্পাদনা পর্যন্ত যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। বইটির এ সংস্করণে মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের দেওয়া সুচিন্তিত মতামত গ্রহণ ও ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করা হয়েছে। এরপরও যদি কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যায় তাহলে তা পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের আশা রাখি। তবে বইটির মানোন্নয়নে যেকোনো গঠনমূলক সমালোচনা ও পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে। পরিশেষে, যাদের জন্য আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস সেসব শিক্ষার্থীরা যদি বইটি পড়ে উপকৃত হয়, তাহলে এ চেষ্টা সার্থক হবে। সবাইকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা।

অধ্যাপক ড. এ আর এম আলী হায়দার | ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল [০১৯৭৯-৪৭৫১৬৯] | ড. মোঃ রেজাউল করিম
ড. মুহাম্মাদ আল আমীন [০১৭১১-২৩০৯১২]

বইটির বৈশিষ্ট্য

- প্রতিটি অধ্যায়ের পাঠভিত্তিক উপস্থাপন
- প্রতিটি পাঠের শেষে 'পাঠ মূল্যায়ন' সংযোজন
- শিখনফলের আলোকে প্রতিটি বিষয়বস্তুর সহজবোধ্য উপস্থাপন
- পাঠভিত্তিক জেনে রাখো, চিন্তা করো, দলীয় বা একক কাজ সংযোজন
- আলোচ্য বিষয়কে স্পষ্ট করার জন্য প্রয়োজনীয় আয়াত ও হাদিস সংযোজন
- সুরা বাকারার নির্বাচিত আয়াতের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি শব্দের আলাদা অর্থ সংযোজন
- শিক্ষাক্রম অনুসারে সর্বশেষ সৃজনশীল প্রশ্নকাঠামোর সঠিক অনুসরণ
- অনুশীলনের জন্য পর্যাপ্তসংখ্যক জ্ঞান, অনুধাবন ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন সংযোজন
- অনুশীলনীতে সৃজনশীল প্রশ্নের পাশাপাশি সমন্বিত অধ্যায়ের প্রশ্ন সংযোজন
- বিগত সালের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সংযোজন
- প্রাঞ্জল ভাষা ও আধুনিক বানানরীতি অনুসরণ

পাঠ্যসূচি

প্রথম অধ্যায়: আল-কুরআন (৪৫ পিরিয়ড)

আল-কুরআনের পরিচয়; আল-কুরআনের বৈশিষ্ট্য; আল-কুরআনের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য; আল-কুরআনের কতিপয় নাম; আল-কুরআনের আলোচ্য বিষয়; কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব ও ফজিলত; আল-কুরআন অবতরণ; কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব; ওহি ও শানে নুজুল; মক্কি ও মাদানি সূরার বৈশিষ্ট্য; আল-কুরআনের সংরক্ষণ; আল-কুরআন সংকলন; আদর্শ জীবন গঠনে আল-কুরআনের ভূমিকা; সূরা আল-বাকারার পরিচিতি ও নামকরণ; সূরা আল-বাকারা নাজিলের সময়কাল ও শানে নুজুল; সূরা আল-বাকারার বিষয়বস্তু; সূরা আল-বাকারার ১ম রুকু অনুবাদ ও ব্যাখ্যা; সূরা আল-বাকারার ২য় রুকু অনুবাদ ও ব্যাখ্যা; সূরা আল-বাকারার ৩য় রুকু অনুবাদ ও ব্যাখ্যা; সূরা-আল বাকারার ৪র্থ রুকু অনুবাদ ও ব্যাখ্যা; সূরা আল-বাকারার ৫ম রুকু অনুবাদ ও ব্যাখ্যা; সূরা আল-বাকারার ৬ষ্ঠ রুকু অনুবাদ ও ব্যাখ্যা; সূরা আল-বাকারার আলোকে মুত্তাকির পরিচয়; সূরা আল-বাকারার আলোকে কাফিরের পরিচয়; সূরা আল-বাকারার আলোকে মুনাফিকের পরিচয়; হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টি ও পৃথিবীতে অবতরণের ইতিহাস; ইবলিসের পরিচয়; ফিরাউনের পরিচয়; বনি ইসরাইল জাতি ও তাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ; বনি ইসলাইলের দুষ্কর্মের বিবরণ; গো-বৎস পূজার ঘটনা।

দ্বিতীয় অধ্যায়: আল-হাদিস (৪০ পিরিয়ড)

হাদিসের পরিচয়; রাবি, সনদ ও মতন; হাদিস, সুন্নাহ, আছার ও খবর; আল-কুরআনের সাথে হাদিসের সম্পর্ক ও পার্থক্য; ইতিহাস রচনায় হাদিসের ভূমিকা; হাদিস সংরক্ষণ; হাদিস সংকলন; সিহাহ সিত্তাহ ও প্রসিদ্ধ ছয় ইমাম; হাদিসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা; হাদিসের প্রকারভেদ; নৈতিক জীবন গঠনে হাদিসের ভূমিকা; নির্বাচিত পঁচিশটি হাদিসের অনুবাদ; ব্যাখ্যা ও শিক্ষা: ১ নম্বর হাদিস- ইসলামের মূলভিত্তি সম্পর্কিত; ২ নম্বর হাদিস- ইমানের শাখা-প্রশাখা সম্পর্কিত; ৩ নম্বর হাদিস- রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা সম্পর্কিত হাদিস; ৪ নম্বর হাদিস- মুনাফিকদের নিদর্শন সম্পর্কিত হাদিস; ৫ নম্বর হাদিস- সত্য গ্রহণ ও মিথ্যা বর্জন সম্পর্কিত হাদিস; ৬ নম্বর হাদিস- আল্লাহর পথে দান ও জ্ঞানী ব্যক্তি সম্পর্কিত হাদিস; ৭ নম্বর হাদিস- ভ্রাতৃত্ববোধ সম্পর্কিত হাদিস; ৮ নম্বর হাদিস- বন্ধু নির্বাচন সম্পর্কিত হাদিস; ৯ নম্বর হাদিস- কর্তব্য ও পরোপকার সম্পর্কিত; ১০ নম্বর হাদিস- ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত; ১১ নম্বর হাদিস- জুলুমের প্রতিরোধ ও মজলুমের সাহায্য সম্পর্কিত; ১২ নম্বর হাদিস- অশ্লীলতা সম্পর্কিত; ১৩ নম্বর হাদিস- ইমানের প্রতিবন্ধক দোষাবলী সম্পর্কিত; ১৪ নম্বর হাদিস- বৃক্ষরোপণ সম্পর্কিত; ১৫ নম্বর হাদিস- ব্যবসায় সততা সম্পর্কিত; ১৬ নম্বর হাদিস- ঋণের অশুভ পরিণতি সম্পর্কিত; ১৭ নম্বর হাদিস- দাতার মর্যাদা সম্পর্কিত; ১৮ নম্বর হাদিস- দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতা সম্পর্কিত; ১৯ নম্বর হাদিস- আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ সম্পর্কিত; ২০ নম্বর হাদিস- হালাল উপার্জন সম্পর্কিত; ২১ নম্বর হাদিস- মাদকদ্রব্যের পরিণাম সম্পর্কিত; ২২ নম্বর হাদিস- হারামের পরিণতি সম্পর্কিত; ২৩ নম্বর হাদিস- মৃতুপরবর্তীতেও আমলনামা জারি সম্পর্কিত; ২৪ নম্বর হাদিস- জ্ঞানার্জন সম্পর্কিত; ২৫ নম্বর হাদিস- রাসুলের নামে মিথ্যাচারের সতর্কতা সম্পর্কিত।

তৃতীয় অধ্যায়: আল ইজমা (১০ পিরিয়ড)

ইজমা উৎপত্তির ইতিহাস; ইজমার পরিচয়; ইজমার প্রকারভেদ; ইজমার পদ্ধতি ও রুকন; ইজমার আহল বা ইজমাকারীদের যোগ্যতা; ইজমার শর্তসমূহ; ইজমার স্তর ও হুকুম; ইজমার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা।

চতুর্থ অধ্যায়: আল কিয়াস (১০ পিরিয়ড)

কিয়াসের উৎপত্তির ইতিহাস; কিয়াসের পরিচয়; কিয়াসের রুকন; কিয়াসের প্রকারভেদ; কিয়াসের শর্তসমূহ; কিয়াসের মূলনীতি ও হুকুম; কিয়াসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা; কিয়াস ইসলামি আইনের উৎস কি না।

পঞ্চম অধ্যায়: ফিকহশাস্ত্র (১৫ পিরিয়ড)

ফিকহশাস্ত্রের পরিচয়; ফিকহশাস্ত্রের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু; ফিকহশাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; ফিকহশাস্ত্রের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা; মাযহাবের সংজ্ঞা এবং বিভিন্ন মাযহাব উৎপত্তির কারণ; হানাফি মাযহাব; মালিকি মাযহাব; শাফিঈ মাযহাব; হাম্বলি মাযহাব; ইমাম আবু হানিফা (রহ.); ইমাম মালিক (রহ.); ইমাম শাফেয়ি (রহ.); ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.)।

ষষ্ঠ অধ্যায়: মৌলিক ইবাদত (১০ পিরিয়ড)

ইবাদতের পরিচয় ও প্রকারভেদ; ইবাদতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য; সালাতের গুরুত্ব; সালাতের শিক্ষা; জাকাতের গুরুত্ব, জাকাতের শিক্ষা; সাওমের গুরুত্ব, সাওমের শিক্ষা; হজের গুরুত্ব; হজের শিক্ষা।

সপ্তম অধ্যায়: তাসাউফ (১০ পিরিয়ড)

তাসাউফের পরিচয় ও উদ্দেশ্য; তাসাউফের উৎপত্তি; তাসাউফের ক্রমবিকাশ; শরিয়ত ও তাসাউফের মধ্যে সম্পর্ক; তাসাউফের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা; আত্মাকে সুস্থ ও পবিত্র রাখার উপায়; হযরত হাসান বসরি (রহ.); হযরত আবদুল কাদির জিলানি (রহ.) এবং হযরত বাহাউদ্দিন নকশবন্দ (রহ.); হযরত মুইনুদ্দিন চিশতি (রহ.) এবং হযরত শায়খ আহমদ সিরহিন্দি (রহ.); নৈতিক, অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক মূল্যবোধ গঠনে তাসাউফের ভূমিকা।

মানবণ্টন

সৃজনশীল প্রশ্ন: ৭০ নম্বর

মোট ১১টি প্রশ্ন থাকবে। ৭টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেকটি প্রশ্নের মান ১০।	১০×৭ = ৭০

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন: ৩০ নম্বর

মোট ৩০টি প্রশ্ন থাকবে। সব কয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেকটি প্রশ্নের মান ১।	১×৩০ = ৩০
মোট	১০০

মানবণ্টন পরিবর্তনশীল; এর সাথে প্রশ্নের ধরনের তেমন সম্পর্ক নেই। মানবণ্টনের আপডেট দেখতে ব্রাউজারের অ্যাড্রেস বারে টাইপ করো— akkharpatra.com/hsc/issmdn25.pdf

সূচিপত্র

অধ্যায় ও বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়: আল-কুরআন	**১-১২০**
আল-কুরআনের পরিচয়	২
আল-কুরআনের বৈশিষ্ট্য	৫
আল-কুরআনের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য	৮
আল-কুরআনের কতিপয় নাম	১০
আল-কুরআনের আলোচ্য বিষয়	১২
কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব ও ফজিলত	১৪
আল-কুরআন অবতরণ	১৭
কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব	১৯
ওহি ও শানে নুজুল	২০
মক্কি ও মাদানি সূরার বৈশিষ্ট্য	২১
আল-কুরআনের সংরক্ষণ	২৩
আল-কুরআন সংকলন	২৬
আদর্শ জীবন গঠনে আল-কুরআনের ভূমিকা	২৯
সূরা আল-বাকারার পরিচিতি ও নামকরণ	৩৫
সূরা আল-বাকারা নাজিলের সময়কাল ও শানে নুজুল	৩৬
সূরা আল-বাকারার বিষয়বস্তু	৩৭
সূরা আল-বাকারার ১ম রুকু : অনুবাদ ও ব্যাখ্যা	৩৮
সূরা আল-বাকারার ২য় রুকু : অনুবাদ ও ব্যাখ্যা	৪৪
সূরা আল-বাকারার ৩য় রুকু : অনুবাদ ও ব্যাখ্যা	৫৭
সূরা আল-বাকারার ৪র্থ রুকু : অনুবাদ ও ব্যাখ্যা	৬৭
সূরা আল-বাকারার ৫ম রুকু : অনুবাদ ও ব্যাখ্যা	৭৮
সূরা আল-বাকারার ৬ষ্ঠ রুকু : অনুবাদ ও ব্যাখ্যা	৮৫
সূরা আল-বাকারার আলোকে মুত্তাকির পরিচয়	৯৮
সূরা আল-বাকারার আলোকে কাফিরের পরিচয়	৯৯

অধ্যায় ও বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
সূরা আল-বাকারার আলোকে মুনাফিকের পরিচয়	১০১
হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টি এবং পৃথিবীতে অবতরণের ইতিহাস	১০২
ইবলিসের পরিচয়	১০৪
ফিরাউনের পরিচয়	১০৫
বনি ইসরাইল জাতি ও তাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ	১০৬
বনি ইসরাইলের দুষ্কর্মের বিবরণ	১০৮
গো-বৎস পূজার ঘটনা	১০৯
এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ	১১২
সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর	১১৩
অনুশীলনী	১১৬
দ্বিতীয় অধ্যায়: আল-হাদিস	**১২১-১৯২**
হাদিসের পরিচয়	১২২
রাবি, সনদ ও মতন	১২৪
হাদিস, সুন্নাহ, আছার ও খবর	১২৫
আল-কুরআনের সাথে হাদিসের সম্পর্ক ও পার্থক্য	১২৬
ইতিহাস রচনায় হাদিসের ভূমিকা	১২৮
হাদিস সংরক্ষণ	১২৯
হাদিস সংকলন	১৩১
সিহাহ সিত্তাহ ও প্রসিদ্ধ ছয় ইমাম	১৩৩
হাদিসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা	১৩৭
হাদিসের প্রকারভেদ	১৩৯
নৈতিক জীবন গঠনে হাদিসের ভূমিকা	১৪২
মহানবি (সা.)-এর পঁচিশটি হাদিসের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা:	
১ নম্বর হাদিস (ইসলামের মূলভিত্তি সম্পর্কিত)	১৪৪

অধ্যায় ও বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
২ নম্বর হাদিস (ইমানের শাখা-প্রশাখা সম্পর্কিত)	১৪৬
৩ নম্বর হাদিস (রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা সম্পর্কিত)	১৪৮
৪ নম্বর হাদিস (মুনাফিকদের নিদর্শন সম্পর্কিত)	১৫০
৫ নম্বর হাদিস (সত্য গ্রহণ ও মিথ্যা বর্জন সম্পর্কিত)	১৫২
৬ নম্বর হাদিস (মহান আল্লাহর পথে দান ও জ্ঞানী ব্যক্তি সম্পর্কিত)	১৫৪
৭ নম্বর হাদিস (ভ্রাতৃত্ববোধ সম্পর্কিত)	১৫৫
৮ নম্বর হাদিস (বন্ধু নির্বাচন সম্পর্কিত)	১৫৭
৯ নম্বর হাদিস (কর্তব্য ও পরোপকার সম্পর্কিত)	১৫৯
১০ নম্বর হাদিস (ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত)	১৬০
১১ নম্বর হাদিস (জুলুমের প্রতিরোধ ও মজলুমের সাহায্য সম্পর্কিত)	১৬১
১২ নম্বর হাদিস (অশ্লীলতা সম্পর্কিত)	১৬৩
১৩ নম্বর হাদিস (ইমানের প্রতিবন্ধক দোষাবলি সম্পর্কিত)	১৬৪
১৪ নম্বর হাদিস (বৃক্ষরোপণ সম্পর্কিত)	১৬৫
১৫ নম্বর হাদিস (ব্যবসায়ে সততা সম্পর্কিত)	১৬৭
১৬ নম্বর হাদিস (ঋণের অশুভ পরিণতি সম্পর্কিত)	১৬৯
১৭ নম্বর হাদিস (দাতার মর্যাদা সম্পর্কিত)	১৭০
১৮ নম্বর হাদিস (দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতা সম্পর্কিত)	১৭২
১৯ নম্বর হাদিস (মহান আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ সম্পর্কিত)	১৭৪
২০ নম্বর হাদিস (হালাল উপার্জন সম্পর্কিত)	১৭৫
২১ নম্বর হাদিস (মাদকদ্রব্যের অশুভ পরিণতি সম্পর্কিত)	১৭৬
২২ নম্বর হাদিস (হারামের পরিণতি সম্পর্কিত)	১৭৭
২৩ নম্বর হাদিস (মৃত্যুপরবর্তীতেও আমলনামা জারি সম্পর্কিত)	১৭৮
২৪ নম্বর হাদিস (জ্ঞানার্জন সম্পর্কিত)	১৮০
২৫ নম্বর হাদিস (রাসুলের নামে মিথ্যাচারের সতর্কতা সম্পর্কিত)	১৮১

অধ্যায় ও বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ	১৮৪
সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর	১৮৫
অনুশীলনী	১৮৮
তৃতীয় অধ্যায়: আল-ইজমা	**১৯৩-২১০**
ইজমার উৎপত্তির ইতিহাস	১৯৪
ইজমার পরিচয়	১৯৫
ইজমার প্রকারভেদ	১৯৬
ইজমার পদ্ধতি ও রুকন	১৯৭
ইজমার আহল বা ইজমাকারীদের যোগ্যতা	১৯৯
ইজমার শর্তসমূহ	২০০
ইজমার স্তর ও হুকুম	২০১
ইজমার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা	২০৩
এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ	২০৫
সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর	২০৬
অনুশীলনী	২০৮
চতুর্থ অধ্যায়: আল-কিয়াস	**২১১-২২৮**
কিয়াসের উৎপত্তির ইতিহাস	২১২
কিয়াসের পরিচয়	২১৩
কিয়াসের রুকন	২১৪
কিয়াসের প্রকারভেদ	২১৬
কিয়াসের শর্তসমূহ	২১৮
কিয়াসের মূলনীতি ও হুকুম	২১৯
কিয়াসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা	২২০
কিয়াস ইসলামি আইনের উৎস কি না	২২১
এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ	২২২
সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর	২২৩
অনুশীলনী	২২৫

অধ্যায় ও বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
পঞ্চম অধ্যায়: ফিকহশাস্ত্র	**২২৯-২৫৬**
ফিকহশাস্ত্রের পরিচয়	২৩০
ফিকহশাস্ত্রের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু	২৩১
ফিকহশাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ	২৩২
ফিকহশাস্ত্রের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা	২৩৬
মাযহাবের সংজ্ঞা এবং বিভিন্ন মাযহাব উৎপত্তির কারণ	২৩৯
হানাফি মাযহাব	২৪১
মালিকি মাযহাব	২৪৩
শাফিঈ মাযহাব	২৪৪
হাম্বলি মাযহাব	২৪৫
চার ইমামের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি: ইমাম আবু হানিফা (রহ.)	২৪৬
ইমাম মালিক (রহ.)	২৪৭
ইমাম শাফেয়ি (রহ.)	২৪৮
ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)	২৪৯
এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ	২৫১
সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর	২৫২
অনুশীলনী	২৫৪
ষষ্ঠ অধ্যায়: মৌলিক ইবাদত	**২৫৭-২৯২**
ইবাদতের পরিচয় ও প্রকারভেদ	২৫৮
ইবাদতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য	২৬০
সালাতের গুরুত্ব	২৬২
সালাতের শিক্ষা	২৬৭
জাকাতের গুরুত্ব	২৬৯

অধ্যায় ও বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
জাকাতের শিক্ষা	২৭৪
সাওমের গুরুত্ব	২৭৫
সাওমের শিক্ষা	২৭৯
হজের গুরুত্ব	২৮০
হজের শিক্ষা	২৮৩
এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ	২৮৬
সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর	২৮৭
অনুশীলনী	২৯০
সপ্তম অধ্যায়: তাসাউফ	**২৯৩-৩১৯**
তাসাউফের পরিচয় ও উদ্দেশ্য	২৯৪
তাসাউফের উৎপত্তি	২৯৭
তাসাউফের ক্রমবিকাশ	২৯৯
শরিয়ত ও তাসাউফের মধ্যে সম্পর্ক	৩০১
তাসাউফের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা	৩০৩
আত্মাকে সুস্থ ও পবিত্র রাখার উপায়	৩০৫
হযরত হাসান বসরি (রহ.) (২১-১১০ হি.)	৩০৬
হযরত আবদুল কাদির জিলানি (রহ.) এবং হযরত বাহাউদ্দিন নকশবন্দ (রহ.)	৩০৭
হযরত মুইনুদ্দিন চিশতি (রহ.) এবং হযরত শায়খ আহমদ সিরহিন্দি (রহ.)	৩০৯
নৈতিক, অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক মূল্যবোধ গঠনে তাসাউফের ভূমিকা	৩১১
এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ	৩১৪
সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর	৩১৫
অনুশীলনী	৩১৭

সহায়ক গ্রন্থসমূহ	৩২০
পরিশিষ্ট	**৩২১-৩৩৬**
বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র	৩২১

১

আল-কুরআন

Al-Quran

প্রধান প্রধান শব্দ

- তিলাওয়াত
- ওহি
- মক্কি সূরা
- মাদানি সূরা
- মুত্তাকি
- বনি ইসরাইল জাতি
- তাওবা

আল-কুরআন মানবরচিত কোনো গ্রন্থ নয়। মহান আল্লাহর পবিত্র কালাম। এ গ্রন্থের ভাষাশৈলী, শিল্প-সৌন্দর্য সবই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নাজিলকৃত। সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য আল-কুরআন উপদেশস্বরূপ এবং পরিপূর্ণ জীবনবিধান। এটি পূর্ববর্তী সব আসমানি কিতাবের নির্যাস ও সত্যায়নকারী। এর নাজিলের পদ্ধতি স্বতন্ত্র ও অনন্য। আল-কুরআন একসাথে নাজিল হয়নি বরং মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর নবুয়তি জীবনের তেইশ বছরে (৬১০ খ্রি. - ৬৩২ খ্রি.) বিভিন্ন প্রেক্ষিতে, প্রয়োজন অনুসারে অল্প অল্প করে নাজিল হয়েছে। যখন যে সূরা বা আয়াত নাজিল হয়েছে তখনই মহানবি (সা.) অত্যন্ত যত্নসহকারে তা মুখস্থ ও আয়ত্ত করে নিয়েছেন। মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর ইন্তেকালের পর ওহি লেখকদের সহযোগিতায় প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) এবং পরবর্তীতে তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা.) পুস্তক আকারে কুরআন সংকলন করেন। মানবজীবনে আল-কুরআনের গুরুত্ব অপরিসীম। মহানবি (সা.)-এর ওপর নাজিলকৃত আল-কুরআন এখনও পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় পৃথিবীর সর্বত্র বিদ্যমান। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের মূল আলোচ্য বিষয় হলো মানুষ বা মানবজীবন। এতে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাষ্ট্রীয়, আন্তর্জাতিকসহ মানবজীবনের সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সমস্যার কল্যাণকর সমাধান দেওয়া হয়েছে। আদর্শ জীবন গঠন এবং সর্বোত্তম চরিত্র বিনির্মাণে আল-কুরআনের অনুসরণ ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই।

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে যা যা শিখব

- আল-কুরআনের পরিচয়, বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্য
- আল-কুরআনের অর্থসহ কয়েকটি নাম
- কুরআনের আলোচ্য বিষয়, কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব ও ফজিলত, কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব, সূরার পরিচয়, মক্কি ও মাদানি সূরার বৈশিষ্ট্য, কুরআন অবতরণ, সংরক্ষণ ও সংকলন পদ্ধতি
- আদর্শ জীবন গঠনে আল-কুরআনের ভূমিকা এবং সে আলোকে জীবন গঠন
- সূরা আল-বাকারার নামকরণ, শানে নুজুল, আলোচ্য বিষয় এবং উক্ত সূরার ১ থেকে ৫৯ আয়াতের অনুবাদ ও বাস্তবজীবনে এর শিক্ষা

পাঠ পরিকল্পনা

পাঠ ১	আল-কুরআনের পরিচয়
পাঠ ২	আল-কুরআনের বৈশিষ্ট্য
পাঠ ৩	আল-কুরআনের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য
পাঠ ৪	আল-কুরআনের কতিপয় নাম
পাঠ ৫	আল-কুরআনের আলোচ্য বিষয়
পাঠ ৬	কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব ও ফজিলত
পাঠ ৭	আল-কুরআন অবতরণ
পাঠ ৮	কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব
পাঠ ৯	ওহি ও শানে নুজুল
পাঠ ১০	মক্কি ও মাদানি সূরার বৈশিষ্ট্য
পাঠ ১১	আল-কুরআনের সংরক্ষণ
পাঠ ১২	আল-কুরআন সংকলন
পাঠ ১৩, ১৪ ও ১৫	আদর্শ জীবন গঠনে আল-কুরআনের ভূমিকা
পাঠ ১৬	সূরা আল-বাকারার পরিচিতি ও নামকরণ
পাঠ ১৭	সূরা আল-বাকারা নাজিলের সময়কাল ও শানে নুজুল
পাঠ ১৮	সূরা আল-বাকারার বিষয়বস্তু
পাঠ ১৯, ২০ ও ২১	সূরা আল-বাকারার ১ম রুকু: অনুবাদ ও ব্যাখ্যা (আল-কুরআন, মুত্তাকি এবং কাফির সম্পর্কে)
পাঠ ২২, ২৩ ও ২৪	সূরা আল-বাকারার ২য় রুকু: অনুবাদ ও ব্যাখ্যা (মুনাফিক সম্পর্কে)
পাঠ ২৫, ২৬ ও ২৭	সূরা আল-বাকারার ৩য় রুকু: অনুবাদ ও ব্যাখ্যা (মহান আল্লাহর ইবাদত, সৃষ্টি, কুরআনের সত্যতার ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ, জান্নাত, দৃষ্টান্ত এবং ফাসিক সম্পর্কে)
পাঠ ২৮, ২৯ ও ৩০	সূরা আল-বাকারার ৪র্থ রুকু: অনুবাদ ও ব্যাখ্যা (হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টি সম্পর্কে)
পাঠ ৩১, ৩২ ও ৩৩	সূরা আল-বাকারার ৫ম রুকু: অনুবাদ ও ব্যাখ্যা (বনি ইসরাইল এবং সালাত সম্পর্কে)
পাঠ ৩৪, ৩৫ ও ৩৬	সূরা আল-বাকারার ৬ষ্ঠ রুকু: অনুবাদ ও ব্যাখ্যা (বনি ইসরাইলদের প্রতি আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ এবং তাদের অবাধ্যতা সম্পর্কে)
পাঠ ৩৭	সূরা বাকারার আলোকে মুত্তাকির পরিচয়
পাঠ ৩৮	সূরা বাকারার আলোকে কাফিরের পরিচয়
পাঠ ৩৯	সূরা বাকারার আলোকে মুনাফিকের পরিচয়
পাঠ ৪০	হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টি এবং পৃথিবীতে অবতরণের ইতিহাস
পাঠ ৪১	ইবলিসের পরিচয়
পাঠ ৪২	ফিরাউনের পরিচয়
পাঠ ৪৩	বনি ইসরাইল জাতি ও তাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ
পাঠ ৪৪	বনি ইসরাইলের দুষ্কর্মের বিবরণ
পাঠ ৪৫	গো-বৎস পূজার ঘটনা

পাঠ ১ আল-কুরআনের পরিচয়
Introduction to Al-Quran

পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহ তাআলার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। মানুষের ভোগ, ব্যবহার, সুখ-শান্তি, সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য তিনি পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে—

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا.

অর্থ: তিনিই মহান আল্লাহ, যিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৯)।

আল্লাহ তাআলা তাঁর নবি-রাসুলদের কাছে নাজিল করেন বিধি-বিধান সম্বলিত আসমানি কিতাব। হযরত আদম (আ.)-এর মাধ্যমে এ ধারা সূচিত হয়ে হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর মাধ্যমে সমাপ্তি ঘটে। মানবজাতির হেদায়েতের জন্য আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন যুগে নবি-রাসুলদের কাছে যেসব আসমানি কিতাব নাজিল করেছেন তার মধ্যে সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ হলো আল-কুরআন।

আভিধানিক পরিচয়

'আল-কুরআন'-এর বিষয়গত তাৎপর্য ও অন্তহীন গুরুত্বের জন্য আরবি ভাষাবিজ্ঞানীগণ এর নামটিকেও বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিশ্লেষণ করেছেন। কারণ, সর্বশেষ আসমানি কিতাবের এ নাম স্বয়ং মহান আল্লাহ প্রদত্ত। তাঁরা বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে আল-কুরআনের নামকরণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপস্থাপন করেছেন।

اَلْقُرْاٰنُ (কুরআন) শব্দটি দুটি শব্দমূল থেকে গঠিত হয়েছে:

১. اَلْقُرْاٰنُ শব্দটি قَرْءٌ শব্দমূল থেকে গঠিত। قَرْءٌ শব্দের অর্থ পাঠ করা, আবৃত্তি করা ইত্যাদি। আসমানি কিতাবগুলোর মধ্যে কুরআন সর্বাধিক পঠিত বিধায় একে কুরআন বলে নামকরণ করা হয়েছে।

২. আবার اَلْقُرْاٰنُ শব্দটি قَرْنٌ শব্দমূল থেকে গঠিত। قَرْنٌ শব্দের অর্থ মিল, সামঞ্জস্য, একত্র করা ইত্যাদি। কুরআনের একটি আয়াতের সাথে অন্য আয়াতের মিল বা সম্পর্ক আছে বিধায় একে কুরআন বলা হয়।

আশআরীয় ধর্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা আবুল হাসান আল আশআরী (রহ.)-এর মতে, আরবদের উক্তি— 'قَرَأْتُ الشَّئَ بِالشَّئِ' (কারাতুশ শাইআ বিশ শাই-ই) বা 'আমি একটি বস্তুকে অপরটির সাথে মিলিয়ে দিয়েছি' অংশের قَرَأْتُ (কারাতু) থেকে اَلْقُرْاٰنُ রূপান্তরিত হয়েছে। এ মহাগ্রন্থে পার্থিব ও পরকালীন জীবনাচারের সমন্বয় এবং সূরা, আয়াত, শব্দ ও বর্ণের মিলন লক্ষ করা যায়।

বেশিরভাগ ভাষাতত্ত্ববিদ ও মুফাস্‌সিরের মতে, اَلْقُرْاٰنُ শব্দটি বাবে فَتَحَ – يَفْتَحُ থেকে قَرَءَ (কারাআ) ক্রিয়ার মাসদার বা ক্রিয়ামূল। কাজেই আল-কুরআন অর্থ পাঠ করা। অন্য একটি মত হচ্ছে, কুরআন শব্দটি এসেছে قُرْنٌ থেকে, আর অর্থ সংগ্রহ ও একত্রিত করা। আবার مَقْرُوْءٌ বা পঠিত অর্থে ব্যবহৃত হয়। জিবরাইল (আ.) মহানবি (সা.)-কে এ মহাগ্রন্থটি পাঠ করে শোনাতেন। তাছাড়া এটি বিশ্বের সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ।

সাধারণ বিবেচনায় اَلْقُرْاٰنُ (আল-কুরআন) শব্দটির মধ্যে আভিধানিকভাবে একত্র করা, সংগ্রহ করা, পাঠ বা আবৃত্তি করা প্রভৃতি অর্থের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

পারিভাষিক পরিচয়

মুফাস্‌সিরগণ বিভিন্নভাবে আল-কুরআনকে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

মিশরের ইসলামি গবেষক **আল্লামা যারকানী (রহ.) বলেন—** 'কুরআন মাজিদ হলো সে কালামসমষ্টি যা মুতাওয়াতির বা অবিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণিত, যা তিলাওয়াত করা হয় এবং যার তিলাওয়াত মহান আল্লাহর ইবাদত হিসেবে গণ্য।'

প্রখ্যাত ভারতীয় আলেম মাওলানা **আশরাফ আলী থানবী (রহ.) বলেন—** 'আল-কুরআন হলো শব্দ ও অর্থ উভয়ের সমষ্টি, এটি মহান আল্লাহর সে কালাম যা তাঁর থেকে হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর ওপর নাজিল হয়েছে এবং হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর কাছ থেকে সংশয়হীন পদ্ধতিতে মাসহাফে লিখিত হয়ে আমাদের কাছে পৌঁছেছে।'

হানাফি মাযহাবের বিখ্যাত উসূলুল ফিকহের কিতাব আল-মানার-এর গ্রন্থকার আন-নাসাফী (রহ.) বলেছেন:

اَلْكِتَابُ هُوَ الْقُرْاٰنُ الْمُنَزَّلُ عَلَى الرَّسُوْلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْمَكْتُوْبُ فِي الْمَصَاحِفِ اَلْمَنْقُوْلُ عَنْهُ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا بِلَا شُبْهَةٍ۔

"আল-কিতাব বা মহাগ্রন্থ হচ্ছে আল-কুরআন। যা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উপর অবতারিত এবং যা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে, আর তা রসূল (সা.) থেকে ধারাবাহিকভাবে সন্দেহাতীত পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে।"

মীযানুল আখবারের রচয়িতা, বায়তুল মুকাররমের তৃতীয় খতিব **মুফতি আমীমুল ইহসান বলেন—** 'কুরআন মাজিদ এমন এক আসমানি কিতাব যা আমাদের বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর ওপর নাজিল হয়েছে। এ গ্রন্থের ছোট্ট একটি সূরার মুকাবিলা করতে সারা দুনিয়ার মানুষ অক্ষমতা প্রকাশ করেছে।'

বস্তুত কুরআন মাজিদ মহান আল্লাহর বাণী। এটি লাওহে মাহফুজ থেকে জিবরাইল (আ.)-এর মাধ্যমে নবুয়তের দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে মহানবি (সা.)-এর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে; যা সন্দেহাতীত প্রক্রিয়ায় অদ্যাবধি অবিকল ও অবিকৃত অবস্থায় সুরক্ষিত হয়ে আসছে এবং যার শব্দ, অর্থ, মর্ম, উপস্থাপনা, বিন্যাস সবই আল্লাহ তাআলার নিজস্ব।

সংখ্যাতাত্ত্বিক পরিচয়

আল-কুরআনে ১১৪টি সূরা, ৫৫৪টি রুকু ও ৬২৩৬টি মতান্তরে ৬৬৬৬টি আয়াত আছে। নাজিলের সময় বিবেচনায় কুরআনের সূরাসমূহকে মক্কি ও মাদানি নামে বিন্যস্ত করা হয়েছে। ৮৬টি সূরা মক্কি আর অবশিষ্ট ২৮টি সূরা মাদানি।

অন্য একটি মতে, মক্কি সূরা ৯২টি এবং মাদানি সূরা ২২টি।

জুয: জুয (جُزْءٌ) অর্থ অংশ। পবিত্র কুরআন ৩০টি সমান অংশে বিভক্ত। এর প্রতিটি অংশকে একেকটি জুয বলা হয়। জুযকে পারাও বলা হয়।

মানজিল: মানজিল (مُنَزَّلٌ) অর্থ– অবতরণস্থল। কুরআন মাজিদকে সাত দিনে খতম (একবার পড়ে শেষ করা) করার সুবিধার্থে সাতটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। এর প্রতিটি ভাগকে একেকটি মানজিল বলা হয়।

কুরআনের সাতটি মানযিল নিম্নরূপ:

মানজিল-১ম: সূরা ফাতিহা থেকে সূরা নিসার শেষ পর্যন্ত।

মানজিল-২য়: সূরা মায়িদার শুরু থেকে সূরা তওবার শেষ পর্যন্ত।

মানজিল-৩য়: সূরা ইউনুসের শুরু থেকে সূরা নাহলের শেষ পর্যন্ত।

মানজিল-৪র্থ: সূরা বনি ইসরাইলের শুরু থেকে সূরা ফুরকানের শেষ পর্যন্ত।

মানজিল-৫ম: সূরা শুআরার শুরু থেকে সূরা ইয়াসীনের শেষ পর্যন্ত।

মানজিল-৬ষ্ঠ: সূরা সফফাতের শুরু থেকে সূরা হুজুরাতের শেষ পর্যন্ত।

মানজিল-৭ম: সূরা কাফ এর শুরু থেকে সূরা নাসের শেষ পর্যন্ত।

শব্দ সংখ্যা: কুরআন মাজিদের শব্দ সংখ্যার ব্যাপারে তিনটি মত পাওয়া যায়। কতিপয় মনীষীর গণনা মতে, কুরআনের শব্দ সংখ্যা ৭৭৪৩৪টি। অন্যদের গণনা মতে, কুরআনের শব্দ সংখ্যা ৭৭২৭৭টি। আবার কেউ কেউ গণনা করে বলেছেন, এর শব্দ সংখ্যা ৭৭৪৩৭টি।

সূরা আল-ফাতিহা আল-কুরআনের প্রথম সূরা। আর শেষ সূরা আন-নাস। কুরআনের সর্ববৃহৎ সূরা আল-বাকারা। এটি আল-কুরআনের দ্বিতীয় সূরা। এতে ৪০টি রুকু ও ২৮৬টি আয়াত আছে। এ সূরার ২৮২ নম্বর আয়াত কুরআনের সর্ববৃহৎ আয়াত। কুরআনের ১০৮তম সূরা আল-কাওসার হলো ক্ষুদ্রতম সূরা। এর ৭৩তম সূরা মুয্যাম্মিলের ২০ নম্বর আয়াত হলো একমাত্র রুকু যা এক আয়াতসম্বলিত।

আল-কুরআনের ৯ম সূরা আত-তাওবা হলো এমন সূরা যার শুরুতে তাসমিয়াহ (বিসমিল্লাহ) লেখা হয়নি এবং ২৭তম সূরা আন-নামল হলো একমাত্র সূরা যাতে দুবার তাসমিয়ার উল্লেখ রয়েছে।

কুরআন মাজিদে সূরাসমূহের ক্রমধারা ও বিন্যাস ওহি (وَحْيٌ) দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে। আর একে মানজিল ও জুযে বিন্যস্ত করা হয়েছে হাদিসের আলোকে। পরবর্তীতে প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে কুরআনে ই'রাব ও যতিচিহ্ন সংযোজিত হয়েছে।

জেনে রাখো

আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত সংখ্যা:

জান্নাতের ওয়াদা—১০০০, জাহান্নামের ভয়—১০০০
আদেশ—১০০০, নিষেধ—১০০০
উদাহরণ—১০০০, কাহিনি—১০০০
হালাল—২৫০, হারাম—২৫০
মহান আল্লাহর পবিত্রতা—১০০, বিবিধ—৬৬

অধীত বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

পবিত্র কুরআনের:

— মোট সূরা ১১৪টি, মক্কি সূরা ৮৬টি, মাদানি সূরা ২৮টি।
— মোট মানজিল ৭টি, পারা বা অংশ ৩০টি।
— সিজদার আয়াত ১৪টি।
— প্রথম হাফিজ হযরত মুহাম্মাদ (সা.)।
— আল-কুরআনে হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর নাম আছে ৪ বার। যথা—

১. আলে ইমরান, আয়াত: ১৪৪; ২. আল-আহযাব, আয়াত: ৪০; ৩. মুহাম্মাদ, আয়াত: ২; ৪. আল-ফাতহ, আয়াত: ২৯।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আল-কুরআন কী? *[রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. ২০১৮]*
২. সর্বশেষ আসমানি কিতাবের নাম কার প্রদত্ত?
৩. কুরআন শব্দের অর্থ কী?
৪. পবিত্র কুরআনে কয়টি আয়াত আছে? *[রা. বো., সি. বো. ২০১৯]*
৫. আল-কুরআনে মক্কি ও মাদানি সূরার সংখ্যা কত?
৬. কুরআন মাজিদকে মানজিল ও জুযে বিন্যস্ত করা হয়েছে কীসের আলোকে?

উত্তরের জন্য দেখো ১১০ পৃষ্ঠা।

খ. একক কাজ

শিক্ষার্থীরা আল-কুরআনের পরিচয় সম্পর্কে ৫টি বাক্য লিখবে এবং তা শ্রেণিশিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ২ আল-কুরআনের বৈশিষ্ট্য
Characteristics of Al-Quran

আল-কুরআন মহান আল্লাহর কালাম। এর রচনাশৈলী ও বিষয়বিন্যাস স্বতন্ত্র। এ গ্রন্থ বিষয়ভিত্তিক ধ্যান-ধারণায় রচিত নয়। স্বকীয় উপস্থাপনা ও বিষয়বৈচিত্র্যের কারণে কুরআন অনবদ্য বিশিষ্টতা পেয়েছে।

পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান: আল-কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ۔

অর্থ: আর আমি আপনার ওপর কিতাব নাজিল করেছি, তা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, সুপথের নির্দেশনা, রহমত এবং মুসলিমদের জন্য সুসংবাদ (সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৮৯)।

তিনি আরও বলেন— مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

অর্থ: এ কিতাবে আমি কোনো কিছু লিপিবন্ধ করা বাকি রাখিনি (সূরা আল-আনআম, আয়াত: ৩৮)।

ত্রুটিহীন গ্রন্থ: মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের প্রথম ও প্রধান অলৌকিকতা হলো- এ গ্রন্থ নিজেই সংশয়, সন্দেহ ও ত্রুটিহীনতার ঘোষণা দিয়েছে। কুরআনের শুরুতেই সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে,

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ۔

অর্থ: (আল-কুরআন) সে কিতাব যাতে কোনো সন্দেহ নেই, এতে মুত্তাকিদের (আল্লাহভীরু) জন্য রয়েছে পথের দিশা সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২)।

মর্যাদাপূর্ণ গ্রন্থ: আসমানি কিতাবসমূহের মধ্যে মর্যাদায় কুরআনই সর্বশ্রেষ্ঠ। মহান আল্লাহ বলেন—

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ (ط)

অর্থ: এ কুরআন যদি আমি পর্বতের ওপর নাজিল করতাম, তাহলে তুমি দেখতে তা মহান আল্লাহর ভয়ে নত ও বিদীর্ণ হয়ে যেত (সূরা আল-হাশর, আয়াত: ২১)। তিনি আরও বলেন— 'নিশ্চয়ই এটা মর্যাদাপূর্ণ কুরআন যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে। যারা পূতপবিত্র তারা ছাড়া অন্য কেউ একে স্পর্শ করবে না' (সূরা আল-ওয়াকিয়া, আয়াত: ৭৭-৭৯)।

আল-কুরআনের মর্যাদার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন আল্লাহ তাআলা কুরআন নাজিলের মাস হিসেবে রমজানকে মর্যাদাসম্পন্ন ঘোষণা দেন। কুরআন নাজিলের রাত পরিণত হয় হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ রাতে। ইরশাদ হয়েছে— 'নিশ্চয়ই এ কুরআনকে আমি কদরের রাতে নাজিল করেছি। আপনি কদর রাত সম্পর্কে কি জানেন? কদর রাত হলো হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ' (সূরা আল-কদর, আয়াত: ১-৩)।

শাশ্বত সত্য: আল-কুরআন সর্বজনীন ও সর্বকালীন এক চিরন্তন সত্য মহাগ্রন্থ। এ গ্রন্থের সংশয়হীনতা ও অভ্রান্ত নির্দেশনা এতটাই সুনিশ্চিত ও অকাট্য যে, তা সব কালের ও সব দেশের মানুষের জন্য প্রযোজ্য। আল্লাহ তাআলা এর সত্যতা খণ্ডনের সর্বাত্মক চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করে বলেন—

وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ۖ وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ۔

অর্থ: আর তোমাদের যদি কোনো সন্দেহ হয় যা আমি আমার বান্দার ওপর নাজিল করেছি তা সম্পর্কে, তাহলে তার মতো একটি সূরা রচনা করো এবং মহান আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সহযোগীদের ডাকো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৩)। কিন্তু কুরআন নাজিল পরবর্তী দেড় সহস্রাব্দের পরও এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার মতো কোনো সংশয়বাদীকে পাওয়া যায়নি।

নির্ভুল ভবিষ্যৎ বক্তা: কুরআন মাজিদ ভবিষ্যতের অজানা-অদৃশ্য অসংখ্য ঘটনা ও বিষয় সম্পর্কে নির্ভুল বিবরণ পেশ করেছে। মুসলিমদের মক্কা বিজয়, রোম বিজয়, মহানবি (সা.)-এর বিরুদ্ধে ইহুদিদের ষড়যন্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে কুরআন শতভাগ নিখুঁত ও অকাট্য ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে এর অলৌকিকত্বকে অবিসংবাদিত করে তুলেছে।

ইতিহাস গ্রন্থ: আ'দ-সামুদ জাতি বা নমরুদ, ফিরাউন, কারুন প্রমুখ ব্যক্তি- যাদেরকে আল্লাহ তাআলা অবাধ্যতার জন্য ধ্বংস করে দিয়েছেন, যাদের সম্পর্কে লিখিত বা প্রামাণ্য কোনো যথার্থ তথ্য অবশিষ্ট নেই, কুরআন মাজিদ তাদের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরেছে। মহান আল্লাহ বলেন—

هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ. فِرْعَوْنَ وَثَمُوْدَ.

অর্থ: সেনাবাহিনীর ইতিবৃত্ত আপনার কাছে পৌঁছেছে কি? ফিরাউন ও সামুদের (সূরা আল-বুরুজ, আয়াত: ১৭-১৮)।

কুরআনে মানুষের উৎপত্তি, পৃথিবীতে আগমন, তাদের বিকাশ, পূর্ববর্তী নবি-রাসুলদের জীবন, ধর্মপ্রচার, বাধা-বিঘ্ন ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলির নিখুঁত বিবরণ রয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনাচার ও সমকালীন পৃথিবীর সর্বাধিক বিশ্বাস্য দলিল কুরআন মাজিদ। মহান আল্লাহ বলেন—

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ (ط) وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ

অর্থ: আমি আপনার কাছে উত্তম কাহিনি বর্ণনা করেছি। সেজন্য আমি আপনার কাছে এ কুরআন নাজিল করেছি। এর আগে এ ব্যাপারে আপনি অবশ্যই অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৩)।

সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য: আল-কুরআন সম্পূর্ণ পদ্য কিংবা পুরোপুরি গদ্য নয়। বরং এ দুয়ের সংমিশ্রণে নাজিল হওয়া এক অভূতপূর্ব গ্রন্থ। শব্দচয়ন, উপমা নির্বাচন, শিল্পমান, ছন্দমূর্ছনা, রচনাশৈলী, অভিনব গ্রন্থনা, প্রাঞ্জল ভাষা, বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব কুরআনকে সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যে পরিণত করেছে।

জ্ঞানের মূল উৎস: সবরকমের জাগতিক, বৈষয়িক ও ধর্মীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল উৎস আল-কুরআন। এ মহাগ্রন্থে ব্যাকরণ, আইন, গণিত, চিকিৎসাবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, দর্শন, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস, সাহিত্য, তর্কশাস্ত্র, অলংকারশাস্ত্র, ফারাইজ (সম্পদ বণ্টনশাস্ত্র), বর্ষপঞ্জীসহ জীবনঘনিষ্ঠ সব প্রয়োজনীয় জ্ঞানের মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন— চিকিৎসা বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন—

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ (ط) وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا.

অর্থ: আমি কুরআনে এমন বিষয় নাজিল করেছি যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মুমিনদের জন্য রহমত। গোনাহগারদের তো এতে শুধু ক্ষতিই বৃদ্ধি পায় (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত: ৮২)।

মহাকাশবিজ্ঞান সম্পর্কে বলা হয়েছে, وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ. **অর্থ:** আর তারা (গ্রহ-নক্ষত্র) প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে মহাশূন্যে পরিভ্রমণ করছে (সূরা ইয়াসিন, আয়াত: ৪০)। এজন্য কুরআন মাজিদকে মহান আল্লাহ বলেছেন 'আল-হিকমা' বা জ্ঞান ও প্রজ্ঞা (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত: ৩৯) এবং আল-হাকিম বা জ্ঞানগর্ভ, বিজ্ঞানময় (সূরা ইয়াসিন, আয়াত: ২)।

গবেষণা-আবিষ্কারের প্রেরণা: কুরআন বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের নেপথ্যে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। যেমন— রেফ্রিজারেটরের ধারণাটি পাওয়া যায় উটের পানি জমা করে রাখা পদ্ধতির মধ্যে। আল্লাহ তাআলা এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন—

اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ـ

অর্থ: তারা কি উটের প্রতি লক্ষ করে না যে, কীভাবে তা সৃষ্টি করা হয়েছে? (সূরা আল-গাশিয়াহ, আয়াত: ১৭)।

নিরন্তর গবেষণার নির্দেশ দিয়ে তিনি বলেছেন, - فَاعْتَبِرُوْا يٰاُولِى الْاَبْصَارِ

অর্থ: অতএব হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিবর্গ! তোমরা গবেষণা ও শিক্ষা গ্রহণ কর (সূরা আল-হাশর, আয়াত: ২)।

হৃদয়স্পর্শী: আল-কুরআনের তিলাওয়াত ব্যক্তির হৃদয় প্রশান্ত ও তৃপ্ত করে। যতবার তিলাওয়াত করা হোক প্রতিবারই এর তিলাওয়াত ব্যক্তিকে নতুন চেতনায়, শ্রেয়তর কল্যাণচিন্তায় উদ্দীপ্ত করে। বস্তুত মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এ মহাগ্রন্থ শ্রেষ্ঠতম মুজিযা (অলৌকিক নিদর্শন)। এজন্য এর তিলাওয়াতে মানুষ মহান আল্লাহর জিকিরে (স্মরণ) নিমগ্ন হয়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন—

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ـ

অর্থ: মহান আল্লাহর স্মরণে অন্তরসমূহ প্রশান্ত ও পরিতৃপ্ত হয় (সূরা রা'দ, আয়াত: ২৮)। কুরআন মাজিদের তিলাওয়াত ও শ্রবণ কোনো পাঠক বা শ্রোতাকে ক্লান্ত ও বিরক্ত করে না বরং তাদের হৃদয়ে এক স্বর্গীয় শান্তি ও তৃপ্তির ঝর্ণাধারা বয়ে আনে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, উমর বিন খাত্তাব (রা.) ছিলেন দুর্ধর্ষ কাফের (অবাধ্য)। হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে হত্যা করাই তাঁর লক্ষ্য ছিল। কিন্তু নির্যাতিত বোন ফাতিমার কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত শুনে তিনি এতটাই বিগলিত হন যে, সাথে সাথে ইসলাম গ্রহণের জন্য হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর কাছেই ছুটে যান।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আল-কুরআন কী কারণে অনবদ্য বিশিষ্টতা পেয়েছে?

২. আল-কুরআনে পূর্ণাঙ্গ বিধান কে দিয়েছেন?

৩. মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের প্রথম ও প্রধান অলৌকিকতা কী?

৪. আল-কুরআন মুত্তাকি বা পরহেজগারদের জন্য কী?

৫. কোন গ্রন্থ নিজেই নিজের সংশয়, সন্দেহ ও ত্রুটিহীনতার ঘোষণা দিয়েছে?

৬. কোন গ্রন্থে ভবিষ্যতের অজানা-অদৃশ্য অসংখ্য ঘটনা ও বিষয় সম্পর্কে নির্ভুল বিবরণ পেশ করা হয়েছে।

উত্তরের জন্য দেখো ১১০ পৃষ্ঠা।

খ. একক কাজ

১. আল-কুরআনের বৈশিষ্ট্য 'পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান' ও 'ত্রুটিহীন গ্রন্থ' সম্পর্কে লিখে শ্রেণিশিক্ষককে দেখাবে।

২. আল-কুরআন কীভাবে গবেষণা ও আবিষ্কারের প্রেরণা দেয়— তা লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৩ আল-কুরআনের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য
Importance and Superiority of Al-Quran

আল-কুরআনের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য অপরিসীম। মানুষের জীবনযাপনের সংবিধান হিসেবে আল্লাহ তাআলা এ মহাগ্রন্থ নাজিল করেছেন। তাই আল-কুরআন হলো মানুষের সফলতা ও ব্যর্থতার প্রকৃত মানদণ্ড।

১. **সঠিক পথের দিশা:** আল-কুরআন হলো সঠিক পথের দিশা। এর পঠন ও অনুসরণ মানুষকে সিরাতুল মুস্তাকিম তথা চিরসত্য, শাশ্বত, সুন্দর পথে পরিচালিত করে। তাই জীবনপথের প্রকৃত নির্দেশনা হিসেবে আল-কুরআন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থ।

২. **সব মানুষের জন্য উপদেশ দানকারী:** আল-কুরআন কোনো বিশেষ দেশ, অঞ্চল বা জাতির জন্য নাজিল হয়নি; এটি বিশ্বের সব মানুষের জন্য উপদেশদাতা হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন— إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. **অর্থ:** এ গ্রন্থ বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ ছাড়া অন্য কিছু নয় (সূরা আত-তাকভির, আয়াত: ৮৭)।

৩. **অন্যান্য আসমানি কিতাবের সারনির্যাস ও সত্যায়নকারী:** আল্লাহ তাআলা যুগের চাহিদা অনুযায়ী রাসুলগণের ওপর আসমানি কিতাব নাজিল করেছেন। পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবসমূহে যেসব তথ্য ও নির্দেশনা রয়েছে তার নির্যাস আল-কুরআনে সন্নিবেশিত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন— وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ **অর্থ:** এ কুরআন তো পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে যা আছে তার সমর্থক/সত্যায়নকারী, সবকিছুর বিশদ বিবরণ, পথনির্দেশ এবং মুমিনদের জন্য রহমতস্বরূপ (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ১১১)।

৪. **ইমানি চেতনা জাগ্রতকারী গ্রন্থ:** কুরআন মাজিদ অতুলনীয় ভাষা-অলংকারে পরিপূর্ণ। এর প্রতিটি আয়াত মুমিনদের মধ্যে ইমানি চেতনা জাগ্রত করে। মহান আল্লাহ বলেন— اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ
অর্থ: মহান আল্লাহ নাজিল করেছেন উত্তম বাণীসম্বলিত কিতাব; যা সুসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যা পুনঃপুন আবৃত্তি করা হয়। এতে যারা তাদের রবকে ভয় করে (কিতাব শোনার পর) তাদের শরীর কেঁপে ওঠে। অতঃপর তাদের দেহ ও মন প্রশান্ত হয়ে মহান আল্লাহর স্মরণের প্রতি ঝুঁকে পড়ে (সূরা আয-যুমার, আয়াত: ২৩)।

৫. **ব্যক্তিজীবনে কুরআনের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য:** ব্যক্তি বৃহত্তর মানবসমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এজন্য কুরআন প্রথমেই ব্যক্তিকে কুফর (অবাধ্যতা), শিরক (বহুঈশ্বরবাদ), পৌত্তলিকতা (মূর্তিপূজা) প্রভৃতি অসার বিশ্বাস বর্জন করে তাওহিদ (একত্ববাদ), রিসালাত ও আখিরাতে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণের আহ্বান জানিয়েছে। কুরআন ব্যক্তিকে সাধারণত সংসারী, ধার্মিক এবং কর্মমুখর হওয়ার নির্দেশনা দিয়েছে। কুরআনে সংসারত্যাগ করা বা বৈরাগ্য জীবনযাপন করাকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।

৬. **পারিবারিক জীবনে গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য:** মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি, স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন নিয়ে মুসলিম পরিবার গড়ে ওঠে। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস, ভালোবাসা, সহানুভূতি, সৌহার্দ ও সম্প্রীতি এবং সর্বাত্মক সহযোগী মনোভাব প্রতিষ্ঠার জন্য কুরআন যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। কুরআন বিভিন্নভাবে নিকটাত্মীয়দের নানা রকমের হক নির্ধারণ করে দিয়ে তা আদায়ের পথ নির্দেশ করেছে এবং এর মাধ্যমে পারিবারিক কাঠামো, শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষণ নিশ্চিত করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন— 'তোমরা নেক ও তাকওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো, পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না' (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত: ২)।

৭. **সমাজজীবনে কুরআনের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য:** মানুষ সামাজিক জীব। আত্মীয়-অনাত্মীয়, মুসলিম-অমুসলিম, পাড়া-প্রতিবেশী নিয়ে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে তাকে সামাজিক জীবনযাপন করতে হয়। অবিচার, জুলুম, অধিকার আত্মসাৎ, হত্যা, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, ব্যভিচার ও নানারকম খারাপ আচরণ মানুষের সামাজিক জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। এ অবস্থা নিরসনে কুরআন ন্যায়বিচার, সদাচার ও প্রয়োজনীয় দণ্ডবিধানের ঘোষণা দিয়েছে। সহানুভূতি, সদাচার ও ন্যায়নীতির ভিত্তিতে কুরআন মাজিদ মানুষের সামাজিক জীবনকে সমস্যামুক্ত ও শান্তিপূর্ণ করার সামগ্রিক বিধান দিয়েছে।

৮. **রাষ্ট্রীয় জীবনে কুরআনের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য:** শাসকদের উদাসীনতা ও দুঃশাসন, নাগরিকদের অবাধ্যতা এবং দায়িত্বহীনতা এবং শাসক ও শাসিতের মধ্যে সম্পর্কহীনতাই রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রধান সমস্যা। এ সমস্যা মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপন ব্যাহত করে। এ সমস্যা নিরসনে শাসকদের জন্য কুরআনের নির্দেশনা হলো— "আর গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্মে তাদের (মানুষদের) সাথে পরামর্শ করো" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৫৯)।

৯. **অর্থনৈতিক জীবনে কুরআনের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য:** সম্পদের অসমবন্টন, উপার্জন ও ব্যয়ে হারাম পদ্ধতি অনুসরণ, সম্পদ আত্মসাৎ, সুদ, ঘুষ প্রভৃতি হচ্ছে মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা। কুরআন এ সমস্যা সমাধানে শ্রমনির্ভর ও জাকাতভিত্তিক এবং সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থা চালুর নির্দেশনা দিয়েছে। অসম অর্থবন্টন রোধে আল্লাহ তাআলা জাকাত প্রথার প্রবর্তন করেছেন। এ ব্যবস্থায় ধনীর সম্পদে গরিবের বিধিসম্মত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কুরআনে এসেছে— وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ **অর্থ:** আর তোমরা সালাত কায়েম করো ও জাকাত দাও (সূরা আল-বাকারা, আয়াত, আয়াত: ৪৩)। অর্থব্যবস্থাকে শোষণমুক্ত রাখতে সুদ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে— وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
অর্থ: আর মহান আল্লাহ কেনাবেচা হালাল করেছেন আর সুদকে হারাম করেছেন (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৭৫)।

১০. **শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনে কুরআনের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য:** নীতি ও আদর্শহীন শিক্ষা এবং অশালীন সংস্কৃতির চর্চা শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের মূল সমস্যা। তাছাড়া অশিক্ষা মানুষকে কুসংস্কারপূর্ণ অন্ধকার জীবনে ঠেলে দেয়। এ সমস্যা সমাধানে কুরআন সবার জন্য শিক্ষাগ্রহণ ফরজ করেছে এবং সব অশালীন আচরণ নিষিদ্ধ করেছে। মহান আল্লাহ বলেন— اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ **অর্থ:** পড়ো তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন (সূরা আল-আলাক, আয়াত: ১)।

অশোভন সংস্কৃতির চর্চা নিষিদ্ধ করে মহান আল্লাহ বলেছেন, 'আপনি বলে দিন, আমার পালনকর্তা অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন- যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য' (সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ৩৩)।

১১. **পার্থিব জীবনে কুরআনের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য:** কুরআনে পার্থিব জীবনকে উপেক্ষা করতে বলা হয়নি। আল্লাহ তাআলা বলেন— فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ **অর্থ:** অতঃপর সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং মহান আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করো (সূরা আল-জুমুআ, আয়াত: ১০)।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মানুষের সফলতা ও ব্যর্থতার প্রকৃত মানদণ্ড কী?
২. বিশ্বের সব মানুষের জন্য উপদেশদাতা হিসেবে কোন গ্রন্থটি অবতীর্ণ হয়েছে?
৩. পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবসমূহের সারনির্যাস ও সত্যায়নকারী গ্রন্থের নাম কী?
৪. কুরআনের প্রতিটি আয়াত মুমিনদের কী জাগ্রত করে?
৫. অসম অর্থবন্টন রোধে আল্লাহ তাআলা কুরআনের নির্দেশ দ্বারা কী প্রবর্তন করেছেন?
৬. নীতি ও আদর্শহীন এবং অশালীন সংস্কৃতির শিক্ষা সমাজের কোন ক্ষেত্রের মূল সমস্যা?

উত্তরের জন্য দেখো ১১০ পৃষ্ঠা।

খ. দলীয় কাজ

শিক্ষার্থীরা দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে একদল পরিবারিক জীবনে আল-কুরআনের গুরুত্ব এবং অন্যদল অর্থনৈতিক জীবনে আল-কুরআনের গুরুত্ব আলোচনা করবে। শ্রেণিশিক্ষক সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

পাঠ ৪ আল-কুরআনের কতিপয় নাম
Several Names of Al-Quran

মিশরের বিজ্ঞজন আস-সুয়ুতি (রহ.) আল-কুরআনের ৫৫টি নাম উল্লেখ করেছেন। হানাফি পণ্ডিত, পাকিস্তানের শরিয়া আদালতের বিচারক মুহাম্মদ তকি উসমানি (রহ.) আল-কুরআনের নাম ৯০টিরও অধিক বলে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি আল-কুরআনের প্রকৃত নাম ৫টি ছাড়া অন্যগুলোকে তার বিশেষণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইমাম জারকানি (রহ.) বলেন— কুরআনুল কারিমের গুণবাচক নামগুলোকেও মূল নামে আখ্যা দেওয়ার ফলে এর সংখ্যা এতো অধিক হয়েছে। বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে, আল-কুরআনের সর্বমোট নাম ৪টি। যেমন— ১. আল-কুরআন, ২. আল-ফুরকান, ৩. আজ-জিকর, ৪. আত-তানজিল।

কুরআন মাজিদের পরিচিতি তুলে ধরার জন্য আল্লাহ তাআলা আল-কুরআনের বিভিন্ন সূরায় এ মহাগ্রন্থকে 'কুরআন' ছাড়া আরও বিভিন্ন নামে অভিহিত করেছেন। যেমন–

১. আল-ফুরকান (اَلْفُرْقَانُ) বা হক ও বাতিলের পার্থক্যকারী। কারণ আল-কুরআন সত্য ও মিথ্যার মধ্যে, ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে।

২. আল-কিতাব (اَلْكِتَابُ) বা স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থ। কুরআন মাজিদ সব দিক বিবেচনাতেই একখানি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ।

৩. আজ-জিকর (اَلذِّكْرُ) বা স্মারক, উপদেশ। কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের স্মারক এবং তাঁর উপদেশ বর্ণিত হয়েছে।

৪. আল-মাওয়িজা (اَلْمَوْعِظَةُ) বা উপদেশ। আল-কুরআনে বিশ্বমানবের জন্য আল্লাহ তাআলা উত্তম ও কল্যাণকর উপদেশ দিয়েছেন।

৫. আল-হিকমা (اَلْحِكْمَةُ) বা বিজ্ঞানময়।

৬. আশ-শিফা (اَلشِّفَاءُ) বা নিরাময়। কুরআন মাজিদ হলো মানুষের অন্তরের ব্যাধিসমূহের প্রতিষেধক।

৭. আল-হুদা (اَلْهُدٰى) বা পথনির্দেশ। আল-কুরআন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশ্বমানবের জন্য হেদায়েত বা পথনির্দেশ।

৮. আর-রাহমাহ (اَلرَّحْمَةُ) বা অনুগ্রহ, দয়া।

৯. আল-খায়র (اَلْخَيْرُ) বা মঙ্গল, কল্যাণ। কুরআন মাজিদ পৃথিবীর সব মানুষের জন্য বিশ্বজনীন কল্যাণ ও চিরায়ত মঙ্গলের প্রতীক।

১০. আল-বুরহান (اَلْبُرْهَانُ) বা স্পষ্ট প্রমাণ। তাওহিদ, রিসালাত এবং ইসলামের সত্যতা এবং অন্য সব কিছুর পক্ষে কুরআন হলো স্পষ্ট প্রমাণ।

১১. আন-নুর (اَلنُّوْرُ) বা জ্যোতি। সঠিক পথে চলার জন্য কুরআন হলো মহান আল্লাহ প্রদত্ত জ্যোতি।

১২. আল-হক (اَلْحَقُّ) বা সত্য। এ মহাগ্রন্থের সব বিষয় ও বক্তব্য এক পরম সত্যের প্রকাশ।

১৩. আন-নিয়ামত (اَلنِّعْمَةُ) বা দান, অনুগ্রহ।

১৪. আল-মুহাইমিন (اَلْمُهَيْمِنُ) বা সংরক্ষক, অভিভাবক।

১৫. আর-রূহ (اَلرُّوْحُ) বা আত্মা, জীবন।

১৬. আল-বালাগ (اَلْبَلَاغُ) বা প্রচারধারা, প্রচারক।

১৭. আল-মাছানি (اَلْمَثَانِيْ) বা পুনরাবৃত্তিকারী।

১৮. আল-মাজিদ (اَلْمَجِيْدُ) বা মর্যাদাপূর্ণ।

১৯. আল-বায়্যিনাহ (اَلْبَيِّنَةُ) বা স্পষ্ট প্রমাণ।

২০. আল-বায়ান (اَلْبَيَانُ) বা বিবরণ, বর্ণনাকারী।

২১. আল-মুফাসসাল (اَلْمُفَصَّلُ) বা বিশদ বিবরণ।

২২. আস-সিরাতুল মুসতাকিম (اَلصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ) বা সঠিক পথ।

২৩. আত-তানজিল (اَلتَّنْزِيْلُ) বা অবতীর্ণ।

২৪. আল-কালাম (اَلْكَلَامُ) বা বাণী।

২৫. আল-হাবলু (اَلْحَبْلُ) বা রজ্জু, রশি।

২৬. আল-মুছাদ্দিক (اَلْمُصَدِّقُ) বা সত্যায়নকারী।

২৭. আল-আলিয়্যু (اَلْعَلِيُّ) বা মহিয়ান, সুউচ্চ।

২৮. আল-মুবিন (اَلْمُبِيْنُ) বা স্পষ্ট বর্ণনাকারী।

২৯. আল-মুহকাম (اَلْمُحْكَمُ) বা দ্ব্যর্থহীন।

৩০. আল-মাসহাফ (اَلْمُصْحَفُ) বা ফলক, গ্রন্থ।

৩১. আল-হাকিম (اَلْحَكِيْمُ) বা প্রজ্ঞাবান।

৩২. আল-বুশরা (اَلْبُشْرٰى) বা সুসংবাদদাতা।

৩৩. আল-কাসাস (اَلْقَصَصُ) বা কাহিনিসমূহ।

জেনে রাখো

কুরআনের বহু নামের হিকমত

কোনো একটি বিষয়ের একাধিক নাম থাকা বিষয়টির মর্যাদা এবং পূর্ণতাকে প্রকাশ করে। যেমন, চতুর ব্যক্তির বহু নাম থাকা চাতুর্যে তার অস্বাভাবিক পারদর্শিতা এবং এ বিষয়ে তার সূক্ষ্ম জ্ঞান থাকাকে বোঝায়। ঠিক তেমনি— আল্লাহ তাআলার অনেক নাম থাকা তার পরিপূর্ণ আজমত ও বড়ত্বকে বোঝায়। কুরআনের বহু নামও এ মহাগ্রন্থের মর্যাদা ও ফজিলতকে নির্দেশ করে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আল্লামা আস-সুয়ুতি (রহ) আল-কুরআনের কয়টি নাম উল্লেখ করেছেন?
২. বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে, আল-কুরআনের সর্বমোট নাম কয়টি?
৩. اَلْفُرْقَانُ (আল-ফুরকান) অর্থ কী?
৪. اَلْكِتَابُ (আল-কিতাব) অর্থ কী? *[সকল বোর্ড ২০২৫]*
৫. اَلذِّكْرُ (আজ-জিকর) অর্থ কী? *[সকল বোর্ড ২০১৯]*
৬. اَلْحَكِيْمُ (আল-হাকিম) অর্থ কী?

উত্তরের জন্য দেখো ১১০ পৃষ্ঠা।

খ. একক কাজ

আল-কুরআনের নামগুলো থেকে ১০টি নাম অর্থসহ লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৫ আল-কুরআনের আলোচ্য বিষয়
Subject Matter of Al-Quran

আল-কুরআনের মূল আলোচ্য বিষয় মানুষ। মহান আল্লাহ বলেন— اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ.

অর্থ: এটাতো কেবল বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ (সূরা আত-তাকভির, আয়াত: ২৭)।

আল-কুরআনে মানব জীবনের সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচিত হয়েছে। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের অসংখ্য দিক বিশ্লেষিত হয়েছে। মৌলিক সব সমস্যা সমাধানের মূলনীতি বিবৃত হয়েছে। তা সত্ত্বেও একটি বিশেষ বিবেচনায় আল-কুরআনের প্রধান আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মানুষ। কারণ; এ আসমানি কিতাবে কিসে মানুষের কল্যাণ আর কিসে তার অকল্যাণ সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

কুরআনের আলোচ্য বিষয় বা বিষয়বস্তুর ধরন ও প্রকৃতি বিবেচনা করে খ্যাতিমান মুহাদ্দিস শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ.) 'আল-ফাওযুল কাবীর' গ্রন্থে এগুলোকে পাঁচটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করেছেন। যেমন—

১. **শরিয়তের বিধিবিধান বর্ণনা:** ইবাদত, লেনদেন, সামাজিক আচরণ, পরিবার পরিচালনা, অর্থ, ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রনীতি বিষয়ক ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব, মুবাহ, মাকরুহ, হালাল, হারাম প্রভৃতি বিধানের মূলনীতি পেশ করা হয়েছে।

২. **বিতর্ক বিষয়ক জ্ঞান:** ইহুদি, খ্রিষ্টান, মুশরিক, মুনাফিক ও কাফিরদের ভ্রান্ত আকিদার অসারতা প্রমাণ এবং তাদের সাথে উত্তম পন্থায় বিতর্ক করার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে।

৩. **মহান আল্লাহর অনুগ্রহের অবহিতি বিষয়ক জ্ঞান:** মানুষ মহান আল্লাহর নিয়ামতে ধন্য আশরাফুল মাখলুকাত। বিশ্বজাহানের সবকিছু মানুষের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। কুরআনে মানুষকে দেওয়া মহান আল্লাহর এ অসংখ্য ও বিপুল নিয়ামতরাজি এবং তার অনুকূলে মানুষের কৃতজ্ঞতা পোষণের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

৪. **অতীত জাতিসমূহকে মহান আল্লাহ কর্তৃক শাস্তিদানের ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহের শিক্ষাপ্রদ আলোচনা:** সৃষ্টির শুরু থেকে অদ্যাবধি সত্যের জয় ও অসত্যের পরাজয়ের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে।

৫. **মৃত্যু ও মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কিত জ্ঞান:** মানুষের মৃত্যু, কবর, কিয়ামত, হাশর, মিজান, পুলসিরাত, জান্নাতের সুখ এবং জাহান্নামের শাস্তি সম্পর্কেও এ মহাগ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

আল্লামা রাগিব ইস্পাহানি তাঁর 'মুকাদ্দামাতুত তাফসির' গ্রন্থে আল-কুরআনের আলোচ্য বিষয়সমূহকে ছয়টি বিশেষ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত বিষয় হিসেবে বিন্যস্ত করেছেন।

১. **আকিদা:** মহান আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলি, ফেরেশতা, আসমানি কিতাব, আখিরাত, কিয়ামত, রিসালাত এবং তাকদিরের প্রতি ইমান পোষণ বিষয়ক বিবরণ পেশ।

২. **ইবাদত:** মহান আল্লাহ ও রাসুলুল্লাহ (সা.) নির্দেশিত পন্থায় সালাত, জাকাত, সাওম, হজসহ সবরকমের ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব, মুবাহ, কুরবানি, ইতিকাফ, কাফফারা প্রভৃতি ইবাদতের পদ্ধতি বর্ণনা।

৩. **মানবিক চাহিদা:** অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা, বিবাহ প্রভৃতির বিধান বর্ণনা।

৪. **পারস্পরিক আচরণ:** লেনদেন, পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য, আমানত, উত্তরাধিকার, বিতর্ক ইত্যাদির বিবরণ।

৫. **দণ্ডবিধি:** চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, হত্যা, ব্যভিচার, মানহানি, সন্ত্রাস ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি, অপহরণ, সম্পদ আত্মসাৎ, মাদকাসক্তি, মিথ্যা সাক্ষ্যদান, বংশবিকৃতি প্রভৃতি অপরাধের পার্থিব দণ্ডবিধি উপস্থাপন।

৬. **আখলাক:** ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় ও সরকারি দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় গুণাবলি সম্পর্কে আলোচনা এবং কাঙ্ক্ষিত নৈতিক গুণে বিভূষিত হওয়ার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ।

কুরআন মাজিদের বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটি হাদিসের উল্লেখ করা যায়। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত— রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "আল-কুরআন পাঁচ প্রকারে নাজিল হয়েছে- ১. হালাল বা বৈধ, ২. হারাম বা নিষিদ্ধ, ৩. মুহকাম বা স্পষ্ট, ৪. মুতাশাবিহ বা রূপক এবং ৫. মিসাল বা দৃষ্টান্ত। তোমরা বৈধকে বৈধ আর নিষিদ্ধকে নিষিদ্ধ জেনো, স্পষ্টকে কাজে পরিণত করো, রূপকের ওপর ইমান রেখো এবং দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো।"

জেনে রাখো

কুরআনে উল্লিখিত জাতিসমূহের নাম

১. আ'দ;
২. সামুদ;
৩. সাবা;
৪. তুব্বা;
৫. বনি ইসরাইল;
৬. আসহাবে কাহফের সাথে সংশ্লিষ্ট জাতি;
৭. আসহাবে সাবত;
৮. আসহাবুল আইকা;
৯. আসহাবুর রাস।

মূলত বিষয়বস্তুর বিস্তৃতি ও সর্বব্যাপী সম্পৃক্ততার জন্যই আল-কুরআনকে বলা যায়, 'A complete code of life' বা পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আল-কুরআনের মূল আলোচ্য বিষয় কী?
২. আল-কুরআনে সব সমস্যা সমাধানের জন্য কী বিবৃত হয়েছে?
৩. শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ.) আল-কুরআনের বিষয়বস্তুকে কয়টি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন?
৪. আল্লামা রাগিব ইস্পাহানি আল-কুরআনের বিষয়সমূহকে কয়টি শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন?
৫. আল্লামা রাগিব ইস্পাহানি কোন গ্রন্থে আল-কুরআনের আলোচ্য বিষয়সমূহকে বিন্যস্ত করেছেন?
৬. কোন গ্রন্থকে 'A complete code of life' বলা হয়?

উত্তরের জন্য দেখো ১১০ পৃষ্ঠা।

খ. একক কাজ

শিক্ষার্থীরা আল-কুরআনের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে ১০টি বাক্যের একটি অনুচ্ছেদ লিখে তা শ্রেণিশিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৬ কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব ও ফজিলত
Importance and Merits of Recitation of the Quran

তিলাওয়াত অর্থ আবৃত্তি বা পাঠ করা, অনুধাবন ও অনুসরণ করা। আল-কুরআন পাঠ করাকে ইসলামি পরিভাষায় কুরআন তিলাওয়াত বলা হয়। কুরআন তিলাওয়াত ইবাদতের অন্যতম অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। নামাজের মতো বহু গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত রয়েছে যা কুরআন তিলাওয়াত ছাড়া সম্ভব হয় না। সাধারণ ইবাদত হিসেবেও কুরআন তিলাওয়াতের অনেক গুরুত্ব ও ফজিলত রয়েছে। মহান আল্লাহর বিশেষ সান্নিধ্য লাভের যেসব সুযোগ রয়েছে, সেগুলোর অন্যতম হচ্ছে কুরআন তিলাওয়াত। প্রয়োজনীয় সব বিধান ও মূলনীতিই এখানে রয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর রিসালাতের মূল দায়িত্ব ছিল মানুষের কাছে কুরআন পৌঁছে দেওয়া। ইব্রাহিম (আ.) তাঁর প্রার্থনায় এজন্যই উল্লেখ করেছেন,

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ ـ

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! তাদের মধ্য থেকেই তাদের জন্য একজন রাসুল প্রেরণ করুন, যিনি তাদের কাছে আপনার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবেন (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১২৯)।

আল-কুরআনে আল্লাহ তাআলা পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান পেশ করেছেন। সেজন্য কুরআন মাজিদের তিলাওয়াত যেমন ফজিলতপূর্ণ তেমনি গুরুত্ববহ। বিভিন্নভাবে বিষয়টি বিশ্লেষণ করা যায়। যথা—

মহান আল্লাহর নির্দেশ: কুরআন তিলাওয়াতের জন্য আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে—

اُتْلُ مَاۤ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ

অর্থ: তোমার প্রতি কিতাবের যা ওহি হয়েছে তা তিলাওয়াত করো (সূরা আল-আনকাবুত, আয়াত: ৪৫)।

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ **অর্থ:** পড়ো তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন (সূরা আল-আলাক, আয়াত: ১)।

সহিহ-শুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত করার জন্য মহান আল্লাহর সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। তিনি বলেছেন, وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا **অর্থ:** আর তুমি সুবিন্যস্ত ও স্পষ্টভাবে কুরআন তিলাওয়াত করো (সূরা আল-মুয্যাম্মিল, আয়াত: ৪)। অবশ্য তিলাওয়াতের জন্য তিনি কোনো পরিমাণ নির্ধারণ করে দেননি বরং তাঁর অপার অনুগ্রহের নিদর্শন রেখে নির্দেশনা দিয়েছেন। যেমন— মহান আল্লাহ বলেন— فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ (ط) **অর্থ:** কাজেই কুরআনের যতটুকু তিলাওয়াত করা সহজ তোমরা ততটুকু তিলাওয়াত করো (সূরা আল-মুয্যাম্মিল, আয়াত: ২০)।

জ্ঞানভাণ্ডার: কুরআন মাজিদ সকল প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার। অতীত জাতির ইতিহাস, বর্তমান ঘটনা বিশ্লেষণ এবং নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষেত্রে কুরআন সর্বতোভাবে নির্ভুল উৎস। আইন, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য প্রতিটি বিষয়েই কুরআন নীতিনির্ধারক গ্রন্থ। এমন কোনো বিষয় নেই যার তথ্য কুরআন মাজিদে পরিবেশিত হয়নি। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন—

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ـ

অর্থ: আর আমি তোমার ওপর কিতাব নাজিল করেছি, যাতে সব বিষয়ের বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে (সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৮৯)।

শান্তি ও রহমত লাভ: নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত ব্যক্তির মনে প্রশান্তি এনে দেয়। মহানবি (সা.) যখনই কোনো বিপদে বা শঙ্কায় পতিত হতেন তখনই তিনি কুরআন তিলাওয়াত করতেন। তাছাড়া এ মহাগ্রন্থের তিলাওয়াতে মহান আল্লাহর রহমত লাভ করা যায়। এ প্রসঙ্গে মহানবি (সা.) ইরশাদ করেন, 'কোনো জাতি বা গোষ্ঠী যখন মহান আল্লাহর ঘরসমূহের কোনো

একটি ঘরে সমবেত হয়ে মহান আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে, পরস্পরের মধ্যে এর শিক্ষা অনুশীলন করে, তাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হয়। মহান আল্লাহর রহমত তাদের বেষ্টন করে রাখে, ফেরেশতারা তাদের ঘিরে রাখে এবং আল্লাহ তাআলা তাঁর নিকটস্থ ফেরেশতাদের কাছে তাদের কথা উল্লেখ করেন' (সহিহ মুসলিম)।

সর্বোত্তম নফল ইবাদত: আল-কুরআনের তিলাওয়াত নফল ইবাদতসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। মহানবি (সা.) ইরশাদ করেন, اَفْضَلُ عِبَادَةِ اُمَّتِیْ قِرَاءَةُ الْقُرْاٰنِ **অর্থ:** আমার উম্মতের সর্বাধিক ফজিলতপূর্ণ ইবাদত হচ্ছে কুরআন পাঠ (বায়হাকি)।

ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) বলেন— "আমি সত্তর বার স্বপ্নযোগে নবি করিম (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করেছি, সর্বোত্তম নফল ইবাদত কোনটি? রাসুলুল্লাহ (সা.) প্রতিবারই বলেছেন, 'কুরআন তিলাওয়াত'।"

মর্যাদা লাভ: কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে তিলাওয়াতকারীর পরিবার এমনকি তার সমাজও মর্যাদা লাভ করে। নবি করিম (সা.) ইরশাদ করেন, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ **অর্থ:** তোমাদের মধ্যে উত্তম লোক সে, যে নিজে কুরআন শিখে এবং অন্যকে তা শিক্ষা দেয় (বুখারি ও মুসলিম)।

জান্নাত ও শাফায়াতের মর্যাদা লাভ: কুরআন তিলাওয়াত ব্যক্তিকে পরকালে জান্নাত লাভ এবং অন্যদের জন্য সুপারিশ করার মর্যাদা এনে দেয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন—

مَنْ قَرَاَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَظْهَرَهٗ فَاَحَلَّ حَلَالَهٗ وَحَرَّمَ حَرَامَهٗ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ وَشَفَّعَهٗ فِیْ عَشَرَةٍ مِّنْ اَهْلِ بَيْتِهٖ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ۔

অর্থ: যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে, তা মুখস্থ করে এবং হালালকে হালাল ও হারামকে হারাম জানে মহান আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং তার আত্মীয়-স্বজনের মধ্য থেকে এমন দশ ব্যক্তির জন্য তার সুপারিশ কবুল করবেন যাদের প্রত্যেকের জন্যই জাহান্নাম নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল (সুনান আত-তিরমিযি)।

সওয়াব লাভ: কুরআন মাজিদ মহান আল্লাহর কালাম। পবিত্রতম এ কালামের তিলাওয়াতও তাই সওয়াব লাভের এক বিশেষ মাধ্যম। এ প্রসঙ্গে নবি করিম (সা.) বলেন—

مَنْ قَرَاَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ فَلَهٗ بِهٖ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا۔

অর্থ: যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর কিতাবের একটি হরফ তিলাওয়াত করে, সে একটি নেকি পায় আর এ প্রত্যেকটি নেকি দশটি নেকির সমান (সুনান আত-তিরমিযি)।

মহান আল্লাহর সাথে বাক্যালাপ: কুরআন মাজিদ মহান আল্লাহর বাণী। রাসুলুল্লাহ (সা.) এ জন্যই বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ যদি মহান আল্লাহর সাথে কথা বলতে চায়, সে যেন বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করে' (সহিহ মুসলিম)।

কুরআনের সুপারিশ: এ মর্মে মহানবি (সা.) ঘোষণা করেন—

اِقْرَءُوا الْقُرْاٰنَ فَاِنَّهٗ يَاْتِیْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لِاَصْحَابِهٖ۔

অর্থ: তোমরা কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত করো। কারণ কিয়ামতের দিন তা স্বীয় তিলাওয়াতকারীর মুক্তির জন্য সুপারিশ করবে (সহিহ মুসলিম)।

নবি করিম (সা.) আরও বলেন— 'সাওম ও কুরআন বান্দাদের শাফায়াত করবে। কুরআন বলবে, "হে মহান আল্লাহ! আমি তাকে রাতের শয্যা গ্রহণ করতে বিরত রেখেছি; তার জন্য আমি সুপারিশ করছি, আমার শাফায়াত কবুল করো। অতঃপর উভয়ের শাফায়াত কবুল করা হবে" (মুসনাদে আহমদ)।

আত্মিক পবিত্রতা লাভ: কুরআন তিলাওয়াত ব্যক্তির অন্তরের কলুষ-কালিমা বিদূরিত করে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন—

إِنَّ هٰذِهِ الْقُلُوْبَ تَصْدَأُ كَمَا يَصْدَأُ الْحَدِيْدُ إِذَا أَصَابَهُ الْمَاءُ. قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ (ص) وَمَا جَلَاءُهَا. قَالَ كَثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَتِلَاوَةُ الْقُرْاٰنِ.

অর্থ: নিশ্চয়ই এ অন্তরেও মরিচা পড়ে, যেমন পানি পড়লে লোহায় মরিচা পড়ে। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসুল (সা.) এ মরিচা দূর করার উপায় কী? তিনি বললেন, বেশি বেশি মৃত্যুকে স্মরণ করা এবং কুরআন তিলাওয়াত করা (মিশকাত)।

শুদ্ধ তিলাওয়াতের গুরুত্ব: আল্লাহ তাআলা আল-কুরআনের শুদ্ধ তিলাওয়াতের ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেছেন—

وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا **অর্থ:** আর তুমি সুবিন্যস্ত ও স্পষ্টভাবে কুরআন তিলাওয়াত করো (সূরা আল-মুয্যাম্মিল, আয়াত: ০৪)। এজন্য কুরআনের যথাযথ তিলাওয়াত অনিবার্য। কেননা আনাস ইবনে মালিক (রা.) হতে বর্ণিত—

رُبَّ قَارِئٍ يَقْرَءُ الْقُرْاٰنَ وَالْقُرْاٰنُ يَلْعَنُهُ.

অর্থ: এমন অনেক কুরআন পাঠক আছে, যারা কুরআন তিলাওয়াত করে আর কুরআন তাদের অভিশাপ দেয় (ইমাম গাযযালির ইহয়ায়ে উলুমুদ্দীন)।

তিনি আরও বলেন— فَلَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْاٰنِ

অর্থ: যে ব্যক্তি সুললিত কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করে না, সে আমার নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয় (সুনানে আবু দাউদ)।

কাজেই নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করা এবং শুদ্ধ তিলাওয়াতের প্রচেষ্টা চালানো জরুরি।

কুরআনের সাধারণ তিলাওয়াতের পাশাপাশি তা মুখস্থ করার ব্যাপারেও নবি (সা.) গুরুত্ব দিয়েছেন। এজন্য তিনি কুরআনহীন মানুষের মনকে শূন্য ঘরের সাথে তুলনা করে বলেছেন—

إِنَّ الَّذِيْ لَيْسَ فِيْ جَوْفِهٖ شَيْءٌ مِّنَ الْقُرْاٰنِ كَالْبَيْتِ الْخَرَابِ.

অর্থ: যে অন্তরে কুরআন মাজিদের কোনো অংশ নেই নিশ্চয়ই তা একটি শূন্য ঘরের মতো (মিশকাত)।

প্রত্যেক মুসলমানের উচিত কুরআন তিলাওয়াত করা, কুরআনের কিছু অংশ মুখস্থ করা এবং তার মর্ম অনুধাবন করে বাস্তবজীবনে তাকে রূপায়িত করা তোলা। তাহলে তার জীবনে আসবে পার্থিব শান্তি ও পরকালিন মুক্তি।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. তিলাওয়াত অর্থ কী?
২. আল-কুরআন পাঠ করাকে ইসলামি পরিভাষায় কী বলা হয়?
৩. সাধারণ ইবাদত হিসেবে কুরআন তিলাওয়াতের কী রয়েছে?
৪. রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর রিসালাতের মূল দায়িত্ব কী ছিল?
৫. নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত ব্যক্তির মনে কী এনে দেয়?
৬. সর্বোত্তম নফল ইবাদত কোনটি?

উত্তরের জন্য দেখো ১১০ পৃষ্ঠা।

খ. একক কাজ

শিক্ষার্থীরা আল-কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে ১০টি বাক্য খাতায় লিখে এনে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৭ আল-কুরআন অবতরণ
The Revelation of Al-Quran

আল-কুরআন সর্বপ্রথম লাওহে মাহফুজ বা সুরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ ছিল। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন—

بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ ـ فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ـ

অর্থ: বরং এটা মহান কুরআন, সুরক্ষিত ফলকে সংরক্ষিত (সূরা আল-বুরুজ, আয়াত: ২১-২২)। তারপর আল্লাহ তাআলা লাওহে মাহফুজ থেকে কুরআন অবতরণের সূচনা করেন। ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে মহানবি (সা.) হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকা অবস্থায় মহান আল্লাহর নির্দেশে জিবরাইল (আ.) আল-কুরআনের সূরা আল-আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত নিয়ে মহানবি (সা.)-এর কাছে অবতরণ করেন। সে সময় জিবরাইল (আ.) মহানবি (সা.)-কে বললেন, পড়ুন। তিনি বললেন, আমিতো পড়তে জানি না। নবি (সা.) বলেন— জিবরাইল (আ.) আমাকে চেপে ধরলেন, তারপর ছেড়ে দিয়ে আবার বললেন, পড়ুন আপনার প্রভুর নামে- যিনি মানুষকে জমাট বাঁধা রক্ত হতে সৃষ্টি করেছেন (সহিহ বুখারি)।

কুরআন অবতরণের প্রাথমিক এ ঘটনার পর তিন বছর পর্যন্ত সরাসরি আর কোনো ওহি তথা প্রত্যাদেশ বাণী অবতীর্ণ হয়নি। ওহি বিরতির এ কালকে ফাতরাহ (فَتْرَةٌ) নামে অবহিত করা হয়।

লাওহে মাহফুজ থেকে নবি করিম (সা.) পর্যন্ত কীভাবে এ মহাগ্রন্থের নাজিল সম্পন্ন হয়েছে সে বিষয়ে একাধিক অভিমত লক্ষ করা যায়।

পর্যায়-১

ক. **সাঈদ বিন জুবায়র (রা.), আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) ও ইকরামা বিন আব্দুল্লাহ (রহ.) বলেন—** "লাওহে মাহফুজ থেকে সমগ্র কুরআন কোনো এক কদরের রাতে পৃথিবীর আকাশের 'বায়তুল ইযযাহ' নামক স্থানে নাজিল হয়।" বায়তুল ইযযাহ হলো বায়তুল মামুরের অপর নাম। এটি বায়তুল্লাহ বরাবর পৃথিবীর নিকটবর্তী আকাশে ফেরেশতাদের ইবাদতগৃহ। মহান আল্লাহ বলেন— اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ـ **অর্থ:** সুনিশ্চিতভাবেই এ কুরআনকে আমি কদর রাতে নাজিল করেছি (সূরা আল-কাদর, আয়াত: ১)। এরপর দ্বিতীয় পর্যায়ে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি ধীরে ধীরে প্রয়োজন মতো অল্প অল্প অংশ নাজিল হয়ে দীর্ঘ তেইশ বছরে এ নাজিল প্রক্রিয়া পূর্ণতা পায় (আল-ইতকান, বায়হাকি)।

খ. **আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী (রহ.) বলেন—** 'লাওহে মাহফুজ থেকে কুরআন মাজিদ বায়তুল ইযযাতে নাজিল হয়েছে ঠিকই কিন্তু সমগ্র কুরআন নয়। বরং প্রতি বছরের কদর রাতে সে বছরের জন্য প্রয়োজনীয় অংশই কেবল পৃথিবীর আকাশে নাজিল হতো' (আত-তিবইয়ান ফী উলূমিল কুরআন)।

গ. **ইমাম সাবী (রহ.)**-এর মতে, লাওহে মাহফুজ থেকে সরাসরি আল-কুরআন প্রয়োজন অনুসারে নবি (সা.)-এর ওপর নাজিল হয়। কদর রাতে এ মহাগ্রন্থের অবতরণ শুরু হয় (মাবাহিস ফী উলূমিল কুরআন)।

ঘ. **ইমাম আল মাওয়ার্দী (রহ.) বলেন—** কুরআন সংরক্ষণকারী ফেরেশতারা সমগ্র কুরআন লাওহে মাহফুজে নাজিল করেন। এখান থেকে প্রতি বছর কদরের রাতে পরবর্তী কদর পর্যন্ত প্রয়োজনীয় অংশ জিবরাইল (আ.)-এর ওপর নাজিল হয়। আর জিবরাইল (আ.) পর্যায়ক্রমে তা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে পৌঁছে দেন (আল-ইতকান)।

পর্যায়-২

দ্বিতীয় পর্যায়ে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে আল-কুরআন অবতরণের ব্যাপারে নানারকম পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিল। পবিত্র কুরআন ও হাদিসে বিভিন্নভাবে পদ্ধতিগুলোর ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে। যেমন—

১. **স্বপ্নযোগে:** নবি করিম (সা.) স্বপ্নযোগে ওহি লাভ করতেন। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন—

اَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِ اَلرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ ـ

অর্থ: রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে প্রথম ওহির সূচনা হয়েছিল ঘুমন্ত অবস্থায় সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে (সহিহ বুখারি)।

২. **ঘণ্টাধ্বনিতে:** হযরত হারিস বিন হিশাম (রা.) কীভাবে ওহি নাজিল হয় জানতে চাইলে নবি করিম (সা.) বলেন—

أَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ ـ

অর্থ: আমার কাছে ঘণ্টাধ্বনির মতো ওহি আসে। আর তা আমার জন্য সবচেয়ে কষ্টকর মনে হয় (সহিহ বুখারি)।

৩. **জিবরাইল (আ.) সরাসরি:** জিবরাইল (আ.) সরাসরি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর অন্তরে মহান আল্লাহর কালাম ঢেলে দিতেন। কুরআনে এসেছে, نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ - عَلَىٰ قَلْبِكَ

অর্থ: বিশ্বস্ত ফেরেশতা এ কুরআন নিয়ে অবতরণ করেছেন আপনার অন্তরে (সূরা আশ-শুআরা, আয়াত: ১৯৩-১৯৪)।

৪. **জিবরাইল (আ.) নিজস্ব আকৃতিতে:** জিবরাইল (আ.) নিজস্ব আকৃতিতে মহান আল্লাহর বাণী নিয়ে আসতেন। ইরশাদ হয়েছে— وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِيْنِ

অর্থ: আর তিনি সেই ফেরেশতাকে প্রকাশ্য দিগন্তে দেখেছেন (সূরা আত-তাকভির, আয়াত: ২৩)। নিজস্ব আকৃতিতে জিবরাইল (আ.) ওহি নিয়ে এসেছেন মাত্র তিনবার (ফতহুল বারী)।

৫. **জিবরাইল (আ.) মানুষের বেশে:** জিবরাইল (আ.) মানুষের বেশে আগমন করে রাসুল করিম (সা.)-এর কাছে কুরআনের আয়াত পৌঁছে দিতেন। নবি (সা.) বলেন— ফেরেশতা পুরুষের আকৃতিতে আমার কাছে ওহি নিয়ে আসত (সহিহ বুখারি)। এ সময় তিনি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সাহাবি দাহিয়া কালবী (রা.)-এর আকৃতি ধারণ করতেন। নবি (সা.)-এর কাছে এ পদ্ধতিতে ওহি নাজিলই সর্বাধিক সহজ মনে হতো (আল-ইতকান)।

৬. **সরাসরি মহান আল্লাহর সাথে বাক্যালাপের মাধ্যমে:** এ বিশেষ মর্যাদা নবি করিম (সা.) জেগে থাকা অবস্থায় মাত্র একবার মিরাজের রাতে লাভ করেছিলেন। অবশ্য অন্য একবার স্বপ্নযোগেও তিনি মহান আল্লাহর সাথে কথোপকথন করেছিলেন (আল-ইতকান)।

জেনে রাখো

- ৬১০ খ্রিষ্টাব্দের রমজান মাসে কদরের রাতে জাবালে নূর পর্বতের হেরা গুহায় সর্বপ্রথম কুরআন অবতীর্ণ হয়।
- সর্বপ্রথম নাজিলকৃত কুরআনের আয়াত হলো সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত।
- প্রথম নাজিলকৃত পূর্ণ সূরা হলো সূরা ফাতিহা।
- কুরআনের প্রথম নাজিল হওয়া শব্দ হলো 'ইকরা' অর্থ 'তুমি পড়ো'।
- কুরআনের সর্বশেষ নাজিলকৃত আয়াত হলো সূরা বাকারার ২৮১ নম্বর আয়াত।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আল-কুরআন সর্বপ্রথম কোথায় লিপিবদ্ধ ছিল?
২. মহানবি (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ আল্লাহ তাআলার প্রথম প্রত্যাদেশ কী?
৩. 'ফাতরাতুল ওহি' অর্থ কী? *[সকল বোর্ড ২০২০, ২০১৮]*
৪. পৃথিবীর নিকটবর্তী আকাশের নাম কী?
৫. আকাশে ফেরেশতাদের ইবাদতগৃহের নাম কী?
৬. জিবরাইল (আ.) কোন সাহাবির আকৃতিতে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে আসতেন?

উত্তরের জন্য দেখো ১১০ পৃষ্ঠা।

খ. দলীয় কাজ

শ্রেণিকক্ষের সকল শিক্ষার্থী ছয়জনকে নির্বাচন করবে। নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকে একটি করে কুরআন অবতরণের পদ্ধতি বর্ণনা করবে।

পাঠ ৮

কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব
Importance of Learning the Quran

আল্লাহ তাআলা মানবজাতির হেদায়েতের জন্য সর্বশেষ নবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর ওপর যে বাণীসমূহ সরাসরি ওহির মাধ্যমে নাজিল করেছেন তার সমষ্টি হচ্ছে আল-কুরআন। আল্লাহ তাআলাকে জানা, তাঁর আদেশ-নিষেধ অবগত হওয়া তথা শরিয়তকেক জানা এবং তদনুযায়ী জীবনযাপন করার জন্য কুরআন শিক্ষা করা অপরিহার্য।

১. **শরিয়তের প্রধান উৎস:** কুরআন মাজিদ শরিয়তের প্রধান এবং মূল উৎস। মহানবি (সা.) বলেছেন, আমি তোমাদের মধ্যে দুটি বস্তু রেখে যাচ্ছি, যতদিন তোমরা এ দুটোকে আঁকড়ে থাকবে ততদিন পর্যন্ত তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। একটি হলো মহান আল্লাহর কিতাব (আল-কুরআন), অপরটি হচ্ছে তাঁর রাসুলের সুন্নাহ (মিশকাত)।

২. **সমস্যার সমাধান লাভ:** কুরআন মাজিদে মানবজীবনের সব সমস্যার সমাধান রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন—

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ۔

অর্থ: আমি আপনার প্রতি কিতাব নাজিল করেছি, যা প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ (সূরা আন-নাহল আয়াত, আয়াত: ৮৯)।

৩. **শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন:** কুরআন শিক্ষা গ্রহণকারী ও শিক্ষা দানকারীর মর্যাদা অত্যধিক। মহানবি (সা.) বলেছেন—

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ **অর্থ:** তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্বোত্তম যে কুরআন শিখে এবং অপরকে শিক্ষা দেয় (বুখারি)।

৪. **মহান আল্লাহর আহল হওয়া:** কুরআন শেখা, মর্মার্থ অনুধাবন করা, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা ও তদনুযায়ী জীবনযাপনের মাধ্যমে মহান আল্লাহর আহল (রূপকার্থে মহান আল্লাহর পরিজন) হওয়া যায়। মহানবি (সা.) বলেছেন—

اَهْلُ الْقُرْاٰنِ هُمْ اَهْلُ اللّٰهِ وَخَاصَّتُهٗ ۔

অর্থ: যারা কুরআনের আহল, তারাই মহান আল্লাহর আহল ও বিশেষ লোক (মুসনাদে আহমাদ)।

৫. **অধিক মর্যাদা ও সওয়াব লাভ:** কুরআন ভালোভাবে শিখতে পারলে অধিক মর্যাদাবান হওয়া যায়। ভালোভাবে শিখতে না পারলেও চেষ্টা, সাধনা ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। কারণ যে ব্যক্তি কষ্ট করে কুরআন শেখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে তার জন্য রয়েছে অধিক সওয়াব। মহানবি (সা.) বলেছেন, 'কুরআনে পারদর্শী ব্যক্তি পুণ্যবান সুমহান সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ফেরেশতার সঙ্গী হবেন। যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও চেষ্টা অব্যাহত রাখে তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সওয়াব' (বুখারি ও মুসলিম)।

৬. **কুরআন শিক্ষার প্রতি মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের গুরুত্বারোপ:** আল্লাহ তাআলা ভালোভাবে কুরআন শেখা ও গবেষণা করার প্রতি গুরুত্বারোপ করে ইরশাদ করেছেন— اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا ۔

অর্থ: তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না, নাকি তাদের অন্তর তালাবদ্ধ? (সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ২৪)। মহানবি (সা.) কুরআন না শেখার পরিণতি সম্পর্কে বলেছেন, যার মধ্যে কুরআনের কোনো অংশ নেই, সে শূন্য গৃহের মতো (তিরমিযি)।

ওপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট এ ধারণা লাভ করা যায় যে, কুরআন শিক্ষা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরজ।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. শরিয়তকে জানার জন্য কী শিক্ষা করা আবশ্যক?
২. শরিয়তের প্রধান এবং মূল উৎস কী?
৩. কোন গ্রন্থে মানবজীবনের সব সমস্যার সমাধান রয়েছে?
৪. কুরআনের শিক্ষার সাথে জড়িত কোন ব্যক্তি মর্যাদাবান?
৫. যার মধ্যে কুরআনের কোনো অংশ নেই, সে কেমন?
৬. কুরআন শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর কী?

উত্তরের জন্য দেখো ১১০ পৃষ্ঠা।

পাঠ ৯ ওহি ও শানে নুজুল
Wahi and Shane Nuzul

আসমানি কিতাবসমূহ ওহির মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে। সর্বশেষ নবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর ওপর দুই প্রকারের ওহি অবতীর্ণ হয়। ১. ওহি মাতলু তথা- কুরআন মাজিদ; ২. ওহি গায়রে মাতলু তথা- হাদিস। কোনো ওহির উদ্দেশ্য, রহস্য ও মর্মার্থ অবগত হতে প্রয়োজন শানে নুজুল। ওহি ও শানে নুজুলের পরিচয় তুলে ধরা হলো:

ওহি (وَحْيٌ): ওহি অর্থ ইঙ্গিত করা, সংবাদ দেওয়া, জানিয়ে দেওয়া, ঢেলে দেওয়া ইত্যাদি।

শরিয়তের পরিভাষায়- আল্লাহ তাআলা কর্তৃক তাঁর নবি-রাসুলদেরকে ফেরেশতার মাধ্যমে, স্বপ্নযোগে কিংবা ইলহামের মাধ্যমে কোনো বিষয় জানিয়ে দেওয়াকে ওহি বলা হয়।

আসমানি কিতাব অবতরণের ধারা শুরু হয়েছে হযরত আদম (আ.)-এর মাধ্যমে এবং শেষ হয়েছে হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর মাধ্যমে। এই ওহির মাধ্যমেই রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। কুরআনেই আছে,

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى -

অর্থ: তিনি নিজের থেকে কিছুই বলেন না, যা কিছু বলেন— ওহির মাধ্যমেই বলেন (সূরা আন-নাজম, আয়াত: ৩-৪)। এ আয়াতের মর্মার্থ অনুসারে কুরআনের সাথে সাথে হাদিসও মহান আল্লাহর ওহির অন্তর্ভুক্ত।

শানে নুজুল (شَانُ نُزُوْلٍ): কোনো ঘটনা সংঘটিত হওয়ার প্রেক্ষাপট বা অন্তর্নিহিত কারণকে শানে নুজুল বলা যায়।

শাব্দিকভাবে শান (شَانٌ) অর্থ অবস্থা, মর্যাদা, কারণ, ঘটনা, পটভূমি; আর নুজুল (نُزُوْلٌ) অর্থ অবতরণ। সুতরাং শানে নুজুল অর্থ অবতরণের কারণ বা পটভূমি। পরিভাষায়- আল-কুরআনের সূরা বা আয়াত নাজিলের কারণ, ঘটনা বা পটভূমিকে 'শানে নুজুল' বলা হয়। একে 'সববে নুজুল'ও বলা হয়।

আল-কুরআন মহানবি (সা.)-এর ওপর একসাথে নাজিল হয়নি। নানা প্রয়োজনে সুদীর্ঘ ২৩ বছরে অল্প অল্প করে নাজিল হয়েছে। কোনো ঘটনার বিধান বর্ণনায় কিংবা কোনো সমস্যার সমাধানে কুরআনের অংশবিশেষ নাজিল হতো। যে ঘটনা বা অবস্থাকে কেন্দ্র করে কুরআনের আয়াত বা সূরা নাজিল হতো সে ঘটনা বা অবস্থাকে ঐ সূরা বা আয়াতের শানে নুজুল বলা হয়। যেমন— রাসুলুল্লাহ (সা.) এর শিশু পুত্র ইন্তেকাল করলে কাফিররা তাঁকে 'আবতার' বা নির্বংশ বলে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে লাগল। এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা মহানবি (সা.)-কে সান্ত্বনা দিয়ে সূরা আল-কাওসার নাজিল করেন। অতএব, মহানবি (সা.)-এর প্রতি কাফিরদের উপহাস করার ঘটনাটি সূরা আল-কাওসারের শানে নুজুল হিসেবে পরিচিত।

শানে নুজুল জানার উপকারিতা অনেক। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য উপকারিতা হলো— ক. এর দ্বারা শরিয়তের বিধান প্রবর্তনের রহস্য জানা যায়। খ. আয়াতের অর্থ, উদ্দেশ্য ও সঠিক মর্মার্থ সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মহানবি (সা.)-এর ওপর কয় প্রকারের ওহি অবতীর্ণ হয়?
২. ইঙ্গিত করা, সংবাদ দেওয়া, জানিয়ে দেওয়া, ঢেলে দেওয়ার আরবি পরিভাষা কী?
৩. কার মাধ্যমে আসমানি কিতাব অবতরণের ধারা শুরু হয়েছে?
৪. শানে নুজুল কী? *[রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. ২০১৮]*
৫. শানে নুজুলের অপর নাম কী?
৬. আয়াতের অর্থ, উদ্দেশ্য ও সঠিক মর্মার্থ সম্পর্কে অবগত হওয়া যায় কীসের মাধ্যমে?

উত্তরের জন্য দেখো ১১০ পৃষ্ঠা।

খ. দলীয় কাজ

শিক্ষার্থীরা দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে ওহি ও শানে নুজুল বিষয়ে দুটি অনুচ্ছেদ লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ১০

মক্কি ও মাদানি সূরার বৈশিষ্ট্য
Characteristics of Makki and Madani Suras

সূরা আরবি শব্দ। আরবি ভাষায় سُوْرَةٌ হলো সীমান্ত রেখা বা নগরপ্রাচীর। সীমান্ত রেখা বা নগরপ্রাচীর যেমন এক এলাকা থেকে অন্য এলাকাকে পৃথক করে, তেমনি কুরআনের এক একটি পরিচ্ছেদও পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য বজায় রাখে। এজন্য এ পরিচ্ছেদগুলোকে বলা হয় সূরা । সমগ্র কুরআনে সর্বমোট ১১৪টি সূরা রয়েছে। নাজিলের সময়কাল বিবেচনায় মুফাস্সিরগণ (কুরআনের ব্যাখ্যা দানকারী) এ সূরাগুলোর কতগুলোকে 'মক্কি সূরা' এবং অবশিষ্টগুলোকে 'মাদানি সূরা' নামে আখ্যায়িত করেছেন।

মক্কি সূরা

সাধারণভাবে মক্কি সূরা হলো সেই সূরা যা মক্কায় নাজিল হয়েছে। কিন্তু মুফাস্সিরগণ মক্কি সূরার আরও ব্যাপ্তির কথা বলেছেন। তারা বলেন— ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে কুরআন মাজিদের অবতরণ শুরু হওয়ার পর থেকে ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে নবি করিম (সা.)-এর মদিনা হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত যে সূরাসমূহ নাজিল হয়েছে সে সূরাসমূহকেই মক্কি সূরা বলা হবে; এ সময়কালের মধ্যে কোনো সূরা ও আয়াত যদি মক্কার বাইরেও নাজিল হয় তবুও তা মক্কি হিসেবে বিবেচিত হবে। সূরা আন-নাস, আল-ফালাক, আল-ইখলাস, লাহাব, আল-আসর, আল-কাওছার, আল-ফিল, আল-মাউন, আত-তীন, আদ-দুহা প্রভৃতি মক্কি সূরার উদাহরণ। ৮৬টি সূরা মক্কি। এ সূরাগুলোর মধ্যে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। যেমন—

১. মক্কি সূরাগুলো আকারে ছোট, আয়াতগুলোও ছোট ছোট।
২. আয়াতের মধ্যে ছন্দ ও অন্তঃমিল রক্ষা করা হয়েছে।
৩. তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাতের আলোচনায় বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।
৪. শিরক ও কুফর সম্পর্কে আলোচনা এবং এগুলোর অসারতা প্রমাণ করা হয়েছে।
৫. উন্নত চরিত্র গঠন এবং দৈহিক পবিত্রতার পাশাপাশি অন্তরের পবিত্রতা অর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
৬. পরিচিত উপমা-উদাহরণের সাহায্যে আকাইদ ও ইমানের বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হয়েছে।
৭. রিসালাতের প্রথম পর্যায়ের দায়িত্ব পালনের রীতি-নীতি বর্ণনা করা হয়েছে।
৮. কিয়ামত বা পুনরুত্থানের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বর্ণিত হয়েছে।
৯. জান্নাতের সীমাহীন সুখ-শান্তি এবং জাহান্নামের অসীম দুর্ভোগের বর্ণনা করা হয়েছে।
১০. পূর্ববর্তী কাফির ও ক্ষমতাসীন বিদ্রোহীদের ভয়ংকর পরিণতি বর্ণনা করা হয়েছে।
১১. আল-কুরআনের সত্যতা প্রমাণের সাথে সাথে অন্যান্য আসমানি কিতাবের সত্যায়ন প্রমাণিত হয়েছে।
১২. আখিরাতের বিচারব্যবস্থা, হিসাবনিকাশ ও শেষ পরিণতির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।
১৩. প্রতিটি সূরাতেই বিভিন্ন বিষয়ের শপথ করার মাধ্যমে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণের প্রচেষ্টা রয়েছে।
১৪. সিজদার আয়াতের সাধারণ উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।
১৫. মানুষের সৃষ্টি সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনা রয়েছে।
১৬. মুশরিক ও কাফিরদের (অবাধ্য) নানা প্রশ্ন এবং তার পরিশীলিত জবাব দেওয়া হয়েছে।
১৭. يَاَيُّهَا النَّاسُ (হে মানুষ), يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ (হে আদম সন্তান), يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ (হে কাফিররা), كَلَّا (কখনো নয়) প্রভৃতি শব্দের সাধারণ প্রয়োগ মক্কি সূরাসমূহকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে।

মাদানি সূরা

সাধারণভাবে মদিনায় নাজিলকৃত সূরাসমূহকে মাদানি সূরা বলা হয়। অবশ্য মুফাস্‌সিরগণ যেসব সূরা ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে নবি করিম (সা.)-এর মদিনায় হিজরতের পর নাজিল হয়েছে সেগুলোকে মাদানি সূরা হিসেবে অভিহিত করেছেন; যদিও এ সূরা বা সূরার কোনো আয়াত মদিনার বাইরে নাজিল হয়। যেমন— সূরা আল-মায়িদার ৩ নম্বর আয়াত মক্কায় বিদায় হজের সফরে নাজিল হয়েছে। তা সত্ত্বেও নাজিলের সময় বিবেচনায় এটি মাদানি সূরার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মাদানি সূরার সংখ্যা ২৮টি। সূরা আল-বাকারা, আলে ইমরান, আন-নিসা, আল-মায়িদা, আল-আনফাল, আল-আনআম প্রভৃতি মাদানি সূরার দৃষ্টান্ত। এ সূরাগুলো কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে মক্কি সূরা থেকে স্বতন্ত্র। যথা—

১. মাদানি সূরাগুলো আকারে দীর্ঘ, আয়াতগুলোও বড় বড়।
২. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ (হে মুমিনগণ!) দিয়ে সাধারণ সম্বোধন।
৩. সূরার মধ্যে গদ্যরীতির অনুসরণ। ছন্দ ও অন্তঃমিল রক্ষার চেয়ে বিষয় বর্ণনার ওপর অধিক গুরুত্বারোপ।
৪. সৃষ্টিতত্ত্বের বাস্তবরূপ ও ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ণনা।
৫. অতীত জাতির জীবনাচার, অবাধ্যতা ও পরিণতির বিস্তারিত বিবরণ।
৬. ইমান ও আকিদাগত বিষয়ের পাশাপাশি ইবাদতের ওপর গুরুত্বারোপ।
৭. আহকামে শরিয়া, হালাল-হারাম ও ইসলামি রীতিনীতির বিশদ বর্ণনা।
৮. ইসলামের ব্যাবহারিক আইন, বিবাহ, ক্রয়-বিক্রয় ও সামাজিক মেলামেশার রীতিপদ্ধতি বর্ণনা।
৯. ইসলামের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয়, আন্তর্জাতিক, শিক্ষা-সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় নীতি, আদর্শ, পদ্ধতি ও ব্যবস্থার বিস্তারিত বিবরণ।
১০. লেনদেন, উত্তরাধিকার আইন, যুদ্ধরীতি, জিহাদ, প্রচার প্রভৃতির রীতি-পদ্ধতি বর্ণনা।
১১. মুশরিক, কাফির, ইহুদি, খ্রিষ্টান বিশেষ করে মুনাফিকদের জীবনাচার ও ভ্রান্ত বিশ্বাসের আলোচনা এবং তাদের মিথ্যা দাবি ও যুক্তির অসারতা প্রমাণ।
১২. মুনাফিক ও ইহুদিদের ষড়যন্ত্র ও ঘৃণ্য মানসিকতার মুখোশ উন্মোচন।
১৩. মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকের সাথে মুসলিমদের আচরণবিধি ও তাদের অধিকার বর্ণনা।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আরবি ভাষায় সীমান্তরেখা বা নগরপ্রাচীরকে কী বলে?
২. আল-কুরআনের পরিচ্ছেদগুলোকে কী নামে অভিহিত করা হয়?
৩. সমগ্র কুরআনে সর্বমোট কতটি সূরা রয়েছে?
৪. আল-কুরআনের সূরাগুলো অবতরণস্থলের দিক দিয়ে কোন দুভাগে বিভক্ত?
৫. কোন সূরাগুলো আকারে ছোট, আয়াতগুলোও ছোট ছোট?
৬. আহকামে শরিয়া, হালাল-হারাম ও ইসলামি রীতিনীতির বিশদ বর্ণনা কোন সূরাগুলোর বৈশিষ্ট্য?

উত্তরের জন্য দেখো ১১০ পৃষ্ঠা।

খ. দলীয় কাজ

শিক্ষার্থীরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে মক্কি ও মাদানি সূরার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করবে।

পাঠ ১১ আল-কুরআনের সংরক্ষণ
The Preservation of Al-Quran

আল-কুরআন সংরক্ষণের পদ্ধতি ও ইতিহাস

কুরআন মাজিদ অপরিবর্তনীয়, শাশ্বত ও চিরন্তন সত্যের ধারক আসমানি গ্রন্থ। অনন্তকাল ধরে এ মহাগ্রন্থ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অসীম সত্তায় বিরাজমান। ইরশাদ হচ্ছে— يَمْحُو اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ۖ وَعِنْدَهٗ أُمُّ الْكِتَابِ ۔

অর্থ: মহান আল্লাহ যা ইচ্ছা মুছে দেন এবং বহাল রাখেন। আর মূল কিতাব তো তাঁর কাছেই রয়েছে (সূরা আর-রা'দ, আয়াত: ৩৯)। কুরআন অবতীর্ণের সময়ে এর সংরক্ষণ ছিল তাঁর অসীম সত্তার মতোই অবিনশ্বর। তারপর আল্লাহ তাআলা মানুষের উপযোগী করে এ মহাগ্রন্থ নাজিল করেন। তার পবিত্রতম সত্তা থেকে নাজিল হওয়ার পর কুরআন মাজিদ সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

লাওহে মাহফুজে সংরক্ষণ

সম্পূর্ণ কুরআন সর্বপ্রথম সংরক্ষিত হয় লাওহে মাহফুজ বা সুরক্ষিত ফলকে। মহান আল্লাহ বলেন—

بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ ۔ فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ۔

অর্থ: বরং এটাতো মর্যাদাময় কুরআন, লাওহে মাহফুজে সুরক্ষিত (সূরা আল-বুরুজ, আয়াত: ২১-২২)। আল-কুরআন নাজিলের সময় মহান আল্লাহর নির্দেশে অগণিত ফেরেশতা নিয়োজিত থাকেন। নাজিল সম্পন্ন হওয়ার পর সত্তর হাজার মর্যাদাবান ফেরেশতা এর সংরক্ষণ কাজে নিয়োগ পান। তারা অকল্পনীয় নিষ্ঠায় অনাদিকাল থেকে এ মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্ব দক্ষতার সাথে পালন করছেন।

বায়তুল ইযযায় সংরক্ষণ

বায়তুল মা'মুরের অপর নাম বায়তুল ইযযাহ। এটি বায়তুল্লাহ বরাবর পৃথিবীর নিকটতম আসমানে (সপ্তম আসমান) অবস্থিত। এটি ফেরেশতাদের ইবাদতগৃহ। কদর রাতে আল্লাহ তাআলা একসঙ্গে বায়তুল ইযযাহ নামক স্থানে সমগ্র কুরআন নাজিল করেন। এখানে আল্লাহ তাআলার নির্দেশে ফেরেশতাদের একটি দল কুরআন সংরক্ষণের কাজে নিয়োজিত আছেন। তারা শয়তানের হস্তক্ষেপ থেকে কুরআনের পবিত্রতা সংরক্ষণ করেন। শয়তান যেন এ মহাগ্রন্থে কোনো হস্তক্ষেপ করতে না পারে সে ব্যাপারে সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ অব্যাহত রাখেন।

পৃথিবীতে অবতরণ এবং সংরক্ষণের নিশ্চয়তা

বায়তুল ইযযাহ থেকে এক বছরের প্রয়োজনীয় আয়াতমালা হযরত জিবরাইল (আ.)-এর ওপর নাজিল হয়। ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে রমজান মাসের কদর রাত্রিতে তিনি মুহাম্মাদ (সা.)-এর কাছে পৌছে দেন মহান আল্লাহর বরকতময় বাণী। কুরআন নাজিলের সাথে সাথে মহানবি (সা.) তা সংরক্ষণের জন্য দ্রুত মুখস্থের চেষ্টা করেন। এ নিয়ে তাঁর পেরেশানি চরম পর্যায়ে পৌছলে আল্লাহ তাআলা চিন্তামুক্ত থাকার নিশ্চয়তা দিয়ে বলেন—

لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ ۔ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ ۔

অর্থ: তাড়াতাড়ি শিখে নেওয়ার জন্য দ্রুত আবৃত্তি করবেন না। এর সংরক্ষণ ও পাঠ আমারই দায়িত্ব (সূরা আল-কিয়ামাহ, আয়াত: ১৬-১৭)।

তিনি আরও বলেন— اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ۔

অর্থ: নিশ্চয়ই আমি এই কুরআন নাজিল করেছি এবং সুনিশ্চিতভাবে আমিই তার সংরক্ষক (সূরা আল-হিজর, আয়াত: ৯)। তাছাড়া এতে কোনো চেষ্টাতেই মিথ্যার অনুপ্রবেশ ঘটানো যাবে না।

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে সংরক্ষণ

আল-কুরআন সংরক্ষণের ইতিহাসে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সময় হলো রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর যুগ। এ সময়ে এ মহাগ্রন্থের সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তিনটি সাধারণ পদ্ধতি বিশেষ গুরুত্ব পায়।

১. **হিফজ প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণ:** নিরক্ষর আরবদের স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। আরব কবিদের সুদীর্ঘ কাব্য এবং নিজেদের পরিপূর্ণ বংশতালিকা মুখস্থ করে রাখায় তারা অসামান্য দক্ষতা প্রদর্শন করেন। কুরআন নাজিল শুরু হওয়ার পর তাদের অসাধারণ স্মৃতিশক্তি এর সংরক্ষণে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

ক. **রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ব্যক্তিগত প্রয়াস:** নবি (সা.) নিজে অক্ষরজ্ঞানহীন ছিলেন। তা সত্ত্বেও আল-কুরআনের যখন যেটুকু নাজিল হতো তিনি সাথে সাথে তা কণ্ঠস্থ করে নিতেন।

ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন— জিবরাইল (আ.) যখনই ওহি নিয়ে আসতেন, নবি (সা.) মাথা নুইয়ে চুপ করে শুনতেন। তিনি চলে যাওয়ার পর মহান আল্লাহর ওয়াদা অনুযায়ী পুরো ওহিই যথাযথভাবে পড়তে পারতেন (সহিহ বুখারি)। এভাবে কুরআন নাজিল অব্যাহত থাকায় মহানবি (সা.) নিজে জীবন্ত কুরআনে পরিণত হন।

খ. **সাহাবিদের হিফজ:** মহানবি (সা.)-এর সাহাবিগণ আল-কুরআন হিফ্জ বা মুখস্থ করে সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেন। কোনো আয়াত নাজিল হলে প্রথমে রাসুলুল্লাহ (সা.) তা পাঠ করে শোনাতেন, পরে তাঁর সাহাবিদের তা পাঠ করে শোনাতে বলতেন। এভাবে মুখস্থ হয়ে যেত। বিরে মাউনের (নজদের নিকটবর্তী স্থান) ঘটনায় ৭০ জন ক্বারি শহিদ হন। ইয়ামামার যুদ্ধে শহিদ ক্বুররা সংখ্যা সত্তরের অধিক। এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায়— তখন অনেকেই কুরআন হিফজ করতেন। এমনিতেই আরবরা বিস্ময়কর স্মরণশক্তির অধিকারী, তদুপরি কুরআন হিফজ করা ছিল গৌরব ও মর্যাদার কাজ, তাই তারা অবলীলাক্রমে কুরআন মুখস্থ করতেন। এ সময় বিশিষ্ট ক্বারিদের মধ্যে আবু বকর, উমর, উসমান, আলি, ইবন মাসউদ, ইবন উমর, ইবন আমর, সালিম, উবাই বিন কাআব, মুআয, তালহা, সাদ, আবু হুরায়রা, আয়শা, হাফসা, উম্মে সালমা (সা.) প্রমুখ সাহাবি ছিলেন অন্যতম।

তাছাড়া পারিবারিকভাবেও সাহাবিগণ আল-কুরআন তিলাওয়াত করতেন। গভীর রাতে তাদের ঘর থেকে কুরআন তিলাওয়াতের পবিত্র ধ্বনি উত্থিত হতো। রাসুলুল্লাহ (সা.) রাতের বেলায় তাদের তিলাওয়াত শুনতে বাইরে বের হতেন।

গ. **জিবরাইল (আ.)-এর পুনরাবৃত্তি:** প্রতি রমজানে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ততদিন পর্যন্ত কুরআনের নাজিলকৃত আয়াতমালা জিবরাইল (আ.)-এর কাছে এবং জিবরাইল (আ.) তাঁর কাছে পুনরাবৃত্তি করতেন। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, প্রতি রমজানে জিবরাইল (আ.) পুরো কুরআন মাজিদ একবার রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে তিলাওয়াত করে শোনাতেন। আর এভাবে মহানবি (সা.)-এর স্মৃতিপটে আল-কুরআন নিরন্তর সংরক্ষিত হতে থাকে।

২. **লেখনীর মাধ্যমে সংরক্ষণ:** যদিও কুরআন নাজিলকালীন সময়ে লিখতে জানা লোকের সংখ্যা ছিল কম, তা সত্ত্বেও যারা লেখাপড়া জানতেন তারা মুখস্থ করার পাশাপাশি লিখেও আল-কুরআনের সংরক্ষণ অব্যাহত রাখেন। এ সময়ে লেখনীর সাজ-সরঞ্জামের অপ্রতুলতার জন্য সাহাবিগণ চামড়া, পাথর, পাতা, হাড় প্রভৃতিতে অসীম ধৈর্য ও নিষ্ঠার সাথে কুরআনের আয়াত লিখে রাখার কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন।

৩. **কাতিবে ওহি নিয়োগ:** নিয়মতান্ত্রিকভাবে কুরআন সংরক্ষণের কাজ সম্পাদনের জন্য মহানবি (সা.) কাতিবে ওহি বা ওহি লেখক নিয়োগ করেন। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে ৪২ জন কাতিব ছিলেন, যারা ওহি নাজিল হলে তাঁর নির্দেশে তা লিপিবদ্ধ করতেন। এদের মধ্যে যায়েদ ইবন সাবিত, আবু বকর, উমর, উসমান, আলি, যুবায়র বিন আওয়াম, সা'দ, খালিদ বিন সাঈদ, আবান বিন সাঈদ, উবাই বিন কাআব, হানযালা বিন রাভী, মুআইকাব বিন আবি ফাতিমা, আরকাম, আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা, খালিদ বিন ওয়ালিদ, মুগীরা বিন শুবা, মুআবিয়া, আমর বিন আস, আব্দুল্লাহ বিন সারাহ (রা.) প্রমুখ সাহাবিদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। এ সময়ে ওহি লিখনপ্রক্রিয়া সম্পর্কে সাহাবাগণ বিভিন্ন বর্ণনা পেশ করেছেন। এ সম্পর্কে হযরত যায়দ বিন সাবিত (রা.) বলেন— নাজিল শেষ হলে আমি দুম্বার চামড়া, হাড় ও লিখন উপযোগী অন্য কিছু নিয়ে হাজির হতাম। লেখা শেষ হলে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলতেন- যা লিখেছো আমাকে পড়ে শোনাও। আমি লিখিত অংশ পড়ে শোনাতাম। কোথাও কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলে নবি (সা.) সাথে সাথে তা শুদ্ধ করে দিতেন। এরপর সংশ্লিষ্ট অংশটুকু অন্যদের সামনে তিলাওয়াত করতেন। লিখিত পাণ্ডুলিপিগুলো মহানবি (সা.) নিজ তত্ত্বাবধানে সংরক্ষণ করেন।

খুলাফায়ে রাশিদিনের যুগে সংরক্ষণ

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর (রা.)-এর খিলাফতকালে কুরআন সংরক্ষণ প্রক্রিয়া নতুন যুগে প্রবেশ করে। তার শাসনামলে হযরত উমর (রা.)-এর পরামর্শে ও যায়েদ বিন সাবিত (রা.)-এর তত্ত্বাবধানে সমগ্র কুরআন গ্রন্থাবদ্ধ করা হয়। তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা.) তার খিলাফতকালে দ্বিতীয়বার সংকলন করার পর মূল কুরআনের অনুলিপি তৈরি করিয়ে তা খিলাফতের সব গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেন। ফলে আল-কুরআনের সংরক্ষণ প্রক্রিয়াটি সারা মুসলিম জাহানে ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমান বিশ্বে সে অনুলিপিরই মুদ্রিতরূপ প্রচলিত রয়েছে।

পরবর্তীকালে সংরক্ষণ

উমাইয়া খিলাফতকালে অনারবদের কাছে আল-কুরআনের সংরক্ষণ সহজসাধ্য করে তুলতে আবুল আসওয়াদ দোয়ালী, ফারাহ প্রমুখ খ্যাতিমান ব্যাকরণবিদদের সহযোগিতায় হাজ্জাজ বিন ইউসুফ আল-কুরআনে হরকত ও নুকতা সংযুক্ত করেন। এখন বিশ্বের দিক-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়া মুসলিম জনগোষ্ঠী একদিকে যেমন সর্বাধুনিক মুদ্রণযন্ত্রে ছাপানো নির্ভুল গ্রন্থাবদ্ধ কুরআন নিজেদের কাছে সংরক্ষণ করেন, তেমনি অসংখ্য মুসলিম গোটা কুরআন মাজিদ মুখস্থ করে এ মহাগ্রন্থের সংরক্ষণ কাজ সবদিক থেকেই নিরাপদ ও নিশ্ছিদ্র রেখেছেন। ফলে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তের মুসলিম সাধারণ একটি ই'রাবের (যবর, যের, পেশ, জযম) গরমিল করেও কুরআন তিলাওয়াত করেন না। বস্তুত মহান আল্লাহ স্বয়ং কুরআন মাজিদ সংরক্ষণের যে দায়িত্ব নিয়েছেন, এ হচ্ছে তারই বাস্তব প্রমাণ।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কোন গ্রন্থটি অপরিবর্তনীয়, শাশ্বত ও চিরন্তন সত্যের ধারক?
২. কোন সময়ে আল্লাহ তাআলা সমগ্র কুরআন একসঙ্গে বায়তুল ইযযায় নাজিল করেন?
৩. আল-কুরআনের সংরক্ষক কে?
৪. বিরে মাউনের ঘটনায় কতজন ক্বারি শহিদ হন?
৫. রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে কতজন কাতিবে ওহি ছিলেন?
৬. কার পরামর্শে সমগ্র কুরআন গ্রন্থাবদ্ধ করা হয়?

উত্তরের জন্য দেখো ১১০ পৃষ্ঠা।

খ. একক কাজ

শিক্ষার্থীরা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে কুরআন সংরক্ষণের ২টি পদ্ধতি লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ১২ আল-কুরআন সংকলন
The Compilation of Al-Quran

আল-কুরআন সংকলনের পদ্ধতি ও ইতিহাস

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায় গ্রন্থাকারে পূর্ণাঙ্গ কুরআন সংকলন সম্ভব ছিল না। কেননা, তিনি বেঁচে থাকা পর্যন্ত ওহি নাজিল অব্যাহত ছিল। তাছাড়া তখন এ সংকলন ততটা আবশ্যক হিসেবে দেখা দেয়নি। স্বয়ং নবি (সা.) ছিলেন জীবন্ত কুরআন। তাঁর অধিকাংশ সাহাবিই (রা.) কুরআন মুখস্থ করে ও লিখে সংরক্ষণ করেছিলেন। কিন্তু মহানবি (সা.)-এর ইন্তেকালের পর খিলাফতে এমন কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ও অপ্রত্যাশিত ঘটনা সংঘটিত হয় যার ফলে এই মহাগ্রন্থ সংরক্ষণ প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্থ হয়। তেমনি সংকটকালে আল-কুরআনের সংকলন অনিবার্য হয়ে পড়লে দুটি ভিন্ন পরিস্থিতিতে দু'বারে আল-কুরআন সংকলনের কাজ সুসম্পন্ন হয়।

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে কুরআন সংকলন

গ্রন্থাকারে সমুদয় কুরআন সংকলিত না হলেও রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর যুগেই এর লিখিত সংকলন তৈরি হয়ে যায়। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর প্রায় অর্ধশত সাহাবি (রা.)-কে 'কাতিবে ওহি' নিয়োগ করে ওহি লেখার যে দায়িত্ব প্রদান করেন তাতেই এ মহাগ্রন্থের সংকলন সম্পন্ন হয়। সূরাসমূহের তারতিব[৩], সূরা লিপিবদ্ধ করার প্রকৃতি, কোন আয়াতের পর কোন আয়াত লিপিবদ্ধ করতে হবে তার নির্দেশনা রাসুলুল্লাহ (সা.) ওহির মাধ্যমে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। পৃথিবীতে মানুষের কাছে আজ যে কুরআন বিদ্যমান তা অবিকল রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর সাহাবিদের কাছে রেখে যান। মহান আল্লাহর নির্দেশে তিনি আয়াত, রুকু ও সূরার বিন্যাস করেছেন। কোনো কোনো সূরা একবারে নাজিল হয়েছে এবং কোনো কোনো সূরা খণ্ড খণ্ডভাবে নাজিল হয়েছে। কোন আয়াত কোন সূরার কোন স্থানে স্থাপন করতে হবে তা তিনি বলে দিতেন এবং তদানুযায়ী তা রুকু ও সূরার অন্তর্ভুক্ত করা হতো। কিন্তু এর গ্রন্থরূপ ছিল না।

হযরত আবু বকর (রা.)-এর কুরআন সংকলন

ক. **সংকলনের কারণ:** রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তেকালের পর ভণ্ডনবিদের আবির্ভাব, যাযাবরদের ইসলাম ত্যাগ, একদল নওমুসলিমের জাকাতদানে অস্বীকৃতি এবং বাইরের শত্রুদের আক্রমণের আশঙ্কা ইসলামি খিলাফতের অস্তিত্ব হুমকির মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়। এমন বিপর্যস্ত অবস্থা মোকাবিলার জন্য হযরত আবু বকর (রা.)-কে অসংখ্য সামরিক অভিযান পরিচালনা করতে হয়। এর মধ্যে দ্বাদশ হিজরিতে (৬৩৩ খ্রি.) ভণ্ডনবি মুসায়লামাতুল কাযযাবের বিরুদ্ধে পরিচালিত ইয়ামামার যুদ্ধ[৪] অন্যতম। এ যুদ্ধে দু'পক্ষেই বিপুল লোক হতাহত হয়। মুসলমানদের মধ্যে এমন সত্তর জন সাহাবি (রা.) শাহাদতবরণ করেন যারা আল-কুরআনের হাফিজ বা পূর্ণ কুরআন মুখস্থকারী ছিলেন।

বহুসংখ্যক হাফেজে কুরআন সাহাবি (রা.)-এর শাহাদতবরণ কুরআন মাজিদ সংরক্ষণ ব্যবস্থায় বিপর্যয় সৃষ্টির আশঙ্কা প্রবল করে তোলে। সবার আগে হযরত উমর (রা.) বিষয়টি উপলব্ধি করেন। তিনি স্পষ্টত প্রত্যক্ষ করেন যে, এভাবে কেবল মুখস্থ করে সম্পূর্ণ কুরআন সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা থাকলে এক সময়ে তার কোনো না কোনো অংশ বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। এ উপলব্ধির পরিপ্রেক্ষিতে হযরত উমর (রা.) খলিফা আবু বকর (রা.)-এর কাছে যান এবং কুরআন সংরক্ষণ প্রক্রিয়া সব দিক থেকে সন্দেহমুক্ত রাখতে গ্রন্থাকারে সংকলনের প্রস্তাব দেন। হযরত আবু বকর (রা.) প্রথম দিকে এ প্রস্তাবে সম্মতি না দিলেও পরে বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করে রাষ্ট্রীয়ভাবে আল-কুরআন সংকলনের উদ্যোগ নেন এবং এ সম্মানজনক ও গুরুত্বপূর্ণ কাজটির দায়িত্ব রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রধান ওহি লেখক হাফেজ ও ক্বারি হযরত যায়েদ বিন সাবিত (রা.)-এর ওপর অর্পণ করেন।

---

৩. 'তারতিব' আরবি শব্দ। এর অর্থ— ধারাবাহিকতা।

৪. ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে মহানবি (সা.)-এর ইন্তেকালের পর অনেক আরব গোত্র ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। খলিফা আবু বকর (রা.) ১১ টি সেনাদল গঠন করে বিদ্রোহীদের মোকাবেলা করেন। মক্কার নিকটবর্তী ইয়ামামার প্রান্তরে সংঘটিত এ যুদ্ধকেই ইয়ামামার যুদ্ধ বলে।

খ. কুরআনের গ্রন্থরূপ দেওয়া: কুরআন সংকলনের সুকঠিন দায়িত্ব লাভের পর হযরত যায়েদ বিন সাবিত (রা.) চারটি বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করেন।

প্রথমত, সাহাবাদের স্মৃতিতে সুরক্ষিত কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের পারস্পরিক তুলনা ও নির্ভুলতা যাচাই।

দ্বিতীয়ত, হযরত উমর (রা.)-এর ব্যক্তিগত পাণ্ডুলিপি ও স্মৃতির সাথে তুলনার মাধ্যমে সত্যতা যাচাই।

তৃতীয়ত, স্বয়ং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সামনে লিপিবন্ধ হওয়ার ব্যাপারে প্রত্যক্ষদর্শী দু'জন সাক্ষীর সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে প্রতিটি আয়াতের অবিকৃতি নিশ্চিতকরণ এবং তারপর লিপিবন্ধ করা।

চতুর্থত, চূড়ান্ত পর্যায়ে লিখিত আয়াতগুলো অন্যান্য সাহাবি কর্তৃক লিখিত পাণ্ডুলিপির সাথে সুষ্ঠুভাবে যাচাই করে মূল পাণ্ডুলিপির অন্তর্ভুক্ত করা।

এভাবে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পরিপূর্ণ নিশ্চয়তা ও সংশয়মুক্ত হওয়ার পর কুরআন মাজিদের এক একটি শব্দ সুন্দরভাবে লিখিত হয় এবং সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি লেখা সমাপ্ত হয়।

এরপর সম্পূর্ণ কুরআন মৃত্যু পর্যন্ত আবু বকর (রা.)-এর কাছে গচ্ছিত থাকে। এরপর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত উমর (রা.)-এর কাছে এটি সংরক্ষিত ছিল। তার মৃত্যুর পরে উমর-তনয়া হাফসা (রা.)-এর কাছে এটি সংরক্ষিত ছিল (সহিহ বুখারি)।

হযরত উসমান (রা.)-এর কুরআন সংকলন

তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে কুরআন মাজিদ সংকলনের সর্বজনীন উদ্যোগ জরুরি হয়ে পড়ে।

ক. সংকলনের কারণ: মূল কুরআন নাজিল হয়েছিল কুরাইশদের ব্যবহৃত আরবি ভাষায়। মহানবি (সা.) কুরআনের পঠন সহজতর করার জন্য মূল অর্থে কোনো পার্থক্য না করে আরবদের বিভিন্ন আঞ্চলিক রীতিতে কুরআন তিলাওয়াতের অনুমতি দেন। সীমিত পরিসরে হওয়ায় এতে কোনো সমস্যা ছিল না। কিন্তু নবিজির ইন্তেকালের পর ইসলাম আরবের সীমানা পেরিয়ে ইরাক, ইরান, সিরিয়া, মিসর, আফ্রিকা ও ইউরোপে ছড়িয়ে পড়লে কুরআন পাঠের গোত্রীয় ভিন্নতা ব্যাপক বিভ্রান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহাবি হুযায়ফা (রা.) খলিফার কাছে কেবল কুরাইশ রীতিতে কুরআন পাঠের ব্যবস্থা করার নিবেদন করেন।

খ. সর্বজনীন সংকলন: পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য উসমান (রা.) সর্বপ্রথম রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে আঞ্চলিক বিকৃতিসম্পন্ন কুরআনের মতবিরোধপূর্ণ ব্যক্তিগত কপিসমূহ সংগ্রহ করেন এবং সাহাবাদের (রা.) ঐকমত্যে সেগুলো পুড়িয়ে ফেলেন। পরবর্তীতে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে কুরাইশদের ব্যবহৃত ভাষায় সবার জন্য উপযোগী একই পঠনরীতিতে সংকলিত এবং হযরত হাফসা (রা.)-এর কাছে রক্ষিত কুরআন মাজিদের মূলকপি চেয়ে আনলেন। এ মাসহাফ[৩] সামনে রেখে সূরার তারতিবসহ কুরআন মাজিদের শুদ্ধতম মাসহাফ সংকলনের জন্য বিশেষজ্ঞ চারজন মাশহুর সাহাবিকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হলো। কমিটির সদস্যরা হলেন— হযরত যায়েদ বিন সাবিত, আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের, সাঈদ বিন আস ও আব্দুর রহমান বিন হারিস (রা.)। তারা মূল মাসহাফ থেকে এর সাতটি অনুলিপি তৈরি করে খিলাফতের গুরত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলোতে পাঠিয়ে দিলেন।

জেনে রাখো

সংকলনপূর্বক কুরআনের অবস্থা:
- মুখস্থ করার মাধ্যমে।
- চামড়ায় লিপিবন্ধ করার মাধ্যমে।
- পাথরে লিখে রাখার মাধ্যমে।
- গাছের পাতায় লিখে রাখার মাধ্যমে।
- গাছের বাকলে লিখে রাখার মাধ্যমে কুরআন সংরক্ষিত ছিল।

[৩] 'মাসহাফ' অর্থ পবিত্র গ্রন্থ। এখানে কুরআনের পাণ্ডুলিপিকে বোঝানো হয়েছে।

আল-কুরআনের এ সংকলন সম্পর্কে হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বলেন— হুযায়ফা বিন ইয়ামান (রা.) উসমান (রা.)-এর কাছে এমন সময় আসলেন যখন শাম ও ইরাকের লোকেরা আরমেনিয়া ও আজারবাইজান বিজয়ের সংগ্রামে লিপ্ত ছিল। হুযায়ফা (রা.) কুরআনের বিভিন্ন রকমের পাঠের ব্যাপারে শঙ্কিত ছিলেন। তাই তিনি উসমান (রা.)-কে বললেন, হে আমিরুল-মুমেনিন, এ জাতি কিতাব সম্পর্কে মতপার্থক্যে লিপ্ত হওয়ার পূর্বে এদেরকে রক্ষা করুন। যেমন এরপূর্বে ইহুদি ও নাসারারা[৪] লিপ্ত হয়েছিল। যেজন্যে উসমান (রা.) হাফসা (রা.)-এর কাছে জনৈক ব্যক্তিকে এ বলে পাঠালেন যে, 'আপনার কাছে সংরক্ষিত কুরআনের লিপিসমূহ আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন, যাতে করে আমরা কুরআনকে একখানি পরিপূর্ণ গ্রন্থাকারে সন্নিবেশিত করতে পারি। এরপর মূললিপি আপনার কাছে ফিরিয়ে দেব।'

হাফসা (রা.) যখন মূললিপি উসমান (রা.)-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন তখন উসমান (রা.) যায়েদ বিন সাবিত, আব্দুল্লাহ বিন যুবায়র, সাঈদ বিন আস ও আব্দুর রহমান বিন হারিস বিন হিশাম (রা.)-কে কুরআন পুনঃলিপিবন্ধ করার নির্দেশ দিলেন। উসমান (রা.) তিনজন কুরাইশকে বললেন, যে ক্ষেত্রে তোমরা যায়েদের সাথে কুরআনের কোনো ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করবে, সেক্ষেত্রে তোমরা কুরাইশদের ভাষায় লিপিবন্ধ করবে, কেননা কুরআন তাদের ভাষায় নাজিল হয়েছে। অতএব তারা তাই করলেন এবং যখন অনেক কপি লেখা হয়ে গেল তখন উসমান (রা.) মূলকপি হাফসা (রা.)-এর কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। এরপর উসমান (রা.) প্রত্যেক প্রদেশে কুরআনের কপিসমূহের এক একখানা পাঠিয়ে দিলেন এবং সাথে সাথে নির্দেশ দিলেন অন্যান্য লিখিত যে কপিসমূহ রয়েছে আলাদা আলাদা অথবা একত্রে সেসব যেন জ্বালিয়ে দেওয়া হয় (সহিহ বুখারি)।

কুরআন সংকলনে যুগান্তকারী এ ভূমিকার জন্য হযরত উসমান (রা.) ইতিহাসখ্যাত হন 'জামিউল কুরআন' বা কুরআন সংকলক, সংগ্রাহক বা একত্রকারী নামে। আর এভাবেই প্রথমে হযরত আবু বকর (রা.) এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে হযরত উসমান (রা.)-এর প্রচেষ্টায় আল-কুরআনের পরিপূর্ণ সংকলন সমাপ্ত হয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কে স্বয়ং জীবন্ত কুরআন ছিলেন?
২. ইয়ামামার যুদ্ধে কতজন হাফিজে কুরআন সাহাবি শাহাদাতবরণ করেন?
৩. কার তত্ত্বাবধানে সমগ্র কুরআন গ্রন্থাবদ্ধ হয়?
৪. আল-কুরআন সংকলনে হযরত যায়েদ বিন সাবিত (রা.) কয়টি বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করেন?
৫. প্রথম দুই খলিফার পরে আল-কুরআনের মূল কপি কার কাছে সংরক্ষিত ছিল?
৬. ইসলামের কোন খলিফাকে 'জামিউল কুরআন' বলা হয়?

উত্তরের জন্য দেখো ১১০ পৃষ্ঠা।

খ. দলীয় কাজ

সব শিক্ষার্থী দু'টি দলে বিভক্ত হবে। একটি দল হযরত আবু বকর (রা.)-এর সময়ে কুরআন সংকলন ও আরেকটি দল হযরত উসমান (রা.)-এর সময়ে কুরআন সংকলনের ইতিহাস সংক্ষেপে লিখে শিক্ষকের কাছে উপস্থাপন করবে।

[৪] বনি ইসরাইল সম্প্রদায়ের যারা ঈসা (আ.)-এর শরিয়ত মেনে চলেন, তাদের নাম নাসারা তথা সাহায্যকারী। কেননা তারা একে অপরকে সাহায্য করেছিলেন।

পাঠ ১৩, ১৪ ও ১৫

আদর্শ জীবন গঠনে আল-কুরআনের ভূমিকা
Role of Al-Quran in Forming Ideal Life

মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। ব্যক্তিজীবন হতে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, জাতীয়, আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক জীবন অবধি জীবনের প্রতিটি অধ্যায় ও বিভাগে মানুষের সমস্যার অন্ত নেই। মানবজাতিকে এ সমস্যার আবর্ত হতে পরিত্রাণ দিয়ে শান্তিময় ও উদ্বেগহীন জীবন পরিচালনার জন্য আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে অগণিত নবি ও রাসুল প্রেরণ করেছেন এবং জীবন সমস্যার সমাধান হিসেবে তাদেরকে দান করেছেন আসমানি কিতাব। এরই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ নবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর প্রতি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব আল-কুরআন নাজিল করেছেন। আল্লাহ তাআলা মানবজীবনের সর্ববিধ সমস্যার সমাধান এই মহাগ্রন্থে উপস্থাপন করেছেন।

ইরশাদ হয়েছে, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ۔

অর্থ: আর আমি তোমার ওপর কিতাব নাজিল করেছি, যা প্রতিটি বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনা সম্বলিত, হেদায়েত, রহমত এবং সুসংবাদ মুসলিম জাতির জন্য (সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৮৯)। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর বিদায় হজের ভাষণে এজন্যই বলেছেন, 'আমি তোমাদের মাঝে দুটো বিষয় রেখে যাচ্ছি। যদি তোমরা এ দুটোকে আঁকড়ে ধর, কখনোই পথভ্রষ্ট হবে না। একটি হলো মহান আল্লাহর কিতাব এবং অপরটি তাঁর রাসুলের সুন্নত' (মিশকাত)।

ব্যক্তিজীবনে আদর্শ প্রতিষ্ঠায়

ব্যক্তি বৃহত্তর মানবসমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তা সত্ত্বেও তার নিজস্ব সমস্যা রয়েছে। ব্যক্তির বিশ্বাস, কার্যক্রম, দায়িত্ব ও কর্তব্যের সীমা নির্ধারণ এবং কাজের জন্য ব্যক্তিকে স্বতন্ত্রভাবে দায়ী করে কুরআন ব্যক্তিজীবনের সমস্যা নিরসনের উদ্যোগ নিয়েছে। এজন্য প্রথমেই ব্যক্তিকে কুফর, শিরক, পৌত্তলিকতা প্রভৃতি অসার বিশ্বাস থেকে মহান আল্লাহর একত্ববাদ বা তাওহিদ, রিসালাত এবং আখিরাতে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণের আহ্বান জানিয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন— تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ **অর্থ:** তোমরা মহান আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রাসুলের প্রতি ইমান আনবে (সূরা আস-সফ, আয়াত: ১১)।

নিজেকে বিশ্বাসী মানুষে পরিণত করা, সদাচার ও ন্যায়-নিষ্ঠায় অভ্যস্ত করা ব্যক্তির নিজের জন্য জরুরি। এ মর্মে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, যে সৎকাজ করল, তা করল তার নিজের জন্য আর যে খারাপ কাজ করল, তার পরিণামও তার ওপরেই বর্তাবে (সূরা আল-জাসিয়া, আয়াত: ১৫)। তিনি আরও বলেন—

مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ (ج) وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا (ط) وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى (ط)

অর্থ: যে হেদায়েতের পথে চলবে, তা হবে তার নিজের জন্য কল্যাণকর। আর যে ভ্রান্ত পথে চলবে, তার গোমরাহির জন্য সে নিজেই দায়ী। কোনো বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত: ১৫)। কর্মবিমুখতা ও বৈরাগ্য ব্যক্তিজীবনের অন্যতম সমস্যা। কুরআন ব্যক্তিকে সংসারী, ধার্মিক এবং কর্মমুখর হওয়ার নির্দেশনা দিয়ে এ সমস্যার নিরসন করে। মহান আল্লাহ বলেন—

وَرَهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ۔

অর্থ: আর বৈরাগ্য, সেতো তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করেছে। আমি এটা তাদের ওপর ফরজ করিনি (সূরা আল-হাদিদ, আয়াত: ২৭)।

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন—

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ.

অর্থ: আর নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভালো লাগে তাকে বিয়ে করো (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৩)।

মহান আল্লাহ আরো বলেন— এরপর সালাত শেষ হলে তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড়, আর মহান আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করো ও মহান আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও (সূরা আল-জুমুআহ, আয়াত: ১০)।

আদর্শ পরিবার গঠনে

মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি, স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন সবাইকে নিয়ে মুসলিম পরিবার গড়ে ওঠে। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস, ভালোবাসা, সহানুভূতি, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি এবং সর্বাত্মক সহযোগী মনোভাব প্রতিষ্ঠাই এ সংস্থার মূল লক্ষ্য। পরিবার তথা স্বজনদের প্রতি দায়িত্ব পালন বিষয়ে কুরআনের প্রথম হেদায়েত হচ্ছে, وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ **অর্থ:** আর নিকটাত্মীয়কে তার হক দিয়ে দাও (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত: ২৬)। কুরআন বিভিন্নভাবে নিকটাত্মীয়দের নানা রকমের হক নির্ধারণ করে দিয়ে তা আদায়ের পথ নির্দেশ করেছে। মহান আল্লাহ বলেছেন—

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا.

অর্থ: হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিজনদের আগুন থেকে রক্ষা করো (সূরা আত-তাহরিম, আয়াত: ৬)।

কুরআনে পরিবারের সদস্যদের প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদাভাবে পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দেশ করা হয়েছে। **যেমন:** মাতা-পিতার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে— 'আর মাতা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দু'বছর দুধ খাওয়াবে, যদি দুধ খাওয়ানোর মেয়াদ পূর্ণ করতে চায়। আর পিতার দায়িত্ব হলো সন্তানের মাতাদের সঠিকভাবে ভরণ-পোষণ প্রদান করা' (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৩৩)। সন্তানদের জন্য নির্দেশনা এসেছে—

وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ؕ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَاۤ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَاۤ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا.

অর্থ: আর মাতা-পিতার সাথে সদাচরণ কর। তাদের একজন কিংবা উভয়ই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয় তাহলে তাদের 'উহ' শব্দটিও বলো না, তাদের ধমক দিয়ো না এবং তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলো (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত: ২৩)। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার নির্দেশ করে বলা হয়েছে- 'আর স্ত্রীদের ওপর স্বামীদের যেমন অধিকার আছে, তেমনি স্ত্রীদেরও স্বামীদের ওপর অধিকার রয়েছে' (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২২৮)। এভাবে কুরআন পারিবারিক সমস্যা সমাধানে সঠিক ও কার্যকর নির্দেশনা দিয়েছে।

আদর্শ সমাজ গঠনে

মানুষ সামাজিক জীব। আত্মীয়-অনাত্মীয়, মুসলিম-অমুসলিম পাড়া-প্রতিবেশী নিয়ে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে তাকে সামাজিক পরিমণ্ডলে জীবনযাপন করতে হয়। অবিচার, জুলুম, অধিকার আত্মসাৎ, হত্যা, চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই, ব্যভিচার ও নানারকম খারাপ আচরণ সামাজিক জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। সাামাজিক সমস্যা সমাধানের মূল উৎস হিসেব এসব সমস্যা নিরসনে কুরআন ঘোষণা দিয়েছে—

ক. اِعۡدِلُوۡا هُوَ اَقۡرَبُ لِلتَّقۡوٰی অর্থ: তোমরা ন্যায়বিচার করো। তা তাকওয়ার সর্বাধিক নিকটবর্তী (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত: ৮)।

খ. وَبِالۡوَالِدَيۡنِ اِحۡسَانًا وَّبِذِی الۡقُرۡبٰی وَالۡيَتٰمٰی وَالۡمَسٰكِيۡنِ وَالۡجَارِ ذِی الۡقُرۡبٰی وَالۡجَارِ الۡجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالۡجَنۡۢبِ

وَابۡنِ السَّبِيۡلِ ۙ وَمَا مَلَكَتۡ اَيۡمَانُكُمۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنۡ كَانَ مُخۡتَالًا فَخُوۡرَا ۙ

অর্থ: আর মাতা-পিতার সাথে ভালো ব্যবহার করো; নিকটাত্মীয়, এতিম ও মিসকিনদের প্রতিও এবং প্রতিবেশী আত্মীয়ের প্রতি, অনাত্মীয় প্রতিবেশীর প্রতি, পাশাপাশি চলার সাথী ও পথিকের প্রতি এবং তোমাদের অধীনস্থ ক্রীতদাস ও দাসীদের প্রতি দয়ানুগ্রহ প্রদর্শন কর। নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ দাম্ভিক ও গর্বকারীকে ভালোবাসেন না (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৩৬)।

গ. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تَاۡكُلُوۡۤا اَمۡوَالَـكُمۡ بَيۡنَكُمۡ بِالۡبَاطِلِ **অর্থ:** মুমিনগণ! তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ আত্মসাৎ করো না (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ২৯)।

ঘ. وَلَا تَقۡتُلُوا النَّفۡسَ الَّتِىۡ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالۡحَـقِّ **অর্থ:** আর এমন কাউকে হত্যা করো না, যাকে হত্যা করা মহান আল্লাহ হারাম করেছেন। অবশ্য ন্যায়সঙ্গত হত্যার কথা স্বতন্ত্র (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত: ৩৩)।

ঙ. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقۡطَعُوۡۤا اَيۡدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ (ط) وَاللّٰهُ عَزِيۡزٌ حَكِيۡمٌ

অর্থ: আর পুরুষ ও মহিলা চোর; উভয়ের হাত কেটে দাও। এটি তাদের কর্মের পরিণাম এবং মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সতর্কবাণী। আর মহান আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, বিজ্ঞানময় (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত: ৩৮)।

চ. ব্যভিচারী পুরুষ ও মহিলা তাদের প্রত্যেককে একশত করে বেত্রাঘাত করো। মহান আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নে তাদের প্রতি তোমাদের মনে যেন করুণা জেগে না ওঠে, যদি তোমরা মহান আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। মুসলিমদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে (সূরা আন-নুর, আয়াত: ২)।

এমনভাবে সহানুভূতি, সদাচার ও ন্যায়নীতির ভিত্তিতে কুরআন মাজিদ মানুষের সামাজিক জীবনকে সমস্যামুক্ত ও শান্তিপূর্ণ করার সামগ্রিক বিধান দিয়েছে।

আদর্শ জাতি গঠনে

জাতীয় জীবনের মূল সমস্যা অনৈক্য, আস্থাহীনতা এবং জাতীয় দায়িত্ব পালনে অবহেলা প্রদর্শন। এ সমস্যার মূলোৎপাটন করতে মুসলিম জাতিকে কুরআন নির্দেশনা দিয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন—

وَاعۡتَصِمُوۡا بِحَبۡلِ اللّٰهِ جَمِيۡعًا وَّلَا تَفَرَّقُوۡا ص

অর্থ: আর তোমরা মহান আল্লাহর পথ ঐক্যবদ্ধভাবে আঁকড়ে ধরো এবং বিচ্ছিন্ন হয়ো না (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১০৩)। এ ঘোষণার মাধ্যমে আল-কুরআন বিভক্তি, অনৈক্য, দায়িত্বহীনতা প্রভৃতি জাতীয় সমস্যার কল্যাণকর সমাধান দেয়।

আন্তর্জাতিক জীবনে আদর্শ প্রতিষ্ঠায়

বর্ণ ও অঞ্চলগত সংঘাত আন্তর্জাতিক জীবনের মূল সমস্যা। এছাড়াও সাম্রাজ্য বিস্তারের অশুভ বাসনা, জবরদখল, যুদ্ধ ইত্যাদি কর্মকাণ্ড বিশ্ব পরিস্থিতিকে অশান্ত করে রাখে। কুরআন সব কালের ও বিশ্বের সব দেশের মানুষকে একই বংশোদ্ভূত ঘোষণা দিয়ে দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে, বর্ণ ও অঞ্চলগত সংঘাত বন্ধের জোরালো তাগিদ দিয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেন— 'হে মানুষ, আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে। পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অন্যের সঙ্গে পরিচিত হতে পারো। তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি মহান আল্লাহর কাছে অধিক মর্যাদাশীল যে অধিক মুত্তাকি (আল্লাহভীরু)' (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১৩)। শান্তি বজায় রাখতে কুরআন শান্তিচুক্তি বা সন্ধির নির্দেশনা দিয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন—

وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ (ط) اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

অর্থ: আর যদি তারা সন্ধি করতে আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহলে তুমিও সেদিকে আগ্রহী হও এবং মহান আল্লাহর ওপর ভরসা করো। নিঃসন্দেহে তিনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন (সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৬১)। এমনকি মুসলিম জাতি বা রাষ্ট্রকে সাহায্য করার ক্ষেত্রেও চুক্তির মর্যাদা রক্ষার কথা বলা হয়েছে। যেমন—

وَاِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اِلَّا عَلٰى قَوْمٍۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ (ط)

অর্থ: আর যাঁরা হিজরত করেনি এমন মুমিনগণ যদি দীনের ব্যাপারে তোমাদের কাছে সাহায্য চায়, তবে তাদেরকে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। কিন্তু সে জাতির বিরুদ্ধে নয় যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি আছে (সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৭২)।

ধর্মীয় জীবনে আদর্শ প্রতিষ্ঠায়

ধর্ম নিয়ে সংঘাত, রক্তপাত ও বাড়াবাড়ি বিভিন্ন ধর্মানুসারী মানুষদের জীবন দুর্বিষহ করে রেখেছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মানুষের জীবন অশান্তিপূর্ণ করে তুলেছে। এর সমাধানকল্পে কুরআন স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে—

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ ۙ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ـ

অর্থ: দীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই। নিঃসন্দেহে হেদায়েত গোমরাহি থেকে পৃথক হয়ে গেছে (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৫৬)।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আদর্শ প্রতিষ্ঠায়

সম্পদের অসম বণ্টন, উপার্জনে ও ব্যয়ে হারাম পদ্ধতি অনুসরণ, সম্পদ আত্মসাৎ, সুদ প্রভৃতি হচ্ছে মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা। এজন্য মানুষকে হালাল জীবিকা উপার্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে— - كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا

অর্থ: তোমরা পৃথিবীর যা হালাল ও পবিত্র, তা আহার করো (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৬৮)।

كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ـ

অর্থ: আমি তোমাদেরকে জীবিকা হিসেবে যা দিয়েছি তা থেকে পবিত্র বস্তু আহার করো (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৭২)।

অপচয় নিষিদ্ধ করে বলা হয়েছে- 'তোমরা খাও ও পান করো। কিন্তু অপচয় করো না' (সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ৩১)। 'আর অপব্যয় করো না, নিশ্চয়ই অপব্যয়ীরা শয়তানের ভাই' (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত: ২৬-২৭)। ধনীদের সম্পদে গরিবদের 'অধিকার' ঘোষণা করে মহান আল্লাহ বলেছেন—

وَفِىْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ـ

অর্থ: আর তাদের সম্পদে প্রার্থনাকারী ও বঞ্চিতদের হক রয়েছে (সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত: ১৯)।

অসম অর্থবণ্টন রোধে মহান আল্লাহ জাকাত প্রথার প্রবর্তন করেছেন। কুরআনে এসেছে, 'আর তোমরা সালাত কায়েম করো ও জাকাত আদায় করো (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৪৩)। সর্বোপরি, অর্থব্যবস্থাকে শোষণমুক্ত রাখতে সুদ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে- وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا **অর্থ:** আর মহান আল্লাহ বেচা কেনা হালাল করেছেন ও সুদকে হারাম করেছেন (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৭৫)। এভাবে অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে কুরআন মাজিদ অনবদ্য ভূমিকা পালন করে।

আদর্শিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চায়

নীতি-আদর্শহীনতা এবং অশালীনতার চর্চা শিক্ষা ও সংস্কৃতির মূল সমস্যা। এ সমস্যা সমাধানে কুরআন সবার জন্য শিক্ষাগ্রহণ ফরজ করেছে এবং নিষিদ্ধ করেছে সব অশালীন আচরণ। মহান আল্লাহ বলেন— اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ **অর্থ:** পড়ো তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন (সূরা আল-আলাক, আয়াত: ১)।

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَاحِشَ **অর্থ:** বলো সুনিশ্চিতভাবেই আমার প্রভু সব অশালীনতা ও অশ্লীলতা হারাম করেছেন (সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ২৮)। কুরআনে জ্ঞানী এবং অশিক্ষিতদের মধ্যে মর্যাদার সুস্পষ্ট বিভেদরেখা টেনে দেওয়া হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেন— هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

অর্থ: যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে?

অশালীন সংস্কৃতিচর্চা নিষিদ্ধ করে ঘোষণা করা হয়েছে–

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (لا) فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ (ط)

অর্থ: যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার বিস্তার কামনা করে নিশ্চয়ই দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে (সূরা আন-নুর, আয়াত: ১৯)।

নৈতিক জীবন গঠনে

নৈতিক অধঃপতন এমন এক সমস্যা যা মানবজাতির ধ্বংস ডেকে আনে। এ সমস্যা থেকে মুক্তিলাভের জন্য কুরআন মানুষকে মহান আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে—

صِبْغَةَ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً

অর্থ: আমরা মহান আল্লাহর রং গ্রহণ করেছি। মহান আল্লাহর রং-এর চাইতে উত্তম রং আর কার হতে পারে? (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৩৮)।

মানুষকে নৈতিক স্খলন ও নীতিহীনতা থেকে রক্ষার জন্য কুরআনে সব রকমের পাপাচার, বিদ্রূপ, উপনামে ডাকা, দোষারোপ, দোষান্বেষণ, ভিত্তিহীন অনুমান, গিবত, অন্যায় ও অশালীন কাজ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে।

আধ্যাত্মিক জীবনে আদর্শ প্রতিষ্ঠায়

কুরআন মানুষের দুটি সত্তার কথা উল্লেখ করেছে। একটি দেহ, অন্যটি রূহ বা আত্মা। পরিপূর্ণ মানুষ হওয়া এবং সত্যিকারের সাফল্যলাভের জন্য মানুষকে তাই দৈহিক ইবাদত ও পবিত্রতার পাশাপাশি রূহের ইবাদত ও পবিত্রতাও অর্জন করতে হয়। সে কারণে কুরআন আধ্যাত্মিক বা আত্মিক সমস্যা নিরসনেও যথার্থ উদ্যোগ নিয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ـ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا ـ

অর্থ: যে নিজেকে শুদ্ধ করে সেই সফল হয় আর যে নিজেকে কলুষিত রাখে সে ব্যর্থ হয় (সূরা আশ-শামস, আয়াত: ৮-৯)।

পার্থিব জীবনে উত্তম আদর্শ প্রতিষ্ঠায়

কুরআনে পার্থিব জীবনকে উপেক্ষা করতে বলা হয়নি। কেননা পার্থিব জীবনের কর্মকাণ্ডের ওপর ভিত্তি করেই পরকালীন সাফল্য-ব্যর্থতা নির্ধারিত হবে। যেমন বলা হয়ে থাকে- اَلدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الْاٰخِرَةِ

অর্থ: দুনিয়া আখিরাতের শস্যক্ষেত্র।

আল্লাহ তাআলা বলেন– رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً

অর্থ: আমাদের প্রভু! আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ দান করুন (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২০১)।

পরকালীন জীবনে শান্তি ও মুক্তির ক্ষেত্রে

পার্থিব জীবন ক্ষণস্থায়ী। পার্থিব জীবনাবসানের পর মানুষ পরকালের অনন্ত জীবনে প্রবেশ করে। আর সে সফল অনন্ত জীবনের জন্য দরকার ইহকালের কৃতকার্যতা। এ জীবনে ব্যর্থ হওয়া মানেই চিরস্থায়ী ধ্বংসে পতিত হওয়া। এজন্য আল-কুরআন পরকালীন জীবনকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়ার নির্দেশনা দেয়। মহান আল্লাহ বলেন— ‘তোমরা কি আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ খুবই নগণ্য’ (সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ৩৮)। বস্তুত মহান আল্লাহর কাছে পরকালমুখী চেষ্টা-সাধনাই গ্রহণযোগ্য। ইরশাদ হয়েছে–

وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا۔

অর্থ: আর যারা পরকাল কামনা করে এবং মুমিন অবস্থায় তার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে, এমন লোকদের চেষ্টাই স্বীকৃত হয়ে থাকে (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত: ১৯)।

কাজেই প্রতীয়মান হয় যে, মানবজীবনের সব দিক ও বিভাগের যাবতীয় সমস্যা সমাধানে আল-কুরআন অভ্রান্ত ও কল্যাণময় নির্দেশনা দিয়েছে। বাস্তবজীবনে এ নির্দেশনার অনুশীলন ও অনুসরণ করা হলেই প্রকৃত শান্তি ও মুক্তিলাভ সম্ভব হবে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সামাজিক সমস্যা সমাধানের মূল উৎস কী? *[সকল বোর্ড ২০২১]*
২. “আর নিকটাত্মীয়কে তার হক দিয়ে দাও।”— এটি কোন সূরায় আছে?
৩. সহানুভূতি, সদাচার ও ন্যায়নীতির ভিত্তিতে কোন গ্রন্থ মানুষের সামাজিক জীবনকে সমস্যামুক্ত ও শান্তিপূর্ণ করার সামগ্রিক বিধান দিয়েছে?
৪. জাতীয় জীবনের মূল সমস্যা কী?
৫. “পড়ো তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।”— এটি কোন সূরার আয়াত?
৬. কোন সমস্যা মানবজাতির ধ্বংস ডেকে আনে?

উত্তরের জন্য দেখো ১১১ পৃষ্ঠা।

খ. দলীয় কাজ

শিক্ষার্থীরা দু'টি দলে বিভক্ত হবে। প্রথম দল পারিবারিক জীবনে আদর্শ প্রতিষ্ঠায় আল-কুরআনের ভূমিকা এবং দ্বিতীয় দল অর্থনৈতিক জীবনে আদর্শ প্রতিষ্ঠায় আল-কুরআনের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করবে।

পাঠ ১৬ সূরা আল-বাকারার পরিচিতি ও নামকরণ
Introduction to Sura Al-Baqara and Its Naming

সূরা আল-বাকারা কুরআন মাজিদের সর্ববৃহৎ সূরা। কেবল কলেবরে নয়; মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বেও এ সূরা বিশেষ গুরুত্বের দাবিদার। নবি করিম (সা.) এ সূরাকে سَنَامُ الْقُرْاٰنِ (সানামুল কুরআন) ও ذُرْوَةُ الْقُرْاٰنِ (যুরওয়াতুল কুরআন) বলে অভিহিত করেছেন। সানাম ও যুরওয়াহ হলো বস্তুর উৎকৃষ্টতম অংশ। কাজেই আল-বাকারা কুরআন মাজিদের উৎকৃষ্টতম সূরা। বিষয় বৈচিত্র্যে এ সূরা শীর্ষস্থানীয়। মুমিন জীবনের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিধানের পাশাপাশি সূরাটিতে অতীত ইতিহাসেরও উল্লেখ করা হয়েছে। এটি কুরআনের দ্বিতীয় সূরা। এতে ৪০টি রুকু এবং ২৮৬টি বরকতপূর্ণ ও বিজ্ঞানময় আয়াত অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

সূরা আল-বাকারার নামকরণ

আল-বাকারা অর্থ গাভী। হাদিসে সূরাটির এ নামই উল্লেখ হয়েছে। সূরার নাম 'বাকারা' থেকে এটা অনুমান করার সুযোগ নেই যে, এ সূরাতে কেবল গাভী সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য, তত্ত্ব, বিধান এবং ঘটনাবলিই বিবৃত হয়েছে। বরং কোনো কিছু অনুমানের আগে সূরার নামকরণে কুরআনি দৃষ্টিভঙ্গি বুঝে নেওয়া দরকার। কুরআন মাজিদের বৃহৎ সূরাগুলোর প্রতিটিতে এতো অসংখ্য বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা স্থান পেয়েছে যে, বিষয়বস্তুর বিবেচনায় এসব সূরার যথার্থ নামকরণ প্রায় অসম্ভব। এজন্য মহান আল্লাহর নির্দেশে মহানবি (সা.) সূরাসমূহের সামগ্রিক শিরোনামের পরিবর্তে 'প্রতীকী' নাম দিয়েছেন। যার কারণে এক সূরা থেকে অন্য সূরার পার্থক্য রক্ষা করা যায়। স্বভাবতই এ নামকরণ তাই বিষয়বস্তুর বিশালতা বিবেচনায় সর্বজনীন না হলেও সূরাটির পরিচিতির একমাত্র প্রতীকে পরিণত হয়।

'আল-বাকারা' নামকরণে কুরআনি এই দৃষ্টিভঙ্গির শতভাগ বাস্তবতা লক্ষ করা যায়। এ সূরার ২৮৬টি আয়াতের মধ্যে কেবল ৯টি আয়াতে (৫১-৫৪ ও ৬৭-৭১) ইসরাইল জাতির সাথে সম্পৃক্ত দুটো 'গাভী' কাহিনির উল্লেখ রয়েছে। ৫১-৫৪ আয়াতে বনি ইসরাইলের গো-বৎস পূজার কাহিনি এবং ৬৭-৭১ আয়াতে একটি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গাভী জবেহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করা হয়েছে। সূরায় আলোচিত অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় ক্ষেত্রবিশেষে কম গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার পরও কেবল নাম রাখতে হবে এ হিসেবে সুরার নাম হয়েছে আল-বাকারা। কাজেই 'সূরা বাকারা'কে 'গাভীর কাহিনি' ভাবার অবকাশ নেই। আসল ব্যাপার হলো বিপুলায়তনের এ সুরাটিতে অসংখ্য আলোচিত বিষয়ের মধ্যে এটিও একটি অন্যতম আলোচনা।

যেহেতু আল-কুরআনে বিষয়ভিত্তিক নামকরণের প্রথাসিদ্ধ পদ্ধতির বিপরীতে 'প্রতীকী' নামকরণের রীতি অনুসৃত হয়েছে; সেক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী এর নামকরণের সার্থকতা মূল্যায়ন নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা। তারপরও বলা যায়, প্রতীকী হলেও এ নাম সূরা বাকারার অন্তর্নিহিত ভাবমূর্তি ও ইতিহাসমুখিতার প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কোনো বিবেচনাতেই যাকে তুচ্ছ ও উদ্দেশ্যহীন বিষয় ভাবা যায় না।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কুরআন মাজিদের সর্ববৃহৎ সূরা কোনটি?
২. 'সানামুল কুরআন' ও 'যুরওয়াতুল কুরআন' হিসেবে অভিহিত করা হয় কোন সূরাকে?
৩. সানাম ও যুরওয়াহ শব্দের অর্থ কী?
৪. সূরা আল-বাকারার আয়াত সংখ্যা কত? *[সকল বোর্ড ২০২৫]*
৫. 'বাকারা' অর্থ কী? *[সকল বোর্ড ২০২৫, ২০২২]*
৬. সূরা বাকারার কততম আয়াতে গাভী জবেহের কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে?

উত্তরের জন্য দেখো ১১১ পৃষ্ঠা।

খ. একক কাজ

শিক্ষার্থীরা সূরা আল-বাকারার নামকরণ সম্পর্কে ৫টি বাক্য লিখে শ্রেণিশিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ১৭ সূরা আল-বাকারা নাজিলের সময়কাল ও শানে নুজুল
Period of Revelation of Sura Al-Baqara and Its Shane Nuzul

আল-বাকারা মাদানি সূরা। এ সূরা নবি করিম (সা.)-এর মদিনায় হিজরত করার পর অবতীর্ণ হয়। অবশ্য কয়েকটি আয়াত বিদায় হজের সময় মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। এমনকি সূরার উপসংহারে প্রার্থনাসূচক যে আয়াতগুলো রয়েছে তা নবি-এর হিজরতের পূর্বে মক্কা নগরীতে অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্যের কারণে সে আয়াতগুলোও এ সূরার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ঐতিহাসিক মদিনা হিজরতের পর (৬২২ খ্রি.) মদিনায় সর্বপ্রথম আল-বাকারা নাজিল শুরু হয়। পরে বিভিন্ন আয়াত বিভিন্ন সময়ে নাজিল হতে থাকে। এ সূরার সুদ সম্পর্কিত আয়াতটি নবি করিম (সা.)-এর শেষ বয়সে মক্কা বিজয়ের পর (৬২৮ খ্রি.) অবতীর্ণ হয়। সূরার وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ শীর্ষক আয়াতখানি আল-কুরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াতগুলোর একটি। দশম হিজরির ১০ যিলহজ বিদায় হজের সময় এ আয়াতটি মিনায় অবতীর্ণ হয়। এর ৮০-৯০ দিন পর নবি করিম (সা.) ইন্তেকাল করেন। সে হিসেবে সাধারণভাবে ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মহানবি (সা.)-এর মদিনা হিজরত থেকে ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর ইন্তেকাল পর্যন্ত পুরো মাদানি জীবনজুড়ে বৃহত্তম এ সূরাটি নাজিল হয়।

সূরা আল-বাকারার নাজিলের কারণ/শানে নুজুল

শানে নুজুল (شَانُ نُزُوْلٍ) হচ্ছে অবতরণের কারণ বা পরিপ্রেক্ষিত। কুরআন মাজিদের প্রতিটি সূরা ও আয়াতই কোনো না কোনো বিশেষ কারণ বা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাজিল হয়েছে। এ সূরাটি বিভিন্ন সময়ে নাজিল হওয়ায় তাফসিরকারকগণ এর পর্যায়ক্রমিক কয়েকটি শানে নুজুল উল্লেখ করেছেন। যেমন—

১. মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবিবকে একবার অতুলনীয় এক সুন্দর কিতাব নাজিলের সুসংবাদ দেন। আল-কুরআন নাজিল শুরু হলে মহানবি (সা.) জানতে চান- এটিই সেই প্রতিশ্রুত সুন্দরতম গ্রন্থ কি না। জবাবে সূরার প্রথম দিকের আয়াতসমূহ নাজিল হয়।

২. কুরআন মাজিদের অবতরণ শুরু হলে মালেক ইবনে সাঈদ নামের এক ইহুদি অপপ্রচার চালানো শুরু করে যে, এ গ্রন্থ সর্বশেষ আসমানি কিতাব নয়। আল-কুরআন সম্পর্কিত সব সংশয় দূর করতে এবং এর সত্যতাকে প্রামাণ্য ও অবিসংবাদিত করে তুলতে আল-বাকারার ২৩ ও ২৪ আয়াত এবং অন্যান্য অংশ নাজিল হয় (লুবাবুন নুকুল)।

৩. বনি ইসরাইলের কাছে আল্লাহ তাআলার ওয়াদা ছিল যে, হযরত ইসমাইল (আ.)-এর বংশে শেষ নবি প্রেরণ করবেন। নিজের ওয়াদানুসারে শেষ নবি প্রেরণ করার পর ইহুদিরা যখন তাঁকে অস্বীকার করে তখন তাদের মুখোশ উন্মোচন করে আল্লাহ তাআলা এ সূরা নাজিল করেন।

৪. মহানবি (সা.) মদিনায় হিজরতের পর মুশরিক ও কাফিররা সম্মিলিতভাবে মহানবি (সা.) ও আল-কুরআন মাজিদের বিরুদ্ধে যে অপপ্রচারের উদ্যোগ নেয়- সেসব অপনোদনের জন্যই এ সূরা নাজিল হয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মদিনায় মহানবি (সা.)-এর ওপর সর্বপ্রথম কোন সূরা নাজিল শুরু হয়?
২. মহানবি (সা.) মক্কা হতে মদিনায় হিজরত করেন কত খ্রিষ্টাব্দে?
৩. বিদায় হজ অনুষ্ঠিত হয় কখন?
৪. شَانُ النُّزُوْلِ (শানে নুজুল) শব্দের অর্থ কী?
৫. কে অপপ্রচার করেছিল যে, আল-কুরআন সর্বশেষ আসমানি কিতাব নয়?
৬. বনি ইসরাইলের কাছে আল্লাহ তাআলার কী ওয়াদা ছিল?

উত্তরের জন্য দেখো ১১১ পৃষ্ঠা।

খ. একক কাজ

সূরা বাকারার শানে নুজুল খাতায় লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ১৮ সূরা আল-বাকারার বিষয়বস্তু
Subject Matter of Sura Al-Baqara

বিষয়বস্তু ও বিধান বর্ণনার দিক দিয়েও সূরা বাকারা সমগ্র কুরআনের মধ্যে অনন্য বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদার অধিকারী। এ সূরায় এক হাজার আদেশ, এক হাজার নিষেধ, এক হাজার হিকমত এবং এক হাজার সংবাদ ও কাহিনি রয়েছে। যে জন্য হযরত উমর ফারুক (রা.) বারো বছর এবং আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.) আট বছর এ সূরার তাফসির অধ্যয়নে অতিবাহিত করেছেন (কুরতুবি)। মূলত এ সূরাটির মধ্যে শরিয়তের হুকুম-আহকাম, রীতি-নীতি, আদেশ-নিষেধ যত বেশি পরিমাণে বিবৃত হয়েছে অন্য কোনো সূরায় তত বর্ণিত হয়নি। সূরার বিষয়বস্তুগুলো হলো:

১. মদিনার মুনাফিক, ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের ইসলামদ্রোহিতার মোক্ষম জবাব ও বিভ্রান্তির অপনোদন।
২. মুসলিমদেরকে ইসলামের একমাত্র বাহক ঘোষণা ও প্রমাণ।
৩. কুরআন মাজিদের সংশয়হীনতা ও সত্যতা অকাট্যভাবে প্রমাণ।
৪. মানবতার মুক্তির অবিসংবাদিত সংবিধান হিসেবে কুরআন মাজিদের উপস্থাপনা।
৫. মুমিন ও মুত্তাকিদের এমন কিছু বাহ্যিক ও অন্তর্গত বৈশিষ্ট্যের বিবরণ যা ছাড়া মুত্তাকি হওয়া যায় না।
৬. কাফিরদের বিরোধিতা ও দোজাহানের সর্বাঙ্গীন ব্যর্থতার বিস্তারিত বিবরণ।
৭. মুনাফিকদের জীবনাচার, পরকালীন ভয়ঙ্কর পরিণতি বর্ণনা ও পার্থিব মুখোশ উন্মোচন।
৮. মানুষ সৃষ্টির নিগূঢ় তত্ত্ব, উদ্দেশ্য ও ইতিহাস বর্ণনা।
৯. হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টি কাহিনি, তাঁর মর্যাদা লাভ ও ইবলিসের বিরোধিতার কারণ বর্ণনা।
১০. ইহুদি জাতির ষড়যন্ত্রকামী মানসিকতা ও হীন মনোবৃত্তির মুখোশ উন্মোচন।
১১. ইহুদি-খ্রিস্টানদের আন্তকোন্দল সম্পর্কিত বর্ণনা পেশ।
১২. আহলে কিতাব কর্তৃক জেনেশুনে শেষ নবি মুহাম্মাদ (সা.)কে অস্বীকার ও তার কারণ বর্ণনা।
১৩. কুরআন মাজিদের অনাগতকালের চ্যালেঞ্জ চিরায়ত মুজিযার ঘোষণা।
১৪. হযরত ইব্রাহিম (আ.) ও তাঁর পুত্র ইসমাইল (আ.)-এর জীবনাচার, প্রার্থনা ও তাদের দিয়ে কাবাগৃহ নির্মাণের ঘটনা।
১৫. কাবাকে বায়তুল মুকাদ্দাসের পরিবর্তে কিবলা নির্ধারণের ঘোষণা।
১৬. মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ এবং স্বতন্ত্র ও স্বকীয় জাতি হিসেবে তাদের পুনর্গঠন।
১৭. তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাতের তাত্ত্বিক আলোচনা।
১৮. সার্বিক সাফল্যলাভের জন্য মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনার পদ্ধতি শিক্ষাদান।
১৯. সামগ্রিক, সর্বজনীন ও পূর্ণাঙ্গ বিধান হিসেবে ইসলামি শরিয়তের প্রবর্তন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সূরা বাকারা সমগ্র কুরআনের মধ্যে অনন্য বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদার অধিকারী কোন দিক দিয়ে?
২. কোন সূরায় এক হাজার আদেশ ও এক হাজার নিষেধ রয়েছে?
৩. হযরত উমর ফারুক (রা.) কত বছর সূরা বাকারার তাফসির অধ্যয়নে অতিবাহিত করেছেন?
৪. মদিনার মুনাফিক, ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের ইসলামদ্রোহিতার মোক্ষম জবাব ও বিভ্রান্তির অপনোদন কোন সূরার বিষয়বস্তু?
৫. সূরা বাকারার বিষয়বস্তুতে কুরআন মাজিদ সম্পর্কে কী উল্লেখ হয়েছে?
৬. মানুষের সৃষ্টি সম্পর্কে সূরা বাকারায় কী বর্ণিত হয়েছে?

উত্তরের জন্য দেখো ১১১ পৃষ্ঠা।

খ. একক কাজ

সূরা আল-বাকারার ১০টি বিষয়বস্তু শিক্ষককে লিখে দেখাবে।

পাঠ ১৯, ২০ ও ২১

সূরা আল-বাকারার ১ম রুকু : অনুবাদ ও ব্যাখ্যা
The 1st Ruku of Sura Al-Baqara: Translation and Explanation

[কুরআন, মুত্তাকি এবং কাফির সম্পর্কে]

	অনুবাদ	আরবি	
১.	আলিফ লাম মিম	الٓمٓ ۔	١.
২.	এই সেই কিতাব যার মধ্যে কোনোই সন্দেহ নেই। পরহেজগারদের জন্য এ গ্রন্থ হেদায়েত বা মুক্তিপথের দিশারী।	ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۔	٢.
৩.	যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন করে, নামাজ প্রতিষ্ঠা করে এবং তাদেরকে জীবিকা হিসেবে আমি যা দিয়েছি তা থেকে দান করে।	الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۔	٣.
৪.	আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে আমি যা অবতীর্ণ করেছি তোমার প্রতি তার ওপর এবং আমি যা অবতীর্ণ করেছি তোমার পূর্বে তার ওপর। আর তারা পরকালে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে।	وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۔	٤.
৫.	তারাই তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে হেদায়েতের ওপর রয়েছে এবং তারাই সফল।	اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۔	٥.
৬.	নিশ্চয়ই যারা কুফরি (অবিশ্বাস) করেছে, তাদেরকে তুমি সতর্ক কর অথবা সতর্ক না কর তাদের জন্য উভয়ই সমান। তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না।	اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۔	٦.
৭.	মহান আল্লাহ তাদের অন্তরসমূহ ও শ্রবণশক্তির ওপর মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তাদের দৃষ্টিশক্তির ওপর টেনে দিয়েছেন পর্দা। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।	خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ ۗ وَعَلٰٓى اَبْصٰرِهِمْ غِشٰوَةٌ ۡ وَّلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۔	٧.

শব্দার্থ-২: ذٰلِكَ — ঐ, الْكِتٰبُ — কিতাবটি, لَا رَيْبَ — সন্দেহ নেই, فِيْهِ — এর মধ্যে, هُدًى — হেদায়েত বা মুক্তিপথের দিশারী, لِّلْمُتَّقِيْنَ — মুত্তাকি তথা পরহেজগারদের জন্য।

শব্দার্থ-৩: الَّذِيْنَ — যারা, يُؤْمِنُوْنَ — তারা ইমান আনে, বিশ্বাস স্থাপন করে, بِالْغَيْبِ — অদৃশ্য বিষয়ে, وَيُقِيْمُوْنَ — এবং যারা প্রতিষ্ঠা করে, الصَّلٰوةَ — সালাত, وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ — আর তাদেরকে জীবিকা হিসেবে আমি যা দিয়েছি তা থেকে, يُنْفِقُوْنَ — তারা ব্যয় করে, দান করে।

শব্দার্থ-৪: وَالَّذِيْنَ — আর যারা, يُؤْمِنُوْنَ — তারা বিশ্বাস স্থাপন করে, بِمَآ اُنْزِلَ — যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, اِلَيْكَ — তোমার প্রতি, وَمَآ اُنْزِلَ — আর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, مِنْ قَبْلِكَ — তোমার পূর্বে, وَبِالْاٰخِرَةِ — এবং পরকালে, هُمْ — তারা, يُوْقِنُوْنَ — দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে।

শব্দার্থ-৫: أُولَٰئِكَ — তারাই, عَلَىٰ هُدًى — হেদায়েতের ওপর রয়েছে, مِّن رَّبِّهِمْ — তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে, وَأُولَٰئِكَ هُمُ — এবং তারাই, الْمُفْلِحُونَ — বিজয়ী বা সফল।

শব্দার্থ-৬: إِنَّ الَّذِينَ — নিশ্চয়ই যারা, كَفَرُوا — অস্বীকার করেছে, অবিশ্বাস করেছে, سَوَاءٌ — সমান, عَلَيْهِمْ — তাদের জন্য, ءَأَنذَرْتَهُمْ — তাদেরকে সতর্ক কর, أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ — অথবা সতর্ক না কর, لَا يُؤْمِنُونَ — তারা ইমান আনবে না।

শব্দার্থ-৭: خَتَمَ – মোহর মেরে দিয়েছেন, اللَّهُ – মহান আল্লাহ, عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ – তাদের অন্তরসমূহের ওপর, وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ – এবং তাদের শ্রবণ শক্তির ওপর, وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ – আর তাদের দৃষ্টিশক্তির ওপর, غِشَاوَةٌ – পর্দা, وَلَهُمْ – আর তাদের জন্য, عَذَابٌ عَظِيمٌ – মহাশাস্তি।

১ থেকে ৫ নম্বর আয়াতের শানে নুজুল: এ আয়াতগুলো মালেক ইবন সাঈদ নামক ইয়াহুদি সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। সে মুমিনদের অন্তরে সংশয় সৃষ্টির জন্য বলত— এ কুরআন সেই কিতাব নয়, যার সুসংবাদ আমাদের তাওরাতে দেওয়া হয়েছে। তখন এ সমস্ত ধারণা খণ্ডনের জন্য উল্লিখিত আয়াতগুলো নাজিল হয়। প্রথম আয়াতে আল্লাহ তা'আলা উক্ত ইয়াহুদির বিভ্রান্তিকর উক্তির জবাব দেন। পরবর্তী চারটি আয়াতে মুমিন-মুত্তাকিদের পরিচয় তুলে ধরেছেন (লুবানুন নকুল)।

١. الٓمٓ۔

আয়াতের ব্যাখ্যা: আলিফ, লাম, মিম বর্ণগুলো اَلْحُرُوْفُ الْمُقَطَّعَاتُ বা বিচ্ছিন্ন বর্ণ হিসেবে পরিচিত। বেশিরভাগ তাফসিরকারের অভিমত হলো- এ বর্ণগুলোর প্রকৃত অর্থ ও যথার্থ মর্ম মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ অবহিত নয়।
হযরত আবু বকর (রা.) বলেন— 'প্রত্যেক গ্রন্থেই কিছু গোপন বিষয় থাকে। আল-কুরআনের গোপন বিষয় 'হুরুফে মুকাত্তায়াত'।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে, الٓمٓ অর্থ হলো اَنَا اللّٰهُ اَعْلَمُ "আমি মহান আল্লাহ, সর্বাধিক অবগত।"
প্রকৃত কথা হলো- কুরআন মাজিদ নাজিলকালীন সময়ের আরবি সাহিত্য রচনারীতিতে হুরুফে মুকাত্তায়াত ব্যবহারের প্রচলন ছিল। কুরআনি পদ্ধতিতেও তার প্রতিফলন ঘটেছে। যেজন্য সমকালীন বিরোধী লোকেরা এ সম্পর্কে কোনো আপত্তি তোলেনি। এমনকি সাহাবাদের (রা.) পক্ষ থেকে এগুলোর অর্থ জিজ্ঞাসার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। কাজেই এর অন্তর্নিহিত মর্ম জানার চেয়ে এর সত্যতায় বিশ্বাস স্থাপন করাই উত্তম।

কুরআন মাজিদের মোট ২৯টি সূরার প্রারম্ভে اَلْحُرُوْفُ الْمُقَطَّعَاتُ আছে।

শিক্ষা: এ আয়াতের শিক্ষাগুলো হলো—
১. আল্লাহ তাআলা এক অদৃশ্য ও রহস্যময় সত্তা। তাঁর সম্পর্কে সবকিছু জানা যাবে না। জানা সম্ভবও নয়। মহান আল্লাহর এই অসীম রহস্যময়তার সামান্য নিদর্শন এই মুকাত্তায়াত হরফগুলো।
২. আল-কুরআনের 'হুরুফে মুকাত্তায়াত' বা বিচ্ছিন্ন বর্ণে ইমান পোষণ করতে হবে। এ ইমান পোষণ করা মূলত গায়েব বা অদৃশ্যের প্রতি ইমান পোষণেরই অন্তর্ভুক্ত।

٢. ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ۔

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদের সংশয়হীনতা ও কার্যকারিতার ওপর আলোকপাত করেছেন। এর একটি সরল অর্থ হলো, নিঃসন্দেহে এটি মহান আল্লাহর কিতাব। তবে এর তাৎপর্য অনেক। বক্তব্যের মূল মর্ম হলো, এটি এমন একখানা কিতাব যাতে সন্দেহপূর্ণ একটি কথাও সন্নিবেশিত হয়নি। দুনিয়ার যেসব গ্রন্থে অলৌকিক তত্ত্ব এবং

অদৃশ্য সত্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, তার সবই অমূলক ধারণানির্ভর। যে জন্য গ্রন্থগুলোর প্রণেতারা পর্যন্ত তাদের বক্তব্য ও তত্ত্ব সম্পর্কে সন্দেহমুক্ত হতে পারে না। তারা গ্রন্থের সূচনাতেই তাদের সন্দেহের কথা ব্যক্ত করেন। ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। বিবৃত বিষয়ে বিজ্ঞ পাঠক-সমালোচকদের মতামত আহ্বান করেন। কিন্তু কুরআন মাজিদে বক্তব্যের শুরুতেই মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, 'এই কিতাবখানার মধ্যে কোনোই সন্দেহ নেই।' এভাবে তিনি (আল্লাহ তাআলা) প্রথমেই সব সন্দেহ-সংশয়ের সম্ভাবনা নির্মূল করে দেন। কুরআন মাজিদের আরও একটি বিশেষ দিক হলো, এ মহাগ্রন্থ পুরোপুরি নিছক হেদায়েত ও সত্যের পথ নির্দেশ মাত্র। কিন্তু কুরআনের এ হেদায়েত থেকে সবাই উপকার লাভ করতে পারে না। এর হেদায়েত পেতে হলে ব্যক্তিকে পরহেজগার হতে হয়। এজন্যই আল্লাহ তাআলা বলেছেন— 'কুরআন মুত্তাকিদের জন্য হেদায়েত।'

শিক্ষা: এ আয়াতের শিক্ষাগুলো হলো—

১. নিঃসন্দেহে কুরআন মহান আল্লাহর কিতাব। এর ওপর ইমান পোষণ করতে হবে।
২. কুরআন মাজিদে সন্নিবেশিত তথ্য, তত্ত্ব ও ইতিহাস সম্পূর্ণ সন্দেহমুক্ত। বিচক্ষণ ও বিবেকবান মানুষ এতে কোনো সন্দেহ পোষণ করতে পারে না।
৩. কুরআনের হেদায়েত সব কালের, সব দেশের মানুষের জন্য হলেও সবাই উপকৃত হবে না। বরং এর মাধ্যমে কেবল তারাই উপকার লাভ করবে, যারা উপকার পেতে চায়।

٣. اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ـ

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা 'মুত্তাকি' তথা পরহেজগারদের পরিচয় দিয়েছেন। মুত্তাকিদের জন্য কুরআন সঠিক পথের নির্দেশনাস্বরূপ। আর মুত্তাকিরা হলেন এমন ব্যক্তিবর্গ যারা:

প্রথমত: 'গায়েবে ইমান' পোষণ করে। 'ইমান বিল গায়ব' (اِيْمَانٌ بِالْغَيْبِ) হচ্ছে মহান আল্লাহর অস্তিত্ব ও ক্ষমতায় বিশ্বাস, পাশাপাশি ফেরেশতা, বেহেশত, দোজখ, হাশর, পুলসিরাত, আরশ, কুরসি, তাকদির, হিসাব-নিকাশ প্রভৃতি অদৃশ্য বিষয়ের সত্যতায় বিশ্বাস পোষণ।

ইমান ও গায়েব শব্দ দুটির অর্থ যথাযথভাবে অনুধাবন করলেই ইমানের পুরোপুরি তাৎপর্য বোঝা সহজ হবে। কোনো বিষয়ে মুখের স্বীকৃতির মাধ্যমে অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা এবং তা কাজে পরিণত করাকে ইমান বলে। এখানে ইমানের তিনটি দিক তুলে ধরা হয়েছে। যথা-১. অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ, ২. সে বিষয়ে মুখের স্বীকৃতি এবং ৩. কাজে তার বাস্তবায়ন করা। শুধু বিশ্বাসের নাম ইমান নয়। কারণ, খোদ ইবলিশ, ফিরাউন, আবু জেহেল এবং অন্য অনেক কাফেরও মনে মনে বিশ্বাস করত কিন্তু না মানার কারণে তারা ইমানদারদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি। আবার, শুধু স্বীকৃতির নামও ইমান নয়। কারণ, মুনাফেকরাও মুখে স্বীকৃতি দেন। এজন্য বিশ্বাস, স্বীকৃতি এবং মানার নাম ইমান।

দ্বিতীয়ত: মুত্তাকি তারা, যারা সালাত কায়েম করে। কুরআন ও সুন্নাহর পরিভাষায় ইকামাতুস সালাত অর্থ নির্ধারিত সময়ে যাবতীয় শর্তাদি ও নিয়মাবলী রক্ষা করে সালাত আদায় করা। সালাতের যত গুণাবলী, ফলাফল, লাভ ও বরকতের কথা কুরআন-হাদিসে বর্ণনা করা হয়েছে, তা সবই ইকামাতুস সালাত এর সম্পৃক্ত। যেমন, কুরআনে আছে 'নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে যাবতীয় অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে' (সূরা আল-আনকাবুত, আয়াত: ৪৫)।

বস্তুত, সালাতের আত্মীক ও চারিত্রিক পরিশুদ্ধির যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে, এর পরিপূর্ণ প্রতিফলন তখনই ঘটবে, যখন সালাত উপরে বর্ণিত অর্থে প্রতিষ্ঠা করা হবে। এ জন্য অনেক সালাত আদায়কারীকে অশ্লীল ও নেক্কারজনক কাজে জড়িত দেখে এ আয়াতের মর্ম সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা ঠিক হবে না। কেননা তারা সালাত আদায় করেছে বটে কিন্তু প্রতিষ্ঠা করেনি। 'ইকামত' শব্দ বা পরিভাষার মাধ্যমে সালাতের ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত, মুস্তাহাবসহ সব বিধান পরিপূর্ণভাবে আদায় করা, এতে সবসময় প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং সার্বিকভাবে আমলের বিষয়ে সুদৃঢ় থাকা সবই বোঝায়। তাছাড়া সময়মত সালাত আদায় করা, সালাতের রুকু, সিজদা, তিলাওয়াত, খুশু-খুজু ঠিক রাখাও এর অন্তর্ভুক্ত (ইবনে কাসির)।

তৃতীয়ত: মহান আল্লাহর পথে ব্যয় অর্থে এখানে ফরজ জাকাত, ওয়াজিব সাদাকা এবং নফল দান-সদাকা প্রভৃতি যা মহান আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা হয় সেসব কিছুকেই বোঝানো হয়েছে (তাফসিরে তাবারি)।

শিক্ষা: এ আয়াতের শিক্ষাগুলো হলো—

১. মুত্তাকিদের মধ্যে কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। জন্মগত সূত্র বা বংশগত কারণে কারো পক্ষে মুত্তাকি বা পরহেজগার হওয়া সম্ভব নয়।

২. মুত্তাকির প্রথম বৈশিষ্ট্য তাকে গায়েব বা অদৃশ্য বিষয়ের অস্তিত্বে বিশ্বাসী হতে হবে।

৩. মুত্তাকিরা ব্যক্তিগতভাবে বিনয় ও নিষ্ঠার সাথে সালাত আদায় করবেন এবং সামষ্টিকভাবে সালাত আদায়ের চেষ্টা চালাবেন।

৪. মুত্তাকি কৃপণ বা অর্থলোভী কোনোটিই হবেন না। মহান আল্লাহ যে রিযিক তাকে দিয়েছেন তা থেকে তিনি মানুষের কল্যাণে মহান আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায় অর্থ ব্যয় করবেন।

٤. وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ـ

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে মুত্তাকিদের আরো তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে। তা হলো—

১. মুত্তাকি তারা যারা হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর প্রতি আল্লাহ তাআলা যা কিছু নাজিল করেছেন তার সত্যতায় বিশ্বাস স্থাপন করেন। অর্থাৎ কুরআন মাজিদ এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বিভিন্ন মুজিযার প্রতি ইমান পোষণের পাশাপাশি মৌলিক স্বীকৃতি এবং তার বিধি-নিষেধ মেনে চলা মুত্তাকির বৈশিষ্ট্য।

২. মুত্তাকিরা মুহাম্মাদ (সা.)-এর আগে প্রেরিত নবিদের প্রতি আল্লাহ তাআলা যে কিতাবসমূহ নাজিল করেছেন সেগুলোর সত্য হওয়ার ব্যাপারে ইমান পোষণ করেন, কিন্তু সেগুলোর বিধান তারা মেনে চলেন না। কারণ, কুরআন নাজিলের পর এ কিতাবসমূহের অনুসরণের কোনো প্রয়োজন নেই। কুরআনেই সব আসমানি কিতাবের মূল শিক্ষা ও সারমর্ম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

৩. মুত্তাকিদের সর্বশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, তারা পরকালের প্রতি ইয়াকিন পোষণ করেন। এক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার তাৎপর্যবহ শব্দচয়নের বিষয়টি লক্ষণীয়। অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রে তিনি 'ইমান' শব্দটি প্রয়োগ করলেও আখিরাত বা পরকালীন জীবনের ক্ষেত্রে 'ইয়াকিন' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। 'ইয়াকিন' হলো সুদৃঢ় প্রত্যয় বা বিশ্বাস পোষণ। ইমান পোষণের চেয়েও এ বিষয়টি বেশি মজবুত। আখিরাতের ক্ষেত্রে এ শব্দ ব্যবহার করে আল্লাহ তাআলা আখিরাতে বিশ্বাসের অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

শিক্ষা: এ আয়াতের শিক্ষাগুলো হলো—

১. মুত্তাকি হতে হলে মুহাম্মাদ (সা.)-এর ওপর এবং তাঁর ওপর নাজিলকৃত কুরআনের প্রতি ইমান পোষণ করতে হবে।

২. মুহাম্মাদ (সা.)-এর আগে আবির্ভূত নবি-রাসুল ও তাঁদের ওপর অবতীর্ণ কিতাবসমূহে বিশ্বাস করা ছাড়া মুত্তাকি হওয়া যাবে না।

৩. অন্যান্য আসমানি গ্রন্থে ইমান পোষণ মানে সেগুলোর অনুসরণ নয়; বরং গ্রন্থগুলোর নাজিল হওয়া ও মহান আল্লাহর কিতাব হওয়ার সত্যতায় বিশ্বাস স্থাপন করা।

৪. কুরআন সর্বশেষ আসমানি কিতাব। আয়াতে এর পূর্ববর্তী কিতাবের কথা বলা হয়েছে। পরবর্তীতে কোনো কিতাব নাজিলের সামান্যতম সম্ভাবনার কথাও বলা হয়নি।

৫. বাস্তব জীবনে অনুসরণ ও অনুশীলনের ক্ষেত্রে আল-কুরআনই হবে একমাত্র পছন্দ।

৬. ইসলামের প্রকৃত অনুসারী মুমিনগণ বিশ্বাসের ক্ষেত্রে রাসুলদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেন না। কারণ, কুরআন মাজিদে বলা হয়েছে– 'রাসুলদের মধ্যে আমরা কোনো পার্থক্য করি না' (সূরা আল-বাকারা , আয়াত: ২৮৫)।

٥. اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۖ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ـ

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে পূর্ববর্তী দু'আয়াতে যে গুণগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে সে গুণবিশিষ্ট মানুষদের হেদায়েতপ্রাপ্তি এবং চূড়ান্ত সাফল্য ও পরম কল্যাণ লাভ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যারা গায়েবে ইমান পোষণ করে, সালাত কায়েম করে, মহান আল্লাহর রাস্তায় দান করে, আল-কুরআনে ইমান পোষণ করে, অন্যান্য আসমানি কিতাবে

বিশ্বাস রাখে এবং আখিরাতে বিশ্বাস পোষণ করে তারা তাদের রবের পক্ষ থেকে হেদায়েতের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ বা 'প্রতিপালকের পক্ষ থেকে হেদায়েত' বলতে কুরআন মাজিদকেই নির্দেশ করা হয়েছে। এ হিসেবে আয়াতের আরেকটি অর্থ হবে যাদের মধ্যে গুণগুলো রয়েছে, তারা তাদের রবের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হেদায়েত তথা আল-কুরআনের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। তারা যেমন দুনিয়াতে কল্যাণ ও সাফল্যের অধিকারী, তেমনি আখিরাতের জীবনেও সফল। মহান আল্লাহর হেদায়েতে তাদের পার্থিব জীবন যেমন শান্তিপূর্ণ, শৃঙ্খলা ও মঙ্গলে পরিপূর্ণ, তেমনি তাদের পরকালের জীবনও মুক্তি আর শান্তিতে পরিপূর্ণ। তারা চিরস্থায়ীভাবে অনন্ত সুখের জান্নাত লাভ করবে।

শিক্ষা: এ আয়াতের শিক্ষাগুলো হলো—

১. প্রকৃত হেদায়েত বা সঠিক পথের যথার্থ নির্দেশনা কেবল মহান আল্লাহর কাছ থেকেই আসে।
২. সব লোকের হেদায়েত লাভ সম্ভব নয়। কেবল সেসব লোকই হেদায়েত লাভ করবে যারা বিশ্বাসী।
৩. মুমিন মুত্তাকিগণ হেদায়েত পান তাদের রবের পক্ষ থেকে।
৪. যারা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে হেদায়েত পান, প্রকৃত কল্যাণ ও সাফল্যের মালিক তারাই।

৬ ও ৭ নম্বর আয়াতের শানে নুজুল: প্রখ্যাত মুফাস্‌সির হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন— রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর একান্ত কামনা ছিল, সব মানুষ যেন মুমিন হয়ে যায় এবং হেদায়েত গ্রহণ করে। কিন্তু মুমিন হওয়া এবং হেদায়েত গ্রহণ করার সৌভাগ্য সবার হয় না। আল্লাহ তাআলা যাদেরকে কবুল করেছেন তারাই কেবল ইমান আনে এবং হেদায়েত গ্রহণ করে। যারা দুর্ভাগা তারা ইমান গ্রহণ করবে না। তাদের সতর্ক করা হোক বা না হোক উভয়ই সমান। একথা জানানোর জন্য আল্লাহ তাআলা এ আয়াত দুটি নাজিল করেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর অপর এক বর্ণনায় আছে— এ আয়াত দুটি আবু জাহল, আবু লাহাব, উতবা, শায়বা, ওয়ালিদ ইবন মুগীরা ও তাদের মতো কট্টর কাফিরদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তারা কিছুতেই ইমান আনবে না, বরং কাফির অবস্থায় মারা যাবে।

٦. اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۔

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা কাফিরদের এমন একটি শ্রেণির বর্ণনা দিয়েছেন, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হেদায়েতের প্রচেষ্টা যাদের ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হয়নি।

كَافِرٌ (কাফির) শব্দটি كُفْرٌ ক্রিয়ামূল থেকে নিষ্পন্ন। শব্দগত বিবেচনায় 'কুফর' হলো আচ্ছাদন করা, ঢেকে দেয়া, গোপন বা আবৃত করা, অবিশ্বাস ও অস্বীকার করা। পরিভাষায়, মহান আল্লাহর অস্তিত্ব ও ক্ষমতা, রিসালাত, আখিরাত, আসমানি কিতাব, জান্নাত, জাহান্নাম, তাকদির, ফেরেশতা প্রভৃতিকে অবিশ্বাস ও অস্বীকারের নাম কুফর। যারা কুফরি করে তাদের কাফির বলা হয়। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন— রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর আকাঙ্ক্ষা ছিল সব কাফির হেদায়েত লাভ করুক। কিন্তু সব কাফির শেষ পর্যন্ত ইমান আনেনি। আবু জাহল, আবু লাহাব, উতবা, শায়বা, ওয়ালিদ প্রমুখ আমরণ কুফরি ও আল্লাহদ্রোহিতায় নিজেদের নিয়োজিত রাখে। তাদের জন্যই মহান আল্লাহ বলেছেন, তাদেরকে সতর্ক করা বা না করা উভয়ই সমান। তারা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সতর্ক বাণী থেকে কোনো উপকার লাভ করবে না এবং নির্ধারিত বিষয়সমূহে ইমান পোষণ করবে না।

শিক্ষা: এ আয়াতে মানবজাতির জন্য যে শিক্ষা নিহিত রয়েছে তা হলো—

১. উল্লিখিত কাফিররা স্থায়ীভাবে অভিশপ্ত এক মানবগোষ্ঠী। তারা ইসলামের চিরশত্রু।
২. আল্লাহদ্রোহিতা ও রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বিরোধিতার জন্য তারা মহান আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের হেদায়েত থেকে উপকার লাভ করতে সক্ষম হয় না।
৩. কাফিরদের ক্ষেত্রে পরকালের স্থায়ী ক্ষতি সম্পর্কে সতর্কবাণী ফলপ্রসূ হয় না।

৭. خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ ۭ وَعَلٰٓى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۡ وَّلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۔

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে চিরস্থায়ী ধ্বংস ও কুফরে নিমগ্ন একশ্রেণির কাফিরদের দুনিয়ার জীবন এবং আখিরাতের পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

নবুয়ত পাওয়ার পর হযরত মুহাম্মাদ (সা.) মক্কার শীর্ষ নেতা আবু জাহল, আবু লাহাব, উতবা, শায়বা, ওয়ালিদ প্রমুখ কাফিরদের দীনের দাওয়াত দেন। তাদেরকে মহান আল্লাহর পথে নিয়ে আসার সাধ্যমতো চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা কুফরিতেই অটল থাকে। ফলে প্রিয়নবি (সা.) হতাশ হয়ে পড়েন। মহান আল্লাহ তাঁর হাবিব (সা.)-কে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন— এ শ্রেণির কাফিরদের ইমান না আনার জন্য আপনি হতাশ হবেন না। কেননা, তারা কখনোই ইমান আনবে না। তাদের ইমান আনার ক্ষমতা রহিত হয়ে গেছে। মহান আল্লাহ তাদের অন্তরসমূহ ও শ্রবণশক্তির ওপর মোহর মেরে দিয়েছেন। আয়াতে মোহর মেরে দেওয়ার বিষয়টি বুঝাতে خَتَمَ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। 'খাতাম' হলো কোনো জিনিসের ওপর ছাপ মেরে দেওয়া। কোনো বস্তু বা বিষয়কে এমনভাবে বন্ধ করে দেওয়া যেন বাইরের কোনো বস্তু তাতে প্রবেশ করতে না পারে। কাজেই কাফিরদের অন্তরে মোহর মেরে দেওয়ার ফলে তাদের সাধারণ কর্মক্ষমতা নষ্ট না হলেও, তারা প্রকৃত সত্য ও যথার্থ সাফল্য লাভের বিষয় উপলব্ধি করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। তাদের শ্রবণশক্তিতে মোহর মেরে দেওয়ার ফলে প্রকৃত সত্যের অমিয় বাণী শ্রবণ তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাদের ইমান না আনার আরও একটি কারণ হলো তাদের দৃষ্টিশক্তির ওপর غِشَاوَةٌ বা পর্দা টেনে দেওয়া হয়েছে। গিশাওয়াত হলো— ঢেকে দেওয়া, পর্দা, ঢাকনা বা আবরণে আবৃত করা। কাফিরদের চোখে গিশাওয়াত বা পর্দা থাকায় তারা সিরাতুল মুস্তাকিম বা চিরসুন্দর সত্য ও মুক্তির পথ দেখতে পায় না। তাদের এমন সত্য বিমুখ আল্লাহদ্রোহী মানসিকতা ও কার্যক্রমের জন্য আখিরাতে তারা চিরস্থায়ী ধ্বংসে নিপতিত হবে। তারা পাবে লাঞ্ছনাকর, যন্ত্রণাদায়ক কঠিনতম শাস্তি।

শিক্ষা: এ আয়াতে বিবৃত শিক্ষাগুলো হলো—

১. বিরামহীন কুফরি ও অব্যাহত গোমরাহিতে লিপ্ত কাফিরদের হৃদয়, কান ও চোখ পুরোপুরি হেদায়েত বিমুখ। তাদের পক্ষে তাই কখনোই ইমান আনা সম্ভব নয়।
২. ইমানের মর্মার্থ ও গুরুত্ব উপলব্ধি, সত্য ও সুন্দর কথা শোনা এবং সিরাতুল মুস্তাকিম দেখা তাদের পক্ষে অসম্ভব।
৩. সাধারণভাবে মানুষ হেদায়েত ও ইসলামি আদর্শ গ্রহণ করা বা না করার ব্যাপারে স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু মানুষ যখন হেদায়েতের পথ ছেড়ে দিয়ে পাপাচার ও গুমরাহির পথে নিজেকে অটুট রাখার সিদ্ধান্ত নেয়- তখন তার মানবিকতা ও সুকুমারবৃত্তি নষ্ট হয়ে যায়। অবশেষে ভালো-মন্দ, সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায় বিচার করার ক্ষমতাও তার থাকে না।
৪. মুমিনদের সার্বক্ষণিক দায়িত্ব হলো লোকদের ইমান ও সৎকর্মের দিকে আহ্বান জানানো।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. الٓمّٓ বর্ণগুলো কী হিসেবে পরিচিত?
২. সূরা বাকারার প্রথম রুকুতে উল্লেখিত 'অদৃশ্যের উপর বিশ্বাস করা' কাদের বৈশিষ্ট্য? *[সকল বোর্ড ২০২১]*
৩. هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ এর মর্মকথা কী? *[সকল বোর্ড ২০২১]*
৪. কিতাব দ্বারা বোঝানো হয়েছে কাকে? *[সকল বোর্ড ২০২২]*
৫. بِالْغَيْبِ শব্দের অর্থ কী?
৬. মহান আল্লাহ কাদের অন্তর ও শ্রবণশক্তির ওপর মোহর মেরে দিয়েছেন?

উত্তরের জন্য দেখো ১১১ পৃষ্ঠা।

খ. একক কাজ

শিক্ষার্থীরা সূরা বাকারার প্রথম রুকু থেকে কী শিক্ষা অর্জন করতে পারবে— তা লিখে শ্রেণিশিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ২২, ২৩ ও ২৪ সূরা আল-বাকারার ২য় রুকু : অনুবাদ ও ব্যাখ্যা
The 2nd Rukū of Sura Al-Baqara: Translation and Explanation

[মুনাফিক সম্পর্কে]

অনুবাদ	আরবি
৮. আর মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা বলে, আমরা মহান আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ইমান এনেছি, অথচ তারা মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত নয়।	٨. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ۔
৯. মহান আল্লাহ এবং মুমিনদের তারা ধোঁকা দেয়। বস্তুতঃ তারা নিজেদেরকেই নিজেরা ধোঁকা দেয়। অথচ তারা তা বোঝে না।	٩. يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۔
১০. তাদের অন্তরসমূহের মধ্যে রয়েছে ব্যাধি। তারপর মহান আল্লাহ তাদের ব্যাধিকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। কারণ, তারা ছিল মিথ্যাবাদী।	١٠. فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ۙ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۢ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ۔
১১. আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না, তখন তারা বলে, নিশ্চয়ই আমরা শান্তি স্থাপনকারী।	١١. وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ ۙ قَالُوْٓا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ ۔
১২. সাবধান! তারাই বিশৃঙ্খলা-বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। কিন্তু তারা তা অনুধাবন করে না।	١٢. اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ۔
১৩. আর তাদেরকে যখন বলা হয়, তোমরা অন্যান্য লোকদের মতো ইমান আনো। তারা বলে, তাহলে আমরা কি নির্বোধদের মতো ইমান আনব? জেনে রাখ, নিশ্চয়ই তারাই নির্বোধ। কিন্তু তারা তা জানে না।	١٣. وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ كَمَآ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ ۗ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ ۔
১৪. আর যারা ইমান এনেছে, তাদের সাথে তারা যখন মিলিত হয়, তখন বলে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আর যখন তারা নিরিবিলিতে তাদের শয়তানদের সাথে মিলিত হয়, তখন তারা বলে 'নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের সাথেই আছি, নিশ্চিতভাবেই আমরা ঠাট্টা-বিদ্রূপকারী'।	١٤. وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۖۚ وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ ۙ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ
১৫. মহান আল্লাহ তাদের সাথে তামাশা করেন এবং তাদেরকে অবাধ্যতার মধ্যে অবকাশ দেন। তারা দিকভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়।	١٥. اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ۔

অনুবাদ	আরবি
১৬. তারাই সেসব লোক যারা হেদায়েতের বিনিময়ে পথভ্রষ্টতা ক্রয় করেছে। কিন্তু এ ব্যবসায় তাদের জন্য লাভজনক হয়নি। আর তারা হেদায়েতপ্রাপ্তও নয়।	١٦. أُولَٰٓئِكَ الَّذِيۡنَ اشۡتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالۡهُدٰى ص فَمَا رَبِحَتۡ تِّجَارَتُهُمۡ وَمَا كَانُوۡا مُهۡتَدِيۡنَ .
১৭. তাদের উপমা হলো- যেমন কোনো এক ব্যক্তি আগুন জ্বালাল। এরপর যখন তা তার চারদিক আলোকিত করে তুলল, তখন মহান আল্লাহ তাদের জ্যোতি নিয়ে গেলেন এবং তাদের ছেড়ে দিলেন অন্ধকারে, তারা দেখতে পায় না।	١٧. مَثَلُهُمۡ كَمَثَلِ الَّذِى اسۡتَوۡقَدَ نَارًا ۚ فَلَمَّاۤ اَضَآءَتۡ مَا حَوۡلَهٗ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوۡرِهِمۡ وَتَرَكَهُمۡ فِىۡ ظُلُمٰتٍ لَّا يُبۡصِرُوۡنَ .
১৮. তারা বধির, বোবা ও অন্ধ; কাজেই তারা ফিরে আসবে না।	١٨. صُمٌّۢ بُكۡمٌ عُمۡىٌ فَهُمۡ لَا يَرۡجِعُوۡنَ .
১৯. অথবা তাদের দৃষ্টান্ত হলো- যেমন আকাশের বর্ষণমুখর মেঘ, তার মধ্যে রয়েছে অন্ধকার, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎ চমক। বজ্রের গর্জনে মৃত্যুর আশঙ্কায় তারা তাদের আঙুলসমূহ তাদের কানে প্রবেশ করায়। আর মহান আল্লাহ কাফিরদের পরিবেষ্টনকারী।	١٩. اَوۡ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ فِيۡهِ ظُلُمٰتٌ وَّرَعۡدٌ وَّبَرۡقٌ ۚ يَجۡعَلُوۡنَ اَصَابِعَهُمۡ فِىۡۤ اٰذَانِهِمۡ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الۡمَوۡتِ ط وَاللّٰهُ مُحِيۡطٌۢ بِالۡكٰفِرِيۡنَ .
২০. বিদ্যুৎ চমকে তাদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেওয়ার উপক্রম হয়। যখনই তাদের জন্য আলো জ্বলে ওঠে, তার মধ্যে তারা পথ চলে। আর যখন তাদের ওপর অন্ধকার নেমে আসে, তারা থমকে দাঁড়ায়। মহান আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের শ্রবণ এবং দৃষ্টিশক্তি হরণ করতে পারেন। নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।	٢٠. يَكَادُ الۡبَرۡقُ يَخۡطَفُ اَبۡصَارَهُمۡ ط كُلَّمَاۤ اَضَآءَ لَهُمۡ مَّشَوۡا فِيۡهِ ۙ وَاِذَاۤ اَظۡلَمَ عَلَيۡهِمۡ قَامُوۡا ط وَلَوۡ شَآءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمۡعِهِمۡ وَاَبۡصَارِهِمۡ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ قَدِيۡرٌ .

শব্দার্থ-৮: وَمِنَ النَّاسِ — আর মানুষদের থেকে, مَنۡ يَّقُوۡلُ — যে বা যারা বলে, اٰمَنَّا —আমরা ইমান এনেছি, بِاللّٰهِ — মহান আল্লাহর প্রতি, وَبِالۡيَوۡمِ الۡاٰخِرِ — আর শেষ দিবসে, وَمَا هُمۡ — কিন্তু তারা নয়, بِمُؤۡمِنِيۡنَ — মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত।

শব্দার্থ-৯: يُخٰدِعُوۡنَ — তারা ধোঁকা দেয়, প্রতারিত করে, اللّٰهَ — মহান আল্লাহকে, وَالَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا — এবং যারা ইমান এনেছে তাদেরকে, وَمَا يَخۡدَعُوۡنَ — তারা ধোঁকা দেয় না, اِلَّاۤ اَنۡفُسَهُمۡ — তাদের নিজেদের ব্যতীত, وَمَا يَشۡعُرُوۡنَ — আর তারা তা বোঝে না, অনুধাবন করে না।

শব্দার্থ-১০: فِيْ قُلُوْبِهِمْ — তাদের অন্তরসমূহের মধ্যে, مَّرَضٌ — ব্যাধি, فَزَادَهُمُ اللّٰهُ — আর মহান আল্লাহ তাদের বাড়িয়ে দিয়েছেন, مَرَضًا — ব্যাধিকে, وَلَهُمْ — আর তাদের জন্য রয়েছে, عَذَابٌ اَلِيْمٌ — যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, بِمَا كَانُوْا — কেননা তারা ছিল, يَكْذِبُوْنَ — মিথ্যাচারী।

শব্দার্থ-১১: وَاِذَا — আর যখন, قِيْلَ — বলা হয়, لَهُمْ — তাদেরকে, لَا تُفْسِدُوْا — তোমরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না, فِى الْاَرْضِ — পৃথিবীতে, قَالُوْٓا — তারা বলে, اِنَّمَا نَحْنُ — নিশ্চয়ই আমরা, مُصْلِحُوْنَ — শান্তি স্থাপনকারী।

শব্দার্থ-১২: اَلَآ — সাবধান! জেনে রাখ, اِنَّهُمْ — নিশ্চয়ই তারা, هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ — তারাই বিপর্যয় সৃষ্টিকারী, وَلٰكِنْ — কিন্তু, لَّا يَشْعُرُوْنَ — তারা অনুধাবন করে না, বোঝে না।

শব্দার্থ-১৩: وَاِذَا — আর যখন, قِيْلَ — বলা হয়, لَهُمْ — তাদেরকে, اٰمِنُوْا — তোমরা ইমান আনো, كَمَآ اٰمَنَ — যেমন ইমান এনেছে, النَّاسُ — অন্যান্য লোক, قَالُوْٓا — তারা বলে, اَنُؤْمِنُ — আমরা কি ইমান আনব, كَمَآ اٰمَنَ — যেমন ইমান এনেছে, السُّفَهَآءُ — নির্বোধরা, اَلَآ — সাবধান, জেনে রাখ, اِنَّهُمْ — নিশ্চয়ই তারা, هُمُ السُّفَهَآءُ — তারাই নির্বোধ, وَلٰكِنْ — কিন্তু, لَّا يَعْلَمُوْنَ — তারা জানে না।

শব্দার্থ-১৪: وَاِذَا — আর যখন, لَقُوا — তারা মিলিত হয়, الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا — যারা ইমান এনেছে তাদের সাথে, قَالُوْٓا — তারা বলে, اٰمَنَّا — আমরা ইমান এনেছি, وَاِذَا — আর যখন, خَلَوْا — তারা নিরিবিলিতে মিলিত হয়, اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ — তাদের শয়তানদের কাছে, قَالُوْٓا — তারা বলে, اِنَّا مَعَكُمْ — নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের সাথে, اِنَّمَا نَحْنُ — নিশ্চয়ই আমরা, مُسْتَهْزِءُوْنَ — ঠাট্টা-বিদ্রূপকারী।

শব্দার্থ-১৫: اَللّٰهُ — মহান আল্লাহ, يَسْتَهْزِئُ — তিনি বিদ্রূপ করেন, بِهِمْ — তাদের সাথে, وَيَمُدُّهُمْ — আর তিনি তাদের সুযোগ দেন, فِيْ طُغْيَانِهِمْ — তাদের অবাধ্যতার মধ্যে, يَعْمَهُوْنَ — তারা বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

শব্দার্থ-১৬: اُولٰٓئِكَ — তারাই, الَّذِيْنَ — যারা, اشْتَرَوُا — ক্রয় করেছে, الضَّلٰلَةَ — বিভ্রান্তি, পথভ্রষ্টতা, بِالْهُدٰى — হেদায়েতের বিনিময়ে, فَمَا رَبِحَتْ — কিন্তু লাভজনক হয়নি, تِّجَارَتُهُمْ — তাদের ব্যবসায়, وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ — আর তারা হেদায়েতপ্রাপ্ত ছিল না।

শব্দার্থ-১৭: مَثَلُهُمْ — তাদের উপমা, كَمَثَلِ الَّذِى — যেমন কোনো এক ব্যক্তি, اسْتَوْقَدَ — প্রজ্বলিত করল, نَارًا — আগুন, فَلَمَّآ اَضَآءَتْ — এরপর যখন আলোকিত করে তুলল, مَا حَوْلَهٗ — তার চারদিক, ذَهَبَ اللّٰهُ — মহান আল্লাহ নিয়ে গেলেন, بِنُوْرِهِمْ — তাদের জ্যোতি, وَتَرَكَهُمْ — আর তাদের ছেড়ে দিলেন, فِيْ ظُلُمٰتٍ — অন্ধকারে, لَّا يُبْصِرُوْنَ — তারা দেখতে পায় না।

শব্দার্থ-১৮: صُمٌّ — বধির/কালা, بُكْمٌ — বোবা/মূক, عُمْيٌ — অন্ধ, فَهُمْ — কাজেই তারা, لَا يَرْجِعُوْنَ — তারা প্রত্যাবর্তন করবে না।

শব্দার্থ-১৯: اَوْ — অথবা, كَصَيِّبٍ — যেমন বর্ষণমুখর মেঘ, مِّنَ السَّمَآءِ — আকাশ থেকে, فِيْهِ ظُلُمٰتٌ — তার মধ্যে অন্ধকার, وَّرَعْدٌ — আর বজ্রধ্বনি, وَّبَرْقٌ — আর বিদ্যুৎ চমক, يَجْعَلُوْنَ — তারা প্রবেশ করায়, اَصَابِعَهُمْ — তাদের আঙুলসমূহ, فِيْٓ اٰذَانِهِمْ — তাদের কানসমূহের মধ্যে, مِّنَ الصَّوَاعِقِ — বজ্রধ্বনি থেকে, حَذَرَ الْمَوْتِ — মৃত্যুর আশঙ্কায়, وَاللّٰهُ — আর মহান আল্লাহ, مُحِيْطٌۢ — পরিবেষ্টনকারী, بِالْكٰفِرِيْنَ — কাফিরদের।

শব্দার্থ-২০: يَكَادُ — উপক্রম হয়, الْبَرْقُ — বিদ্যুৎ চমক, يَخْطَفُ — কেড়ে নেয়, اَبْصَارَهُمْ — তাদের দৃষ্টিশক্তি, كُلَّمَآ — যখনই, اَضَآءَ لَهُمْ — তাদের জন্য আলোকিত করে, مَّشَوْا فِيْهِ — তারা তার মধ্যে পথ চলে, وَاِذَآ — আর যখন, اَظْلَمَ — অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, عَلَيْهِمْ — তাদের ওপর, قَامُوْا — তারা থমকে দাঁড়ায়, وَلَوْ — আর যদি, شَآءَ اللّٰهُ — মহান আল্লাহ চান, لَذَهَبَ — নিয়ে যেতেন, হরণ করতেন, بِسَمْعِهِمْ — তাদের শ্রবণশক্তি, وَاَبْصَارِهِمْ — আর তাদের দৃষ্টিশক্তি, اِنَّ اللّٰهَ — নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ, عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ — প্রতিটি বিষয়ের ওপর, قَدِيْرٌ — ক্ষমতাশালী, সর্বশক্তিমান।

৮ থেকে ১৩ নম্বর আয়াতের শানে নুজুল: রইসুল মুফাসসিরীন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন— উল্লিখিত আয়াতসমূহ আবদুল্লাহ ইবনে উবাই, মা'তার ইবনে কুশাইর, জুদ ইবনে কায়েস প্রমুখ মুনাফিক সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তারা মুখে ইমানের দাবি করত, কিন্তু অন্তরে জঘন্যরূপে কুফর (অবিশ্বাস) পোষণ করত। এ আয়াতসমূহে মহান আল্লাহ তাদের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছেন।

৮. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ۘ

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে মহান আল্লাহ মুনাফিকদের একটি বিশেষ দিক তুলে ধরেন। ইসলাম প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার সব পর্যায়ে ইসলামের সর্বাধিক ক্ষতিসাধন করেছে মুনাফিকরা। মুনাফিক হলো সেই বিশেষ শ্রেণির লোক যারা অন্তরে কুফরি লালন করে, বাস্তবজীবনেও তার অনুসরণ ও অনুশীলন করে। কিন্তু মুখে মুখে ইমান আনার দাবি করে নিজেদের মুসলিম হিসেবে পরিচয় দেয়। তারা একইসাথে কাফির ও মুমিনদের প্রিয়ভাজন হিসেবে থাকতে চায় এবং এর মাধ্যমে দুপক্ষ থেকেই নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির পথ খোলা রাখে। এখানে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় এ শ্রেণির লোকদের 'মুমিন নয়' বলে ঘোষণা দিয়েছেন। কারণ, শুধু মৌখিক দাবিই মুমিন হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। মুনাফিকরা এ বিশ্বাসের ক্ষেত্রেই সবচেয়ে বড় বিভ্রান্তির শিকার। তারা তাদের কাজে ইমানের ঘোষণার প্রতিফলন ঘটায় না। বরং তারা কাফিরদের সাথে যোগসাজশে ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি করতে চায়।

শিক্ষা: এ আয়াতের শিক্ষাগুলো হলো—

১. ইমানের কেবল মৌখিক দাবির ভিত্তিতে কেউ মুমিন হবে না।
২. যারা অন্তরে ইসলামবিরোধী বিশ্বাস পোষণ করে শুধু মুখে ইমানের দাবি করে তারা মুমিন নয়। তাদেরকে অবশ্য কাফিরও বলা হবে না। বরং তারা মুনাফিক।
৩. মুনাফিকরা কাফিরদের চেয়েও ইসলামের বড় দুশমন।

৭. يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّاۤ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۔

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের ইমানের দাবিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন। তাদের মুখে ইমানের প্রকাশ একটি প্রতারণা। এটা বাস্তব সত্য যে, মহান আল্লাহকে কেউ ধোঁকা দিতে পারে না। মুনাফিকরাও একথা হয়ত ভাবে না যে, তারা মহান আল্লাহকে ধোঁকা দিতে পারবে, বরং রাসুলুল্লাহ (সা.) এবং মুমিনদের সাথে ধোঁকাবাজি করার জন্য বলা হয়েছে যে, তারা মহান আল্লাহর সাথে ধোঁকাবাজি করছে। প্রকৃতপক্ষে এসব লোক আত্ম-প্রবঞ্চনায় লিপ্ত। কারণ, আল্লাহ তাআলা সমস্ত ধোঁকা ও প্রতারণার উর্ধ্বে। অনুরূপ তাঁর রাসুল এবং মুমিনগণও ওহির বদৌলতে ছিলেন সব ধরনের ধোঁকা-প্রতারণা থেকে নিরাপদ। পরন্তু তাদের এ ধোঁকার ক্ষতিকর পরিণতি দুনিয়া ও আখিরাতে উভয় ক্ষেত্রে তাদেরই উপর পতিত হয়।

শিক্ষা: এ আয়াতের শিক্ষাগুলো হলো—

১. মুনাফিকদের প্রতারণাপূর্ণ আচরণের মূল লক্ষ্য হলো মহান আল্লাহ ও মুমিনদের সাথে প্রতারণা করা।
২. আল্লাহ তাআলা মানুষের সব গোপন খবর রাখেন। ফলে মুনাফিকরা তার সাথে প্রতারণা করতে পারছে না। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে মুমিনদের জানিয়ে দিয়েছেন বলে তারাও প্রতারিত হচ্ছে না।
৩. অব্যাহত শঠতা, ষড়যন্ত্র, আল্লাহদ্রোহিতা ও পাপাচার মানুষের সাধারণ জ্ঞান ও বিচার-বিবেচনা বিলুপ্ত করে দেয়। মুনাফিকরাও এ অবস্থার শিকার। তাই মুমিনের তা থেকে দূরে থাকা কর্তব্য।

১০. فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ۙ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۔ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ۔

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের কপট ও শঠতাপূর্ণ কার্যক্রমের কারণ এবং তার চিরস্থায়ী পরিণতি বর্ণনা করেছেন।

মুনাফিকরা মুখে ইমানের দাবি করে কিন্তু অন্তরে কুফরি লালন করে। মৌখিকভাবে মুমিন হওয়ার কথা ঘোষণা করলেও তারা মুমিন নয়। ইমান আনার কথা বলে তারা মূলত আল্লাহ তাআলা ও মুমিনদের সাথে প্রতারণা করতে চায়। তারা মনে করে, তাদের এ দ্বিমুখিতা হয়তো আল্লাহ তাআলা বুঝতে পারবেন না।

মুনাফিকদের এ শ্রেণির অন্যায় আচরণ ও ধৃষ্টতাপূর্ণ ব্যবহারের কারণ হলো— তাদের অন্তরে আছে নিফাক, কুফর, শিরক, হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, গর্ব-অহংকার ও ঘৃণার মতো নানা মানসিক ব্যাধি। এজন্য তাদের হেদায়েত পাওয়ার বিষয়টি অসম্ভব হয়ে পড়ে। যেমন- মহান আল্লাহ বলেন— 'মহান আল্লাহ তাদের সাথে উপহাস করছেন এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় দিকভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবার অবকাশ দিচ্ছেন' (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৫)।

মুনাফিকদের পরকালীন পরিণতি হলো— যন্ত্রণাদায়ক কঠিনতম শাস্তি।

শিক্ষা: এ আয়াত থেকে যেসব শিক্ষা পাওয়া যায় তা হলো—

১. মুনাফিকদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। তা হলো কপটতা, মিথ্যাবাদিতা, কুফর, নিফাক ও শিরকের ব্যাধি।
২. মুনাফিকরা সতত ষড়যন্ত্র ও পাপাচারে নিমগ্ন থাকে বলে তাদের অন্তরে এ ধরনের ব্যাধির সৃষ্টি হয়েছে।
৩. তারা মূলত মিথ্যাবাদী। মুখে ইমানের দাবি করে অন্তরে কুফরি লালন করে তারা মিথ্যার চরম প্রকাশ ঘটায়।
৪. মিথ্যাবাদিতার জন্য তারা বিশেষ শাস্তি পাবে। এ শাস্তি মুনাফিকিজনিত অন্যান্য পাপাচারের অতিরিক্ত।

১১. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ۙ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ -

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন।

মুনাফিকরা প্রতারণা ও শঠতাপূর্ণ জীবনযাপন করে। তারা মুমিনদের কাছে বিশ্বস্ততা প্রমাণের জন্য কাফিরদের বিভিন্ন গোপন তথ্য ফাঁস করে দেয়। কখনো কখনো উস্কানিমূলক মিথ্যা তথ্য দিয়ে তারা নিজেদেরকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে পরিণত করার প্রয়াস চালায়। একই কাজ তারা কাফিরদের সাথেও করে। মুমিনদের নানা গোপন বিষয় তাদেরকে অবহিত করার মাধ্যমে বন্ধুত্ব রক্ষা করে। মুনাফিকরা তাদের তৈরি এ ফাসাদকে ইতিবাচক কাজ হিসেবে মনে করছে। তারা মনে করে, আমরা মুমিন ও কাফিরের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করছি যেন উভয় দলের মধ্যে আপোস ও শান্তি বজায় রাখতে পারি। জবাবে আল্লাহ তাআলা বলছেন যে, মনে রেখ তারা যেটাকে আপোস ও মীমাংসা মনে করছে সেটাই আসলে ফাসাদের মূল সূত্র।

শিক্ষা: এ আয়াত থেকে যে শিক্ষাগুলো পাওয়া যায় তা হলো—

১. মুমিনদের জন্য বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কাজ করা হারাম। তাদেরকে শান্তির বার্তা বাহক হতে হবে।
২. নিফাক একটি মারাত্মক অন্তরের ব্যাধি। একজন মুমিন এ থেকে নিজেকে পরিশুদ্ধ রাখবেন।
৩. মুনাফিকরা মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্য দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করে এবং পারস্পরিক বা জাতীয় সম্পর্ক নষ্ট করে।
৪. মহান আল্লাহর অবাধ্যরা জমিনে ফাসাদ সৃষ্টিকারী।

১২. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ -

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের ব্যাপারে মুমিনদের সতর্ক থাকার নির্দেশনা দিয়েছেন।

মুনাফিকরা পাপাচারী এবং পথভ্রষ্ট। তারা অন্তরে কুফরি লালন করে, মুখে ইমানের দাবি পেশ করে। তাদের ইমানের দাবি যেমন মিথ্যা এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তেমনি আরো হাজারো মিথ্যায় তারা আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা থাকে। তারা মানুষে মানুষে শত্রুতা তৈরির চেষ্টা করে। সুসম্পর্ক বিনষ্ট করতে অপতৎপরতা চালায়। মুনাফিকরা নিজেদের তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র স্বার্থ উদ্ধারের জন্য মিথ্যা তথ্য ও সংবাদের মাধ্যমে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। তারা নিজেদের নিরাপত্তা, শক্তিমত্তা ও অর্থ-সম্পদের শতভাগ সংরক্ষণ সম্পন্ন করতে কাফির, মুশরিক ও মুমিনদের খামোখাই যুদ্ধের পথে ঠেলে দেয়। মুনাফিকদের নেতিবাচক ভূমিকার জন্য শান্ত-সুখময় মানবসমাজে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা নেমে আসে। জনজীবন বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত হয়।

সচেতন মানুষ ও মুমিনরা মুনাফিকদেরকে তাদের কুটিল আর বিপর্যয় তৈরির ভূমিকা থেকে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিলে তা ব্যর্থ হয়। কারণ, মুনাফিকরা মনেই করে না যে, তারা বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। বরং নিজেদের তারা শান্তি-শৃঙ্খলা ও সুসম্পর্ক রক্ষার অগ্রদূত মনে করে। মহান আল্লাহ সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন, মুমিনরা যেন তাদের এই বিভ্রান্তিমূলক মিথ্যা বক্তব্যের শিকার হয়ে তাদেরকে বিশ্বাস না করে। কারণ, প্রকৃতপক্ষে বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় সৃষ্টির নেপথ্যে মূল ভূমিকাতো তাদেরই। তা সত্ত্বেও মুনাফিকরা যে নিজেদের 'শান্তির দূত' মনে করে তার কারণ হলো- ক্রমাগত পাপচিন্তা, পাপপ্রবণতা ও পাপাচার এবং ষড়যন্ত্রমূলক মনোবৃত্তি তাদের বিবেক-বুদ্ধি কেড়ে নিয়েছে। সেজন্য তারা নিজেদের এ বিপথগামী ভূমিকা সম্পর্কে বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত রয়েছে।

শিক্ষা: এ আয়াতের শিক্ষাগুলো হলো—

১. মুমিনদেরকে তাদের ইমানি চেতনা সদা জাগ্রত ও শানিত করতে হবে। অন্তর পরিশুদ্ধ করে তারা সবসময় অপরের কল্যাণ ও শান্তি নিশ্চিত করার মানসিকতা লালন করবেন।

২. মুনাফিকরা অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে নিজেদেরকে শান্তির দূত দাবি করলেও বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয়ের মূল হোতা তারাই।

৩. মানুষের কথার পাশাপাশি কাজও বিশেষভাবে মূল্যায়িত হবে।

৪. মন ও বিবেককে সবসময় খারাপ কাজে নিয়োজিত রাখলে ব্যক্তির সুস্থ বিবেক ও শুভবুদ্ধির মৃত্যু ঘটে।

১৩. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ كَمَآ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ ؕ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ -

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে মুনাফিকদের সামনে সত্যিকারের ইমানের একটি রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে। তাদেরকে বলা হয়েছে অন্যান্য লোক তথা সাহাবিরা যেমন সাচ্চা দিলে ও সরল অন্তরে ইমান এনে মুসলমান হয়েছেন, তোমরাও যদি ইসলাম গ্রহণ করতে চাও তাহলে তদের মতোই নিষ্ঠা সহকারে সাচ্চা দিলে গ্রহণ করো।

সে যুগের মুনাফিকরা সাহাবিদের বোকা বলে আখ্যায়িত করেছে। যারা এভাবে নিষ্ঠা সহকারে ইসলাম গ্রহণ করে নিজেদেরকে উৎপীড়ন, নির্যাতন, কষ্ট ও বিপদের মুখে নিক্ষেপ করেছিলেন তাদেরকে তারা নির্বোধ মনে করত। তাদের মতে, নিছক সত্য ও ন্যায়ের জন্য সারা দেশের জনসমাজের শত্রুতার মুখোমুখি হওয়া নিরেট বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা মনে করত, হক ও বাতিলের বিতর্কে না পড়ে সব ব্যাপারে কেবল নিজের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ। বস্তুত, এ ধরনের গোমরাহী সবযুগেই চলে আসছে।

আল্লাহ তাআলা পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করছেন যে, এসব লোক নিজেরাই বোকা। কেননা এমন উজ্জ্বল ও প্রকাশ্য নির্দেশাবলি থাকা সত্ত্বেও তাতে বিশ্বাস স্থাপন করার মতো জ্ঞান-বুদ্ধি তাদের হয়নি। তাদের বোকামীর কারণেই তারা যে কঠিন মূর্খতা ও পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত সেটা বুঝতে পারছে না। নিঃসন্দেহে বোকামী ও মূর্খতা যারা বুঝতেই পারে না তারা সবচেয়ে বড় বোকা (ইবনে কাসির)।

শিক্ষা: এ আয়াতের শিক্ষাগুলো হলো—

১. মুনাফিকরা কখনোই প্রকৃত মুমিনদের মতো ইমান আনবে না।

২. অব্যাহত পাপাচার, দ্বিমুখিতা ও ষড়যন্ত্রকামিতা মুনাফিকদের শুভবুদ্ধি ও বিবেকবোধকে ধ্বংস করে।

৩. আল্লাহ তাআলা ও রাসুলুল্লাহ (সা.) হলেন ইমানের অনিবার্য বিষয়। মহান আল্লাহ ইমান পোষণ করতে বলেছেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) শিক্ষা দিয়েছেন ইমান পোষণের বিস্তারিত পদ্ধতি। ইমান আনা ঠিক হলো না কি ভুল হলো তা নির্ধারণ করার মাপকাঠি হলেন সাহাবাগণ (রা.)।

৪. মুনাফিকরা স্বার্থান্ধ বলে যেকোনো পার্থিব স্বার্থহানির ঘটনাকে নির্বুদ্ধিতার বিষয় মনে করে।

৫. তারা কেবল নিজেদেরকে বুদ্ধিমান ও কৌশলী এবং অন্যদের বোকা মনে করে।

১৪ থেকে ১৬ নম্বর আয়াতের শানে নুজুল: এ আয়াতসমূহ মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ বিন উবাই ও তার সাথিদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। একদিন হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.) ও হযরত আলি (রা.) মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ বিন উবাই-এর কাছে গমন করেন। হযরত আবু বকর (রা.) তাকে বললেন, তুমি ও তোমার সাথিরা আমাদের প্রতি আন্তরিকতা পোষণ করো। তদুত্তরে আবদুল্লাহ বিন উবাই বলল, আবু বকর (রা.), উমর (রা.) ও আলি (রা.)-এর আগমন শুভ হোক। একথা শুনে হযরত আলি (রা.) তাকে বললেন, মহান আল্লাহকে ভয় করো, কপটতা পোষণ করো না। সে বলল, আমার ইমান আপনাদের ইমানের মতো বলেই তো আমি এটা বলছি। তাদের প্রত্যাবর্তনের পর আবদুল্লাহ বিন উবাই তার সাথিদের বলল, তোমরাও মুসলমানদের সাথে মিলিত হয়ে এভাবেই বলবে, যেভাবে আমি বলেছি। তারা বলল, তিনি যতদিন পর্যন্ত আমাদের মধ্যে থাকবেন ততদিন আমরা কল্যাণে থাকব। তখন এ আয়াতসমূহ নাজিল হয়।

١٤. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّاۚ وَإِذَا خَلَوْا إِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ ۙ قَالُوْٓا إِنَّا مَعَكُمْ ۙ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ.

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের দ্বিমুখিতার স্বরূপ উন্মোচন করেছেন।
মুনাফিকরা প্রকাশ্যে ইমান আনার ঘোষণা দেয়। সে সূত্রে তারা মুমিনদের সাথে মিলেমিশে সামাজিক জীবনযাপন করে। সমাজের সদস্য হিসেবে মুমিনরা যে সুযোগ ও অধিকার ভোগ করে, তারাও তার সমান অধিকার পায়। এজন্য মুমিনদের সাথে মিলিত হলে তারা ঘোষণা দেয়, 'আমরা ইমান এনেছি'। আসলে তারা ইমান আনেনি। ইমানকে তারা স্বার্থসিদ্ধি ও নিরাপত্তা লাভের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। তাদের প্রকৃত রূপ ফুটে ওঠে তারা যখন কাফিরদের সাথে মিলিত হয় কিংবা নেতাদের সংস্পর্শে আসে। তখন মুনাফিকরা তাদের বাহ্যিক মুখোশ খুলে ফেলে স্বতঃস্ফূর্ত ঘোষণা দেয়, 'আমরাতো আছি তোমাদের সাথেই'। নেতাদের সাথে মিলিত হওয়ার এ কাজটি তারা নির্জনে সম্পন্ন করে যেন তা মুমিনদের দৃষ্টিগোচর না হয়। কেননা তারা দুপক্ষ থেকেই সুবিধা নিতে চায়।

প্রতারণা, শঠতা ও ধোঁকাবাজিকে মুনাফিকরা গৌরব ও বীরত্বের বিষয় মনে করে। তারা মুমিনদের ইমান আনার কথা বলে তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন রকমের সুযোগ গ্রহণ করে। মুমিনরা তাদের দুরভিসন্ধি ও প্রতারণা সম্পর্কে কিছুই বুঝতে পারে না বলে তারা মুমিনদের নির্বোধ ও বোকা মনে করে। শঠতাকে তারা বুদ্ধিমত্তার পরিপূরক হিসেবে ভেবে আহ্লাদিত হয় এবং সদম্ভে ঘোষণা করে, 'আমরা তো মুমিনদের সাথে উপহাস করি মাত্র'। অথচ মুমিনদের ধোঁকা দেওয়ার মাধ্যমে তারা প্রতিনিয়ত ধোঁকা দেয় নিজেদের, উপহাসও করে নিজেদেরই সাথে। কিন্তু আত্মপ্রতারণায় তাদের কোনো গ্লানি নেই। কারণ, তারা নিজেরাই ভ্রষ্টতা ও বিভ্রান্তির অথৈ পারাবারে হাবুডুবু খাওয়া একদল বিপথগামী লোক।

শিক্ষা: এ আয়াতের শিক্ষাগুলো হলো—

১. মুনাফিকি বা শঠতা ও প্রতারণার নীতি হলো দুর্বল মানসিকতা ও কাপুরুষতার লক্ষণ।
২. মুনাফিকরা মুমিনদের সাথে প্রতারণা করে কিছু বাহ্যিক ও পার্থিব সুবিধা লাভ করে মাত্র।
৩. মুমিনদেরকে প্রতারণা করে তারা উপহাস ও বিদ্রূপের অসৎ আনন্দ লাভ করে, কিন্তু তারা বুঝতেও পারে না প্রকৃতপক্ষে নির্বোধ ও প্রতারিত পক্ষ তারা নিজেরাই।
৪. মুনাফিকদের মূলনীতি হলো মিথ্যা কথা বলা।
৫. মুনাফিকরা সবসময় গুপ্তচরবৃত্তিতে লিপ্ত থাকে এবং মুমিনদের সব গোপন তথ্য কাফিরদের কাছে ফাঁস করে দেয়।

১৫. اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ۔

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের ঠাট্টা বা উপহাসের বিপরীতে তাদের সাথেই উপহাসের কথা বলেছেন। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন— আল্লাহ তাআলা তাদের থেকে বদলা নেওয়ার জন্য তাদের সাথে উপহাস করছেন। কাফির ও মুনাফিকদের ঠাট্টা বা উপহাসের বিপরীতে তাদের সাথে মহান আল্লাহর উপহাস করা দোষনীয় কিছু নয়।

শিক্ষা: এ আয়াতের শিক্ষাগুলো হলো—

১. মুনাফিকরা চরম দুর্ভাগ্যের শিকার। তাদের ষড়যন্ত্রমূলক দ্বিমুখী মনোভাবই তাদেরকে এ অবস্থায় নিয়ে এসেছে।
২. মুনাফিকরা ধোঁকা ও প্রতারণা দিয়ে ভাবছে তারা মুমিনদের প্রতারণা করছে। তারা মুমিনদের উপহাসের পাত্রে পরিণত করছে; মূলত প্রতারণা ও উপহাসের পাত্র হচ্ছে তারা নিজেরাই।
৩. মহান আল্লাহ নিজে মুনাফিকদের বিদ্রুপ ও ঠাট্টার পাত্রে পরিণত করার ব্যবস্থা করে দেন।
৪. মহান আল্লাহ মুনাফিকদের চরম ও দুঃখজনক পরিণতি বরণের জন্য অবকাশ দেন। তারা এটাকেই বিজয় মনে করে।
৫. মুনাফিকরা মহান আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত বঞ্চিত হতভাগ্য এক জনগোষ্ঠী; চিরস্থায়ী ক্ষতিই যাদের প্রাপ্য।

১৬. اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى ص فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ۔

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের চূড়ান্ত পথভ্রষ্টতার ওপর আলোকপাত করেছেন।
রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সময়ের মুনাফিকরা তাঁকে খুব কাছে থেকে দেখেছে। কপটভাবে হলেও তাঁর আদর্শের অনুসরণ করেছে। পাশাপাশি প্রকৃত মুমিনদের হেদায়েতের ঐশী আলোয় আলোকিত হতে দেখেছে। নিজেরা জেনেছে মুহাম্মাদ (সা.)-এর সত্যতা সম্পর্কে, কিন্তু সেই সত্যের রশ্মিতে নিজেদের আলোকিত করতে পারেনি। তারা মুখে বলে, আমরা মহান আল্লাহ ও আখিরাতের ওপর ইমান এনেছি। প্রকৃতপক্ষে তারা মুমিন নয়। তাদের অন্তরে লালিত হয় কুফর, শিরক ও পাপাচার। তারা সবসময় মিথ্যায় অভ্যস্ত থাকে। তাদের মূলনীতি শঠতা ও প্রতারণা। এমনকি নিজেদের মিথ্যা দাবির মাধ্যমে তারা মুমিনদের পাশাপাশি আল্লাহ তাআলাকে পর্যন্ত ধোঁকা দিতে চায়।

তাদেরকে নিষ্ঠা ও সততার সাথে ইমান আনতে বললে তারা একে নির্বুদ্ধিতা বলে উপহাস করে। মুমিনদেরকে প্রতারিত করার জন্য তারা নিজেদের মুমিনদের শুভাকাঙ্ক্ষী ও সহযোগী হিসেবে পরিচয় দেয়। আবার কাফিরদের কাছে গিয়ে বিদ্রুপে অট্টহাস্যে ফেটে পড়ে। মুমিনদের সাথে নিজেদের শুভেচ্ছা বিনিময়কে তারা আখ্যায়িত করে উপহাস হিসেবে। কিন্তু তাদের এ কার্যক্রম তাদের জন্য লাভজনক হয়নি। স্বার্থসিদ্ধির এ তৎপরতায় তারা বিপুল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মুনাফিকরা হেদায়েতের বিনিময়ে গ্রহণ করেছে গোমরাহিকে।

শিক্ষা: এ আয়াতের শিক্ষাগুলো হলো—

১. পরকালীন লাভ-লোকসান বিবেচনায় ইমান আনা ও না আনার বিষয়টি ব্যবসায়ের সাথে তুল্য।
২. মুনাফিকরাও এ ব্যবসায়ে নিয়োজিত, কিন্তু তারা হেদায়েতের বিনিময়ে গোমরাহি ক্রয় করেছে। কাজেই তাদের ব্যবসায় লাভজনক হয়নি।
৩. মুনাফিকরা শঠতা ও প্রতারণার নীতিতে নিজেদেরকে মিথ্যার ওপর অধিষ্ঠিত করেছে। তাই তারা মুক্তির পথের দিশা পাবে না।
৪. পার্থিব স্বার্থ, সম্পদ ও সম্মান লাভের জন্য মুনাফিকরা হেদায়েতের পথ ত্যাগ করতে দ্বিধা করে না। তারা মূলত চরম বোকা।

১৭. مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا ۚ فَلَمَّآ أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُۥ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِى ظُلُمَٰتٍ لَّا يُبْصِرُونَ -

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের বাস্তব অবস্থা বোঝানোর জন্য একটি অসাধারণ দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। কাফিরদের মতো মুনাফিকরা ইসলামের আহ্বান সরাসরি উপেক্ষা করেনি বা অস্বীকার করেনি বরং তারা ইসলামের আহ্বান শুনেছে। ইসলামের সত্যতার বিষয়টি উপলব্ধি করেছে। ইসলামকে জানা ও বোঝার পর তারা সত্য-ন্যায়ের পথের চেয়ে অন্যায় ও অসত্যের পথকে, ইমানের চেয়ে নিফাককে, কল্যাণ ও মঙ্গলের পরিবর্তে প্রতারণা ও ষড়যন্ত্রকে সচেতনভাবে অগ্রাধিকার দিয়েছে। ইসলামের মধ্যে থেকে, জেনে-বুঝেও তারা ইসলামের শাশ্বত সুন্দর পথ পরিহার করে নিফাককে বরণ করে নিয়েছে।

নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের লক্ষ্যে মুখে ইমানের কথা প্রকাশকারী এ শ্রেণির লোকদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন— এদের উদাহরণ হলো ঐ ব্যক্তির মতো যে আগুন জ্বালিয়েছে। যখন সেটি তার চারপাশ আলোকিত করল তখন মহান আল্লাহ তাদের আলো তুলে নিলেন এবং তাদেরকে ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত করলেন। এমতাবস্থায় তারা আর কিছুই দেখতে পায় না। কপটচারী মুনাফিকদের অবস্থাও ঠিক এরকম। তারা হেদায়েতের ঐশী রশ্মির কাছাকাছি থাকে, সেই জ্যোতিতে আলোকিত হয় চারপাশের মানুষ, কিন্তু মুনাফিক তার অন্তর্নিহিত কপটতার জন্য কাছে থেকেও সেই নুর দ্বারা উপকৃত হতে পারে না, বরং নিমজ্জিত থাকে গোমরাহির মধ্যে।

শিক্ষা: এ আয়াতের শিক্ষাগুলো হলো—

১. মুনাফিকরা সত্যকে সত্য হিসেবে বুঝতে পারে কিন্তু স্বীকার করে না এবং মেনেও নেয় না।
২. তাদের কাছে পার্থিব স্বার্থই মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।
৩. তারা নিজেরা কুফর ও জুলমাতের পার্থক্য বুঝতে পেরেও যেমন তা গ্রহণ করে না, তেমনি কেউ বুঝিয়ে দিতে চাইলেও সে বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ করে না।
৪. মুনাফিকরা ইমানের আলো প্রজ্বলনের পূর্বে প্রত্যাশায় ছিল তা জ্বলে উঠুক কিন্তু তা যখন প্রকাশিত হয় তখন তারা বিরোধিতায় লিপ্ত হয়।
৫. তাদের এমন মূর্খতাসুলভ আচরণের জন্য মহান আল্লাহ তাদের অন্ধকারে অর্থাৎ কুফরির মধ্যে ফেলে রেখেছেন।

১৮. صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ -

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের সত্য পথে ফেরা অসম্ভব হওয়ার ওপর আলোকপাত করেছেন। কাফিরদের মতো মুনাফিকরা প্রথমেই হেদায়েত উপেক্ষা করেনি। তারা রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে অস্বীকার করেনি বা নিজেদের অবিশ্বাসের কথাও সরাসরি ঘোষণা করেনি বরং আল্লাহর রাসুল (সা.)-এর কথা শুনেছে। এ সম্পর্কে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেছে। নিজেদের বুঝশক্তির সাহায্যে প্রকৃত সত্যের আলো প্রত্যক্ষ করেছে কিন্তু গ্রহণ করেনি। বরং বাস্তব অবস্থা হলো- তাদের শ্রবণশক্তি আছে ঠিকই কিন্তু প্রকৃত সত্য শোনা ও হৃদয়ঙ্গম করার ব্যাপারে তারা একে অকার্যকর করে রেখেছে। তাদের কথা বলার ক্ষমতাও আছে। কেবল সত্য স্বীকার ও বলার ব্যাপারেই তারা বোবা হয়ে আছে। তাদের দৃষ্টিশক্তিও আছে, কিন্তু সিরাতুম মুস্তাকিম দেখার ক্ষেত্রে তারা একে ব্যবহার করেনি। তারা তাদের কানকে অকেজো করে দিয়ে বধির সেজেছে। জিহ্বাকে নিষ্ক্রিয় করে বোবা সেজেছে আর চক্ষুকে যথার্থ কাজে না লাগিয়ে অন্ধে পরিণত হয়েছে। তাই মুনাফিকদের আর সত্য ও হেদায়েতের পথে এবং চিরায়ত কল্যাণ ও আলোর দিকে প্রত্যাবর্তনের কোনো সম্ভাবনা নেই।

শিক্ষা: এ আয়াতের শিক্ষাগুলো হলো—

১. মুনাফিকরা সত্যকে জানার পরও মনে প্রাণে তা গ্রহণ করে না।

২. তারা ইসলামের সত্য বাণী শোনার পরও না শোনার ভান করে। এজন্য তারা বধির।

৩. তাদের মুখ আছে কিন্তু মুখ দিয়ে ইসলামের সত্য বাণী বলতে চায় না। এ জন্য তারা বোবা।

৪. তাদের চোখ আছে কিন্তু তারা তা দিয়ে সত্যকে দেখে না। এ জন্য তারা অন্ধ।

৫. মুনাফিকরা সত্যের পথে, ইসলামের পথে প্রত্যাবর্তন করবে না। তারা সবসময় ঐশী আলোয় আলোকিত ইসলামের পথ থেকে দূরে সরে গিয়ে অন্ধকারেই নিমজ্জিত থাকতে চায়। তাই তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের নিচতম স্তর।

১৯ ও ২০ নম্বর আয়াতের শানে নুজুল: মদিনা হতে দুজন মুনাফিক পলায়ন করে মক্কার দিকে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে তারা প্রবল বৃষ্টি, মেঘের গর্জন, বিদ্যুৎ ও বজ্রের বিকট শব্দের মধ্যে পড়ল। ভীষণ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে তারা ভীতসন্ত্রস্ত হলো। বিদ্যুৎ যখন চমকাত তখন তারা কিছুদূর অগ্রসর হতো, আবার অন্ধকার হলে তারা দাঁড়িয়ে যেত। বজ্রের ভীষণ গর্জনে তারা কর্ণকুহরে আঙুল প্রবেশ করাত। অবশেষে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে তারা বলতে লাগল, যদি সকাল হয় এবং মেঘমালা চলে যায় তথা আমরা বিপদ থেকে রক্ষা পাই তাহলে আমরা মুহাম্মাদ (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁর অনুগত হয়ে যাব। তারপর ধীরে ধীরে মেঘমালা কেটে গেল এবং সকাল হলো। ঠিকই তারা তাদের কথামতো সকালে মুহাম্মাদ (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ইমান নবায়ন করে খাঁটি ইমানদার হয়ে গেল। তাদের উপরিউক্ত অবস্থার বর্ণনা দিয়ে এবং মুনাফিকদের জীবনকে এর সাথে তুলনা করে এ আয়াতগুলো নাজিল হয়।

১৯. اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ فِيْهِ ظُلُمٰتٌ وَّرَعْدٌ وَّبَرْقٌ ۚ يَجْعَلُوْنَ اَصَابِعَهُمْ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ؕ وَاللّٰهُ مُحِيْطٌ بِالْكٰفِرِيْنَ -

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের দুরবস্থার একটি ভাষাচিত্র অঙ্কন করেছেন।

মুনাফিকদের দৃষ্টান্ত এমন যেমন অন্ধকার রাতে আকাশ থেকে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত হয়। তাতে বিদ্যুৎ চমকাতে থাকে, থাকে বজ্রধ্বনি। দুর্যোগের এ ঘনঘটায় যারা পথ চলে, তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়। বজ্রপাত তাদেরকে মৃত্যুর শঙ্কায় শঙ্কিত করে তোলে। বিপদগ্রস্ত পথচারী মৃত্যুভয়ে কানে আঙুল দেয়। মুনাফিকদের অবস্থাও অন্ধকার রাতের এ বিপদগ্রস্ত পথিকদের মতো। যখন তারা ইসলামের একটু আলো লাভ করে তখন তারা তাতে চলতে থাকে। আর যখন অন্ধকারে নিপতিত হয় তখন দাঁড়িয়ে থাকে। মুনাফিকরা সবসময় দুঃসহ মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকে। সবসময় তারা ভীত-সন্ত্রস্ত, শঙ্কিত এবং আতঙ্কগ্রস্ত থাকে। কারণ, তাদের অন্তরে ইমান নেই, অথচ তারা ইমানের দাবিদার হয়। এমন অবস্থায় এ ভয় তাদেরকে পেয়ে বসে যে, কোন সময় তাদের আসল রূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে। পাশাপাশি ইসলামের দাবিদার হয়ে মুসলমানদের কাছ থেকে যাবতীয় স্বার্থ চরিতার্থে তারা উন্মত্ত থাকে। ভয় ও লোভ তাদেরকে দিশেহারা করে তোলে। এরপর যখন বিপদের আশঙ্কা দেখা দেয়, তারা আত্মরক্ষার চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু যেমন বজ্রপাত ও মৃত্যুর আক্রমণ থেকে কানে আঙুল দিয়ে আত্মরক্ষা করা যায় না, ঠিক তেমনি মুনাফিকরাও মহান আল্লাহর আজাব থেকে রক্ষা পায় না। কারণ, আল্লাহ তাআলা সর্বশক্তিমান, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনি তাঁর বিশেষ কুদরতে মুনাফিকদের পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। তাদের সব তৎপরতা ও চক্রান্ত তাঁর নখদর্পণে।

শিক্ষা: এ আয়াতের শিক্ষাগুলো হলো—

১. মুনাফিকরা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের শিকার। তারা মৃত্যুকে ভয় পায় কিন্তু মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নেয় না।

২. ইসলামের দুর্দিন দেখলে বা ইসলাম ও মুসলমানদের ওপর কোনো আঘাত ও বিপদাপদ আসতে দেখলে তারা মৃত্যুর ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পালাতে থাকে।

৩. মহান আল্লাহ তাদের এ দ্বিমুখী ও ভণ্ডামি নীতির কারণে দুনিয়ার শান্তি কেড়ে নেন এবং আখিরাতে তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেবেন।

২০. يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ ۖ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের কর্মতৎপরতা ও দুরবস্থার এক বাস্তব ভাষাচিত্র নির্মাণ করেছেন। মুনাফিকরা যেন সেই অসহায় পথচারী, যে অন্ধকার রাতে মুষলধারার বৃষ্টি ও ভয়ঙ্কর বজ্রপাতের মধ্যে মৃত্যুভয়ে সন্ত্রস্ত অবস্থায় পথ চলে। তুমুল বৃষ্টিপাত আর নিকষ অন্ধকারে পথ চলতে গিয়ে পথিক যেমন থেমে যায়, বজ্রপাত আর বিদ্যুতের চমকে পথ আলোকিত হলে ঝুঁকি নিয়ে তার মধ্যে যেমন সে পথ চলে, মুনাফিকরাও তেমনি। যখন ইসলামের একটু আলো তারা লাভ করে, তখন তাতে চলতে থাকে। আর যখন কুফরির অন্ধকার তাদের ঘিরে ফেলে তারা থমকে দাঁড়ায়। মুনাফিকরা সবসময় দুঃসহ মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস[১] (রা.) বলেন— মুনাফিকদের আলোতে চলার তাৎপর্য হলো ইসলাম কবুল করা আর অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকার মর্মার্থ হচ্ছে কুফর বা মহান আল্লাহর নাফরমানির দিকে প্রত্যাবর্তন করা। ইবনে কাসির[২] বলেন— কিয়ামতের দিনও মুনাফিকদের এ অবস্থাই হবে। সেদিন মুনাফিকরা মুমিনদের অনুসরণ করবে। তারা মুমিনদের প্রদত্ত নুরে পথ চলতে চাইবে, কিন্তু তাদের জন্য এ আলো কোনো উপকারে আসবে না। যেমন উপকারে আসেনি পৃথিবীতে হেদায়েতের আলো। পৃথিবীর সব মুনাফিক এ সুযোগ গ্রহণ থেকে নিজেদের কেবল বিরতই রাখেনা বরং শঠতা ও মিথ্যার পথ অবলম্বন করে নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করে।

উপরের আলোচনা থেকে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে যে, পবিত্র কুরআনের প্রথম থেকে এ পর্যন্ত মানুষকে কয়েক শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। ১. খাটি মুমিন (সূরা বাকারার প্রথম চার আয়াতে তাদের পরিচয় দেওয়া হয়েছে)। ২. খাটি কাফের (তাদের বর্ণনা পরবর্তী দুই আয়াতে প্রদত্ত হয়েছে)। ৩. মুনাফিক; মুনাফিক আবার দুই শ্রেণির—
ক. খাটি মুনাফিক; আগুন জ্বালানোর উপমা দিয়ে তাদের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। খ. সন্দেহের দোলায় দোদুল্যমান মুনাফিক; তারা কখনো ইমানের আলোয় আলোকিত হয়, আবার কখনো কুফরির অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। বজ্র ও বিদ্যুতের উদাহরণ পেশ করে তাদেরকে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রথম দলের অবস্থা থেকে তাদের মুনাফিকি একটু নরম।

---

[১] প্রখ্যাত সাহাবি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) নবি করিম (সা.)-এর চাচাতো ভাই। তিনি নবি (সা.)-এর প্রিয়জন, বাল্যবন্ধু, আপন চাচা হযরত আব্বাস (রা.)-এর সন্তান। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মদিনায় হিজরতের তিন বছর আগে জন্মগ্রহণ করেন। নবি করিম (সা.) যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন তিনি তেরো বছরের বালক। প্রজ্ঞার কারণে সবাই তার দ্বারস্থ হতেন। তিনি শুদ্ধভাষী এবং বড় আলেম ছিলেন।

[২] ইবনে কাসির ছিলেন একজন মুহাদ্দিস, ফকিহ, মুফাসসির ও ইতিহাসবিদ। তাফসির রচনার জন্য তিনি অধিক প্রসিদ্ধ। তার রচিত তাফসিরটি 'তাফসিরে ইবনে কাসির' নামে প্রসিদ্ধ। এই তাফসিরকে প্রামাণ্য দলিল হিসেবে ধরা হয়।

এর মাধ্যমে আরও স্পষ্ট হয় যে, মুমিনরা দুভাগে বিভক্ত। ক. সাবেকুন বা বিশুদ্ধ; খ. আববার বা সাধারণ মুমিন। আর কাফেররা দুই ভাগে বিভক্ত: ক. অনুসৃত বা কুফরির দিকে আহ্বানকারী কাফের দল; খ. অনুসারী বা অনুসরণকারী সাধারণ কাফের।

অনুরূপভাবে মুনাফিকদের শ্রেণি দুইটি। প্রথম শ্রেণির মুনাফিক হচ্ছে সেসব কট্টর মুনাফিক যাদের অন্তরে ইমানের লেশমাত্র নেই। দ্বিতীয় শ্রেণির মুনাফিকদের অন্তরে ইমানের কিছু থাকলেও নিফাকের সব চরিত্র তাদের মধ্যে বিদ্যমান। [ইবনে কাসির]

শিক্ষা: এ আয়াতের শিক্ষাগুলো হলো—

১. মুনাফিকরা চরম হতভাগ্য। হেদায়েতপ্রাপ্ত লোকদের সাথে থেকে তাদের মতো বাহ্যিক আচরণ করেও তারা হেদায়েতের পথে চলার সৌভাগ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়।
২. মহান আল্লাহর দেওয়া দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি কাজে লাগিয়ে তারা আল্লাহদ্রোহিতায় লিপ্ত হয়। মহান আল্লাহ ইচ্ছে করলে তাদের সব শক্তি হরণ করতে পারেন। তিনি পরম দয়ালু বলেই মুনাফিকদের প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দেন।
৩. মুনাফিকদের জীবন পৃথিবীতে যেমন অসম্মান ও অবিশ্বাসে ভরা, পরকালেও তা কল্পনাতীত যন্ত্রণা ও আজাবে ভরপুর থাকবে। বস্তুত তারা চিরস্থায়ী ধ্বংস ও ক্ষতিতে নিমজ্জিত হবে।
৪. কাফির ও মুমিন-দু'পক্ষের সাথে সম্পর্ক রাখতে হয় বলে মুনাফিকদের জীবন ঝুঁকিপূর্ণ।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ আয়াতে কাদের কথা বলা হয়েছে? *[সকল বোর্ড ২০১৯]*
২. "তাদের অন্তরসমূহের মধ্যে রয়েছে ব্যাধি।"— এখানে কাদের কথা বলা হয়েছে? *[সকল বোর্ড ২০২২]*
৩. মুনাফিকরা হেদায়েতের বিনিময়ে কী ক্রয় করেছে?
৪. কারা বধির, বোবা ও অন্ধ?
৫. ফাসাদ বলতে কী বোঝায়? *[সকল বোর্ড ২০২২]*
৬. ইসলাম প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার সব পর্যায়ে ইসলামের সর্বাধিক ক্ষতিসাধন করেছে কারা? *[সকল বোর্ড ২০২১]*

উত্তরের জন্য দেখো ১১১ পৃষ্ঠা।

খ. একক কাজ

শিক্ষার্থীরা বোর্ডে দুইটি বক্স তৈরি করবে। প্রথম বক্সে মুনাফিকের পরিচয় এবং দ্বিতীয় বক্সে মুনাফিকের পরিণতি উল্লেখ করবে।

পাঠ ২৫, ২৬ ও ২৭

সূরা আল-বাকারার ৩য় রুকু : অনুবাদ ও ব্যাখ্যা
The 3rd Ruku of Sura Al-Baqara: Translation and Explanation

[মহান আল্লাহর ইবাদত, সৃষ্টি, কুরআনের সত্যতার ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ, জান্নাত, দৃষ্টান্ত এবং ফাসিক সম্পর্কে]

অনুবাদ	আরবি
২১. হে মানবসমাজ! তোমরা তোমাদের প্রভুর ইবাদত করো, যিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন। যেন তোমরা তাকওয়াবান তথা পরহেজগার হতে পার।	٢١. يَاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ-
২২. যিনি তোমাদের জন্য জমিনকে করেছেন বিছানা আর আকাশকে ছাদ এবং তিনি আকাশ থেকে বর্ষণ করেছেন বৃষ্টি। অতঃপর তার মাধ্যমে উৎপাদন করেছেন ফল-ফসল যা তোমাদের জন্য জীবিকাস্বরূপ। সুতরাং জেনেশুনে তোমরা মহান আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করো না।	٢٢. اَلَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً ۖ وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ-
২৩. আর আমি আমার বান্দার (মুহাম্মাদ স) ওপর যা নাজিল করেছি তার ওপর যদি তোমাদের সন্দেহ হয় তাহলে তার অনুরূপ একটি সূরা নিয়ে আসো এবং মহান আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সব সহযোগীকে ডাকো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।	٢٣. وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ۖ وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ-
২৪. তারপর তোমরা যদি তা না পার এবং তোমরা তা কখনোই পারবে না, তাহলে তোমরা সে আগুনকে ভয় করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যা কাফিরদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে।	٢٤. فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۚ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ-
২৫. আর যারা ইমান এনেছে ও সৎকাজ সম্পাদন করেছে তাদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার নিম্নদেশ থেকে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত হয়। সেখানে তাদেরকে ফলমূল থেকে জীবিকাস্বরূপ যা দেওয়া হবে, তারা বলবে, 'এগুলোতো সে জীবিকা যা এর পূর্বে আমাদের দেওয়া হয়েছিল'। আর তাদেরকে সামঞ্জস্যপূর্ণ ফলই দেওয়া হবে। সেখানে তাদের জন্য থাকবে পূত-পবিত্র স্ত্রীরা এবং সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।	٢٥. وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۗ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوْا هٰذَا الَّذِىْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۙ وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ۗ وَلَهُمْ فِيْهَآ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۙ وَّهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ-

অনুবাদ	আরবি
২৬. নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ মশা কিংবা তার চেয়ে ক্ষুদ্র কোনো কিছুর উপমা বর্ণনা করতে লজ্জাবোধ করেন না। সুতরাং যারা ইমান এনেছে তারা জানে সুনিশ্চিতভাবেই এগুলো তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে সত্য। আর যারা কুফরি করেছে তারা বলে, 'এ দৃষ্টান্ত পেশ করার মাধ্যমে মহান আল্লাহ কী ইচ্ছা পোষণ করেন?' এর মাধ্যমে তিনি অনেককে পথভ্রষ্ট করেন এবং এর মাধ্যমেই অনেককে তিনি পথ প্রদর্শন করেন। আর তিনি ফাসিক বা পাপাচারীদের ছাড়া অন্য কাউকেই এর দ্বারা পথভ্রষ্ট করেন না।	٢٦. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْىٖۤ اَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا ؕ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَيَقُوْلُوْنَ مَاذَاۤ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَّيَهْدِىْ بِهٖ كَثِيْرًا ؕ وَمَا يُضِلُّ بِهٖۤ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ ۔
২৭. যারা মহান আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তাঁর সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার পর, মহান আল্লাহ যা অক্ষুণ্ন ও অবিচ্ছিন্ন রাখতে আদেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা-বিপর্যয় সৃষ্টি করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।	٢٧. اَلَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ ۠ وَيَقْطَعُوْنَ مَاۤ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖۤ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۔
২৮. তোমরা কীভাবে মহান আল্লাহর সাথে কুফরি কর? অথচ তোমরা মৃত ছিলে। অতঃপর তিনি তোমাদের জীবন দিয়েছেন। তারপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন এবং তিনিই তোমাদের জীবিত করবেন আর তাঁর কাছেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।	٢٨. كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ۚ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۔
২৯. তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। এরপর তিনি মনোনিবেশ করেছেন আকাশসমূহের দিকে। আর সেগুলোকে বিন্যস্ত করেছেন সাতটি আকাশে। আর তিনি প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে ভালোভাবেই অবহিত।	٢٩. هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۗ ثُمَّ اسْتَوٰۤى اِلَى السَّمَآءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ؕ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ۔

শব্দার্থ-২১: يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ হে মানবসমাজ, اعْبُدُوْا তোমরা ইবাদত করো, رَبَّكُمُ তোমাদের প্রভুর, الَّذِىْ যিনি, خَلَقَكُمْ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, وَالَّذِيْنَ এবং যারা, مِنْ قَبْلِكُمْ তোমাদের পূর্ববর্তী, لَعَلَّكُمْ যেন তোমরা, تَتَّقُوْنَ পরহেজগার হও।

শব্দার্থ-২২: الَّذِىْ যিনি, جَعَلَ তৈরি করেছেন, لَكُمُ তোমাদের জন্য, الْاَرْضَ পৃথিবীকে, فِرَاشًا বিছানা, وَّالسَّمَآءَ এবং আকাশকে করেছেন, بِنَآءً ছাদ, وَّاَنْزَلَ এবং অবতরণ করেছেন/বর্ষণ করেছেন, مِنَ السَّمَآءِ আকাশ থেকে, مَآءً পানি বা বৃষ্টি, فَاَخْرَجَ بِهٖ এরপর তা দ্বারা বের করেন, مِنَ الثَّمَرٰتِ ফল ফসল থেকে, رِزْقًا لَّكُمْ তোমাদের জন্য জীবিকাস্বরূপ, فَلَا تَجْعَلُوْا কাজেই তোমরা সাব্যস্ত করো না, لِلّٰهِ মহান আল্লাহর জন্য, اَنْدَادًا প্রতিপক্ষ/অংশীদার, وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ অথচ তোমরা জান।

শব্দার্থ-২৩: وَاِنْ আর যদি, كُنْتُمْ তোমরা হও, فِيْ رَيْبٍ সংশয়াপন্ন, مِّمَّا যা, نَزَّلْنَا আমি অবতীর্ণ করেছি, عَلٰى عَبْدِنَا আমার বান্দার ওপর, فَأْتُوْا তাহলে তোমরা নিয়ে আস, بِسُوْرَةٍ একটি সূরা, مِّنْ مِّثْلِهٖ তার অনুরূপ, وَادْعُوْا এবং তোমরা আহ্বান কর, شُهَدَآءَكُمْ তোমাদের সে সব সাহায্যকারীদেরকে বা সহযোগীকে, مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ মহান আল্লাহ ব্যতীত, اِنْ كُنْتُمْ যদি তোমরা হও, صٰدِقِيْنَ সত্যবাদী।

শব্দার্থ-২৪: فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا তারপর তোমরা যদি না পার, وَلَنْ تَفْعَلُوْا আর তোমরা কখনই পারবে না, فَاتَّقُوْا তাহলে তোমরা ভয় করো, النَّارَ নরককে/আগুনকে, الَّتِيْ যার, وَقُوْدُهَا তার ইন্ধন হবে, النَّاسُ মানুষ, وَالْحِجَارَةُ এবং পাথর, اُعِدَّتْ প্রস্তুত রাখা হয়েছে, لِلْكٰفِرِيْنَ কাফিরদের জন্য।

শব্দার্থ-২৫: وَبَشِّرِ আর সুসংবাদ দাও, الَّذِيْنَ যারা, اٰمَنُوْا ইমান এনেছে, وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ আর সৎকাজ করেছে, اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ নিশ্চয়ই তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, تَجْرِيْ প্রবাহিত হয়, مِنْ تَحْتِهَا তার তলদেশ থেকে, الْاَنْهٰرُ ঝর্ণাসমূহ, كُلَّمَا رُزِقُوْا তাদের প্রত্যেককে যা জীবিকা দেওয়া হবে, مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا জীবিকাস্বরূপ ফলমূল থেকে, قَالُوْا তারা বলবে, هٰذَا الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ এগুলোতো সে জীবিকা/এর পূর্বে যা আমাদের দেওয়া হয়েছিল, وَاُتُوْا بِهٖ আর তাদেরকে দেওয়া হবে, مُتَشَابِهًا সামঞ্জস্যপূর্ণ/অনুরূপ, وَلَهُمْ فِيْهَا আর তাদের জন্য সেখানে থাকবে, اَزْوٰجٌ مُّطَهَّرَةٌ পবিত্র স্ত্রীগণ, وَهُمْ فِيْهَا আর সেখানে তারা, خٰلِدُوْنَ চিরস্থায়ী, চিরদিন থাকবে।

শব্দার্থ-২৬: اِنَّ اللّٰهَ নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ, لَا يَسْتَحْيٖ সংকোচ করেন না/লজ্জাবোধ করেন না, اَنْ يَّضْرِبَ বর্ণনা করতে, উপস্থাপন করতে, مَثَلًا দৃষ্টান্ত, উপমা, مَّا যেকোনো, بَعُوْضَةً মশার, فَمَا فَوْقَهَا কিংবা তার ওপরের, فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا এরপর যারা ইমান এনেছে, فَيَعْلَمُوْنَ তারা জানে, اَنَّهُ الْحَقُّ নিশ্চয়ই তা সত্য, مِنْ رَّبِّهِمْ তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে, وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا আর যারা কুফরি করেছে/অস্বীকার করেছে, فَيَقُوْلُوْنَ তারা বলে, مَاذَآ اَرَادَ اللّٰهُ মহান আল্লাহ তাআলা কী ইচ্ছা পোষণ করেন, بِهٰذَا مَثَلًا এ ধরনের উপমা দ্বারা, يُضِلُّ بِهٖ তিনি এর দ্বারা বিভ্রান্ত করেন, كَثِيْرًا অনেককে, وَيَهْدِيْ بِهٖ এবং তিনি হেদায়েত দেন/পথ প্রদর্শন করেন, كَثِيْرًا অনেককে, وَمَا يُضِلُّ بِهٖ আর তিনি এর দ্বারা বিভ্রান্ত করেন না কাউকে, اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ ফাসিক ও পাপাচারীদের ব্যতীত।

শব্দার্থ-২৭: الَّذِيْنَ যারা, يَنْقُضُوْنَ ভঙ্গ করে/ছিন্ন করে, عَهْدَ اللّٰهِ মহান আল্লাহর চুক্তি/অঙ্গীকার, مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ তার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর, وَيَقْطَعُوْنَ এবং বিচ্ছিন্ন করে/কেটে ফেলে, مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ মহান আল্লাহ যা আদেশ দিয়েছেন, اَنْ يُّوْصَلَ অবিচ্ছিন্ন রাখতে/অক্ষুণ্ণ রাখতে, وَيُفْسِدُوْنَ এবং তারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে/বিপর্যয় সৃষ্টি করে, فِي الْاَرْضِ পৃথিবীতে, اُولٰٓئِكَ هُمُ তারাই, الْخٰسِرُوْنَ ক্ষতিগ্রস্ত।

শব্দার্থ-২৮: كَيْفَ কীভাবে, تَكْفُرُوْنَ তোমরা কুফরি কর, بِاللّٰهِ মহান আল্লাহর সাথে, وَكُنْتُمْ আর তোমরা ছিলে, اَمْوَاتًا মৃত, فَاَحْيَاكُمْ এরপর তিনি তোমাদের জীবন দান করেন, ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ এরপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ তারপর তিনি তোমাদের জীবিত করবেন, ثُمَّ اِلَيْهِ এরপর তাঁর দিকেই, تُرْجَعُوْنَ তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

শব্দার্থ-২৯: هُوَ الَّذِيْ তিনিই সেই সত্তা যিনি, خَلَقَ সৃষ্টি করেছেন, لَكُمْ তোমাদের জন্য, مَّا فِي الْاَرْضِ যা আছে পৃথিবীতে, جَمِيْعًا সবকিছু, ثُمَّ اسْتَوٰى এরপর তিনি মনোনিবেশ করেন, اِلَى السَّمَآءِ আকাশের দিকে, فَسَوّٰهُنَّ আর সেগুলোকে বিন্যস্ত করেন, سَبْعَ سَمٰوٰتٍ সাতটি আকাশে, وَهُوَ এবং তিনি, بِكُلِّ شَيْءٍ প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে, عَلِيْمٌ অবহিত।

২১. يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ۔

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর সব মানুষকে তাঁর ইবাদতে একনিষ্ঠ হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। 'ইবাদত' অর্থ হলো মেনে চলা, দাসত্ব করা। ব্যাপকার্থে, আল্লাহ তাআলা যে কাজ করার আদেশ দিয়েছেন তা করা এবং যে কাজসমূহ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন তা থেকে বিরত থাকাই ইবাদত। এ হিসেবে মানুষের জীবনের প্রতিটি কাজ, কথা ও তৎপরতা ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে যদি তা মহান আল্লাহর বিধান অনুসারে সম্পন্ন হয়। আয়াতে সাধারণভাবে সব মানুষকে এ ইবাদতে আত্মনিয়োগ করতে বলা হয়েছে।

আয়াতের সম্বোধনের বিষয়টি এখানে বিবেচ্য হয়ে উঠতে পারে। এখানে يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বা 'হে মুমিনগণ' না বলে বলা হয়েছে- يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ বা 'হে মানুষ!' এ সম্বোধন দ্বারা পৃথিবীর সব মানুষকে এ ঘোষণায় ও আহ্বানে একীভূত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'তোমরা তোমাদের রবের ইবাদত করো।' 'রব' হলেন প্রতিপালক। যিনি জীবন ও জীবিকা দেন এবং লালন-পালন করেন। সাধারণ বিবেচনাতে তাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ইবাদত অনিবার্য। পাশাপাশি তিনি নিজেই এ যৌক্তিকতা নির্দেশ করে বলেন— সেই রবের ইবাদত করো, 'যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পূর্বের সব লোকদের'।

আল্লাহ তাআলা মানুষকে ইবাদতের এই যে নির্দেশ দিয়েছেন তার নেপথ্যে ক্রিয়াশীল রয়েছে এক মহান উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য হলো, যদি মানুষ তাদের রবের ইবাদত করে তাহলে তারা তাকওয়াবান হতে পারবে।

শিক্ষা: এ আয়াতের শিক্ষাগুলো হলো—

১. সব মানুষ মহান আল্লাহর সৃষ্টি। সেজন্য তাদের প্রত্যেকেই মহান আল্লাহর নির্দেশের অনুগত হতে বাধ্য।
২. মানুষের 'রব' হলেন মহান আল্লাহ। কাজেই তিনি তাদের জীবন ও জীবিকাদাতা এবং লালন-পালনকারী।
৩. আল্লাহ তাআলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সব মানুষের একমাত্র স্রষ্টা তিনি। এ কাজে কেউ তাঁর সহযোগী নয়। তিনি কারো সাহায্য নেননি।
৪. মানুষের 'রব' ও 'স্রষ্টা' হিসেবে মানুষের ইবাদতের নিরঙ্কুশ ও একচ্ছত্র অধিকার একমাত্র মহান আল্লাহর।

২২. الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً ۪ وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ۔

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা মানুষের প্রতি তাঁর নিয়ামতের বিভিন্ন দিক নির্দেশ করেছেন।

আল্লাহ তাআলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে তিনি তাঁর 'খলিফা' মনোনীত করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। পৃথিবীতে বসবাসকালীন মানবজীবন আনন্দময় ও সুন্দর করার জন্য আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন নিয়ামত দিয়েছেন। মহান আল্লাহর এ নিয়ামত অগণিত। মানুষের বসবাসের জন্য মহান আল্লাহ পৃথিবী দিয়েছেন। বসবাসের সুবিধার জন্য পুরো পৃথিবীকে দুর্গম এলাকায় পরিণত করেননি। মরুভূমি বা কংকরময় অঞ্চল করেননি কিংবা জলময়ও করে দেননি, বরং মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় এলাকাসমূহকে সমতল ও আরামদায়ক বিছানার মতো করেছেন, যেন এখানে মানুষের জীবনযাপন সহজ হয়। একই উদ্দেশ্যে তিনি তারকাশোভিত আকাশমণ্ডল নির্মাণ করেছেন। ফলে মানুষের আলোর অভাব দূর হয়েছে। আর মানুষ পেয়েছে দৃষ্টিনন্দন মনোহর ছাদ! মহান আল্লাহ মানুষের জন্য মেঘমালা তৈরি করেছেন। সেখান থেকে জীবনের জন্য সর্বাধিক প্রয়োজনীয় উপাদান পানির ব্যবস্থা করেছেন। এ পানি তাদের তৃষ্ণা মেটায়। আর এ পানিই মানুষের জীবিকা, ফল ও ফসল উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য এসব নিয়ামত দানে শরিকহীন। মানুষের সৃষ্টিতে যেমন, তেমনি তার প্রতিপালনেও মহান আল্লাহর সাহায্যকারী কেউ নেই। মানুষ এ সম্পর্কে ভালোভাবেই অবহিত। আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে নবি-রাসুলদের পাঠিয়ে মানুষকে এ শিক্ষাই দিয়েছেন।

শিক্ষা: এ আয়াতের শিক্ষাগুলো হলো—

১. আল্লাহ তাআলা মানুষকে সীমাহীন নিয়ামত দিয়েছেন।
২. তিনি সমতলভূমি দিয়েছেন বিছানাস্বরূপ, আকাশকে করেছেন ছাদ, সেখান থেকে বর্ষণ করেছেন পানি আর তা দিয়ে মানুষের জীবিকা উৎপাদন করেছেন।
৩. মানুষের সৃষ্টি, প্রতিপালন ও মানুষকে নিয়ামতদানে মহান আল্লাহর কোনো শরিক নেই।
৪. মানুষ শুধু মহান আল্লাহরই ইবাদত করবে। তাঁর কোনো অংশীদার সাব্যস্ত করবে না।
৫. মানুষের জীবনযাপন ও জীবনধারণের সব উপকরণ ও উপাদান মহান আল্লাহর সীমাহীন নিয়ামতেরই অংশ।

২৩. وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ.

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদের সত্যতার প্রশ্নে সব দেশের, সব কালের কাফিরদের কাছে চিরস্থায়ী চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করেছেন।

কুরআনুল কারিম মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর ওপর নাজিল হয়েছে। এ মহাগ্রন্থ সব রকমের বিতর্ক ও প্রশ্নের ঊর্ধ্বে। এটি এক অসাধারণ আসমানি গ্রন্থ। এ কিতাবের বিষয়বস্তু অলৌকিক, উপস্থাপনা অনন্য, শব্দচয়ন ও রচনাশৈলী অভিনব। এ আসমানি গ্রন্থের বক্তব্য সন্দেহাতীত ও সংশয়হীন। যেমন- অন্যত্র বলা হয়েছে- ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ **অর্থ:** এটি সেই গ্রন্থ, যার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। এ আয়াতের অর্থ অবশ্য এটা নয় যে— এ কিতাবে কেউ সন্দেহ পোষণ করে না, বরং একদল অবিশ্বাসী এ কিতাবের সত্যতা ও যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। তারা মনে করে, এ কিতাব মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিল হয়নি, হওয়া সম্ভব নয়। হযরত মুহাম্মাদ (সা.) নিজেই এটি রচনা করেছেন। এ শ্রেণির লোকদের জন্য সুস্পষ্ট ঘোষণায় মহান আল্লাহ বলেছেন, অবিশ্বাসী ও সংশয়বাদী মূর্খরা শোনো! আমার প্রিয় রাসুল হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর ওপর আমি যে কিতাব নাজিল করেছি, তার সত্যতার ব্যাপারে তোমাদের যদি কোনো সংশয় থাকে, যদি মনে কর এ গ্রন্থ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিল হয়নি, মুহাম্মাদ (সা.) নিজেই এটি রচনা করেছেন, তাহলে তোমরা একটা বিশেষ চ্যালেঞ্জ নাও। তোমরাও এর মতো কিছু একটা রচনা করে নিয়ে আসো। সম্পূর্ণ গ্রন্থ রচনা করার দরকার নেই; এ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কোনো

ছোট্ট একটি সূরা বা অনুচ্ছেদর মতো কিছু একটা রচনা করে নিয়ে এসো। হযরত মুহাম্মাদ (সা.) প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অক্ষরজ্ঞান লাভ করেননি। তাঁর পক্ষে যদি এমন গ্রন্থ রচনা সম্ভব হয়, তবে তোমাদের পক্ষে তা অধিকতর সহজ হওয়া উচিত। তারপরও এ বিষয়ে তোমরা অন্যদের সাহায্য নিতে পারো। বিশেষত সাহায্য নিতে পারো তোমাদের সেই উপাস্য প্রভুদের, মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের উপাসনা কর। তোমরা অবশ্যই এ কাজটি করবে যদি নিজেদের সন্দেহ ও দাবিতে তোমরা সত্যবাদী হও।

শিক্ষা: এ আয়াতের শিক্ষাগুলো হলো—

১. কুরআন মাজিদ মহান আল্লাহর কালাম। তাঁর পক্ষ থেকে সত্য ও সন্দেহমুক্তভাবে এটি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর ওপর নাজিল হয়েছে। আয়াতের عَبْدٌ দ্বারা মুহাম্মাদ (সা.)-কে বোঝানো হয়েছে।
২. কুরআনের সব বক্তব্যই মহান আল্লাহর। এতে মানুষের নিজস্ব বক্তব্য বলতে কিছু নেই।
৩. মানুষের পক্ষে কুরআনের মতো গ্রন্থতো নয়ই, এমনকি এর একটি ছোট সূরার ন্যায় সূরাও রচনা করা সম্ভব নয়।
৪. কুরআন মাজিদ বিশ্বের সব দেশের মানুষের একমাত্র নির্ভুল হেদায়েত গ্রন্থ। উল্লিখিত আয়াতের চ্যালেঞ্জ তাই প্রমাণ করে।
৫. কুরআনের মতো গ্রন্থ বা সূরা রচনা করতে গিয়ে সমকালীন শ্রেষ্ঠ আরব কবিরা ব্যর্থ হয়ে স্বীকার করে নিয়েছেন যে, 'এটা কোনো মানুষের কথা নয়'।

٢٤. فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوْا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۚ أُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ -

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা কাফিরদের আখিরাতের আজাব সম্পর্কে সতর্ক করেছেন।

আল-কুরআন মহান আল্লাহর কালাম। এতে কোনো সংশয় কিংবা সন্দেহ নেই। কোনো অসত্য ও মিথ্যা ভাষণও এতে স্থান পায়নি। কুরআন মানুষের রচনা নয়। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এ মহাগ্রন্থ নাজিল হয়েছে। তা সত্ত্বেও কাফিররা এর সত্যতায় সন্দেহ পোষণ করে। সেজন্য মহান আল্লাহ তাদের চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন, তারা যেন এ মহাগ্রন্থের কোনো ছোট একটি সূরার মতো সূরা রচনা করে। মহান আল্লাহ জানেন এটি কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। মহান আল্লাহর কালামের কাছাকাছি কোনো গ্রন্থ রচনার ক্ষমতা মানুষের নেই। তা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা অবিশ্বাসীদের সহজভাবে বলেছেন, "তারপর তোমরা যদি কুরআন মাজিদের ছোট্ট সূরার মতো কোনো একটি সূরা রচনা করার কাজ করতে না পার, আর প্রকৃত ব্যাপার হলো এটা তোমরা কখনোই করতে পারবে না"। এক্ষেত্রে মহান আল্লাহর উপদেশ হলো, যেহেতু কুরআন মানুষের রচনা নয় সুতরাং তোমরা একে অবিশ্বাস করো না, অস্বীকার করো না। কারণ, কুরআন অস্বীকার করলে পরকালের জীবনে ভয়ানক শাস্তি ভোগ করতে হবে। ভয়াবহ সেই শাস্তি হবে আগুনের। মানুষ আর পাথর হবে সে আগুনের জ্বালানি। সে আগুন কেবল কাফিরদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। কাজেই ভয়ঙ্কর সেই আগুনের শাস্তির কথা মনে রেখেই তোমাদের আল-কুরআনে সন্দেহ পোষণ করা উচিত নয়।

শিক্ষা: এ আয়াতের শিক্ষাগুলো হলো—

১. কুরআন মাজিদ মহান আল্লাহর কালাম, এতে কোনো সংশয় ও সন্দেহ নেই।
২. মানুষের পক্ষে কুরআনের মতো কোনো গ্রন্থ বা এই গ্রন্থের কোনো সূরার কাছাকাছি সূরা রচনা করা সম্ভব নয়।
৩. যারা কুরআনে সন্দেহ ও অবিশ্বাস পোষণ করে তারা কাফির।
৪. পরকালে কাফিরদের জন্য মহান আল্লাহ অত্যন্ত কঠিন আগুনের শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। ভীষণ সেই আগুনে মানুষ ও পাথর প্রজ্বলিত হবে।
৫. আখিরাতের ধ্বংসের কথা মনে রেখেই মানুষের কুরআনে সন্দেহ পোষণ করা উচিত নয়।

২৫. وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ
قَالُوْا هٰذَا الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۙ وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ؕ وَلَهُمْ فِيْهَاۤ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۙۗ وَّهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۔

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা সৎকর্মশীল মুমিনের জন্য পরম সাফল্যের সুসংবাদ দিয়েছেন। মানুষ মহান আল্লাহর প্রিয় সৃষ্টি। পৃথিবীতে মানুষের প্রতিটি মুহূর্ত কাটে মহান আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহে। তা সত্ত্বেও বেশিরভাগ মানুষই তাঁকে অস্বীকার করে। তাঁর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে না। অসৎ ও নিষিদ্ধকাজে নিজেকে ব্যাপৃত রাখে। এ শ্রেণির লোকদের জন্য মহান আল্লাহ চিরস্থায়ী শাস্তির অঙ্গীকার করেছেন। পাশাপাশি যারা ইমান এনেছে ও আমলে সালেহ সম্পন্ন করেছে তাদের জন্য রয়েছে অন্তহীন পুরস্কার ও কল্যাণ। আমলে সালেহ হলো— সব সুন্দর ও শুভ কাজ; যার নির্দেশনা মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসুল দিয়েছেন। এ শ্রেণির সৎকর্মপরায়ণ মুমিন পাবে জান্নাত। পরম শান্তিময় সে জান্নাতের নিচ দিয়ে প্রবাহিত হবে ঝর্ণাসমূহ। সেখানে তাদেরকে ফলমূলসহ বিভিন্ন জীবিকা দেওয়া হবে। তারা যেন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে সেজন্য এ জীবিকাসমূহ পার্থিব জীবিকার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে। তারা বিস্মিত ও বিমুগ্ধ কণ্ঠে বলে উঠবে, এটা সেই জীবিকা পৃথিবীতে যা আমাদের দেওয়া হয়েছিল। অবশ্য স্বাদ, সৌন্দর্য ও উপকারে পৃথিবীর ফলমূলের চেয়ে জান্নাতের ফলমূল লক্ষ কোটিগুণ বেশি ভালো হবে। এছাড়াও সৎকর্মশীল মুমিনগণ পূত-পবিত্র স্ত্রী পাবেন।

এখানে মূল আরবি বাক্যে 'আযওয়াজ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এটি বহুবচন। এর এক বচন হচ্ছে 'যাওজ' যার অর্থ জোড়া। এ শব্দটি স্বামী বা স্ত্রী উভয় অর্থে ব্যবহার করা হয়। স্বামীর জন্য স্ত্রী হচ্ছে 'যাওজ'। আবার স্ত্রীর জন্য স্বামী হচ্ছে 'যাওজ'। তবে আখিরাতে আযওয়াজ তথা জোড়া হবে পবিত্রতার গুণাবলী সহকারে। যদি দুনিয়ার কোনো সৎকর্মশীল পুরুষের স্ত্রী সৎকর্মশীলা না হয়, তাহলে আখিরাতে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। সে ক্ষেত্রে ঐ সৎকর্মশীল পুরুষটির জন্য অন্য কোনো সৎকর্মশীলা স্ত্রী দান করা হবে। আর দুনিয়ার কোনো স্ত্রী যদি হয় সৎকর্মশীলা এবং তার স্বামী হয় অসৎ তাহলে আখিরাতে ঐ অসৎ স্বামী থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে কোনো সৎ পুরুষকে তার স্বামী হিসেবে দেওয়া হবে। তবে যদি দুনিয়ার কোনো স্বামী স্ত্রী দুজনেই সৎ হয় তাহলে আখিরাতে তাদের এই সম্পর্কটি চিরন্তন ও চিরস্থায়ী সম্পর্কে পরিণত হবে।

শিক্ষা: এ আয়াতের শিক্ষাগুলো হলো—

১. ইমান এনে সৎকর্মশীল হলে আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হন।
২. সৎকর্মপরায়ণ মুমিনদের মহান আল্লাহ চিরস্থায়ীভাবে চিরসুখের জান্নাত দান করবেন।
৩. কেবল সৎকর্ম করলে বা শুধু ইমান আনলেই হবে না বরং ইমানের সাথে সৎকর্ম করলেই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার পাওয়া যাবে।
৪. জান্নাত চিরসুখের জায়গা। সেখানে দুনিয়ার খাদ্যের সামঞ্জস্যপূর্ণ কিন্তু অধিকতর স্বাদবিশিষ্ট খাদ্য পাওয়া যাবে। জান্নাতের তলদেশে প্রবাহিত থাকবে নদী, সাথে থাকবে পবিত্র স্ত্রীগণ।
৫. মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভের জন্য মানুষের কর্তব্য হলো সৎকর্মশীল মুমিন হওয়ার সাধনা করা।

২৬ ও ২৭ নম্বর আয়াতের শানে নুজুল:

হযরত কাতাদাহ[৩] (রা.) বলেন— যখন সূরা আল-হাজ্জে মশা ও সূরা আল-আনকাবুতে মাকড়সার দ্বারা দৃষ্টান্ত প্রদান করা হয়, তখন কাফিররা বলতে লাগল, কুরআনের মতো আসমানি কিতাবে এমন ক্ষুদ্র ও নিকৃষ্ট প্রাণীকে উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা কী? তখন উল্লিখিত আয়াতদ্বয় নাজিল হয়।

---

[৩] হযরত কাতাদাহ (রা.) ছিলেন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর খাদেম হযরত আনাস (রা.) এর শিষ্য। তিনি হাদিস বর্ণনায় শব্দ ও অর্থের পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করতেন।

٢٦. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيٖۤ اَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا ؕ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَيَقُوْلُوْنَ مَاذَاۤ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا ۙ وَّيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا ؕ وَمَا يُضِلُّ بِهٖۤ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ ۔

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা কাফিরদের একটি মূর্খতাপ্রসূত জিজ্ঞাসার জবাব দিয়েছেন।

কুরআন মাজিদের একটি ক্ষুদ্রতম সূরার অনুরূপ সূরা রচনার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ব্যর্থ হওয়ার পর কাফিররা এর নতুন ত্রুটি অনুসন্ধান করে। তারা বলে, আল্লাহ তাআলা এক মহান সত্তা। তাঁর বাণীও তাই সুমহান। মশা, মাছি এবং মাকড়সার মতো তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট বিষয় তাতে উল্লেখ থাকবে কেন? যদি কুরআন মাজিদ প্রকৃতই মহান আল্লাহর কালাম হতো, তাহলে তাতে কোনো নিকৃষ্ট জিনিসের উল্লেখই থাকত না।

কাফিরদের এ প্রশ্ন অসঙ্গত। কারণ, শ্রোতার কাছে বক্তব্য সুস্পষ্টরূপে প্রকাশের প্রয়োজনে উপমা দেওয়া হয়। এর সাথে বক্তার সত্তা ও শ্রেষ্ঠত্বের সামঞ্জস্য থাকা জরুরি নয়। সেজন্য মহান আল্লাহ বিশ্বাসী এবং পরিণামদর্শী মুমিনগণ এ উপমাকে সত্য ও যথার্থ হিসেবে বিশ্বাস করেন। আর কাফির ও পাপাচারীরা এ ব্যাপারে উদ্ভট প্রশ্ন উত্থাপন করে। এভাবে পবিত্র কুরআনের প্রতি অবিশ্বাসের কারণে অনেকে পথভ্রষ্ট হয়। আর এ অবস্থা শুধু তাদেরই হয়, যারা ফাসিক।

'ফিসক' শব্দটির শাব্দিক অর্থ 'সীমালঙ্ঘন করা'। আর শরিয়তের পরিভাষায়, ফাসিক সেই ব্যক্তিকে বলা হয়, যে কবিরা গুনাহ করে এবং শরিয়তের বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করে।

শিক্ষা: এ আয়াতের শিক্ষাগুলো হলো—

১. আল্লাহ তাআলা উপমার মাধ্যমে মানুষকে নানামুখী শিক্ষাদান করেন। উপমায় শিক্ষাদান সহজ হয়।

২. ইমান পোষণ মুমিনকে মহান আল্লাহর নিঃশর্ত আনুগত্য ও নিবিড় উপলব্ধিতে উপনীত করে। সে মহান আল্লাহর প্রতিটি কাজে তাঁর সীমাহীন শক্তি ও কুদরতের নিদর্শন দেখে আরো বেশি সুদৃঢ় ইমান লাভ করে।

৩. মুমিনরা মহান আল্লাহর উপমা দেখে শিক্ষার্থীর দৃষ্টিতে। তারা এ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে কিন্তু শুরু থেকেই কাফিররা এ সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোষণ করে। ফলে তারা এ থেকে কোনো উপকার পায় না।

৪. মুমিনরা উপমাকে শিক্ষাপ্রদ ও সত্য বিষয় হিসেবে জেনে হেদায়েতের পথে আরো দৃঢ়তার সাথে পথ চলতে থাকে। আর কাফিররা এর ত্রুটি-বিচ্যুতি খুঁজতে গিয়ে আরো বিভ্রান্ত হয়।

৫. বস্তুত একটি বিষয় একই সময়ে একাধিক মানুষের মধ্যে বিভিন্নরূপ ক্রিয়া করে। শ্রোতা ও দর্শকের গ্রহণের ক্ষমতার ওপর বিষয়টি নির্ভর করে।

٢٧. الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ ۪ وَيَقْطَعُوْنَ مَاۤ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖۤ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۔

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা ফাসিকদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন।

ফাসিকদের প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো তারা মহান আল্লাহর সাথে সুদৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ছিন্ন করে। মহান আল্লাহর সাথে কেবল ফাসিকরা নয় বরং সব মানুষই সুদৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ। আর এ প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন হয়েছিল মানুষের পৃথিবীতে আগমনের পূর্বে আলমে আরওয়াহ বা আত্মার জগতে। আদম (আ.)-কে সৃষ্টির পর তাঁর পৃষ্ঠদেশ থেকে মহান আল্লাহ সব মানুষের আত্মা বের করেন। সেগুলোকে বাকশক্তি ও বুদ্ধি দেন। তারপর সব আত্মাকে জিজ্ঞাসা

করেন- اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ তথা আমি কি তোমাদের রব নই? তারা সবাই জবাব দেয়- نَعَمْ তথা হ্যাঁ, আপনিই আমাদের রব। পৃথিবীতে মুমিনরা তাদের ইমান ও সৎকর্ম দ্বারা সেই অঙ্গীকারই বাস্তবায়ন করে। আর ফাসিকরা তা ভুলে গিয়ে অন্যকে নিজের রব বানায়। মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য সত্তার দাসত্ব করে।

আয়াতে ফাসিকদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো মহান আল্লাহ তাদেরকে যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখার নির্দেশ দিয়েছেন তারা তা ছিন্ন করে। তাদেরকে ইমান ও হেদায়েতের সাথে, সৎকর্ম ও নিকটাত্মীয়দের সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তারা অবলীলায় সব সম্পর্ক ত্যাগ করেছে। তাদের সর্বশেষ ও অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো– পৃথিবীতে তারা অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়। সমাজে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম রাখে। এভাবে সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি করে ফাসিকরা নিজেদের স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখতে চায়। মহান আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন, এভাবে কখনো কখনো হয়তো তারা পৃথিবীতে লাভবান হবে। নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বও হয়তো এদের হাতে আসবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা হবে অকল্পনীয় ক্ষতির শিকার। পৃথিবীতে যেমন তারা মর্যাদা পাবে না, পরকালেও তেমনি তাদের পরিণতি হবে ভয়াবহ। তারা চিরস্থায়ী ধ্বংস ও ক্ষতির মধ্যে নিপতিত হবে।

শিক্ষা: এ আয়াতের শিক্ষাগুলো হলো—

১. মানুষ বিস্মৃতিপ্রবণ সৃষ্টি। মহান আল্লাহর সাথে করা ওয়াদা ভুলে তারা খারাপ কাজে লিপ্ত হয়। এক্ষেত্রে অগ্রগামী হলো ফাসিকরা। তারা চরম স্বেচ্ছাচারিতার সাথে তাদের ওয়াদা ভঙ্গ করে।

২. ফাসিকদের মধ্যে আল্লাহদ্রোহিতা প্রবল। যেন মহান আল্লাহর বিরোধিতার জন্যই তারা মহান আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজসমূহ প্রবল আগ্রহ নিয়ে সম্পাদন করে।

৩. ফাসিকরা অশান্তির দূত। তারা বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।

৪. মানুষের কর্তব্য হলো মহান আল্লাহর নিকট কৃত ওয়াদা স্মরণ করে ফাসেকি কাজ থেকে বিরত থাকা।

৫. মহান আল্লাহর সাথে কৃত সৎকাজের এবং তাঁর আনুগত্যের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে মানুষ যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয় তেমনি মানুষের সাথে কৃত ওয়াদা যারা ভঙ্গ করে তারাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

٢٨. كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ۚ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۔

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা মানুষের জীবনধারা উল্লেখ করে তাদের কুফরিতে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।

মানুষ মহান আল্লাহর সেরা সৃষ্টি, প্রিয়তম সৃষ্টি। মানুষকে তিনি অগণিত নিয়ামত দিয়েছেন। মানুষ একটা মুহূর্তও মহান আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া চলতে পারে না। তারপরও মানুষের খেয়ালি জীবনযাপন ও গাফিলতির অন্ত নেই। তারা মহান আল্লাহকে অস্বীকার করে। মহান আল্লাহর নিয়ামত স্বীকার না করে কুফরি করার ধৃষ্টতা দেখায়। মহান আল্লাহ তাই মানুষের কাছে প্রশ্ন তুলে ধরেছেন- মানুষ! কীভাবে বা কোন যুক্তিতে তোমরা মহান আল্লাহর নিয়ামত এবং স্বয়ং তাঁকে অস্বীকার করতে পারছ? কোন গোমরাহি ও মিথ্যা আশায় ঘুরপাক খেয়ে মহান আল্লাহকে অস্বীকার ও উপেক্ষা করার সাহস দেখাচ্ছ? অথচ তোমরা যাকে অস্বীকার করছ, তোমাদের বর্তমান অবস্থা ও তোমাদের জীবন তাঁরই নিয়ামত মাত্র। যে জীবনীশক্তি দিয়ে তোমরা তাঁর কুফরি করছ তাঁর অস্তিত্বের পেছনেও আছেন তিনি। তোমরা ছিলে প্রাণহীন। সেখান থেকে মহান আল্লাহ তোমাদের প্রাণ দিয়েছেন। এরপর তোমরা মৃত্যুবরণ করবে। তোমাদের পৃথিবীর জীবন শেষ হয়ে যাবে। তারপর পরকালের অসীম জীবনে তোমরা প্রবেশ করবে। সেখানে তোমাদের পুনরায় জীবিত করা হবে। এরপরে আর মৃত্যু থাকবে না। থাকবে না নতুন করে অন্য জীবন শুরু করার কোনো ব্যাপার। এ অন্তহীন জীবনযাপনের জন্য তোমাদের প্রত্যাবর্তন কেবল মহান আল্লাহর দিকেই। সুতরাং এরপরেও কোন যুক্তিতে তোমরা মহান আল্লাহর সাথে কুফরি করতে পার?

শিক্ষা: এ আয়াতের শিক্ষাগুলো হলো—

১. মানুষের জীবনযাপনের মোট চারটি পর্যায়। মাতৃগর্ভে এর সূচনা। পরকাল এর সর্বশেষ রূপ যেটি স্থায়ী হয়।

২. মানুষ তাঁর জীবনযাত্রার প্রতিটি পর্যায়েই মহান আল্লাহর দয়া ও রহমতের মুখাপেক্ষী।

৩. মানুষের জীবন-মৃত্যু কেবল মহান আল্লাহর ইচ্ছাধীন। এর নেপথ্যে অন্য কারো হাত নেই। সেজন্য বুদ্ধিমান মানুষ এ বিষয়ে মহান আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করতে পারে না।

৪. মানুষের আগমন যেমন মহান আল্লাহর কাছ থেকে তেমনি মানুষের প্রত্যাবর্তনও তাঁর দিকেই। সুতরাং মানুষের সুন্দরতম প্রত্যাবর্তনের চেষ্টা করা উচিত।

২৯. هُوَ الَّذِیْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا ثُمَّ اسْتَوٰۤی اِلَی السَّمَآءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ؕ وَهُوَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ۔

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা মানুষকে দেওয়া তাঁর নিয়ামতের ওপর আলোকপাত করেছেন।

মহান আল্লাহ অসীম ক্ষমতার মালিক। তিনি এক আদি-অন্তহীন অনন্ত সত্তা। নিতান্তই অনুগ্রহবশত মানুষকে তিনি সৃষ্টি করেছেন। দিয়েছেন শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টির মর্যাদা। মানুষ তার সবচেয়ে প্রিয় সৃষ্টি। সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক প্রিয় সৃষ্টির জীবনযাপন সুন্দর, সাবলীল, আরামদায়ক ও কল্যাণময় করার জন্য আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে তিনি বিভিন্ন প্রকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের মেধা ও শক্তি-সামর্থ্য দান করেছেন। ফলে মানুষ ভূপৃষ্ঠে যেমন আরাম-আয়েশে বসবাসের উপযোগী নানারকম উপকরণ আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে, তেমনি মহাকাশ ও সমুদ্রতলে গমনাগমনের পথ সুগম করতে সক্ষম হয়েছে। তারপর এগুলোর বৈধ ব্যবহারে উৎসাহ দিয়েছেন।

মানুষের বসবাস আনন্দময় করার জন্য পৃথিবীর যাবতীয় আয়োজন সম্পন্ন করে মহান আল্লাহ আকাশের দিকে মনোযোগ দিলেন। তাকে তারকারাজিতে শোভিত করলেন। চাঁদের আলোর স্নিগ্ধতায় ভরে দিলেন। সূর্যের রশ্মিতে প্রয়োজনীয় উপাদান দিলেন। এভাবে মানুষের বেঁচে থাকাকে তিনি সবদিক থেকে স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ ও নিরাপদ করলেন। এটা করা তাঁর জন্য অবশ্য কঠিন কিছু ছিল না। কেননা তিনিতো সব বিষয়েই মহাজ্ঞানী। সুতরাং তাঁর পক্ষে কোনো কিছুই কষ্টকর বা অসম্ভব নয়।

শিক্ষা: এ আয়াতের শিক্ষাগুলো হলো—

১. পৃথিবীর সবকিছু মহান আল্লাহ মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। সীমালঙ্ঘন না করে মানুষ এর সবকিছু ভোগ ও ব্যবহার করতে পারে।

২. আল্লাহ তাআলা আকাশকে সাতটি স্তরে বিন্যস্ত করেছেন। এর মধ্যেও মানুষের জন্য কল্যাণ রয়েছে।

৩. মহান আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে জানেন। সুতরাং এত নিয়ামত পেয়েও মানুষ যদি অবাধ্য হয় তবে তিনি তাদের শাস্তির হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

৪. কাজেই মানুষের কৃতজ্ঞ ও আবেদ (ইবাদতকারী) হওয়া জরুরি।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ (ইয়া-আইয়্যুহান্নাছ) অর্থ কী?

২. মহান আল্লাহ জমিনকে মানুষের জন্য কী করেছেন? *[সকল বোর্ড ২০২২]*

৩. দোজখের আগুন জ্বালানোর উপকরণ তথা ইন্ধন কী হবে?

৪. জান্নাতের নিম্নদেশ থেকে কী প্রবাহিত হয়?

৫. মহান আল্লাহ কীসের উপমা বর্ণনা করতে লজ্জাবোধ করেন না?

৬. কোন আসমানি কিতাব সব রকমের বিতর্ক ও প্রশ্নের ঊর্ধ্বে?

উত্তরের জন্য দেখো ১১১ পৃষ্ঠা।

খ. একক কাজ

কুরআনের সত্যতার প্রমাণ দিয়ে একটি অনুচ্ছেদ লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ২৮, ২৯ ও ৩০ সূরা আল-বাকারার ৪র্থ রুকু : অনুবাদ ও ব্যাখ্যা
The 4th Ruku of Sura Al-Baqara: Translation and Explanation

[হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টি সম্পর্কে]

অনুবাদ	আরবি
৩০. আর যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন, নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে খলিফা বা প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে চাই। তারা বলল, 'আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে এবং সেখানে রক্তপাত করবে? অথচ আমরাইতো আপনার প্রশংসাসহ তাসবিহ পাঠ করছি এবং আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি।' তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই আমি তা জানি, যা তোমরা জানো না।'	٣٠. وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ط قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ج وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ط قَالَ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ـ
৩১. আর তিনি আদমকে শিক্ষা দিলেন সব বিষয়ের নাম। তারপর সেগুলো ফেরেশতাদের কাছে পেশ করে বললেন, তোমরা আমাকে ঐসব বিষয়ের নাম বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।	٣١. وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ لا فَقَالَ اَنْۢبِئُوْنِىْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ـ
৩২. তারা বলল, আপনি পবিত্র; মহান। আপনি আমাদের যা শিখিয়েছেন তা ছাড়া আমাদের কোনো জ্ঞান নেই। সুনিশ্চিতভাবেই আপনি হচ্ছেন মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান।	٣٢. قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ط اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ـ
৩৩. তিনি বললেন, হে আদম, তুমি তাদেরকে সেসব বিষয়সমূহের নাম জানিয়ে দাও। তারপর সে যখন তাদেরকে (ফেরেশতাদের) জানিয়ে দিল সেসব বিষয়ের নাম, তিনি বললেন, আমি কি তোমাদের বলিনি? আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর গোপন বিষয়সমূহ সম্পর্কে সম্যক অবহিত আর আমি ঐসব বিষয়েও অবহিত যা তোমরা প্রকাশ করো এবং যা তোমরা গোপন রাখ।	٣٣. قَالَ يٰٓاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ج فَلَمَّآ اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ لا قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لا وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ـ
৩৪. আর যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, তোমরা আদমকে সিজদা করো, তখন ইবলিস ব্যতীত তারা সবাই সিজদা করল। সে (ইবলিস) অমান্য করল এবং অহঙ্কার করল। আর সে ছিল কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত।	٣٤. وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ط اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ ق وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ـ

অনুবাদ	আরবি
৩৫. আর আমি বললাম— হে আদম, তুমি এবং তোমার স্ত্রী উভয়েই জান্নাতে বসবাস করতে থাকো এবং তোমরা উভয়ে সেখানে স্বাচ্ছন্দ্যে খেতে থাকো যেখান থেকে খুশি, যেভাবে খুশি। তবে এ বৃক্ষটির নিকটবর্তী হয়ো না। তাহলে তোমরা সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।	৩৫. وَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ۖ وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ۔
৩৬. অতঃপর শয়তান তাদেরকে জান্নাত থেকে পদস্খলিত করল এবং তারা যেখানে ছিল সেখান থেকে তাদের উভয়কে বহিষ্কার করল। আমি বললাম, তোমরা নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু। আর পৃথিবীতে তোমাদের জন্য রয়েছে বসবাসের স্থান এবং একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ভোগের সামগ্রী।	৩৬. فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ۖ وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ۔
৩৭. তারপর আদম তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে কিছু বাণী লাভ করল। পরে তিনি তার ওপর দয়াপরবশ হলেন। নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	৩৭. فَتَلَقّٰٓى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ۔
৩৮. আমি বললাম, তোমরা একসাথে এখান থেকে নেমে যাও। তারপর যদি আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে কোনো হেদায়েত (মুক্তি পথের দিশা) এসে পৌঁছে অতঃপর যে ব্যক্তি সে হেদায়েতের অনুসরণ করবে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।	৩৮. قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ۔
৩৯. আর যারা কুফরি করে ও আমার আয়াতসমূহ মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী। তারা সেখানে চিরদিন অবস্থান করবে।	৩৯. وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ۔

শব্দার্থ-৩০: وَاِذْ — আর যখন, قَالَ — সে বলল/তিনি বললেন, رَبُّكَ — তোমার প্রতিপালক, لِلْمَلٰٓئِكَةِ — ফেরেশতাদের, اِنِّيْ — নিশ্চয়ই আমি, جَاعِلٌ — প্রস্তুতকারী/প্রেরণকারী, فِي الْاَرْضِ — পৃথিবীতে, خَلِيْفَةً — স্থলাভিষিক্ত/প্রতিনিধি, قَالُوْٓا — তারা বলল, اَتَجْعَلُ — আপনি কি প্রস্তুত করবেন? فِيْهَا — সেখানে/পৃথিবীতে, مَنْ يُّفْسِدُ — যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে, فِيْهَا — সেখানে/পৃথিবীতে, وَيَسْفِكُ — আর প্রবাহিত করবে, الدِّمَآءَ — বিপুল রক্ত, وَنَحْنُ — অথচ আমরা, نُسَبِّحُ — আমরা তাসবিহ পাঠ করি, بِحَمْدِكَ — আপনার প্রশংসার সাথে, وَنُقَدِّسُ — এবং আমরা পবিত্রতা বর্ণনা করি, لَكَ — আপনার জন্য, قَالَ — তিনি বললেন, اِنِّيْ — নিশ্চয়ই আমি, اَعْلَمُ — আমি অধিক জানি, مَا — যা, لَا تَعْلَمُوْنَ — তোমরা জান না।

শব্দার্থ-৩১: وَعَلَّمَ — আর তিনি শিক্ষা দিলেন, اٰدَمَ — আদমকে, الْاَسْمَآءَ — নামসমূহ, كُلَّهَا — সব বিষয়ের, ثُمَّ — এরপর, عَرَضَهُمْ — তিনি তাদের পেশ করলেন/সেগুলোকে উপস্থাপন করলেন, عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ — ফেরেশতাদের কাছে, فَقَالَ — এরপর বললেন, اَنْۢبِـُٔوْنِىْ — তোমরা আমাকে অবহিত করো বা বলে দাও, بِاَسْمَآءِ — নামসমূহ, هٰٓؤُلَآءِ — ঐসবের/ঐসব বস্তু ও বিষয়ের, اِنْ — যদি, كُنْتُمْ — তোমরা হও, صٰدِقِيْنَ — সত্যবাদী।

শব্দার্থ-৩২: قَالُوْا — তারা বলল, سُبْحٰنَكَ — আপনি পূত-পবিত্র, لَا عِلْمَ — কোনো জ্ঞান নেই, لَنَآ — আমাদের, اِلَّا — ব্যতীত, مَا عَلَّمْتَنَا — যা আপনি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, اِنَّكَ اَنْتَ — নিশ্চয়ই আপনি, الْعَلِيْمُ — মহাজ্ঞানী, الْحَكِيْمُ — প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/বিজ্ঞানময়।

শব্দার্থ-৩৩: قَالَ — তিনি বললেন, يٰٓاٰدَمُ — হে আদম, اَنْۢبِئْهُمْ — তুমি তাদের জানিয়ে দাও, بِاَسْمَآئِهِمْ — তাদের নামসমূহ, فَلَمَّآ — তারপর যখন, اَنْۢبَاَهُمْ — তিনি তাদের অবহিত করেন, بِاَسْمَآئِهِمْ — তাদের সমুদয় নাম, قَالَ — তিনি বললেন, اَلَمْ اَقُلْ — আমি কি বলিনি? لَّكُمْ — তোমাদের, اِنِّىْٓ — নিশ্চয়ই আমি, اَعْلَمُ — জানি, غَيْبَ السَّمٰوٰتِ — আকাশমণ্ডলীর অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে, وَالْاَرْضِ — এবং পৃথিবীর, وَاَعْلَمُ — এবং আমি জানি, مَا تُبْدُوْنَ — যা তোমরা প্রকাশ করো, وَمَا كُنْتُمْ — এবং যা তোমরা, تَكْتُمُوْنَ — তোমরা গোপন রাখ।

শব্দার্থ-৩৪: وَاِذْ — আর যখন, قُلْنَا — আমি বললাম, لِلْمَلٰٓئِكَةِ — ফেরেশতাদের, اسْجُدُوْا — তোমরা সিজদা করো, لِاٰدَمَ — আদমকে, فَسَجَدُوْٓا — তারপর তারা সিজদা করল, اِلَّآ اِبْلِيْسَ — ইবলিস ব্যতীত, اَبٰى — সে উপেক্ষা করল/অমান্য করল, وَاسْتَكْبَرَ — এবং সে অহঙ্কার করল, وَكَانَ — এবং সে ছিল, مِنَ الْكٰفِرِيْنَ — কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত।

শব্দার্থ-৩৫: وَقُلْنَا — আর আমি বললাম, يٰٓاٰدَمُ — হে আদম, اسْكُنْ اَنْتَ — তুমি বসবাস করতে থাকো, وَزَوْجُكَ — এবং তোমার স্ত্রী, الْجَنَّةَ — জান্নাতে, وَكُلَا — এবং তোমরা দু'জনেই খাও, مِنْهَا — সেখান থেকে, رَغَدًا — স্বাচ্ছন্দ্যে, حَيْثُ شِئْتُمَا — যেখান থেকে ও যেভাবে খুশি, وَلَا تَقْرَبَا — আর নিকটবর্তী হয়ো না, هٰذِهِ الشَّجَرَةَ — এই বৃক্ষটির, فَتَكُوْنَا — তাহলে তোমরা হয়ে যাবে, مِنَ الظّٰلِمِيْنَ — সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

শব্দার্থ-৩৬: فَاَزَلَّهُمَا — এরপর সে তাদের পদস্খলন ঘটাল, الشَّيْطٰنُ — শয়তান, عَنْهَا — সেখান থেকে, فَاَخْرَجَهُمَا — তারপর তাদের বহিষ্কার করল, مِمَّا كَانَا فِيْهِ — যেখানে ছিল সেখান থেকে, وَقُلْنَا — আর আমি বললাম, اهْبِطُوْا — তোমরা নেমে যাও, بَعْضُكُمْ — তোমরা পরস্পর, لِبَعْضٍ — একে অপরের জন্য, عَدُوٌّ — শত্রু, وَلَكُمْ — আর তোমাদের জন্য, فِى الْاَرْضِ — পৃথিবীতে রয়েছে, مُسْتَقَرٌّ — বসবাসের স্থান, وَّمَتَاعٌ — এবং জীবিকা/সম্পত্তি/ভোগের সামগ্রী, اِلٰى حِيْنٍ — কিছু সময় পর্যন্ত।

শব্দার্থ-৩৭: فَتَلَقّٰى — এরপর সে লাভ করল, اٰدَمُ — আদম, مِنْ رَّبِّهٖ — তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে, كَلِمٰتٍ — বাণীসমূহ, فَتَابَ — তারপর তিনি দয়া পরবশ হলেন, عَلَيْهِ — তার ওপর, اِنَّهٗ — নিশ্চয়ই তিনি, هُوَ — তিনি, التَّوَّابُ — অত্যন্ত ক্ষমাশীল, الرَّحِيْمُ — পরম দয়ালু।

শব্দার্থ-৩৮: قُلْنَا — আমি বললাম, اهْبِطُوْا — তোমরা নেমে যাও, مِنْهَا — এখান থেকে, جَمِيْعًا — সবাই এক সাথে, فَاِمَّا — এরপর যদি, يَاْتِيَنَّكُمْ — তোমাদের কাছে আসে, مِّنِّيْ — আমার পক্ষ থেকে, هُدًى — হেদায়েত/সুপথের নির্দেশনা, فَمَنْ تَبِعَ — তারপর যে ব্যক্তি অনুসরণ করবে, هُدَايَ — আমার হেদায়েতের, فَلَا خَوْفٌ — তাহলে কোনো ভয় নেই, عَلَيْهِمْ — তাদের ওপর, وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ — এবং তারা চিন্তিতও হবে না।

শব্দার্থ-৩৯: وَالَّذِيْنَ — আর যারা, كَفَرُوْا — তারা অস্বীকার করে/কুফরি করে, وَكَذَّبُوْا — এবং যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, بِاٰيٰتِنَآ — আমার আয়াতসমূহকে, اُولٰٓئِكَ — উহারা, اَصْحٰبُ النَّارِ — জাহান্নামের অধিবাসী, هُمْ — তারা, فِيْهَا — সেখানে থাকবে, خٰلِدُوْنَ — চিরদিন।

৩০. وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ؕ قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۚ
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ؕ قَالَ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ۔

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা মানুষ সৃষ্টির প্রথম প্রস্তাবনা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

আল্লাহ তাআলা আদি অন্তহীন, অপরিসীম ক্ষমতার মালিক এবং শাশ্বত সত্তা। যখন কেউ ছিল না, কিছু ছিল না, তখনও তিনি ছিলেন। হাদিসে কুদসিতে এসেছে, 'আমি গুপ্ত ছিলাম। আমার আত্মপ্রকাশের ইচ্ছে হলো। এজন্য আমি মানুষ সৃষ্টি করলাম'। প্রকৃতই মহান আল্লাহ তাঁর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও সীমাহীন দয়া প্রকাশের মাধ্যম হিসেবেই মানুষ সৃষ্টি করেন। এর আগে তিনি ফেরেশতাদের সৃষ্টি করেন। ফেরেশতারা কায়া ও স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অধিকারী। মহান আল্লাহর বিধান ও নির্দেশাবলী তারা বাস্তবায়ন করে থাকে কিন্তু নিজে থেকে কিছু করার ক্ষমতা ফেরেশতাদের নেই। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ফেরেশতাদেরকে নুর থেকে তৈরি করা হয়েছে (মুসলিম)।

পরে মহান আল্লাহ জিন সৃষ্টি করলেন, কিন্তু এরা পৃথিবীতে অপরাধ ও আল্লাহদ্রোহিতার চরমরূপ প্রকাশ করে। সর্বশেষ মহান আল্লাহ পৃথিবীতে তাঁর খলিফা হিসেবে মানুষ তৈরি করতে চান।

আয়াতে বর্ণিত 'খলিফা' শব্দের অর্থ নির্ণয়ে বিভিন্ন মত এসেছে। **মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক** বলেন— এর অর্থ স্থলাভিষিক্ত হওয়া। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের সম্বোধন করে বলেছেন যে, আমি তোমাদের ছাড়া এমন কিছু সৃষ্টি করতে যাচ্ছি, যারা যুগ যুগ ধরে বংশানুক্রমে একে অপরের স্থলাভিষিক্ত হবে। **ইবনে জারির** বলেন— আয়াতের ব্যাখ্যা হচ্ছে, আমি জমিনে আমার পক্ষ থেকে প্রতিনিধি নিয়োগ করতে চাই, যে আমার সৃষ্টিকুলের মধ্যে ইনসাফের সাথে আমার নির্দেশনা বাস্তবায়ন করবে।

মানুষ সৃষ্টির এ নিগূঢ় রহস্য সম্পর্কে ফেরেশতাদের কোনো ধারণা ছিল না। পূর্ববর্তী জিন জাতির কথা মনে রেখে স্বভাবতই তারা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে জানতে চান, 'পৃথিবীতে কি আপনি এমন কাউকে তৈরি করবেন যারা সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে এবং সেখানে রক্তপাত করবে? অথচ আমরাইতো আপনার প্রশংসাসহ তাসবিহ পাঠ করছি এবং আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি।'

মহান আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য কেবল তাসবিহ তাহলিল পাঠই ছিল না বরং তিনি তাঁর খলিফা হিসেবে মানুষকে ভালো ও মন্দ করার বিপুল ক্ষমতা দিয়ে পৃথিবীতে পাঠাবেন। তাদের অসীম নিয়ামতে ধন্য করে পরীক্ষা করবেন কে হেদায়েতের পথে চলে আর কে চলে না। পরে তার ওপর ভিত্তি করে দেবেন শাস্তি অথবা পুরস্কার। মহান আল্লাহর এ পরিকল্পনা সম্পর্কে ফেরেশতাদের কোনো জ্ঞানই নেই। অথচ আল্লাহ তাআলা এর সূচনা থেকে সর্বশেষ পরিণতি সম্পর্কে বিস্তারিত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান রাখেন।

শিক্ষা: এ আয়াতের শিক্ষাগুলো হলো—

১. আল্লাহ তাআলা এক সুমহান উদ্দেশ্য ও বিপুল দায়িত্ব দিয়ে মানুষ সৃষ্টি করেছেন।
২. ফেরেশতারা ঠিক ততটুকু জ্ঞানের অধিকারী যতটুকু জ্ঞান মহান আল্লাহ তাদের দেন।
৩. আল্লাহ তাআলা অন্তহীন জ্ঞানের অধিকারী। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সবকিছুই তিনি বিস্তারিতভাবে জানেন।
৪. ফেরেশতাদের মতো মানুষ ইচ্ছাশক্তিহীন এবং স্বাধীন কাজের ক্ষমতাহীন কোনো সৃষ্টি নয়; বরং স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্ম নির্বাচনের স্বাধীন ক্ষমতাসম্পন্ন বিশেষ সৃষ্টি হলো মানুষ।
৫. পৃথিবীতে মানুষকে মহান আল্লাহ তাঁর খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন।

৩১. وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِىْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ۔

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের ওপর মানুষের জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেছেন।

মহান আল্লাহর পরিকল্পনা সম্পর্কে না জানার কারণেই ফেরেশতাদের মধ্যে মানব সৃষ্টি সম্পর্কে দ্বিধা কাজ করছিল। তাদের দ্বিধা তাই বিবেচিত হলো না। মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে প্রথম মানব আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করলেন। আর তাকে তাঁর খলিফা হওয়ার উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য জীবজগতের সবকিছুর জ্ঞান দিলেন। ফলে মানুষের যাত্রা শুরু হলো শিক্ষিত ও জ্ঞানী সত্তা হিসেবে। এরপর আল্লাহ পাক মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের পদক্ষেপ নিলেন। তিনি ফেরেশতাদের সমাবেশে হযরত আদম (আ.)-কে যে বিষয়ে জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল সে বিষয়গুলো পেশ করেন। তাদেরকে আদেশ দেন বিষয়গুলোর নাম বলতে। বলেন, তোমরা যে বলেছিলে আমার খলিফারা পৃথিবীতে কেবল বিশৃঙ্খলা ও রক্তপাত করবে। জ্ঞান সাধনা, তাসবিহ তাহলিল এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ করবে না। তোমাদের এই বক্তব্যে তোমরা যদি সত্যবাদী হও, যদি মনে কর এ কথাগুলো যথার্থ, তাহলে এ বিষয়গুলোর নাম অবহিত করো।

ফেরেশতাদের পক্ষে নিজে থেকে কোনো কিছু সম্পর্কেই বলা সম্ভব নয়। সেজন্য তারা হযরত আদম (আ.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের এ জ্ঞান প্রতিযোগিতায় হেরে যায়। নিজেদের দাবি ও ধারণাকে সত্য প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়।

শিক্ষা: এ আয়াতের শিক্ষাগুলো হলো—

১. সৃষ্টির শুরু থেকে মানুষ শিক্ষিত ও জ্ঞানী। মহান আল্লাহ স্বয়ং তাকে শিক্ষিত করে তুলেছেন।
২. মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা। মহান আল্লাহ মানুষকে এ মর্যাদা দিয়েছেন।
৩. খলিফার দায়িত্ব পালনের জন্য নিজের মর্যাদা, অবস্থান, উদ্দেশ্য ও পরিণতি সম্পর্কে মানুষের সুস্পষ্ট জ্ঞান রাখতে হবে।
৪. মানুষের জ্ঞানের উৎস আল্লাহ তাআলা। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার কারণ তার এ জ্ঞান।

জেনে রাখো

হযরত আদম (আ.)-কে কী কী নাম শেখানো হয়েছিল?

কাতাদাহ (রহ.) বলেন— হযরত আদম (আ.)-কে সবকিছুর নাম শেখানো হয়েছিল। যেমন— এটা পাহাড়, এটা সমুদ্র, এটা এই, ওটা সেই প্রত্যেকটি বস্তুর নাম। তারপর ফেরেশতাদের কাছে সেগুলো পেশ করে নাম জিজ্ঞেস করা হয়েছিল (ইবনে কাসির)। এ থেকে বোঝা যায়, হযরত আদম (আ.)-কে সমস্ত সৃষ্টিকুলের নাম এবং তাদের কর্মকাণ্ডের নাম শেখানো হয়েছিল।

৩২. قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ـ

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের জ্ঞানগত সীমাবদ্ধতার বিষয়টি নির্দেশ করেছেন।

ফেরেশতা মহান আল্লাহর বিশেষ প্রজাতির সৃষ্টি। তাদের 'নুর' দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে নর-নারী বলতে কোনো বিষয় নেই। তাদের সংসার নেই, সন্তান নেই, বংশবৃদ্ধির ব্যাপারও নেই। তারা সাধারণত অদৃশ্য। মহান আল্লাহ চাইলে যেকোনো আকৃতিতে তারা দৃশ্যমান হতে পারেন। তাদের নিজে থেকে কোনো কাজ করার বা কোনো বিষয়ে জ্ঞানলাভ করার ক্ষমতা নেই। ফেরেশতারা কেবল তাই করেন যা করার নির্দেশ মহান আল্লাহ তাদের দেন। তারা কেবল সেটুকুই জানতে পারেন যতটুকু জ্ঞান মহান আল্লাহ তাদের দেন। হযরত আদম (আ.)-কে আল্লাহ তাআলা যে জ্ঞান দিয়েছেন, সে সম্পর্কে ফেরেশতাদের কোনো ধারণা ছিল না। তারা এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছিল। মহান আল্লাহ যখন তাদের নির্দেশ দিলেন "তোমরা আমাকে এসব বিষয়ের নাম অবহিত করো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও", তখন তাদের অক্ষম হওয়া ছাড়া উপায় থাকল না। নিজেদের অপারগতা প্রকাশ করতে গিয়েও তারা মহান আল্লাহরই প্রশংসা করেন। তারা বলেন— "আপনি পূত-পবিত্র ও মহান। আপনি যা আমাদের শিখিয়েছেন, তা ছাড়া আমাদের কোনো জ্ঞান নেই। সুনিশ্চিতভাবেই আপনি মহাজ্ঞানী এবং প্রজ্ঞাবান।"

শিক্ষা: এ আয়াতের শিক্ষাগুলো হলো—

১. আল্লাহ তাআলা চিরপবিত্র এক মহান সত্তা। কোনো সময়ে এ পবিত্রতা ও মহত্ত্ব অণুমাত্র ম্লান হবে না।

২. সব জ্ঞানের একমাত্র উৎস তিনি।

৩. কারো পক্ষেই নিজে থেকে কোনো বিষয়ের জ্ঞানলাভ করা সম্ভব নয়। জ্ঞান সে-ই লাভ করতে পারে যাকে মহান আল্লাহ জ্ঞান দান করেন।

৪. জ্ঞান মহান আল্লাহর এক বিশেষ নিয়ামত। আল্লাহ তাআলা সবাইকে এ নিয়ামত দান করেন না। যারা এর জন্য চেষ্টা করে, মহান আল্লাহ সম্পর্কে জানার জন্য সাধনা করে, তাদেরকেই তিনি জ্ঞান দান করে থাকেন।

৩৩. قَالَ يٰۤاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۚ فَلَمَّاۤ اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۙ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ غَیْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۙ
وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ـ

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা আদম (আ.)-এর জ্ঞানগত দক্ষতা ও নিজের ক্ষমতার ওপর আলোকপাত করেছেন।

আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে মানুষকে তাঁর খলিফা হিসেবে সৃষ্টির ঘোষণা দেন। মানুষ সম্পর্কে ফেরেশতারা আপত্তি উত্থাপন করেন। মহান আল্লাহ তাদের আশ্বস্ত করেন এবং মানবজাতির প্রতিনিধি ও প্রথম মানব হযরত আদম (আ.)-কে তিনি প্রথমেই সব বিষয়ের নাম শিক্ষা দেন। এটি ছিল ফেরেশতাদের চেয়ে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের কৌশল। তারপর সব বস্তু ফেরেশতাদের সামনে পেশ করেন, কিন্তু তারা মহান আল্লাহর এমন এক বিশেষ সৃষ্টি যারা নিজ থেকে কিছু জানতে পারে না। এই পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহকে তারা কোনো কিছুরই নাম জানাতে পারল না। শেষে তিনি হযরত আদম (আ.)-কে নির্দেশ দেন বিষয়গুলোর নাম বলতে। আল্লাহ তাআলা পূর্বেই হযরত আদম (আ.)-কে এ জ্ঞান দিয়েছিলেন বিধায় তিনি স্বাচ্ছন্দ্যে ও সাবলীলভাবে ফেরেশতাদের উপস্থিতিতে সব বিষয়ের নাম ঘোষণা করেন।

হযরত আদম (আ.)-এর এ দক্ষতায় তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। তিনি এটিকে ফেরেশতাদের মৃদু আপত্তির মোক্ষম জবাব হিসেবেই বিবেচনা করেন। মানুষ সৃষ্টির গোড়াতে ফেরেশতাদের সে ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি তাদের বলেন— "আমি কি তোমাদের বলিনি আকাশ ও পৃথিবীর সব গোপন বিষয়ের বিস্তারিত, সুস্পষ্ট ও সঠিক জ্ঞান আমার

আছে?” বস্তুত সৃষ্টজীব যা প্রকাশ করে সে সম্পর্কেও মহান আল্লাহ যেমন সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত জ্ঞান রাখেন, তেমনি যে বিষয় প্রকাশ করা হয় না, বরং মনের গহিন কোণে গোপন রাখা হয়, সে সম্পর্কেও তিনি যথার্থ জ্ঞান রাখেন। সঙ্গত কারণেই ফেরেশতারা শঙ্কা ব্যক্ত করলেও আল্লাহ তাআলা মানুষ সৃষ্টির পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছেন।

শিক্ষা: এ আয়াতের শিক্ষাগুলো হলো—

১. মহান আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন এবং যার প্রতি তাঁর রহমত নাজিল করেন সে যেকোনো পর্যায়ে ও পরিস্থিতিতে বিজয়ী হবে। হযরত আদম (আ.)-এর বিজয়ী হওয়া তাই প্রমাণ করে।

২. মানুষ মহান আল্লাহর অপরিসীম ভালবাসা ও করুণাধন্য সৃষ্টি। সৃষ্টির উষালগ্ন থেকেই মানুষ মহান আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ পাচ্ছে।

৩. আল্লাহ তাআলা সব গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট, বিস্তারিত ও যথার্থ জ্ঞান রাখেন। সুতরাং মানুষ যেমন প্রকাশ্যে সব গুনাহের কাজ থেকে বিরত থাকবে, তেমনি সব গোপন পাপ থেকেও নিজেকে হিফাজত করবে।

৪. মুসলিমদের পারলৌকিক জ্ঞানের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় জাগতিক জ্ঞানও অর্জন করতে হবে।

٣٤. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّآ إِبْلِيسَ ۖ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ ۚ وَكَانَ مِنَ الْكَٰفِرِينَ۔

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতা কর্তৃক হযরত আদম (আ.)-এর শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি এবং ইবলিসের অস্বীকৃতি ও তার পরিণাম সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

প্রথম মানব হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টির পর আল্লাহ তাআলা তাকে সব বিষয়ের নাম শিখিয়েছেন। তাকে সব দিক ও বিভাগ থেকে নিজের প্রতিনিধিত্বের উপযুক্ত করেছেন। তারপর তাকে সৃষ্টির সেরা প্রমাণের জন্য ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন এবং এই শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি আদায়ের জন্য আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের নির্দেশ দেন, “তোমরা আদমকে সিজদা করো।” এটা ছিল সম্মানসূচক সিজদা। তাছাড়া সরাসরি মহান আল্লাহর নির্দেশে তারই প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এ সিজদা হয়েছে। তাই এ সিজদা আদমের প্রতি ছিল না, বরং এর মাধ্যমে মহান আল্লাহর নির্দেশেরই আনুগত্য করা হয়েছে। সুতরাং এর ওপর ভিত্তি করে মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সৃষ্টিকে সিজদা করার রীতি প্রবর্তন বৈধ হবে না।

মহান আল্লাহর নির্দেশ পেয়ে সব ফেরেশতা একসাথে হযরত আদম (আ.)-কে সম্মানসূচক সিজদা করল। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিল। তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করল। কারণ, তাদেরকে এমনভাবেই তৈরি করা হয়েছে যে, তাঁরা কেবল নির্দেশ মেনে নেবে। গর্ব, অহঙ্কার, হিংসা এবং দ্রোহিতার সাথে তাদের পরিচয় ছিল না। ফেরেশতাদের দলে আযাযিল নামের এক জিন ছিল। মহান আল্লাহর এ নির্দেশে তার মধ্যে অহঙ্কার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। সে ভাবল, আদম মাটির তৈরি। আর মহান আল্লাহ তাকে তৈরি করেছেন আগুন দিয়ে। সে একটা বিশাল সময় ধরে মহান আল্লাহর ইবাদত করেছে। সুতরাং সে কেন মাটির আদমকে সিজদা করবে? সে মহান আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করল। নিজের বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের জন্য অহঙ্কার করল। ফলে তার এতদিনের সব আমল বিনষ্ট হয়ে গেল। মহান আল্লাহর একটি নির্দেশ অমান্য করায় সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হলো এবং পাপে লিপ্ত হওয়ার পর তার নাম হলো ইবলিস তথা অভিশপ্ত। মূলত ইসলামে দুষ্ট জিনদের বলা হয় শয়তান। তাই তার নাম ইবলিস শয়তান।

শিক্ষা: এ আয়াতের শিক্ষাগুলো হলো—

১. মহান আল্লাহর সব সৃষ্টির মধ্যে মানুষই সেরা।

২. মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব মহান আল্লাহর দেওয়া নিয়ামত। এ নিয়ামত অস্বীকার করলে মহান আল্লাহর ক্রোধে পতিত হতে হবে।

৩. মহান আল্লাহর সরাসরি নির্দেশে ফেরেশতারা হযরত আদম (আ.)-কে সিজদা করেছেন। এ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করা হারাম। সুতরাং মাজার, কবর বা পীরসাহেবকে সিজদা করলে তা হবে শিরকি কাজ।

৪. মুসলিম হতে হলে মহান আল্লাহর নির্দেশের প্রতি শতভাগ আনুগত্য দেখাতে হবে। কোনো একটি ক্ষেত্রে অবাধ্যতা করলেও পূর্বের সব আনুগত্য মূল্যহীন হয়ে পড়বে।

৫. অহংকার পতনের মূল। অহংকারীকে মহান আল্লাহ পছন্দ করেন না। ইবলিস তার অহংকারের কারণেই অভিশপ্ত শয়তানে পরিণত হয়েছে।

৬. অহংকার ত্যাগ করে মহান আল্লাহর নির্দেশ নিঃশর্তভাবে পালন করাই মানবজীবনের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত।

৩৫. وَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ۖ وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ـ

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা মানুষের প্রতি তাঁর প্রথম আদেশ-নিষেধ ব্যক্ত করেছেন।

কুরআনের বাকরীতি দ্বারা বোঝা যায়, হযরত আদম (আ.)-এর জান্নাতে প্রবেশের আগেই হযরত হাওয়া (আ.)-কে সৃষ্টি করা হয়। হযরত আদম (আ.)-এর বাম পাঁজরের একটি হাড় দিয়ে তার স্ত্রী হযরত হাওয়া (আ.)-কে সৃষ্টি করা হয় এবং তাঁকে যথাযথ রূপ দান করা হয় যেন হযরত আদম (আ.) তার সাহচর্যে পরিতৃপ্ত থাকেন। (ইবনে কাসির)

অন্য বর্ণনায় ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস এবং অন্যান্য সাহাবি থেকে এসেছে হযরত আদম (আ.)-কে জান্নাতে বসবাসের সুযোগ দেওয়া হলো কিন্তু তিনি সেখানে একাকীত্ব অনুভব করতে থাকলেন। তারপর তার ঘুম আসল। তিনি ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে দেখতে পেলেন, তার মাথার পাশে একজন মহিলা বসে আছেন, যাকে তাঁর পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর প্রথম এ দম্পতির প্রতি তাঁর প্রথম নির্দেশ ব্যক্ত করলেন, 'আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করতে থাক।' জান্নাত হলো সব সুখ, সমৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ্যের শ্রেষ্ঠতম আধার। এখানে হযরত আদম (আ.) দম্পতির জীবন যেন শান্তিময় হয় সেজন্য মহান আল্লাহ তাদের স্বাধীনতা দিয়ে জানালেন, জান্নাতের যেখানে খুশি তোমরা গমন করতে পারো, কোনো নিষেধ নেই। সবকিছুই করা যাবে, খাওয়া যাবে, ধরা যাবে; কেবল একটি বিশেষ বৃক্ষের কাছে যাওয়া যাবে না। প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো, সেই বৃক্ষের ফল খাওয়া যাবে না। মহান আল্লাহর দেওয়া অন্তহীন সমৃদ্ধির বিপরীতে এই একটিমাত্র নিষেধাজ্ঞা তেমন গুরুতর কিছু ছিল না। এটা পালন ছিল অত্যন্ত সহজ এবং মহান আল্লাহ এক্ষেত্রেও তাঁদের কাছে শতভাগ আনুগত্য চাচ্ছিলেন। এজন্য এ ব্যাপারে তিনি চরম হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন, যদি তোমরা নিষিদ্ধ এ বৃক্ষের নিকটবর্তী হও বা বৃক্ষের কোনো কিছু গ্রহণ করো তাহলে তোমরা সীমালঙ্ঘনকারীতে পরিণত হবে। তখন তোমাদের কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পেতে হবে।

শিক্ষা: এ আয়াতের শিক্ষাগুলো হলো—

১. মানুষ মহান আল্লাহর প্রিয় সৃষ্টি। মহান আল্লাহ এ সৃষ্টির স্বাভাবিক বংশবৃদ্ধি চান। এজন্য মানব সৃষ্টির পর তিনি মানবী সৃষ্টি করেছেন। তাদেরকে একসাথে বসবাসের নির্দেশ দিয়েছেন।

২. মানুষ সৃষ্টি করে মহান আল্লাহ লাগামহীনভাবে ছেড়ে দেননি। তাদের করণীয় এবং বর্জনীয় সম্পর্কে প্রথম থেকেই স্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন।

৩. মহান আল্লাহর নির্দেশ মেনে চললে তিনি খুশি হন এবং কল্পনাতীত পুরস্কার দান করেন।

৪. মানুষ মহান আল্লাহর 'স্বাধীন ইচ্ছা শক্তিসম্পন্ন' একমাত্র সৃষ্টি। স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মশক্তি এবং সীমাহীন নিয়ামত দিয়ে তিনি মানুষকে পরীক্ষা করতে চান যে, তাদের মধ্যে কে তাঁর নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আর কে করে না।

٣٦. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ۖ وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ
مُسْتَقَرٌّ وَّمَتٰعٌ إِلٰى حِيْنٍ۔

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা হযরত আদম ও হাওয়া (আ.) দম্পতির পদস্খলন এবং তাদের পৃথিবীতে অবতরণ বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

সৃষ্টির প্রথম প্রহরে আল্লাহ তাআলা হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)-এর বসবাসের স্থান হিসেবে জান্নাত নির্বাচন করেন। প্রাথমিকভাবে তাদেরকে সেখানে থাকতে দেওয়া হয়। আর দেওয়া হয় একটি বিশেষ নির্দেশ। এ নির্দেশ লঙ্ঘন করা হলে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করা হবে। সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে মহান আল্লাহর ক্রোধের শিকার হবে। মহান আল্লাহর নির্দেশে হযরত আদম (আ.) দম্পতি শান্তিতে জান্নাতে বসবাস শুরু করেন। তাঁরা সর্বান্তকরণে মহান আল্লাহর নির্দেশের অনুসরণ করতে থাকেন। কিন্তু তাঁদের অবস্থান বেশি দিন অব্যাহত থাকল না। অভিশপ্ত আযাযিল তাদের শান্তি বিনষ্টের জন্য উঠেপড়ে লাগল। নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য সে মানুষকে দায়ী করে। প্রতিশোধের উগ্রবাসনায় সে মহান আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমতা চেয়ে নেয়। আর সমস্ত শক্তি নিয়ে হযরত আদম (আ.) দম্পতির চরম সর্বনাশের কাজে আত্মনিয়োগ করে। সে নানা ছলচাতুরী ও প্রতারণা করে হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)-কে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করায়। ফলে পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী শয়তানের চক্রান্তের শিকার হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)-কে আল্লাহ তাআলা বহিষ্কার করলেন। তাদের জন্য নতুন বাসস্থান হিসেবে নির্ধারণ করলেন পৃথিবীকে। সেখানে একটা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত মানুষ অবস্থান করবে। তারা তথায় মহান আল্লাহর দেওয়া নির্দিষ্ট নিয়ামত ভোগ করবে।

শিক্ষা: এ আয়াতের শিক্ষাগুলো হলো—

১. মানব সৃষ্টির উষালগ্ন থেকেই শয়তান মানুষের শত্রু। হযরত আদম (আ.)-কে দিয়ে এ শত্রুতার সূচনা হলেও কিয়ামত পর্যন্ত সব মানুষের সাথেই তা অব্যাহত থাকবে।
২. শয়তান সবসময় মানুষের চরম ক্ষতি করতে চায়। কেননা সে তার অভিশপ্ত জীবনের কারণ হিসেবে মানুষকেই দায়ী করে। মানুষের জীবনকে অভিশপ্ত ও বিপর্যস্ত করে সে প্রতিশোধ নিতে চায়।
৩. জান্নাতকে আদমের চিরস্থায়ী বাসস্থান করা হয়নি। প্রাথমিকভাবে তাঁকে সেখানে থাকতে দেওয়া হয়েছিল মাত্র। কারণ, মহান আল্লাহ মানুষকে খলিফা বানিয়ে জান্নাতে রাখার পরিকল্পনা করেননি। পৃথিবীতে মানুষকে তিনি খলিফা মনোনীত করেছেন।
৪. পৃথিবী মানুষের চিরস্থায়ী বাসস্থান নয়। এখানে সে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবস্থান করবে। তারপর পরকালের অনন্ত জীবনে প্রবেশ করবে।
৫. মানুষকে শয়তানের চক্রান্ত সম্পর্কে চূড়ান্ত সতর্কতা অবলম্বন করে মহান আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলতে হবে।

٣٧. فَتَلَقّٰى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ؕ إِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ۔

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা মানুষের আদি পিতা হযরত আদম (আ.)-এর প্রতি তাঁর বিশেষ এক নিয়ামতের ওপর আলোকপাত করেছেন।

হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টির পর ঘটনার বিবর্তন ও ধারাবাহিকতা তাঁর এবং তাঁর বংশধরদের সাথে ইবলিসের চিরস্থায়ী শত্রুতার সূচনা করে। শেষ পর্যন্ত তার ষড়যন্ত্রে নিতান্ত অনিচ্ছায় হযরত আদম (আ.) মহান আল্লাহর নির্দেশ লঙ্ঘন করেন। তিনি সপরিবারে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেয়ে ফেলেন। এরপর মহান আল্লাহ হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)-

কে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেন। দুনিয়ায় আসার পর মহান আল্লাহর নির্দেশ লঙ্ঘনের ভুলের জন্য হযরত আদম (আ.) সীমাহীন লজ্জা ও অনুশোচনায় পড়ে মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এ সময়ে আল্লাহ তাআলা দয়াপরবশ হয়ে হযরত আদম (আ.)-কে ক্ষমা প্রার্থনার বিশেষ পদ্ধতি শিখিয়ে দেন:

رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۔

অর্থ: আমাদের প্রভু! আমরা নিজেদের ওপর জুলুম করেছি। এখন আপনি যদি আমাদের ক্ষমা না করেন আর আমাদের প্রতি রহম না করেন, তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্গত হব (সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ২৩)।

মহান আল্লাহর শিখিয়ে দেওয়া বাণী ও পদ্ধতিতে অব্যাহত বিনীত প্রার্থনার পর আল্লাহ তাআলা দয়াপরবশ হলেন এবং তাঁর তাওবা কবুল করলেন।

শিক্ষা: এ আয়াতের শিক্ষাগুলো হলো—

১. মানুষ ভুল করবে। ভুল করা মানুষের স্বভাবজাত বিষয়। কিন্তু মানুষ যদি ভুল করে অনুতপ্ত হয়ে মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, তাহলে তিনি ক্ষমা করে দেন।

২. মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার সুনির্দিষ্ট নিয়ম ও পদ্ধতি আছে। আল্লাহ তাআলা এ নিয়ম পদ্ধতি মানুষকে শিখিয়েছেন।

৩. ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় ভুল করার সাথে সাথে মানুষকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। এ কাজে গড়িমসি করা হলে ক্ষমা পাওয়া যাবে না।

٣٨. قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۔

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা মানুষের পার্থিব জীবনে তাঁর পক্ষ থেকে হেদায়েত প্রেরণের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে তা অনুসরণের প্রতিফল ব্যাখ্যা করেছেন। ইবলিসের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে আদম (আ.) দম্পতি নিতান্ত অনিচ্ছায় মহান আল্লাহর নির্দেশ লঙ্ঘনের ফলে তাদের দেহ থেকে জান্নাতি পোশাক খশে পড়ে এবং মহান আল্লাহ তাদেরকে জান্নাত ছেড়ে পৃথিবীতে নেমে যাওয়ার নির্দেশ দেন।

জান্নাতের নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ বসতি থেকে পৃথিবীতে আসার নির্দেশে আদম (আ.) সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। সেখানে কীভাবে থাকবেন, মহান আল্লাহর সাথে কীভাবে যোগাযোগ রাখবেন, কেমন করে জীবন পরিচালনা করবেন প্রভৃতি ভাবনায় ব্যাকুল হয়ে পড়েন। তাঁর শঙ্কা ও ব্যাকুলতা উপলব্ধি করে আল্লাহ তাআলা তাকে আশ্বস্ত করেন, তোমরা পৃথিবীতে চলে গেলেও আমার সাথে যোগাযোগহীন হবে না। সেখানে তোমাদের চিন্তিত হওয়ার ও সন্ত্রস্ত হওয়ার অনেক ব্যাপার থাকবে। শয়তানও তার কুমন্ত্রণা নিয়ে অহরহ প্রতারণার জাল বিস্তার করবে। তার মধ্যে আমি তোমাদের জন্য সঠিক পথের নির্দেশনা পাঠাব। যে ব্যক্তি সে নির্দেশের পূর্ণ আনুগত্য করবে তার কোনো ভয় থাকবে না।

শিক্ষা: এ আয়াতের শিক্ষাগুলো হলো—

১. মহান আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীতে তাঁর খলিফা মনোনীত করেছেন। এজন্য মানুষ পৃথিবীতে আসবে এটাই যথার্থ। শয়তানের প্ররোচনার এ ঘটনা না থাকলেও মানুষের গন্তব্য ছিল পৃথিবী।

২. পৃথিবীতে মানুষকে মহান আল্লাহ উদ্দেশ্যহীন ও নির্দেশনা ছাড়া পাঠাননি। তিনি তাদেরকে হেদায়েত দেবেন। এ হেদায়েত মানুষকে চিরসত্য ও সুন্দরের পথে পরিচালিত করবে।

৩. আল্লাহ তাআলা হযরত আদম (আ.)-কে পৃথিবীতে যে হেদায়েত পাঠানোর আশ্বাস দিয়েছিলেন সেই হেদায়েতই হলো ইসলাম।

৪. আর যে হেদায়েতের পথ অনুসরণ করবে তার দুনিয়া ও আখিরাতে কোনো ভয় ও চিন্তা নেই।

৩৯. وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ۔

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁর দেওয়া হেদায়েতের অস্বীকৃতি ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পরিণতি বর্ণনা করেছেন। মানুষ মহান আল্লাহর খলিফা। পৃথিবীতে মানুষকে মহান আল্লাহ খিলাফতের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন। পৃথিবীতে প্রেরণের প্রাক্কালেই আশ্বাস দিয়েছিলেন, যদি আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে কোনো হেদায়েত এসে পৌঁছে, আর যে ব্যক্তি সে হেদায়েতের অনুসরণ করবে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। কিন্তু যারা সে হেদায়েত অনুসরণ করবে না, মহান আল্লাহর দেওয়া বিধান ও হুকুম আহকাম অস্বীকার করবে এবং তাঁর দেওয়া সুপথের নির্দেশনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে; তাদের ভীত ও চিন্তিত না হওয়ার কোনো কারণ নেই। তারা আখিরাতে চরম শাস্তির মুখোমুখি হবে। চিরদিনের জন্য তাদের বাসস্থান নির্ধারিত হবে জাহান্নাম।

শিক্ষা: এ আয়াতের শিক্ষাগুলো হলো—

১. শান্তিপূর্ণ ও সুন্দর আখিরাতের জন্য মহান আল্লাহর নির্দেশনার অনুসরণ ও আনুগত্য করতে হবে।

২. যারা সে নির্দেশনা অস্বীকার করবে ও অবিশ্বাস করবে তারা কাফির। তাদের বাসস্থান জাহান্নাম। কাফিররা সেখানে চিরদিন অবস্থান করবে।

৩. সমাজে কাফিরদের অবস্থা ভালো হতে পারে, তাদের সম্মান, প্রতিপত্তি ও প্রভাব বাহ্যত মুমিনদের চেয়েও শ্রেষ্ঠতর মনে হতে পারে। কিন্তু তা দেখে মুমিনদের হতাশ হওয়ার কিছু নেই। তাদের সাধনা হওয়া উচিত নিজেদেরকে দীনের ওপর মজবুতভাবে টিকিয়ে রাখা।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. خَلِيْفَةٌ (খলিফা) অর্থ কী? *[রা. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০২২]*

২. مَلٰٓئِكَةٌ (মালাইকা) শব্দের অর্থ কী? *[রা. বো., দি. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০২২]*

৩. মহান আল্লাহ আদমকে কী শিক্ষা দিলেন?

৪. ইবলিস কেন আদমকে সিজদা করল না?

৫. মানব সৃষ্টির পর মহান আল্লাহ কাকে সিজদা করার নির্দেশ দেন? *[সকল বোর্ড ২০২২]*

৬. কে অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু?

উত্তরের জন্য দেখো ১১১ পৃষ্ঠা।

খ. দলীয় কাজ

'মানব সৃষ্টির উষালগ্ন থেকেই শয়তান মানুষের শত্রু'– আল-কুরআনের আলোকে উল্লিখিত কথাটির তাৎপর্য লিখে শ্রেণিতে আলোচনা করবে।

পাঠ ৩১, ৩২ ও ৩৩ সূরা আল-বাকারার ৫ম রুকু : অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

The 5th Ruku of Sura Al-Baqara: Translation and Explanation

[বনি ইসরাইল এবং সালাত সম্পর্কে]

অনুবাদ	আরবি
৪০. হে বনি ইসরাইল জাতি! তোমরা আমার সে নিয়ামতের কথা স্মরণ করো, যা আমি তোমাদের দান করেছি। আর তোমরা আমার সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করো, তাহলে আমি পরিপূর্ণ করব তোমাদের সাথে কৃত অঙ্গীকার এবং তোমরা শুধু আমাকেই ভয় করো।	٤٠. يٰبَنِىٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِىْٓ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ ۚ وَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ۔
৪১. আর আমি যা অবতীর্ণ করেছি তার প্রতি ইমান আনো। এটা তোমাদের কাছে যা আছে তার সত্য প্রমাণকারী। আর তোমরা এর প্রথম অস্বীকারকারী হয়ো না এবং আমার আয়াতসমূহের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করো না। আর তোমরা শুধু আমাকেই ভয় করো।	٤١. وَاٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْٓا اَوَّلَ كَافِرٍۢ بِهٖ ۖ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۫ وَّاِيَّايَ فَاتَّقُوْنِ۔
৪২. আর তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে ফেলো না এবং জেনেশুনে সত্যকে গোপন করো না।	٤٢. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ۔
৪৩. আর তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠিত করো ও জাকাত আদায় করো এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু করো।	٤٣. وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ۔
৪৪. তোমরা কি মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দাও, আর তোমাদের নিজেদের ব্যাপারে ভুলে যাও? অথচ তোমরা আসমানি কিতাব পাঠ করো। তবে কি তোমরা বুঝতে পার না?	٤٤. اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ۔
৪৫. আর তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। আর নিশ্চয়ই তা খোদাভীরুদের ছাড়া অন্যদের উপর অত্যন্ত কঠিন।	٤٥. وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ۙ۔
৪৬. যারা বিশ্বাস করে যে, তাদের প্রভুর সাথে তাদের অবশ্যই সাক্ষাৎ হবে এবং তারা তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে।	٤٦. الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ۔

শব্দার্থ-৪০: يَا — হে, بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ — ইসরাইল জাতি, اذْكُرُوْا — তোমরা স্মরণ করো, نِعْمَتِيَ — আমার দান/অনুগ্রহ, الَّتِيْٓ — যা, اَنْعَمْتُ — আমি দান করেছি, عَلَيْكُمْ — তোমাদের ওপর, وَاَوْفُوْا — এবং তোমরা পূর্ণ করো, بِعَهْدِيْٓ — আমার সাথে কৃত অঙ্গীকার, اُوْفِ — আমি পূর্ণ করবো, بِعَهْدِكُمْ — তোমাদের সাথে কৃত অঙ্গীকার, وَاِيَّايَ — আর কেবল আমাকেই, فَارْهَبُوْنِ — তোমরা ভয় করো।

শব্দার্থ-৪১: وَاٰمِنُوْا — এবং তোমরা বিশ্বাস পোষণ করো/ইমান আনো, بِمَآ — যা, اَنْزَلْتُ — আমি অবতীর্ণ করেছি, مُصَدِّقًا — সত্যায়নকারী/সত্য প্রমাণকারী, لِّمَا مَعَكُمْ — যা আছে তোমাদের কাছে, وَلَا تَكُوْنُوْٓا — আর তোমরা হয়ো না, اَوَّلَ — প্রথম, كَافِرٍۢ — কাফির/অস্বীকারকারী, بِهٖ — ইহার, وَلَا تَشْتَرُوْا — আর তোমরা ক্রয় করো না/গ্রহণ করো না, بِاٰيٰتِيْ — আমার আয়াতসমূহের বিনিময়ে, ثَمَنًا — মূল্য/দাম, قَلِيْلًا — কম/অল্প, وَاِيَّايَ — এবং আমাকেই, فَاتَّقُوْنِ — তোমরা ভয় করো।

শব্দার্থ-৪২: وَلَا تَلْبِسُوا — আর তোমরা মিশিয়ে ফেলো না, الْحَقَّ — সত্যকে, بِالْبَاطِلِ — মিথ্যার সাথে, وَتَكْتُمُوا — আর তোমরা গোপন করো না, الْحَقَّ — সত্যকে, وَاَنْتُمْ — অথচ তোমরা, تَعْلَمُوْنَ — তোমরা জান।

শব্দার্থ-৪৩: وَاَقِيْمُوا — এবং তোমরা কায়েম করো/প্রতিষ্ঠিত করো, الصَّلٰوةَ — সালাতকে/নামাজকে, وَاٰتُوا — এবং তোমরা প্রদান করো/আদায় করো, الزَّكٰوةَ — জাকাতকে, وَارْكَعُوْا — এবং তোমরা রুকু করো, مَعَ — সাথে, الرّٰكِعِيْنَ — রুকুকারীদের।

শব্দার্থ-৪৪: اَتَاْمُرُوْنَ — তোমরা কি নির্দেশ দাও? النَّاسَ — মানুষকে, بِالْبِرِّ — সৎকাজের/পুণ্যের, وَتَنْسَوْنَ — আর তোমরা ভুলে যাও, اَنْفُسَكُمْ — তোমাদের নিজেদের, وَاَنْتُمْ — অথচ তোমরা, تَتْلُوْنَ — পাঠ করো/তিলাওয়াত করো, الْكِتٰبَ — কিতাব/আসমানি গ্রন্থ, اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ — তবে কি তোমরা বুঝতে পার না?

শব্দার্থ-৪৫: وَاسْتَعِيْنُوْا — আর তোমরা সাহায্য কামনা করো, بِالصَّبْرِ — ধৈর্যের মাধ্যমে, وَالصَّلٰوةِ — এবং সালাতের মাধ্যমে, وَاِنَّهَا — আর নিশ্চয়ই তা (সালাত), لَكَبِيْرَةٌ — অত্যন্ত কঠিন, اِلَّا — ব্যতীত, عَلَى — ওপর, الْخٰشِعِيْنَ — বিনীতদের/আল্লাহভীরুদের।

শব্দার্থ-৪৬: الَّذِيْنَ — যারা, يَظُنُّوْنَ — তারা ধারণা করে/মনে করে, اَنَّهُمْ — নিশ্চয় তারা, مُّلٰقُوْا — তাদের সাক্ষাৎ হবে/তারা মিলিত হবে, رَبِّهِمْ — তাদের প্রভুর সাথে, وَاَنَّهُمْ — আর নিশ্চয়ই তারা, اِلَيْهِ — তার দিকে, رٰجِعُوْنَ — প্রত্যাবর্তনকারী/তারা ফিরে যাবে।

٤٠. يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِيْٓ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ ۚ وَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ -

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে ইসরাইল জাতিকে তাদের ওপর নাজিল হওয়া অনুগ্রহের কথা স্মরণ করে তাদের ওয়াদা পূরণের আহ্বান জানানো হয়েছে।

হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর অপর নাম ইসরাইল। আর তার বংশধররা হলেন বনি ইসরাইল বা ইসরাইল জাতি। এ জাতিকে মহান আল্লাহ সাধারণ নিয়ামতের বাইরে আরও বিশেষ কিছু নিয়ামতে ভূষিত করেন। যেমন– তাদের কাছে সবচেয়ে বেশি নবি-রাসুল পাঠানো হয়। এছাড়া রয়েছে ফিরাউন[১] ও কিবতিদের[২] নির্যাতন থেকে মুক্তি, সমুদ্রে রাস্তার ব্যবস্থা করে তাদের বের করে আনা, সুমিষ্ট পানির ব্যবস্থা করণ। জান্নাতি মান্না-সালওয়া[৩] এবং তীহ ময়দানে মেঘমালার ছায়া দেওয়া হয়। তৎকালীন বিশ্বে সবার উপর বনি ইসরাইলদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়। প্রতিটি ক্ষেত্রে অবাধ্যতা প্রদর্শনের পরও তাদেরকে বিশেষ ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়।

শেষ নবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর আগমণ ঘটলে তারা তাঁর সত্যতা সম্পর্কে শুরু থেকেই সন্দেহ পোষণ করে। পূর্বসূরিদের ধারা অনুযায়ী তারা অবাধ্যতার পথ বেছে নেয়। অথচ ইতোপূর্বে তাদেরকে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর আগমন সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল। তাদের কাছ থেকে আনুগত্যের সুদৃঢ় অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল। বিনিময়ে মহান আল্লাহ তাদের আরও বেশি মর্যাদা ও সম্মান দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু অবাধ্য বনি ইসরাইল তাদের অঙ্গীকার পূরণ করেনি। রাসুলুল্লাহ (সা.) ও মুসলিমদের ক্ষতিসাধন ও বিরোধিতাকেই তারা মূলনীতি সাব্যস্ত করেছিল। সেজন্য মহান আল্লাহ বনি ইসরাইলকে তাঁর নিয়ামতের কথা স্মরণ করতে বলেছেন। তাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণের নির্দেশ দিয়েছেন। আর পৃথিবীর কোনো দল, শক্তি বা স্বার্থহানিকে ভয় করতে নিষেধ করে ভয় কেবল তাঁকেই করতে বলেছেন।

শিক্ষা: এ আয়াতের শিক্ষাগুলো হলো—

১. বনি ইসরাইল ছিল মহান আল্লাহর অনুগ্রহে ধন্য একটা বিশেষ জাতি।
২. মহান আল্লাহ অত্যন্ত দয়াশীল। মানুষকে তিনি না চাইতেই অনেক কিছু দিয়েছেন। তারপরও মানুষ যদি তাঁর কাছে করা অঙ্গীকার পূরণ করে, তিনি তাদের আরও সাফল্য ও মর্যাদা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।
৩. অঙ্গীকার বা চুক্তির শর্তাবলী পালন করা আবশ্যক। আর তা লংঘন করা হারাম।

٤١. وَاٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْٓا اَوَّلَ كَافِرٍ بِهٖ ۖ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۚ وَاِيَّايَ فَاتَّقُوْنِ -

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে মহান আল্লাহ ইসরাইল জাতিকে ইমান আনয়ন এবং মহান আল্লাহর কালামের মর্যাদা সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়েছেন।

বনি ইসরাইল আসমানি কিতাবপ্রাপ্ত জাতি। তাদের কাছে তাওরাত ও ইঞ্জিল কিতাব নিয়ে হযরত মুসা (আ.) ও ঈসা (আ.)-এর মতো দু'জন প্রধান রাসুল আগমন করেছিলেন। তাদের কাছে নিয়ে আসা সব কিতাবেই একজন সর্বশেষ রাসুল আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। তাদের সব নবি রাসুলই একজন আঁখেরি নবির পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ আসমানি কিতাব কুরআন সম্পর্কেও তারা অবহিত ছিল। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর আবির্ভাবের পরপরই তারা

---

[১] প্রাচীনকালে মিশরীয় বাদশাদের 'ফিরাউন' বলা হতো।
[২] ফিরাউনের অনুসারীদের 'কিবতি' বলা হয়।
[৩] মান্না— এক প্রকার খাদ্য, যা রাতে শিশিরের মতো জমিনে জমে থাকতো। সালওয়া— অধিকাংশ আলিমদের মতে এটা ছিলো ক্ষুদ্র পাখি যা আসমান থেকে আসতো। আর মান্না ও সালওয়া হলো বনি ইসরাইলের জন্য মহান আল্লাহ প্রদত্ত জান্নাতি খাবার।

বুঝতে পেরেছিল, তিনিই প্রতিশ্রুত নবি। কুরআনই প্রতিশ্রুত গ্রন্থ। কিন্তু তারা ইমান আনার ক্ষেত্রে বিমুখতা প্রদর্শন করেছিল। তাদেরকে তাই মহান আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তাতে ইমান পোষণ করতে বলা হয়েছে। এতে তাদের মর্যাদাই বাড়বে। কেননা, সর্বশেষ নাজিলকৃত বিষয়ে ইসরাইল জাতির কিতাব ও নবি রাসুলদের স্বীকৃতি রয়েছে। এজন্যই বনি ইসরাইলের দায়িত্ব হলো তারা কুরআনের প্রথম বিশ্বাসী হবে, অবিশ্বাসী হবে না। তাছাড়া নিজেদের কোনো তুচ্ছ স্বার্থ রক্ষা বা পার্থিব মর্যাদার মূল্যে মহান আল্লাহর বাণী বিকৃতও করবে না। অর্থাৎ নিজেদের বিরুদ্ধতা বৈধ করতে তাওরাত, ইঞ্জিলের ভবিষ্যদ্বাণী বদলে ফেলবে না। তা করা হবে অত্যন্ত জঘন্য কাজ। পৃথিবীর কেউ বুঝতে না পারলেও মহান আল্লাহর সর্বদশী চোখকে তারা ফাঁকি দিতে পারবে না। সেজন্য এ কাজে তাদের অন্তত মহান আল্লাহকে ভয় করা উচিত। কেননা ভীত করার মতো ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ আছে কেবল আল্লাহ তাআলার।

শিক্ষা: এ আয়াতের শিক্ষাগুলো হলো—

১. আল্লাহ তাআলা যা নাজিল করেছেন তার ওপর ইমান পোষণ করা সবার প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব।

২. কুরআন মাজিদ পূর্বের সব নবি রাসুল ও আসমানি কিতাবের সত্যায়ন করে।

৩. তুচ্ছ স্বার্থ রক্ষা বা পার্থিব মর্যাদার মূল্যে মহান আল্লাহর কালাম বিকৃত করা বা কালামের অপব্যাখ্যা করা অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ।

৪. যাদের সত্যবিষয়ক জ্ঞান আছে, সত্যকে মেনে নেওয়াই তাদের প্রথম দায়িত্ব ।

٤٢. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা সত্য-মিথ্যার সংমিশ্রণ এবং জ্ঞাতসারে সত্য গোপন না করার নির্দেশ দিয়েছেন।

ইহুদি ও খ্রিষ্টান ধর্মযাজকরা ধর্মকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করত। প্রকৃত সত্য সম্পর্কে তারা অবহিত ছিল কিন্তু ব্যক্তি স্বার্থের জন্য তারা সে সত্যকে ভিন্নভাবে পরিবেশন করত। তারা সত্যের মধ্যেই নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে কিছু মিথ্যাও মিশিয়ে দিত। তাদের ঘৃণ্য ও জঘন্য কার্যক্রমের ফলে সাধারণ মানুষ তাওরাতের মূল শিক্ষা সম্পর্কে জানতে পারত না। ইঞ্জিলের হেদায়েত থেকেও তারা দূরে থাকত। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর আবির্ভাবের ব্যাপারেও তারা এ ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করে। তারা জানত মহানবি (সা.) মক্কায় প্রেরিত হবেন এবং কুরাইশ বংশেই নিতান্ত অসহায় অবস্থায় প্রেরিত হবেন। রাসুলের আবির্ভাবের পর তারা বুঝতে পারল— তিনিই প্রতিশ্রুত নবি। কিন্তু তারা বিষয়টিকে ধামাচাপা দিল। লোকজন তাদের কাছে জানতে চাইলে তারা প্রকৃত সত্য গোপন করে বলল, 'শেষ নবি তাদের মধ্যেই প্রেরিত হবেন।' মহান আল্লাহ বনি ইসরাইল ও তাদের ধর্মগুরুদের এ অন্যায় অবস্থান থেকে সরে দাঁড়াতে নির্দেশ দেন। সত্যের সাথে মিথ্যা মিশিয়ে দেওয়ার এ প্রবণতা হারাম ঘোষণা করেন। জেনেশুনে সত্য গোপন করা মহাপাপ।

শিক্ষা: এ আয়াত বনি ইসরাইলের সাথে সম্পৃক্ত হলেও এর শিক্ষা গোটা মানবজাতির জন্য। অত্যন্ত গুরুত্ববহ ও সুস্পষ্ট এ আয়াতের শিক্ষাগুলো হলো—

১. সত্য ও মিথ্যা সম্পূর্ণ বিপরীত ও পরস্পরবিরোধী দুটি বিষয়। এদের মধ্যে কখনোই সমঝোতা সম্ভব নয়।

২. সত্য ও মিথ্যা মিশিয়ে দিলে মিথ্যার চরিত্র অপরিবর্তিত থাকে। কিন্তু সত্য তার বিশ্বাসযোগ্যতা হারায়।

৩. যে সত্য ব্যক্তি জানে তার দায়িত্ব হচ্ছে উপযুক্ত সময়ে সে সত্য প্রকাশ করা। ইচ্ছাকৃতভাবে সত্য গোপন করা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।

৪. যে ব্যক্তি সত্য ও মিথ্যাকে একই সাথে ধারণ করে সে মূলত মিথ্যাকেই ধারণ করে।

৪৩. وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ۔

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা সালাত প্রতিষ্ঠা ও জাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তনের নির্দেশ দিয়েছেন।

বনি ইসরাইলকে দেওয়া শরিয়তে সালাতের বিধান ছিল। তবে তা ছিল তুলনামূলক কঠোর। অবাধ্য ইসরাইল জাতি সালাত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিশেষ গাফিলতি প্রদর্শন করে আসছিল। এজন্য মহান আল্লাহ তাদের সালাত কায়েমের নির্দেশ দিয়েছেন। সালাত কায়েমের মধ্যে দুটো দিক রয়েছে। একটি হলো, পরম নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় সালাত সম্পাদন। সালাতের প্রতিটি কাজের দাবি ও গুরুত্ব অবহিত হয়ে সে অনুযায়ী কাজগুলো সম্পন্ন করা। দ্বিতীয়ত, একা একা সালাত আদায় না করে সবাইকে নিয়ে সালাত আদায় করা। সালাত আদায়ের পরিবেশ সৃষ্টি করা। সংশ্লিষ্ট সবাইকে সালাত আদায় করতে বলা। নামাজি মানুষের সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। অথবা সালাত কায়েম হলো জামাতের সাথে সালাত আদায় করা। আয়াতের শেষাংশ থেকে এ অনুমান আরও সহজ হয়। আর তোমরা রুকুকারীদের সাথে রুকু করো অর্থ— জামাতে সালাত আদায় করো। কেউ কেউ অবশ্য বলেছেন, ইসরাইল জাতির সালাতে রুকুর প্রচলন ছিল না বলে এখানে রুকুর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

আয়াতে জাকাত আদায়ের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। জাকাত হলো শরিয়ত নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী বাধ্যতামূলকভাবে অভাবীদের সম্পদ দিয়ে দেওয়া। দৈহিক ইবাদতের মধ্যে সালাত এবং আর্থিক ইবাদতের মধ্যে জাকাতই শ্রেষ্ঠ বলে আয়াতে এ দুটো বিষয়েরই উল্লেখ করা হয়েছে।

শিক্ষা: এ আয়াতের শিক্ষাগুলো হলো—

১. নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে সালাত আদায় করতে হবে। অলসতা ও উপেক্ষা নিয়ে সালাত আদায় করে মুনাফিকরা।
২. সব মানুষকে সালাত ও জাকাতের শিক্ষায় উজ্জীবিত হতে হবে।
৩. নিজে সালাত আদায়ের পাশাপাশি অন্যদেরকেও সালাত আদায়ের নির্দেশ দিতে হবে। সামাজিকভাবে সালাত প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
৪. সালাত আদায় করতে হবে জামাতের সাথে। একা একা সালাত আদায় করা উচিত হবে না।
৫. নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে নির্ধারিত পদ্ধতিতে জাকাত দিতে হবে।

৪৪. اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ۔

ব্যাখ্যা: এআয়াতে আল্লাহ তাআলা ইসরাইল জাতির ধর্মগুরু ও পণ্ডিতদের একটি নিন্দনীয় স্বভাবের সমালোচনা করেছেন।

ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্মযাজকরা 'তাওরাত' ও 'ইঞ্জিল' তিলাওয়াত করে। কিতাবের সব সৎকাজ সম্পর্কে তারা ভালোভাবেই অবহিত। তাদের কাছে মানুষ এলে তারা মানুষকে এ সব সৎকাজ সম্পাদনের নির্দেশ দেয়। সুনীতি ও হেদায়েতের কথা শোনায়। হেদায়েতের পথে চলার ও ভালো কাজ করার গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দেয়, কিন্তু নিজেরা সৎকাজ করে না। নিজেদের ক্ষেত্রে সুনীতি ও হেদায়েতের কথা বিস্মৃত হয়ে পড়ে। নিজেরা কিতাবের শিক্ষা ভুলে স্বার্থ রক্ষার জন্য দিশেহারা হয়ে ওঠে। নীতি-আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়ে নিজেরা অনাচারে মেতে ওঠে।

মুখে মুখে সৎকাজের কথা বলা আর নিজে তার বিপরীত কাজ করা ভয়ঙ্কর মুনাফেকি। ইসরাইল জাতির ধর্মগুরুরাও এটা জানে। তারা এটিও জানে যে এরকম আচরণের জন্য কিতাবে ভয়াবহ শাস্তির হুঁশিয়ারি রয়েছে। তারা নিজেরা কিতাব পাঠ করে। মুনাফেকির শাস্তি ও ভয়ানক পরিণতি সম্পর্কেও তারা অবহিত। তা সত্ত্বেও তারা সাবধান হয় না। কিতাবের হেদায়েত হৃদয়ঙ্গম করে নিজেদের শুধরে নেয় না। এটা তাদের মূর্খতাসুলভ স্বার্থপূজা এবং আত্মপ্রবঞ্চনারই বাস্তব পরিণাম।

শিক্ষা: এ আয়াতে ইহুদি ধর্মযাজকদের জন্য নির্দেশ বিঘোষিত হলেও এর শিক্ষা সবার জন্য। যেমন—

১. পুণ্যের উপদেশ দেওয়ার আগে নিজেকে সেটা করতে হবে। তাহলে উপদেশ ফলপ্রসূ হবে।

২. কথা একরকম এবং কাজ অন্যরকম হলে ব্যক্তি মুনাফিকদের অন্তর্ভুক্ত হবে। মুনাফিকদের জন্য রয়েছে সর্বনিম্ন স্তরের জাহান্নাম।

৩. ভালো কাজের উপদেশ দিয়ে নিজে মন্দকাজ করা জঘন্যতম আত্মপ্রবঞ্চনা। মুমিন এটা করতে পারে না।

৪. সমাজে ইসলাম প্রচারের কাজে মৌখিক পদ্ধতির চেয়ে নিজের চরিত্রে তার প্রতিফলিত পদ্ধতিই বেশি কার্যকর। রাসুলুল্লাহ (সা.) কোনো বিষয় কাউকে বলার আগে নিজের চরিত্র ও আচরণে তার প্রতিফলন ঘটাতেন। মুমিনদেরও বিষয়টি গুরুত্বের সাথে অনুশীলন করা উচিত।

৫. মহান আল্লাহর কালাম তিলাওয়াত করে তা অনুধাবন করতে হবে এবং তা বাস্তবজীবনে রূপায়িত করতে হবে।

৪৫. وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ۙ۔

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য প্রার্থনার মাধ্যম হিসেবে সবর বা ধৈর্য ও সালাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইহুদি ধর্মগুরুরা কিতাব বিকৃতি ও স্বার্থসিদ্ধির কাজে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছিল। তাদের গৃহীত নীতিতে প্রতারণা ও পাপাচার ঢুকে গিয়েছিল। জেনেশুনে সত্য গোপনের মতো মূর্খতা তাদেরকে ঘিরে ফেলেছিল। নিজেদের বিবেচনায় তাদের এ অবস্থা উত্তরণের কোনো উপায় ছিল না। পরম দয়ালু মহান আল্লাহ এই দুরবস্থা নিরসনের পন্থা বলে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেছেন, "তোমরা সবর ও সালাতের মাধ্যমে মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও।"

সবরের মাধ্যমে মহান আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনার নির্দেশ দানের বিশেষ তাৎপর্য আছে। আল্লাহ তাআলা তাঁর অসীম জ্ঞানের কারণে অবহিত ছিলেন, ইহুদিদের এই পতনের জন্য দায়ী তাদের ধৈর্যহীনতা। দুঃখে-সুখে, নির্যাতনে-নিপীড়নে সবর নীতি অনুশীলনের যে নির্দেশ তাদের দেওয়া হয়েছিল ইহুদিরা তা ভুলে গিয়েছিল। তার পরিবর্তে তারা লোভ ও পাপাচারের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। তাদের সালাতও নিয়ম-নীতি অনুসারে হচ্ছিল না। এক্ষেত্রে তারা অলসতা ও উপেক্ষা প্রদর্শন করছিল। অথচ মহান আল্লাহর আনুগত্য প্রদর্শনের সবচেয়ে সহজ পন্থা হচ্ছে সালাত। কিন্তু ব্যক্তি যদি মহান আল্লাহর অসন্তুষ্টিকে ভয় না পায়, তার মধ্যে যদি তাকওয়া না থাকে, তাহলে সবর অবলম্বন করা বা সালাত আদায় করা অত্যন্ত কঠিন কাজ হয়ে পড়ে। কেবল যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে মহান আল্লাহর নির্দেশ পালন করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করে, তাদের পক্ষে সালাত আদায় ও সবর করা খুবই সহজ বিষয়।

শিক্ষা: এ আয়াতের শিক্ষাগুলো হলো—

১. পৃথিবীতে সব অপরাধ ও পাপ থেকে বেঁচে থাকার জন্য মহান আল্লাহর সাহায্য জরুরি।

২. মহান আল্লাহ এমনিতে সবাইকে সাহায্য করেন না। যারা তাঁর কাছে সাহায্য চায় তিনি তাদেরই সাহায্য করেন।

৩. মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনার বিশেষ পদ্ধতি আছে। সবর ও সালাতের মাধ্যমে তাঁর সাহায্য পাওয়া সম্ভব।

৪. পাপ থেকে মুক্তি পেতে হলে সবর অবলম্বন এবং নিজের সত্তাকে মহান আল্লাহর কাছে বিলিয়ে দেওয়ার জন্য সালাত আদায় করা হলে মহান আল্লাহ ব্যক্তির ওপর রহম করেন।

৫. সব লোকের পক্ষে সবর অবলম্বন ও সালাত আদায় সম্ভব নয়। কেবল আল্লাহভীরু মানুষের পক্ষেই এ আচরণ সম্ভব।

৪৬. اَلَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ـ

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা কারো কারো কাছে সালাত আদায় ও সবর অবলম্বন সহজ প্রতীয়মান হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। সবর বা ধৈর্যধারণ একটি কঠিন কাজ। অর্থপ্রীতি, সম্মানপ্রীতি, পাপকাজে আগ্রহ প্রভৃতি থেকে সবর অবলম্বন করা এবং নিজেকে এসব পাপ থেকে দূরে রাখা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। সালাত আদায়ও বেশ কঠিন কাজ। প্রতিদিন একই নিয়মে, নির্ধারিত সময়ে পাঁচবার সালাত আদায়ের চেষ্টা নিঃসন্দেহে কঠিন কাজই বটে। তবে এক শ্রেণির লোকের কাছে এটা কঠিন কাজ নয়। যারা মহান আল্লাহকে ভয় পায় তাদের পক্ষে এসব করা কোনো ব্যাপারই নয়। তারা স্বাচ্ছন্দ্যে সালাত আদায় করে, অবলীলায় ধৈর্যধারণ করে। কারণ, তারা সুনিশ্চিতভাবে দুটি বিশেষ ধারণা পোষণ করে। বিষয় দুটি হলো তারা বিশ্বাস করে, অবশ্যই তাদের সাথে তাদের রবের মিলন হবে এবং শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর সব মানুষকে নিশ্চিত করেই মহান আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। এ বিশ্বাস পোষণের কারণে ব্যক্তি পরকালের পাথেয় সঞ্চয়ে উদগ্রীব থাকে। সবর ও সালাত তার সে পাথেয় সংগ্রহের মূল প্রেরণা এবং মাধ্যম। ফলে তার জন্য সালাত আদায় করা বা সবর অবলম্বন করা কঠিন ব্যাপার হয় না।

শিক্ষা: এ আয়াতের শিক্ষাগুলো হলো—

১. পাপ প্রবণতাসম্পন্ন মানুষের কাছে ভালো কাজ সবসময়ই কষ্টকর বিবেচিত হয়।

২. সালাত ও সবর পাপীদের কাছে অত্যন্ত কঠিন কাজ। কারণ, তারা একে নিছক কাজ মনে করে এবং তা সম্পাদনের কষ্ট তাদের কাছে মুখ্য হয়ে ওঠে। কাজের লক্ষ্য বা পরিণতি বিষয়ে তাদের কোনো ধারণা নেই।

৩. আল্লাহভীরুদের কাছে সালাত ও সবর কোনো কঠিন কাজ নয়। কারণ, তারা এগুলোকে মুক্তির মাধ্যম মনে করেন।

৪. মুমিনের কাছে সৎকাজ করা সহজ, কঠিন হলো খারাপ কাজ করা। পাপাচারীদের ক্ষেত্রে এর উল্টোটা ঘটে। তাদের কাছে খারাপটাই সহজ আর ভালোটা ভীষণ কঠিন হয়ে পড়ে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বনি-ইসরাইল কারা? *[রা. বো., দি. বো., কু. বো., সি. বো., য. বো. ২০১৭]*

২. ইসরাইল শব্দের অর্থ কী? *[রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. ২০১৮]*

৩. وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ (ওয়া আকিমুস্‌সলাতা) শব্দের অর্থ কী?

৪. আল্লাহ তাআলা কীভাবে সাহায্য প্রার্থনা করতে বলেছেন?

৫. আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাইলকে কী স্মরণ করতে বলেছেন?

৬. বনি ইসরাইলরা কী সম্পর্কে অবহিত ছিল?

উত্তরের জন্য দেখো ১১১ পৃষ্ঠা।

খ. একক কাজ

শিক্ষার্থীরা বনি ইসরাইল জাতির প্রতি মহান আল্লাহর অনুগ্রহ সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৩৪, ৩৫ ও ৩৬

সূরা আল-বাকারার ৬ষ্ঠ রুকু : অনুবাদ ও ব্যাখ্যা
The 6th Ruku of Sura Al-Baqara: Translation and Explanation

[বনি ইসরাইলদের প্রতি মহান আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তাদের অবাধ্যতা সম্পর্কে]

অনুবাদ	আরবি
৪৭. হে ইসরাইল জাতি! তোমরা আমার সে অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো, যা আমি তোমাদের দান করেছি। আর নিশ্চয়ই আমি বিশ্ববাসীর ওপর তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।	٤٧. يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ـ
৪৮. আর তোমরা সে দিনকে ভয় করো, যেদিন কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তির বিন্দুমাত্র উপকারে আসবে না, তার পক্ষে কোনো সুপারিশ গৃহীত হবে না, তার পক্ষ থেকে কোনো বিনিময় গ্রহণ করা হবে না এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না।	٤٨. وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ـ
৪৯. আর যখন আমি তোমাদেরকে ফিরাউনের লোকদের কবল থেকে মুক্ত করেছি, যারা তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি দিত, তারা তোমাদের পুত্রদের জবেহ করত আর তোমাদের নারীদের জীবিত রাখত। আর এর মধ্যে তোমাদের জন্য তোমাদের রবের পক্ষ থেকে কঠিন পরীক্ষা ছিল।	٤٩. وَاِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ۗ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ـ
৫০. আর যখন আমি তোমাদের জন্য সমুদ্রকে বিভক্ত করেছিলাম, এরপর তোমাদের উদ্ধার করেছিলাম, আর ফিরাউনের বংশধরদের ডুবিয়ে দিয়েছিলাম এবং তোমরা তা প্রত্যক্ষ করছিলে।	٥٠. وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَاَنْجَيْنٰكُمْ وَاَغْرَقْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ـ
৫১. আর যখন আমি মুসাকে চল্লিশ রাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, এরপর থেকে তোমরা একটি বাছুরকে (উপাস্যরূপে) গ্রহণ করেছিলে। আর তোমরা ছিলে জালিম (সীমা লঙ্ঘনকারী)।	٥١. وَاِذْ وٰعَدْنَا مُوْسٰٓى اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ـ
৫২. এরপরেও আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো।	٥٢. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ـ
৫৩. আর (স্মরণ করো) যখন আমি মুসাকে আসমানি কিতাব ও ফুরকান তথা সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী দিয়েছি, যেন তোমরা হেদায়েত লাভ করতে পার।	٥٣. وَاِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ـ

অনুবাদ	আরবি
৫৪. আর যখন মুসা তাঁর জাতিকে বললেন, হে আমার জাতি! নিশ্চয়ই বাছুরকে (উপাস্যরূপে) গ্রহণ করে তোমরা নিজেদের ওপর জুলুম করেছ। কাজেই তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে তওবা করো এবং তোমরা নিজেদের হত্যা করো। তোমাদের প্রতিপালকের কাছে তোমাদের জন্য এটাই কল্যাণকর। তারপর তিনি তোমাদের তওবা কবুল করলেন। নিশ্চয়ই তিনি তওবা কবুলকারী এবং পরম দয়ালু।	٥٤. وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوْبُوْٓا اِلٰى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ ؕ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ؕ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۔
৫৫. আর যখন তোমরা বলেছিলে, হে মুসা! আমরা কখনোই তোমাকে বিশ্বাস করব না, যতক্ষণ না আমরা প্রকাশ্যে মহান আল্লাহকে দেখি। ফলে বজ্র তোমাদের আক্রমণ করল এবং তোমরা তা দেখেছিলে।	٥٥. وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ۔
৫৬. তারপর তোমাদের মৃত্যুর পরে আমি তোমাদের আবার জীবিত করলাম, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো।	٥٦. ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۔
৫৭. আর আমি তোমাদের ওপর মেঘের ছায়া দিলাম, আর তোমাদের ওপর অবতীর্ণ করলাম মান্না ও সালওয়া। তোমাদের আমি যে পবিত্র রিজিক দিয়েছি তা থেকে আহার করো। আর তারা আমার ওপর জুলুম করেনি বরং তারা তাদের নিজেদের ওপরেই জুলুম করেছিল।	٥٧. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ؕ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ؕ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۔
৫৮. আর যখন আমি বললাম, তোমরা এই জনপদে প্রবেশ করো। অতঃপর সেখান থেকে স্বাচ্ছন্দ্যে খাও এবং প্রবেশপথ দিয়ে মাথা নিচু করে প্রবেশ করো আর বলো— ক্ষমা। আমি তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করব এবং অচিরেই সৎকর্মপরায়ণদের প্রতিদান বা পুরস্কার বৃদ্ধি করে দেব।	٥٨. وَاِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُوْلُوْا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطٰيٰكُمْ ؕ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ۔
৫৯. তারপর জালিমরা পরিবর্তন করে ফেলল সে কথা যা তাদেরকে বলতে বলা হয়েছিল। ফলে আমি আকাশ থেকে তাদের জন্য শাস্তি অবতীর্ণ করলাম, কেননা তারা পাপাচারে লিপ্ত ছিল।	فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ۔

শব্দার্থ-৪৭: يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ – হে ইসরাইল জাতি, اذْكُرُوْا — তোমরা স্মরণ করো, نِعْمَتِيَ — আমার নিয়ামত/অনুগ্রহ, الَّتِيْٓ — যা, اَنْعَمْتُ — আমি নিয়ামত দিয়েছি, عَلَيْكُمْ — তোমাদের ওপর/তোমাদেরকে, وَاَنِّيْ — আর নিশ্চয়ই আমি, فَضَّلْتُكُمْ — তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি, عَلَى —ওপর, الْعٰلَمِيْنَ —বিশ্ববাসীর।

শব্দার্থ-৪৮: وَاتَّقُوْا – আর ভয় করো, يَوْمًا – দিনকে/সে দিনকে, لَّا تَجْزِيْ – উপকারে আসবে না, نَفْسٌ কোনো ব্যক্তি, عَنْ نَّفْسٍ কোনো ব্যক্তির অনুকূলে, شَيْـًٔا – কিছুমাত্র, وَّلَا يُقْبَلُ – আর গৃহীত হবে না, مِنْهَا – তার থেকে, شَفَاعَةٌ – সুপারিশ, وَّلَا يُؤْخَذُ – আর গ্রহণ করা হবে না, مِنْهَا – তার পক্ষ থেকে, عَدْلٌ – বিনিময়, وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ – আর তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।

শব্দার্থ-৪৯: وَاِذْ – আর যখন, نَجَّيْنٰكُمْ – আমি তোমাদের মুক্তি দিয়েছিলাম, مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ – ফিরাউনের লোকদের থেকে, يَسُوْمُوْنَكُمْ – তোমাদের শাস্তি দিত, سُوْٓءَ الْعَذَابِ – কঠিন শাস্তি, يُذَبِّحُوْنَ – তারা জবেহ করত, اَبْنَآءَكُمْ – তোমাদের পুত্রদের, وَيَسْتَحْيُوْنَ – আর তারা জীবিত রাখত, نِسَآءَكُمْ – তোমাদের কন্যাদের, وَفِيْ ذٰلِكُمْ – আর এর মধ্যে তোমাদের জন্য, بَلَآءٌ – পরীক্ষা, مِّنْ رَّبِّكُمْ – তোমাদের রবের পক্ষ থেকে, عَظِيْمٌ – কঠিন।

শব্দার্থ-৫০: وَاِذْ – আর যখন, فَرَقْنَا – আমি বিভক্ত করেছিলাম, بِكُمُ – তোমাদের জন্য, الْبَحْرَ – সমুদ্রকে, فَاَنْجَيْنٰكُمْ – তারপর আমি তোমাদের উদ্ধার করেছিলাম, وَاَغْرَقْنَآ – আর আমি ডুবিয়ে দিয়েছিলাম, اٰلَ فِرْعَوْنَ –ফিরাউনের লোকদের, وَاَنْتُمْ – আর তোমরা, تَنْظُرُوْنَ — দেখছিলে।

শব্দার্থ-৫১: وَاِذْ – আর যখন, وٰعَدْنَا — আমি ওয়াদা করেছিলাম, مُوْسٰٓى — মুসাকে, اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً — চল্লিশ রাতের, ثُمَّ — এরপরে, اتَّخَذْتُمُ —তোমরা গ্রহণ করলে, الْعِجْلَ — বাছুর বা গোবৎস, مِنْۢ بَعْدِهٖ —এরপর থেকে, وَاَنْتُمْ — আর তোমরা ছিলে, ظٰلِمُوْنَ — জালিম/সীমা লঙ্ঘনকারী।

শব্দার্থ-৫২: ثُمَّ — এরপরে, عَفَوْنَا — আমি ক্ষমা করে দিয়েছি, عَنْكُمْ — তোমাদের থেকে, مِّنْۢ بَعْدِ — পরে, ذٰلِكَ — ঐ/উহার, لَعَلَّكُمْ — যেন তোমরা, تَشْكُرُوْنَ — তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো।

শব্দার্থ-৫৩: وَاِذْ — আর যখন, اٰتَيْنَا — আমি দিয়েছি, مُوْسَى — মুসাকে, الْكِتٰبَ — কিতাব/ আসমানি গ্রন্থ, وَالْفُرْقَانَ — এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী, لَعَلَّكُمْ — যেন তোমরা, تَهْتَدُوْنَ — তোমরা হেদায়েত পাও/সুপথে চলতে পার।

শব্দার্থ-৫৪: وَإِذْ — আর যখন, قَالَ — সে বলল, مُوسٰى — মুসা, لِقَوْمِهٖ — তার জাতির জন্য, يٰقَوْمِ — হে আমার জাতি, إِنَّكُمْ — নিশ্চয়ই তোমরা, ظَلَمْتُمْ — জুলুম করেছ, أَنْفُسَكُمْ — তোমাদের নিজেদের ওপর, بِاتِّخَاذِكُمُ — তোমাদের গ্রহণ দ্বারা, الْعِجْلَ — বাছুর বা গোবৎস, فَتُوبُوٓا — কাজেই তোমরা তওবা করো, إِلٰى بَارِئِكُمْ — তোমাদের রবের দিকে, فَاقْتُلُوٓا — আর তোমরা হত্যা করো, أَنْفُسَكُمْ — তোমাদের নিজেদের, ذٰلِكُمْ — ইহাই তোমাদের, خَيْرٌ — কল্যাণ/মঙ্গল, لَّكُمْ — তোমাদের জন্য, عِنْدَ — নিকটে, بَارِئِكُمْ — তোমাদের রবের, فَتَابَ — এরপর তিনি ক্ষমা করলেন, عَلَيْكُمْ — তোমাদের ওপর, إِنَّهٗ — নিশ্চয়ই তিনি, هُوَ التَّوَّابُ — তওবা কবুলকারী, الرَّحِيمُ — পরম দয়ালু।

শব্দার্থ-৫৫: وَإِذْ — আর যখন, قُلْتُمْ — তোমরা বলেছিলে, يٰمُوسٰى — হে মুসা, لَنْ نُّؤْمِنَ — আমরা কখনোই বিশ্বাস করব না, لَكَ — তোমাকে, حَتّٰى — যতক্ষণ না, نَرَى — আমরা দেখব, اللّٰهَ — মহান আল্লাহকে, جَهْرَةً — প্রকাশ্যে, فَأَخَذَتْكُمُ — এরপর তোমাদেরকে ধরল, الصّٰعِقَةُ —বজ্র, وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ — আর তোমরা দেখেছিলে।

শব্দার্থ-৫৬: ثُمَّ — এরপর, بَعَثْنٰكُمْ — আমি তোমাদের পুনরুজ্জীবিত করলাম, مِّنْ بَعْدِ — পরে, مَوْتِكُمْ — তোমাদের মৃত্যুর, لَعَلَّكُمْ — যেন তোমরা, تَشْكُرُونَ — তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো।

শব্দার্থ-৫৭: وَظَلَّلْنَا — আর আমি ছায়াদান করলাম, عَلَيْكُمُ — তোমাদের ওপর, الْغَمَامَ — মেঘমালার, وَأَنْزَلْنَا — আর আমি নাজিল করলাম, عَلَيْكُمُ — তোমাদের ওপর, الْمَنَّ —মান্না, وَالسَّلْوٰى — এবং সালওয়া, كُلُوا — তোমরা খাও, مِنْ طَيِّبٰتِ — পবিত্র বস্তু থেকে, مَا رَزَقْنٰكُمْ — যা আমি তোমাদের রিজিক দিয়েছি, وَمَا ظَلَمُونَا — আর তারা আমার ওপর জুলুম করেনি, وَلٰكِنْ — বরং, كَانُوٓا — তারা ছিল, أَنْفُسَهُمْ — তাদের নিজেদের, يَظْلِمُونَ — তারা জুলুম করেছে।

শব্দার্থ-৫৮: وَإِذْ — আর যখন, قُلْنَا — আমি বললাম, ادْخُلُوا — তোমরা প্রবেশ করো, هٰذِهِ الْقَرْيَةَ — এই নগরীতে, فَكُلُوا — তারপর খাও, مِنْهَا — সেখান থেকে, حَيْثُ — যথা, شِئْتُمْ — তোমাদের ইচ্ছা, رَغَدًا — স্বাচ্ছন্দ্যে, وَّادْخُلُوا — আর প্রবেশ করো, الْبَابَ — প্রবেশপথে, سُجَّدًا — নতশিরে, وَّقُولُوا — আর বল, حِطَّةٌ — ক্ষমা, نَّغْفِرْ لَكُمْ — আমি তোমাদের ক্ষমা করে দেব, خَطٰيٰكُمْ — তোমাদের অপরাধসমূহ, وَسَنَزِيدُ — আর অচিরেই বৃদ্ধি করে দেব, الْمُحْسِنِينَ — সৎকর্মপরায়ণদের।

শব্দার্থ-৫৯: فَبَدَّلَ – এরপর পরিবর্তন করে ফেলল, الَّذِيْنَ – যারা, ظَلَمُوْا – তারা জুলুম করেছে, قَوْلًا – কথা, غَيْرَ ব্যতীত/অপর, الَّذِىْ – যা, قِيْلَ لَهُمْ – তাদের বলা হয়েছিল, فَاَنْزَلْنَا – এরপর আমি অবতীর্ণ করলাম, عَلَى – ওপরে, الَّذِيْنَ – যারা, ظَلَمُوْا – তারা জুলুম করেছে, رِجْزًا – শাস্তি, مِّنَ السَّمَآءِ – আকাশ থেকে, بِمَا – যেহেতু, كَانُوْا – তারা ছিল, يَفْسُقُوْنَ – তারা পাপাচার করে।

৪৭. يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّىْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ -

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইসরাইল জাতিকে তাদের ওপর নাজিল হওয়া অনুগ্রহের কথা স্মরণ করে তাঁর কাছে আনুগত্য প্রকাশের পরোক্ষ নির্দেশ দিয়েছেন।

হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর অপর নাম ইসরাইল। তাঁর বংশধররাই ইতিহাসে বনি ইসরাইল বা ইসরাইল জাতি হিসেবে পরিচিত। এ জাতিকে আল্লাহ তাআলা সাধারণ নিয়ামতের বাইরে আরো বিশেষ কিছু নিয়ামতে ভূষিত করেন। তাদের কাছে সর্বাধিক নবি-রাসুল পাঠানো হয়। তাওরাত ও ইঞ্জিলের মতো আসমানি কিতাব নিয়ে তাদের মধ্যে আবির্ভূত হন অন্যতম দুইজন রাসুল হযরত মুসা ও হযরত ঈসা (আ.)। এছাড়াও অসংখ্য নবি তাদের হেদায়েতের জন্য প্রেরিত হন। কিন্তু এ জাতি নবিদের অনুসরণ না করে বরং তাঁদের হত্যা করে ফেলে। তারা ফিরাউন ও কিবতিদের ভয়ঙ্কর নির্যাতনে নিষ্পেষিত হচ্ছিল। মহান আল্লাহ সেখান থেকে তাদের মুক্তি দেন। দান করেন মেঘমালার ছায়া, অলৌকিক পানীয় ও জান্নাতি খাবার মান্না-সালওয়া। প্রতিটি ক্ষেত্রে অবাধ্যতা প্রদর্শনের পরও তাদের বিশেষ ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়। নিয়ামতে, মর্যাদায় সমকালীন সব জাতির ওপর বনি ইসরাইলকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়। এত এত নিয়ামতের বিপরীতে স্বভাবতই যেখানে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন অনিবার্য সেখানে তারা দেখিয়েছে শুধুই অবাধ্যতা। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর আগমনের পরও তাদের এ চরিত্র বদল হয়নি। অথচ মহান আল্লাহর সীমাহীন অনুগ্রহের বিপরীতে বনি ইসরাইলের দায়িত্ব ছিল সবার আগে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি ইমান আনা।

শিক্ষা: এ আয়াতের শিক্ষাগুলো হলো—

১. ইসরাইল জাতি ছিল মহান আল্লাহর বিপুল অনুগ্রহধন্য একটি জাতি।
২. ইসরাইল জাতিকে আল্লাহ তাআলা তাদের সমকালীন বিশ্বের সব জাতির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলেন।
৩. বনি ইসরাইল ছিল অকৃতজ্ঞ ও অবাধ্য জাতি। তারা মহান আল্লাহর নিয়ামত ভোগ করত ঠিকই, কিন্তু তারা মহান আল্লাহর ইবাদত করার প্রয়োজনবোধ করত না।
৪. মহান আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ করলেই তাঁর শোকর করতে হয়।
৫. আল্লাহ তাআলা মানুষকে নিয়ামত ও শ্রেষ্ঠত্ব দেন। মানুষ তা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ইবাদত না করলে মহান আল্লাহ বিশেষ নিয়ামত প্রত্যাহার করে নেন। ইসরাইল জাতির ক্ষেত্রে তাই ঘটেছিল।

৪৮. وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ -

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা হাশরে প্রতিদান দিবসের অবস্থা ব্যাখ্যা করেছেন।

মানুষের পার্থিব জীবন ক্ষণস্থায়ী। একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তারা এখানে থাকবে। তারপর তাদের আখিরাতের অনন্ত জীবনে প্রবেশ করতে হবে। সে জীবনে মানুষ চিরস্থায়ী শান্তি অথবা শাস্তি পাবে। এটা নির্ভর করবে মানুষের পার্থিব

কার্যক্রমের ওপর। পৃথিবীতে সৎকাজ করলে এবং মহান আল্লাহর নির্দেশ মেনে চললে মানুষ পরকালে মুক্তি পাবে। পাপাচারে লিপ্ত থাকলে পাবে চিরস্থায়ী ধ্বংস। মানুষের এ অনন্ত ভাগ্য নির্ধারণের জন্য পৃথিবী ধ্বংসের পর সব মানুষকে এক জায়গায় সমবেত করা হবে। তারপর আল্লাহ পাক মানুষের পাপপুণ্যের হিসাব নেবেন। এ দিন অন্য যেকোনো দিন থেকে আলাদা। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা আসীন হবেন বিচারকের আসনে। ফেরেশতা ও নবি রাসুলগণ হবেন সাক্ষী। প্রয়োজনে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য নেওয়া হবে। এ দিন বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, শাসক-শাসিত বা নেতাকর্মী কেউ কারো উপকারে আসবে না। সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। আল্লাহ তাআলা এ দিন সাধারণভাবে কোনো সুপারিশ গ্রহণ করবেন না। কেউ অণু পরিমাণ পাপকাজ করলে তার যেমন শাস্তি দেবেন তেমনি কেউ অণু পরিমাণ পুণ্য করলে তাকেও বঞ্চিত করবেন না। কারো অপরাধের ক্ষমা বা আজাব থেকে মুক্তির জন্য এ দিন কারো পক্ষ থেকে কোনো বিনিময় গ্রহণ করা হবে না। সবচেয়ে বড় কথা হলো এ নাজুক পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এ সময় কারো পক্ষেই কোনো সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না।

শিক্ষা: এ আয়াতের শিক্ষাগুলো হলো—

১. পৃথিবীর জীবন চিরস্থায়ী নয়। এটা হলো একটা চিরস্থায়ী জীবনে প্রবেশের প্রথম স্তর।

২. পৃথিবীর কাজকর্ম ও আচরণের ওপর চিরস্থায়ী সে জীবনের সুখশান্তি বা আজাব নির্ভর করে।

৩. সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব মানুষকে চিরস্থায়ী জীবনে প্রবেশের পূর্বে একটা মহাসমাবেশে যোগ দিতে হবে। সেখানে পাপ-পুণ্যের বিচার হবে।

৪. সে বিচার হবে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, ইনসাফপূর্ণ ও বাহ্যিক প্রভাবমুক্ত। সেদিন কোনো সুপারিশ বা বিনিময় গৃহীত হবে না। কেউ কারো উপকারে আসবে না বা কেউ কোনো সাহায্যও পাবে না।

৫. মুমিন ব্যক্তির জন্য সে দিনটি হবে আনন্দের। কারণ, নিয়ামতের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সে ইবাদত সম্পাদন করেছে।

৪৯. وَإِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ؕ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ -

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়ের নিপীড়ন থেকে বনি ইসরাইলের মুক্তি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন।

ফিরাউন ও তার সম্প্রদায় সমকালীন মিসরে শাসকশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ছিল। বনি ইসরাইল জাতিকে তারা নিজেদের দাসত্ব মেনে নিতে বাধ্য করেছিল। তারা ইসরাইল জাতির স্বাধীনভাবে জীবনযাপনের পথ রুদ্ধ করে রেখেছিল। তাদের কোনো মর্যাদা ও অধিকার ছিল না। কারণে-অকারণে তাদের নির্যাতন করা ফিরাউন সম্প্রদায়ের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। বনি ইসরাইলের এ পরাধীন ও অসম্মানজনক জীবন অব্যাহত রাখার জন্য ফিরাউন এক অমানবিক পথ গ্রহণ করেছিল। সে তার লোকদের দ্বারা বনি ইসরাইল পুত্রসন্তানদের হত্যা করত, যেন স্বাধীন জাতি হিসেবে তাদের প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কোনো সুযোগ না থাকে। বনি ইসরাইল মেয়েদের তারা জীবিত রাখত। দাসী ও ভোগের সামগ্রী হিসেবে তাদের ব্যবহার করত। অথবা কোনো ব্যক্তি ফিরাউনের কাছে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে, ইসরাইল বংশে এমন এক ছেলের জন্ম হবে, যার হাতে তোমার রাজত্বের অবসান ঘটবে। এ জন্য ফিরাউন নবজাতক পুত্রসন্তানকে হত্যা করতে আরম্ভ করল। যেকোনো জাতির জন্যই এ অবস্থা অত্যন্ত অপমানজনক ও নাজুক। ইসরাইল জাতির জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে

এটা ছিল বড় রকমের পরীক্ষা। পরে তাদের পরীক্ষার সময় পেরিয়ে গেলে মহান আল্লাহ ত্রাণকর্তা পাঠান। ইসরাইল জাতির মধ্যেই জন্ম নেন তাদের উদ্ধারকর্তা হযরত মুসা (আ.)। তিনি নানা মুজিযা[8] ও অলৌকিক ঘটনার মাধ্যমে ইসরাইল জাতিকে ফিরাউন সম্প্রদায়ের দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হন। পাশাপাশি তাদের ধরতে গিয়ে উল্টো ফিরাউন ও তার দলবল সমূলে ধ্বংস হয়ে যায়।

শিক্ষা: এ আয়াতের শিক্ষাগুলো হলো—

১. কোনো খারাপ ও বিপজ্জনক অবস্থাই চিরস্থায়ী নয়। এক সময় অবশ্যই দুরবস্থার অবসান হয়।
২. মুমিন ও নেক বান্দাদের পরীক্ষার জন্য আল্লাহ তাআলা মাঝে মাঝে কঠিন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন। সে অবস্থায় ধৈর্য না হারালে তিনি পরবর্তীতে বহুগুণ পুরস্কার দান করেন।
৩. অত্যাচারী যত প্রবল ও ক্ষমতাশালীই হোক না কেন, মহান আল্লাহর ক্ষমতার কাছে তারা নিতান্তই দুর্বল।
৪. বিপদে পড়লে সবসময় ধৈর্যধারণ করতে হবে। তাহলে পৃথিবীতে এবং পরকালে মহাপুরস্কার পাওয়া যাবে।

৫০. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنٰكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ -

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইসরাইল জাতিকে দেওয়া তাঁর অসংখ্য নিয়ামতের মধ্যে একটি বিশেষ নিয়ামত সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।

ফিরাউন ও তার জাতির লোকেরা বনি ইসরাইলের ওপর সীমাহীন নিপীড়ন চালাত। হযরত মুসা (আ.)-কে আল্লাহ তাআলা তাদের ত্রাণকর্তা হিসেবে প্রেরণ করেন। বিশাল সাম্রাজ্যের অত্যাচারী শাসক ফিরাউন হযরত মুসা (আ.)-কে অস্বীকার করে। তাঁকে উপেক্ষা করে তাঁর জাতির ওপর জুলুম অব্যাহত রাখে। মহান আল্লাহর ইচ্ছায় হযরত মুসা (আ.) বিভিন্ন মুজিযা নিয়ে আসেন। সে মুজিযা ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়কে বারবার অন্তহীন যন্ত্রণায় নিপতিত করে। জালিম ফিরাউনদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়। হযরত মুসা (আ.)-এর মুজিযার সামনে তারা নিতান্তই অসহায় হয়ে পড়ে। নির্ধারিত সময়ে উদ্বাস্তু স্বজাতিকে নিয়ে হযরত মুসা (আ.) ফিলিস্তিন গমন করেন। তাঁর চলে যাওয়ার খবরে ফিরাউনের মনে প্রতিহিংসা জেগে ওঠে। সে তার সেনাবাহিনী নিয়ে হযরত মুসা (আ.) ও তাঁর সঙ্গীদের ধাওয়া করে। এর ফলে বনি ইসরাইল নিদারুণ বিপদের মুখোমুখি হয়। তাঁদের পেছনে অত্যাচারী ফিরাউনের নিষ্ঠুর সেনাদল আর সামনে উত্তাল লোহিত সাগর। এমন দুঃসময়ে তারা যখন সুনিশ্চিত ধ্বংস ও হত্যাকাণ্ডের মুখোমুখি, তখন তাঁদের প্রতি আল্লাহ তাআলা রহমত নাজিল করেন। মহান আল্লাহর নির্দেশে সাগর বিভক্ত হয়ে যায়। তার বুক চিরে প্রকাশ পায় পারাপারের প্রশস্ত সড়ক। হযরত মুসা (আ.) অলৌকিক এ সড়ক দিয়ে নিরাপদে সাগর পার হন। পেছনে পেছনে ছুটে আসে ফিরাউনের বাহিনী। পুরো সেনাদল যখন সাগরের মাঝে পৌঁছে মহান আল্লাহর নির্দেশে সড়ক অদৃশ্য হয়ে যায়। বনি ইসরাইলের চোখের সামনে লোহিত সাগরে ফিরাউন তার দলবলসহ করুণভাবে মৃত্যুবরণ করে।

শিক্ষা: এ আয়াতের শিক্ষাগুলো হলো–

১. কোনো নির্যাতনেই মজলুমদের ভেঙে পড়ার বা হতাশ হওয়ার কিছু নেই। কারণ, জুলুম-নির্যাতন মহান আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের জন্য বিশেষ পরীক্ষামাত্র।
২. জুলুম-নির্যাতনে ধৈর্যধারণ করলে আল্লাহ তাআলা মহাপুরস্কার দান করেন।
৩. মানুষের শক্তি ও বুদ্ধি যখন বিপদ মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়, তখনই নেক বান্দাদের জন্য মহান আল্লাহর সাহায্য নেমে আসে।
৪. আল্লাহদ্রোহীরা সবসময় ভয়াবহ পরিণতির শিকার হয়।

---

[8] মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নবি-রাসুলদের মাধ্যমে যে অলৌকিক কার্যাবলি প্রকাশ পায় তাকে মুজিযা বলে।

৫১. وَإِذْ وٰعَدْنَا مُوْسٰى أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهٖ وَأَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ۔

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা হযরত মুসা (আ.)-কে তাওরাত কিতাব দানের পরিপ্রেক্ষিত এবং বনি ইসরাইলদের গো-বৎস পূজা প্রসঙ্গে আলোচনা পেশ করেন।

বনি ইসরাইল জাতি ফিরাউনের নির্যাতন থেকে মুক্ত হওয়ার পর নিজেদের পরিচালনার জন্য একটি শরিয়ত প্রার্থনা করে। তাদের আন্তরিক কামনা পূরণের জন্য হযরত মুসা (আ.)-কে তুর পাহাড়ে যেতে বলা হয়। মহান আল্লাহ তাঁর কাছে ত্রিশ রাতের প্রতিশ্রুতি নেন। তাদের বলা হয়, যদি মুসা (আ.) এক মাস তুর পাহাড়ে ইবাদতে লিপ্ত থাকেন তাহলে তাঁর মাধ্যমে বনি ইসরাইলদেরকে একটি শরিয়ত দেওয়া হবে। প্রতিশ্রুতি মতো হযরত মুসা (আ.) তুর পাহাড়ে গমন করেন। কিন্তু ত্রিশ দিন পর ফিরে এলেন না। রোজা অবস্থায় মিসওয়াক করায় তাঁর অবস্থানের মেয়াদ দশ দিন বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এদিকে হযরত মুসা (আ.)-এর অনুপস্থিতির সুযোগে সামেরি নামের এক স্বর্ণকার সোনা দিয়ে একটি গরুমূর্তি নির্মাণ করে। তারপর মূর্তিটির মধ্যে হযরত জিবরাইল (আ.)-এর ঘোড়ার খুরের মাটি ঢুকিয়ে দেয়। ফলে মূর্তিটি জীবিত হয়ে ওঠে। পাপাচারী সামেরি বনি ইসরাইলদের কাছে ঘোষণা দেয়, 'এই গো-বৎসের মধ্যে ইসরাইলদের খোদা অবতীর্ণ হয়েছেন। সুতরাং তার পূজা শুরু করো।'
হযরত মুসা (আ.)-এর ভাই হযরত হারুন (আ.) বনি ইসরাইলকে এ কাজে বাধা দিলেন। তাদের প্রতি মহান আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। অত্যাচারী ও সীমালঙ্ঘনকারী ইসরাইল জাতি গো-মূর্তি পূজায় লিপ্ত হয়ে গেল। প্রকৃতই তারা ছিল চরম অকৃতজ্ঞ ও জালিম সম্প্রদায়।

শিক্ষা: এ আয়াতের শিক্ষাগুলো হলো–

১. মহান আল্লাহর প্রতিশ্রুতিতে আস্থা স্থাপন করতে হবে।
২. গো-বৎসের পূজা করে বনি ইসরাইল ভয়ঙ্কর জুলুম করেছিল। কারণ, ইবাদতের যোগ্য একমাত্র সত্তা হলেন মহান আল্লাহ। সুতরাং তিনি ছাড়া আর কারো উপাসনা করা হলে জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।
৩. কোনো ঘটনার কারণ অনুসন্ধান না করে তাড়াহুড়া করে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না।
৪. মুমিনরা সবসময় যেকোনো ধরনের শিরক থেকে নিজেদের দূরে রাখবে।

৫২. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ۔

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা গো-বৎস পূজার মতো জঘন্য পাপে লিপ্ত হওয়ার পরও বনি ইসরাইলদের প্রতি তাঁর ক্ষমা প্রদর্শনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন।

বনি ইসরাইল ছিল নিপীড়িত জাতি। ফিরাউন ও তার সম্প্রদায় তাদেরকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রেখেছিল। নিজেদের ক্ষমতায় স্বাধীন হওয়ার অবস্থা তাদের ছিল না। আল্লাহ তাআলা তাঁর অপার অনুগ্রহে বনি ইসরাইল জাতিকে মুক্তি দিয়েছিলেন। হযরত মুসা (আ.)-এর মাধ্যমে তারা শরিয়ত প্রার্থনা করেছিল। মহান আল্লাহ তাওবা কবুল করেছিলেন কিন্তু হযরত মুসা (আ.) শরিয়ত নিয়ে ফিরে আসার আগেই তারা মহান আল্লাহর এত শত নিয়ামত ভুলে গিয়েছিল। মহান আল্লাহর পরিবর্তে তারা একটি গো-মূর্তির পূজা শুরু করে দিয়েছিল। তাদের এ অপরাধ ছিল চরম পর্যায়ের। এর মাধ্যমে তারা ভয়ঙ্কর অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিল। কিন্তু তাদের অপরাধের চেয়ে মহান আল্লাহর উদারতা অনেক বেশি। তিনি ক্ষমার সুমহান গুণের উৎস। সেজন্য এত বড় খোদাদ্রোহী কাজ করার পরও আল্লাহ তাআলা তাদের ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, যেন তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয়। মহান আল্লাহর ইবাদতের মাধ্যমে তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে।

শিক্ষা: এ আয়াতের শিক্ষাগুলো হলো—

১. আল্লাহ তাআলা ক্ষমাশীল। মানুষের অতি বড় অপরাধও তিনি ক্ষমা করেন; যদি মানুষ আন্তরিকভাবে ক্ষমা চায়।

২. অপরাধ করলেই মানুষকে সাথে সাথে শাস্তি দেওয়া মহান আল্লাহর নীতি নয়। তিনি মানুষকে অবকাশ দেন এবং সংশোধনের সুযোগ দেন।

৩. মহান আল্লাহর ক্ষমা প্রদর্শনের উদ্দেশ্য হলো– মানুষ যেন তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়। কেননা মানুষকে তিনি অত্যন্ত ভালোবাসেন। তিনি চান বান্দা যেন তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে।

৫৩ - وَاِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ -

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা হযরত মুসা (আ.)-কে কিতাব ও ফুরকান প্রদান এবং তা প্রদানের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছেন।

ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়ের নির্যাতন ও দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার পর বনি ইসরাইল একটা শরিয়ত দাবি করে। হযরত মুসা (আ.) তাই মহান আল্লাহর কাছে একটা শরিয়তের জন্য বিনীত প্রার্থনা করেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রার্থনা কবুল করেন। মহান আল্লাহর নির্দেশে হযরত মুসা (আ.) তুর পর্বতে গমন করেন। সেখানে তিনি নিষ্ঠার সাথে ইবাদত সম্পাদন করতে থাকেন। এভাবে চল্লিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর মহান আল্লাহ তাঁকে কিতাব ও ফুরকান দান করেন। মুসা (আ.)-কে যে কিতাব দেওয়া হয় তার নাম 'তাওরাত'। এ কিতাব লিখিতভাবে গ্রন্থাকারে একত্রে নাজিল হয়। বনি ইসরাইলদের যাবতীয় রীতিনীতি এতে উল্লেখ ছিল। এছাড়া মুসা (আ.)-কে ফুরকান বা সত্যমিথ্যার পার্থক্যকারী বিষয় দেওয়া হয়। তাফসিরকারগণ বলেছেন, মুসা (আ.)-কে যে 'ফুরকান' দেওয়া হয়েছিল তা হলো তাঁর মুজিযা। তাঁকে কিতাব ও ফুরকান দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল– যেন বনি ইসরাইল কিতাবের বিধান অনুসরণ করে সুপথে জীবনযাপন করতে সক্ষম হয়, পৃথিবীতে শান্তিতে থাকে এবং পরকালে মুক্তি পায়।

শিক্ষা: এ আয়াতের শিক্ষাগুলো হলো—

১. আল্লাহ তাআলা মুসা (আ.)-কে কিতাব ও ফুরকান দিয়েছেন। নবুয়তের দায়িত্ব পালনের জন্য মহান আল্লাহ এভাবেই নবি রাসুলদের কিতাব বা ফুরকান দিয়ে থাকেন।

২. আল্লাহ তাআলা কিতাব ও ফুরকান দিয়ে নবির সম্মান ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করেন। তবে তাঁর কিতাব প্রদানের একমাত্র লক্ষ্য এটা নয়। তিনি কিতাব দান করেন হেদায়েত দেওয়ার জন্য। যেন সমকালীন মানুষ কিতাবের অনুসরণ করে নিজেদের জীবন সঠিক পথে পরিচালনা করে।

৩. বনি ইসরাইল তথা ইহুদিরা মহান আল্লাহকে স্বীকার করে, মহান আল্লাহর নবি ও কিতাবের দোহাই দেয়। কেবল রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি ইমান পোষণ করে না। সেজন্য তারা মুমিন নয়। তবে আহলে কিতাব হিসেবে মুমিনগণ তাদের সাথে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে।

৫৪. وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوْبُوْٓا اِلٰى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ط
ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ ط فَتَابَ عَلَيْكُمْ ط اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ -

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা গো-বৎস পূজার পর ইসরাইলি জাতির ক্ষমা প্রার্থনা পদ্ধতি ও তাদের প্রার্থনা কবুল হওয়া বিষয়ে আলোচনা পেশ করেছেন।

মুসা (আ.) স্বাধীন বনি ইসরাইল জাতির জন্য শরিয়ত বা জীবনব্যবস্থা আনার জন্য তুর পাহাড়ে গমনের পর ইসরাইল জাতি একটি ভয়াবহ পাপাচারে জড়িয়ে পড়ে। তারা নিজেদের তৈরি একটি গো-মূর্তির পূজা শুরু করে। এক্ষেত্রে তারা হযরত হারুন (আ.)-এর নিষেধাজ্ঞা পুরোপুরি উপেক্ষা করে। চল্লিশ দিন পর শরিয়ত নিয়ে ফিরে এসে জাতির এ অবস্থা দেখে মুসা (আ.) অত্যন্ত ব্যথিত হন। তিনি তাদের ওপর রাগান্বিত হয়ে ওঠেন। গো-মূর্তিটি জ্বালিয়ে নদীতে ভাসিয়ে দেন। সসম্প্রদায়ের সবাইকে ডেকে জানান, তারা গো-বৎসকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে অত্যন্ত জঘন্য একটি পাপ করেছে। এর মাধ্যমে তারা নিজেদের ওপর ভয়ঙ্কর জুলুম করেছে। সুতরাং তাদের উচিত তওবা করা। এর অর্ত হলো- কৃতকাজের জন্য আন্তরিক অনুশোচনা এবং ভবিষ্যতে আর তেমন কাজ না করার সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত নেওয়া। কিন্তু ইসরাইল জাতির অপরাধের প্রায়শ্চিত্য হিসেবে এতটুকু যথেষ্ট ছিল না। তাদের অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনার অংশ হিসেবে মুসা (আ.) একজন অন্যজনকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। দিনের আলোয় হত্যা সম্ভব হচ্ছিল না বলে আল্লাহ তাআলা দিনেই রাতের অন্ধকার দিয়েছিলেন। তার মধ্যে ইসরাইল জাতির ৭০ হাজার সদস্য একে অন্যকে হত্যা করে। ক্ষমা প্রার্থনার এ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার জন্য মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। কারণ, মুসা (আ.) এজন্য বিশেষ প্রার্থনা করেছিলেন। প্রকৃতই মহান আল্লাহর ক্ষমা ও দয়াশীলতার কোনো পরিমাপ নেই।

শিক্ষা: এ আয়াতের শিক্ষাগুলো হলো–

১. আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য যে কাউকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করা জঘন্যতম অপরাধ।

২. অপরাধ যে পর্যায়েরই হোক নিষ্ঠার সাথে মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলে তিনি ক্ষমা করে দেন।

৩. মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার মধ্যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

৪. মহান আল্লাহর ক্ষমা ও দয়ার কোনো পরিমাপ নেই। যথাযথভাবে তাঁর কাছে চাইতে হবে।

৫. সমাজ জীবনে মুমিনদের ক্ষমার আদর্শ বাস্তবায়ন করতে হবে। তারা একে অন্যের অপরাধ ক্ষমা করবেন এবং সংশোধন করে দেবেন। আল্লাহ তাআলার ক্ষমাশীলতার মধ্যে এ শিক্ষাই নিহিত রয়েছে।

৫৫. وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ـ

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাইল জাতির ধৃষ্টতা ও অবাধ্যতার একটি দিক তুলে ধরেছেন।

হযরত মুসা (আ.)-এর নেতৃত্বে বনি ইসরাইল জাতি ফেরাউনের কবল থেকে মুক্ত হওয়ার পর হযরত মুসা (আ.) তাদের জন্য শরিয়ত নিয়ে আসেন। মহান আল্লাহ তাঁর সীমাহীন অনুগ্রহের নিদর্শন হিসেবে তাঁকে আসমানি কিতাব 'তাওরাত' দান করেন। এই কিতাবে বনি ইসরাইলের জীবনবিধান পেশ করা হয়েছে। মহান আল্লাহর এ কিতাবের নির্দেশনা অনুযায়ী হযরত মুসা (আ.) তাঁর জাতিকে সর্বপ্রথম মহান আল্লাহর ওপর ইমান আনার আহ্বান জানান। আল্লাহ তাআলা অসীম ক্ষমতার মালিক। তাঁর আদি ও অন্ত নেই। তিনি সবকিছুর স্রষ্টা, প্রতিপালক ও বিধানদাতা। তিনি সর্বত্র বিরাজমান। কিন্তু তাঁর সত্তা দৃশ্যমান নয়। হযরত মুসা (আ.) বনি ইসরাইলকে প্রথমেই মহান আল্লাহর সত্তা ও ক্ষমতায় ইমান আনতে বলেন। কিন্তু পাপাচারী ইসরাইল জাতি এক্ষেত্রে চরম ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্য পেশ করে। তারা বলে, মহান আল্লাহকে সরাসরি না দেখা পর্যন্ত তারা তাঁর সত্তা ও ক্ষমতায় ইমান আনবে না। ইসরাইল জাতির প্রতি মহান আল্লাহর অগণিত নিয়ামতের বিপরীতে তাদের এ বক্তব্য মারাত্মক অকৃতজ্ঞতার পরিচয় বহন করে। অপরাধের ভয়াবহতার জন্য আল্লাহ তাআলা তাদের তাৎক্ষণিক শাস্তি প্রদান করেন। চোখের সামনেই বজ্রপাতে তাদের নির্মম মৃত্যু হয়। মহান আল্লাহর ইচ্ছায় এ নির্মমতা তারা নিজেরাই প্রত্যক্ষ করে।

শিক্ষা: এ আয়াতের শিক্ষাগুলা হলো–

১. ইসলামের সব শিক্ষা ও আদর্শের প্রথম কথা হলো মহান আল্লাহর প্রতি ইমান পোষণ করা।

২. আল্লাহ তাআলা দৃশ্যমান সত্তা নন। সে হিসেবেই তাঁর সত্তা ও ক্ষমতায় ইমান আনতে হবে।

৩. সবসময় মহান আল্লাহর সত্তা ও ক্ষমতায় পরিপূর্ণ ইমান পোষণ করতে হবে।

৪. মহান আল্লাহর ক্ষমতা ও সত্তার ব্যাপারে উপহাস ও বিদ্রূপ করলে আল্লাহ তাআলা শাস্তি দিবেন।

৫. কোনো মানুষের ক্ষমতা বা যোগ্যতা নিয়ে উপহাস-বিদ্রূপ করাও কোনো মুমিনের কাজ নয়।

৫৬. ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ۔

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাইলের পুনর্জীবন দান বিষয়ক নিয়ামতের উল্লেখ করেছেন।

তুর পাহাড় থেকে কিতাব নিয়ে ফিরে আসার পর হযরত মুসা (আ.) তাঁর জাতিকে মহান আল্লাহর ওপর ইমান আনার নির্দেশ দেন। কিন্তু অকৃতজ্ঞ ইসরাইল জাতি নবির এ নির্দেশ লঙ্ঘন করে। বরং তারা চরম ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে উল্টো আল্লাহ তাআলাকে দেখার ঔদ্ধত্যপূর্ণ দাবি করে। তারা বলে, "আমরা মহান আল্লাহকে প্রত্যক্ষভাবে না দেখা পর্যন্ত তোমাকে কখনো বিশ্বাস করব না।" তাদের এ অপরাধের জন্য তাৎক্ষণিক শাস্তি হিসেবে তারা বজ্রপাতে নিহত হয়। বজ্রপাতে নিহত ব্যক্তিরা ছিল বনি ইসরাইলের নেতৃস্থানীয় লোক। তাদের নিহত হওয়া হযরত মুসা (আ.)-এর প্রচারকাজে বিরূপ প্রভাব ফেলবে এ চিন্তায় তিনি তাদের পুনর্জীবন কামনা করেন। মহান আল্লাহ প্রিয়নবির প্রার্থনা কবুল করে নেন। তাদেরকে আবার জীবন দান করেন। এত শত নিয়ামত ও অনুগ্রহ দানের কারণ হলো, তারা যেন মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

শিক্ষা: এ আয়াতের শিক্ষাগুলো হলো–

১. আল্লাহ তাআলা অসীম ক্ষমতার অধিকারী। জীবন-মৃত্যুর মালিক তিনি। যখন খুশি, যাকে খুশি তিনি জীবন দিতে পারেন; যাকে যখন খুশি দিতে পারেন মৃত্যু।

২. বনি ইসরাইলের লোকদের পুনর্জীবন দান করার এ ঘটনা মহান আল্লাহর সীমাহীন ক্ষমতার একটি বলিষ্ঠ প্রমাণ।

৩. মহান আল্লাহর নিয়ামত ভোগ করার বিনিময়ে তাঁর শুকরিয়া আদায় করতে হবে।

৪. কেউ কারো উপকার করলে উপকৃত ব্যক্তির উচিত উপকারীর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা। এতে পারস্পরিক উপকারের ধারা বেগবান হবে। সমাজজীবনে নেমে আসবে স্বস্তি ও শান্তি।

৫৭. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ؕ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ؕ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ۔

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাইল জাতির ওপর নাজিল হওয়া নিয়ামতের কথা উল্লেখ করে তাদের অবাধ্যতার একটি দিক তুলে ধরেছেন।

বনি ইসরাইলকে আল্লাহ তাআলা একটি শরিয়ত দান করেন। কিন্তু তারা তা মেনে নিতে অস্বীকার করে। তাদেরকে ইমান আনার কথা বললে সরাসরি আল্লাহ তাআলাকে দেখার দাবি জানায়। এমনি আরো কিছু অবাধ্যতার জন্য তাদেরকে তিহ উপত্যকায় অবস্থানের নির্দেশ দেওয়া হয়। সেখানে তারা মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং ইবাদত করে দিন কাটাবে। এ সময়ে তারা তীব্র রোদের কারণে অস্থির হয়ে পড়ে এবং হযরত মুসা (আ.)-এর কাছে ছায়া দাবি করে। আল্লাহ তাআলা তাদের মেঘমালার ছায়া দান করেন। তাফসিরে এসেছে, একখণ্ড সাদা মেঘ সবসময় তাদেরকে রোদ থেকে রক্ষা করতে থাকে। এক সময়ে বনি ইসরাইল তীব্র খাদ্যাভাবের জন্য খাবার প্রার্থনা করে। আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য বেহেশতের মান্না ও সালওয়া নামক খাবার নাজিল করেন। তাদেরকে পবিত্র ও বরকতময় এ খাবার গ্রহণের

নির্দেশ দেওয়া হয়। পাশাপাশি এ খাদ্য সঞ্চয় করে রাখা নিষিদ্ধ করেন, কিন্তু নিজেদের অবাধ্য প্রকৃতির কারণে তারা মহান আল্লাহর নির্দেশ লঙ্ঘন করে। মান্না ও সালওয়া জমা করে নিজেদের ওপরই জুলুম করে। এরপর মান্না-সালওয়া নাজিল বন্ধ হয়ে যায়। মহান আল্লাহর নির্দেশ লঙ্ঘন করে তারা আবার তীব্র দুঃখকষ্টের সম্মুখীন হয়। এ অবস্থায় তারা মহান আল্লাহর কোনো অসুবিধা বা নাজুক অবস্থা সৃষ্টি করেনি বরং নিজেদের জন্যই তারা অকল্পনীয় জুলুম ও দুর্ভাগ্যের দ্বার খুলে দিয়েছিল।

শিক্ষা: এ আয়াতের শিক্ষাগুলো হলো–

১. আল্লাহ তাআলা মানুষের শেষ আশ্রয় এবং একমাত্র আহারদাতা।
২. মানুষের বিপদের সময় অভাব-অভিযোগ দূর করার একমাত্র ক্ষমতা মহান আল্লাহর।
৩. মানুষকে আল্লাহ তাআলা নিয়ামত দেন এবং নিয়ামত সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে ভোগের আদেশ দেন। এক্ষেত্রে কোনো ব্যতিক্রম হলে মহান আল্লাহ নিয়ামত তুলে নেন।
৪. মহান আল্লাহর নিয়ামতের জন্য প্রার্থনা করা, তার সদ্ব্যবহার করা ও ক্ষমা প্রার্থনা করাও মুমিনদের কর্তব্য।
৫. খারাপ ও অন্যায় কাজ দিয়ে মানুষ কেবল নিজের ক্ষতি করে। নিজেদের উপর জুলুম করে। মানুষের কোনো খারাপ কাজের অশুভ প্রভাব মহান আল্লাহর ওপর নিপতিত হয় না।

৫৮. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُوْلُوْا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطٰيٰكُمْ ۭ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ۔

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা তিহ উপত্যকা থেকে ইসরাইলি জাতির আদি বাসভূমি জেরুজালেমে প্রবেশের পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন।

বনি ইসরাইলের প্রতি মহান আল্লাহর অনুগ্রহের অন্ত ছিল না। তাদেরকে তিনি স্বাধীনতা দিয়েছেন, শরিয়ত দিয়েছেন, দিয়েছেন বিভিন্ন নিয়ামত ও ক্ষমা। তিহ প্রান্তরে ৪০ বছর অবস্থানের সময় তাদের জন্য অলৌকিক রিজিকের ব্যবস্থা করেছেন কিন্তু অবাধ্য ইসরাইলি জাতি চেয়েছে পৃথিবীর প্রচলিত জীবিকা শাক-সবজি, চাল, ডাল, গম প্রভৃতি। সেজন্য আল্লাহ তাআলা তাদের আদি জনপদে প্রবেশের নির্দেশ দেন। জেরুজালেম বনি ইসরাইলের আদি বাসভূমি। আমালিকারা[৫] এখান থেকে তাদের বহিষ্কার করেছিল। তিহ উপত্যকা ত্যাগ করতে চাইলে আল্লাহ তাআলা তাদের জেরুজালেম পুনরুদ্ধারের নির্দেশ দেন। বনি ইসরাইলকে অবনত মস্তকে 'ক্ষমা' (হিত্তাতুন) বলতে বলতে শহরে প্রবেশের পদ্ধতি শিখিয়ে দেওয়া হয়। তারপর শহর থেকে ইচ্ছেমতো খাদ্য গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়। তাদের এ বিশেষ পদ্ধতিতে প্রবেশের তাৎপর্য হলো– নতশিরে প্রবেশ করে তারা মহান আল্লাহর আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা ঘোষণা করবে। আর 'ক্ষমা চাই' বাক্যের মাধ্যমে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য বিনীত ক্ষমা প্রার্থনা করবে। শুধু মহান আল্লাহর নির্দেশের অনুবর্তী হয়ে বনি ইসরাইলগণ এ কাজটুকু করলে মহান আল্লাহ তাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করার ঘোষণা দিয়েছেন। পাশাপাশি প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন সহসাই নিয়ামত আরো বাড়িয়ে দেওয়ার। সেক্ষেত্রে অবশ্য সৎকর্মপরায়ণতার শর্তারোপ করেছেন।

শিক্ষা: এ আয়াতের শিক্ষাগুলো হলো–

১. মহান আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের জন্য নতশিরে এবং বিনীতভাবে প্রার্থনা করা জরুরি। তবেই তিনি নিয়ামত বৃদ্ধি করে দিবেন।
২. সবরকমের জ্ঞাত-অজ্ঞাত অপরাধের জন্য মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।
৩. বিনীতভাবে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাআলা অপরাধ ক্ষমা করে দেন।
৪. মহান আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও ক্ষমা প্রার্থনার সাথে সাথে সৎকর্ম সম্পাদনও অব্যাহত রাখতে হবে। তাহলেই লাভ করা যাবে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য।

---

[৫] প্রাচীনকালে মিশরের একটি বংশের নাম আমালিকা। এই বংশ থেকেই মিশরের ফিরাউন তথা রাজা নির্বাচিত হতো।

৫৯. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইসরাইল জাতির একটি বিশেষ অবাধ্যতা ও তার পরিণতি বর্ণনা করেছেন। ইসরাইল জাতির আদিভূমি জেরুজালেম। আমালিকারা সেখান থেকে তাদের বহিষ্কার করেছিল। তারা বাধ্য হয়েছিল ফিরাউনের দাসত্ব মেনে নিতে। মহান আল্লাহর অনুগ্রহে হযরত মুসা (আ.) তাদের স্বাধীনতা এনে দেন। তাদের প্রতি মহান আল্লাহর নিয়ামতের অজস্র ধারায় বর্ষিত হতে থাকে। ফিরাউনের কবল থেকে মুক্তির ৪০ বছর পর আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাইলকে জেরুজালেম দখলের নির্দেশ দেন। তাদেরকে নতশিরে 'হিত্তাতুন' বা ক্ষমা চাই বলতে বলতে শহরের মূল সড়ক দিয়ে প্রবেশের আদেশ দেন। অথচ হঠকারী বনি ইসরাইল মহান আল্লাহর এ নির্দেশ অমান্য করে এবং নিতান্তই উপহাস ও বিদ্রুপাত্মক রসিকতায় মহান আল্লাহর নির্দেশিত 'হিত্তাতুন' শব্দটি বদলে ফেলে। এর পরিবর্তে তারা 'হিনতাতুন' বা গম চাই বলতে বলতে শহরে প্রবেশ করে। তাদের এ ঔদ্ধত্যের জন্য আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর আসমানি গজব নাজিল করেন। তাউন বা প্লেগ রোগ মহামারী আকারে পুরো ইসরাইল সম্প্রদায়কে আক্রমণ করে। দ্বিপ্রহরের মধ্যে ৭০ হাজার ইসরাইলি মৃত্যুবরণ করে।

শিক্ষা: এ আয়াতের শিক্ষাগুলো হলো–

১. আল্লাহ তাআলা যে বিধান যেভাবে পালনের নির্দেশ দেন অবিকল সেভাবে পালন করাই মানুষের দায়িত্ব।
২. মহান আল্লাহর নির্দেশ ও বিধান পরিবর্তন বা বাতিল করার অধিকার কারো নেই।
৩. অবাধ্যতা ও হঠকারিতার পরিণাম সবসময়ই ভয়াবহ।
৪. অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করে আল্লাহ তাআলা মাঝেমধ্যে পৃথিবীতেও শাস্তি বা আজাব নাজিল করেন। বিশেষত তাঁর হুকুম বদলে ফেলার মতো ধৃষ্টতা দেখানো হলে তিনি আসমানি গজব নাজিল করেন।
৫. মহান আল্লাহর নির্দেশ মানার বিষয়ে মুমিনদের সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন জরুরি।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. اُذْكُرُوْا (উজকুরূ) শব্দের অর্থ কী?
২. اَلْفُرْقَانُ (আল-ফুরআন) শব্দের অর্থ কী?
৩. কে তওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু?
৪. আল্লাহ তাআলা কাদের 'মান্না' ও 'সালওয়া' রিজিক হিসেবে দান করেছিলেন?
৫. আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাইলকে কার লোকদের কবল থেকে মুক্ত করেছিলেন?
৬. মুসা (আ.)-এর অনুপস্থিতিতে বনি ইসরাইলরা কাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল?

উত্তরের জন্য দেখো ১১১ পৃষ্ঠা।

খ. একক কাজ

শিক্ষার্থীরা ইসরাইল জাতির একটি বিশেষ অবাধ্যতা ও তার পরিণতি লিখে শ্রেণিশিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৩৭ সূরা আল-বাকারার আলোকে মুত্তাকির পরিচয়
Identity of Muttaqi in the Light of Sura Baqara

মুত্তাকি (مُتَّقِىْ) এমন ব্যক্তি যার মধ্যে তাকওয়া রয়েছে। তাকওয়া একটি অসাধারণ নৈতিকগুণ। মহান আল্লাহর কাছে মর্যাদা প্রাপ্তির এক অনিবার্য উপায়। পরকালীন জীবনে ব্যক্তির ক্ষতির কারণ হতে পারে এমন কাজ ও বিষয় থেকে বিরত থাকাই তাকওয়া।

সূরা আল-বাকারায় আল্লাহ তাআলা মুত্তাকির কয়েকটি বিশেষ পরিচিতি তুলে ধরেছেন। এগুলো হলো—

ক. **গায়বে বিশ্বাসী:** মুত্তাকির প্রথম পরিচয় হলো তারা গায়ব বা অদৃশ্য বিষয়সমূহে ইমান পোষণ করে। আর গায়ব হলো এমন বিষয় যা ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করা যায় না। সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে বোঝা যায়।

খ. **সালাত কায়েমকারী:** মুত্তাকির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে মহান আল্লাহ বলেন— وَيُقِيمُونَ الصَّلٰوةَ **অর্থ:** আর তারা সালাত কায়েম করে (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৩)। মুত্তাকির সালাত কায়েম করার অর্থ হলো— সে নিজে সমস্ত নিয়ম মেনে বিনয়-নম্রতা ও নিষ্ঠার সাথে সালাত আদায় করে। যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে সালাতের ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত, নফল, হারাম, মাকরুহ প্রভৃতি বিধান পালনের মাধ্যমে সমাজে নামাজ প্রতিষ্ঠা করা।

গ. **ফি সাবিলিল্লাহ সম্পদ ব্যয়কারী:** মুত্তাকির তৃতীয় বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে মহান আল্লাহ বলেন- وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ **অর্থ:** আর তাদের যে জীবিকা দেওয়া হয়েছে, তারা সেখান থেকে ব্যয় করে (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৩)। মুত্তাকির ফি সাবিলিল্লাহ বা মহান আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করার অর্থ হলো তারা জাকাত-সাদাকাহ আদায় করে। মানুষের যেকোনো কল্যাণে নিজেদের সম্পদ ব্যয় অব্যাহত রাখে।

ঘ. **আসমানি কিতাবে বিশ্বাসী:** মুত্তাকি আসমানি কিতাবের সত্যতায় বিশ্বাস রাখে। আল্লাহ তাআলা বলেন- 'আর যারা আপনার প্রতি যা আমি নাজিল করেছি তার প্রতি ইমান রাখে। যা আপনার পূর্বে নাজিল করেছি তার প্রতিও বিশ্বাস পোষণ করে' (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৪)। এক্ষেত্রে অবশ্য বিশ্বাসের ধরনে পার্থক্য রয়েছে। মুত্তাকিরা রাসুলুল্লাহ (সা.) এর পূর্বে নাজিলকৃত আসমানি কিতাবগুলো যে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকেই নাজিল হয়েছে সে বিশ্বাস রাখে কিন্তু এগুলোর অনুসরণ ও অনুশীলন করে না।

ঙ. **পরকালে বিশ্বাসী:** মুত্তাকিরা পরকালে সুদৃঢ় প্রত্যয় পোষণ করে। আল্লাহ তাআলা বলেন- وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ **অর্থ:** আর তারাই পরকালে ইয়াকিন বা বিশ্বাস পোষণ করে (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৪)। ইয়াকিন হলো অত্যন্ত সুদৃঢ় বিশ্বাস। মুত্তাকিরা বিশ্বাস করে- পৃথিবী ক্ষণস্থায়ী। এখানে মানুষ মাত্র কিছুকাল অবস্থান করবে। পৃথিবীতে তারা মূলত প্রস্তুতি নেবে পরবর্তী জীবনের জন্য। আর সে জীবন অনন্তকালের।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. পরকালীন জীবনে ব্যক্তির ক্ষতির কারণ হতে পারে এমন কাজ ও বিষয় থেকে বিরত থাকাকে কী বলা হয়?
২. সূরা আল-বাকারায় আল্লাহ তাআলা মুত্তাকির কয়টি বিশেষ পরিচয় তুলে ধরেছেন?
৩. মুত্তাকির প্রথম পরিচয় কী?
৪. মুত্তাকিদের যে সম্পদ দেওয়া হয়েছে, তারা সেখান থেকে কী করে?
৫. মুত্তাকিগণ আসমানি কিতাবের ব্যাপারে কী পোষণ করে?
৬. পরকালে কারা দৃঢ় প্রত্যয় পোষণ করে?

উত্তরের জন্য দেখো ১১১ পৃষ্ঠা।

খ. একক কাজ

শিক্ষার্থীরা মুত্তাকিদের পরিচয় সম্পর্কে ১০ বাক্যের একটি অনুচ্ছেদ লিখে তা শিক্ষকের কাছে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ৩৮

সূরা আল-বাকারার আলোকে কাফিরের পরিচয়
Indentity of Disbeliever in the Light of Sura Baqara

সূরা আল-বাকারায় প্রথমে মুমিন-মুত্তাকিদের বিশ্বাস, জীবনাচার ও জীবনবোধ সম্পর্কে একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। তারপর তুলে ধরা হয়েছে কাফিরদের প্রতিচ্ছবি। মুমিন-মুত্তাকি ও কাফিরদের ছবি সম্পূর্ণ বিপরীত।

কাফির শব্দটি আরবি কুফর (كُفْرٌ) শব্দ থেকে এসেছে। কুফর অর্থ অস্বীকার করা, গোপন করা, ঢেকে দেয়া, আচ্ছাদন করা, প্রত্যাখ্যান করা। এর মর্মার্থ হলো, অবিশ্বাস বা অস্বীকার করা। রাত যেমন পৃথিবীকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে বলে রাতকে 'কাফির' বলা হয়। ঠিক তেমনি অধর্ম-ধর্মকে, অসত্য সত্যকে, অনাচার সদাচারকে, অকৃতজ্ঞতা কৃতজ্ঞতাকে আচ্ছাদিত করে বলে একেও 'কুফর' বলা হয়। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায়– যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা, রাসুল, আসমানি কিতাব, আখিরাত, বেহেশত-দোযখ, ফেরেশতা ইত্যাদি ইসলামের মহাসত্যকে অস্বীকার করে, গোপন করে বা প্রত্যাখ্যান করে তাকেই কাফির বা অবিশ্বাসী বলা হয়।

ইসলামের পরিভাষায় কুফর ইমানের বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয়।

মহানবি (সা.) বলেন— 'মুসলিমকে হত্যা করা কুফর, তাকে গালি দেওয়া কুফর এবং যে তার পিতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল সে তো কুফরি করল' (বুখারি ও মুসলিম)। এখানে 'কুফরি' শব্দ দিয়ে অকৃতজ্ঞতা বোঝানো হয়েছে।

সূরা আল-বাকারার এখানে কাফিরদের চিরন্তন স্বরূপ উদঘাটন করে বলা হয়–

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ -

خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ ط وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ -

অর্থ: নিশ্চয়ই যারা কুফরি (অবিশ্বাস) করেছে, তাদেরকে তুমি সতর্ক করো অথবা সতর্ক না করো তাদের জন্য উভয়ই সমান। তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। মহান আল্লাহ তাদের অন্তরসমূহ ও শ্রবণশক্তির ওপর মোহর মেরে দিয়েছেন, তাদের দৃষ্টিশক্তির ওপর টেনে দিয়েছেন পর্দা। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৬-৭)।

এ থেকে কাফিরদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। সেগুলো হলো:

১. সর্বকালের ও সব দেশের কাফিরদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে– এরা সব সময় বাঁকা পথে চলে। হেদায়েত গ্রহণ, ভীতি প্রদর্শন বা সত্য সুন্দরের আহ্বানে তারা কখনোই সাড়া দেয় না। এজন্যে এদেরকে বোঝানো বা ভীতি প্রদর্শন সবই নিষ্ফল ও বৃথা। কেননা মুত্তাকিদের মন-মগজের জানালাগুলো খোলা আর কাফিরদের রুদ্ধ।

২. কুফরি করতে করতে তাদের অন্তর কালি দিয়ে সম্পূর্ণ ঢেকে গেছে। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরে সিল মেরে দিয়েছেন। এজন্য তারা হৃদয় দিয়ে সত্য উপলব্ধি করতে পারে না। কোনটি সত্য ও কোনটি মিথ্যা, তাদের হৃদয়ে তা অনুধাবন করার শক্তি নাই। মিথ্যার মধ্যে ডুবে থাকায় তাদের অন্তরে সত্যের অনুভূতি জাগ্রত হয় না।

৩. কাফিরদের শ্রবণশক্তিতে সিল মেরে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ সিল মেরে বন্ধ করে দেওয়ার কারণে তাদের কানে হেদায়েতের কোনো ধ্বনি বা প্রতিধ্বনি প্রবেশ করে না।

৪. তাদের চোখের ওপর রয়েছে আচ্ছাদান। এ কারণে চোখে হেদায়েতের কোনো আলো প্রতিফলিত হয় না। আসলে হেদায়েতকে স্বেচ্ছায় অগ্রাহ্য ও উপেক্ষা করার শাস্তি হিসেবেই আল্লাহ তাআলা কাফির-নাস্তিকদের মনে ও কানে সিল মেরে দিয়েছেন, আর তাদের চোখের ওপর পর্দা ফেলে দিয়েছেন। এ কারণে তাদের কাছে সত্য-মিথ্যা উপলব্ধি করার শক্তি-সামর্থ্য লোপ পেয়েছে।

৫. কাফির নাস্তিকদের হৃদয় বা মনে এবং শ্রবণশক্তিতে সিল মেরে দেওয়া হয়। যখন চোখ দিয়ে সত্য ও হেদায়েতের আলো দেখার ক্ষমতা রহিত করা হয়, তখন তাদের আর হেদায়েতের কোনো পথ খোলা থাকে না। কুফরির অন্ধকারাচ্ছন্ন গহ্বর থেকে তাদের আর তুলে আনা যায় না। সত্য-সুন্দর ও হেদায়েতের আহ্বান এবং ভীতি প্রদর্শন করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়।

৬. কাফির-নাস্তিকরা কোনো যুক্তি মানতে চায় না। তারা তাদের একগুঁয়ে স্বভাবের কারণে সবসময় সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে থাকে। অন্যকে হেদায়েতের আলো থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। সমাজ-সভ্যতাকে সুন্দরের দিকে নিয়ে যেতে দেয় না। তাদের স্বার্থবাদী নীতি কায়েম রাখার জন্যে তারা খুবই তৎপর হয়।

৭. কাফির-নাস্তিকদের জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি অবধারিত। কারণ তারা শাস্তিই পাবার উপযুক্ত।

কুফরের কুফল

মানবজীবনে কুফরের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। কুফরের ফলে শুধু দুনিয়াতেই নয় বরং আখিরাতেও মানুষকে শোচনীয় পরিণতি বরণ করতে হবে। দুনিয়ার জীবনে কুফর মানুষের মধ্যে অবাধ্যতা ও অকৃতজ্ঞতার জন্ম দেয়। কাফির আল্লাহ তাআলা, পরকাল, হাশর, মিজান, পুলসিরাত, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি অবিশ্বাস করে এবং দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দেয়। সুতরাং সে দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও আরাম-আয়েশের লোভে পড়ে নানারকম অসৎকাজে জড়িয়ে পড়ে। সে আল্লাহ তাআলার বিধি-বিধান ও আদেশ-নিষেধের কোনো পরোয়া করে না। বরং মহান আল্লাহ, ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে বিরোধিতা করে। ফলে আল্লাহ তাআলা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন; তার ধ্বংস অনিবার্য।

পরকালে কাফিররা জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে। তারা জাহান্নামে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۔

অর্থ: আর যারা কুফরি করবে এবং আমার নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করবে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৩৯)।

কুফর একটি মারাত্মক পাপ। সুতরাং এ থেকে সকলেরই বেঁচে থাকা উচিত।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মুমিন-মুত্তাকি ও কাফিরদের বিশ্বাস, জীবনাচার ও জীবনবোধ পরস্পর কীরূপ?

২. كُفْرٌ (কুফর) শব্দের অর্থ কী?

৩. কাদের জন্য সতর্ক করা অথবা সতর্ক না করা উভয়ই সমান?

৪. আল্লাহ তাআলা কাদের দৃষ্টিশক্তির ওপর পর্দা টেনে দিয়েছেন?

৫. কাফির-নাস্তিকরা সবসময় সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে কেন?

৬. কাফির-নাস্তিকদের জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে কী অবধারিত?

উত্তরের জন্য দেখো ১১১ পৃষ্ঠা।

খ. একক কাজ

শিক্ষার্থীরা 'কাফিরদের বৈশিষ্ট্যের' ওপর ১০ বাক্যের একটি অনুচ্ছেদ লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৩৯ সূরা আল-বাকারার আলোকে মুনাফিকের পরিচয়
Identity of Munafiq in the Light of Sura Baqara

মুনাফিক এমন ব্যক্তি যার মধ্যে 'নিফাক' বিদ্যমান থাকে। নিফাক অর্থ: কপটতা, ভণ্ডামি, ধোঁকাবাজি ও দ্বিমুখীভাব পোষণ করা। অন্তরে শত্রুতা ও বিরোধিতা গোপন রেখে বাইরে আনুগত্য প্রদর্শন করা। পরিভাষায় অন্তরে কুফর, শিরক ও অবাধ্যতা গোপন রেখে মুখে মুমিনসুলভ বাক্য উচ্চারণ এবং লোক দেখানো ইবাদত সম্পন্ন করার নাম নিফাক। কাজেই যে ব্যক্তি এমন আচরণ করে সে মুনাফিক। মহান আল্লাহ বলেন– اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

অর্থ: নিশ্চয়ই মুনাফিকদের স্থান জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৪৫)।

সূরা আল-বাকারায় আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের কয়েকটি পরিচয় তুলে ধরেছেন। যেমন–

ক. মুনাফিকরা মুখে আল্লাহ তাআলা ও পরকালের প্রতি ইমান পোষণের দাবি করে। কিন্তু তাদের অন্তরে যেমন এ ব্যাপারে কোনো আস্থা নেই তেমনি তাদের কাজেও এ দাবির কোনো প্রতিফলন পাওয়া যায় না।

খ. মানুষকে প্রতারিত করার প্রবণতা তাদের প্রবল। এমনকি তারা মৌখিক দাবিতে ইমানের ঘোষণা দিয়ে এমন ধারণা পোষণ করে যে, তারা প্রতারণা করছে মহান আল্লাহর সাথে।

গ. তারা মনের ভেতর লালন করে শিরক, কুফরি ও প্রতারণার ব্যাধি।

ঘ. তারা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে থাকে। অব্যাহত মিথ্যা ও শিরক কুফর ও প্রতারণার অকল্পনীয় মূর্খতার জন্য তাদের ব্যাধি বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ঙ. মুনাফিকরা বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় সৃষ্টিতে মুখ্য ভূমিকা রাখে কিন্তু তারা তা স্বীকার করে না।

চ. নিষ্ঠার সাথে ইমান আনাকে তারা নির্বোধদের কাজ মনে করে।

ছ. তারা দ্বিমুখী নীতিকেই জীবনে সাফল্য লাভের মূলনীতি মনে করে।

জ. মুনাফিকদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো তারা মুমিনদের কাছে এলে মুমিনদের সঙ্গে থাকার কথা বলে, আবার কাফিরদের কাছে গেলে কাফিরদের পক্ষ নেয়।

ঝ. মুনাফিকরা মুখে ইসলামের দরদি সেজে গোপনে ইসলামের মারাত্মক ক্ষতি করতে চেষ্টারত থাকে।

ঞ. মুনাফিকরা হচ্ছে সর্বহারা দল। অবিশ্বাস ও সন্দেহের আবর্তে পড়ে কাফির বা মুসলিম কোনো এক দিকে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করতে পারে না।

ট. কাফিরদের চেয়েও মুনাফিকরা ইসলামের জন্য বেশি বিপজ্জনক।

হজরত হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা.) হতে বর্ণিত– তিনি বলেন– নিফাক বা মুনাফিক রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে ছিল, আজকের দিনেও আছে, আর সেটা হলো– ইমানের পরে কুফরি করা অর্থাৎ ইমান প্রকাশ করে মহান আল্লাহর দীনের বিরোধী কাজ করা (বুখারি)।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মুনাফিক কে? *[দি. বো., সি. বো., ব. বো. ২০২৫]*
২. 'নিফাক' অর্থ কী?
৩. মুনাফিকদের স্থান কোথায়?
৪. মুনাফিকরা মনের ভিতর কী ব্যাধি লালন করে?
৫. কারা বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় সৃষ্টিতে মুখ্য ভূমিকা রাখে?
৬. কারা কাফিরদের চেয়েও ইসলামের জন্য বেশি বিপজ্জনক?

উত্তরের জন্য দেখো ১১১ পৃষ্ঠা।

খ. একক কাজ

সংক্ষেপে মুনাফিকদের পরিচয় লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৪০ হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টি এবং পৃথিবীতে অবতরণের ইতিহাস
History of Creation and Arrival to the Earth of Hazrat Adam (A)

হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন- 'আমি ছিলাম গুপ্ত ও গোপন। আমার আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা হলো। অতঃপর আমি নিজেকে আত্মপ্রকাশ করলাম।' নিজের ক্ষমতা ও অতুলনীয় সত্তার পরিচয় প্রকাশ করতে মহান আল্লাহ সৃষ্টি করলেন বিশ্বজাহান। সৃষ্টি করলেন জান্নাত, জাহান্নাম, আকাশ, গ্রহ, নক্ষত্র ও ফেরেশতা। পৃথিবীকে বানালেন বংশ বিস্তার ও নির্ধারিত সময়ে জীবন নির্বাহের কেন্দ্র হিসেবে। প্রথমে এখানে বসবাসের জন্য সৃষ্টি করলেন জিন জাতি। কিন্তু খুব শীঘ্রই জিন জাতি লিপ্ত হয়ে পড়ল কুফরি ও নাফরমানিতে। মহান আল্লাহ জিনদের শায়েস্তা করতে পাঠালেন একদল ফেরেশতা। তারা বেশির ভাগ জিনকে হত্যা করল। কিছু জিন বসতি ছেড়ে নির্জন দ্বীপ ও গুহায় আশ্রয় নিল। এ পর্যায়ে আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টির নতুন পরিকল্পনা করলেন।

ক. **ফেরেশতাদের কাছে প্রস্তাব ও তাদের জিজ্ঞাসা:** আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পূর্বে ফেরেশতাদের কাছে বিষয়টি উত্থাপন করেন। তিনি বলেন— 'নিশ্চয়ই পৃথিবীতে আমি আমার খলিফা বানাতে চাই।' এর মাধ্যমে মহান আল্লাহ তাদের অনুমতি নেননি কিংবা তাদের সাথে পরামর্শও করেননি। বরং তাদেরকে অবহিত করেছেন মাত্র।

জিন জাতি সম্পর্কে ফেরেশতাদের অভিজ্ঞতা ছিল তিক্ত। তারা জিন জাতির কুফর ও নাফরমানি প্রত্যক্ষ করেছিলো। সেজন্য নতুন এ সৃষ্টির বিষয়টি তাদের মধ্যে এক বিনীত জিজ্ঞাসার জন্ম দিল। তারা বললেন— 'আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করতে চান— যারা সেখানে অশান্তি সৃষ্টি করবে ও রক্তপাত করবে? অথচ আমরাইতো আপনার প্রশংসা ও পবিত্রতা ঘোষণা করি।'

খ. **আদম (আ.)-এর অবয়ব তৈরি:** প্রথম মানব সৃষ্টির জন্য মহান আল্লাহর কোনো পূর্বনকশা বা এ জাতীয় কিছু ছিল না। নিতান্তই শূন্য অবস্থা থেকে তাঁকে সৃষ্টি করা হলো। এজন্য প্রথমে সংগ্রহ করা হলো মাটি। হযরত আজরাইল (আ.) পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকা থেকে মাটি সংগ্রহ করলেন। এর সাথে মিশানো হলো মদিনার সে অংশের মাটি যেখানে রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে দাফন করা হবে। সবশেষে আল্লাহ তাআলা এ মাটি দিয়ে নিজ প্রতিনিধিত্বের যোগ্য সুন্দরতম আকৃতিতে ষাটগজ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট হযরত আদম (আ.)-এর দেহ তৈরি করলেন।

গ. **জ্ঞানদান:** পৃথিবীতে মহান আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের জন্য সৃষ্টি হয়েছিল মানুষ। আল্লাহ তাআলা তাই আদম (আ.)কে প্রয়োজনীয় পার্থিব জ্ঞান দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। তাঁর নির্দেশে জিবরাইল (আ.) 'আল-হামদু' নামক পরিবহনে চড়িয়ে হযরত আদম (আ.)-কে বিশ্বজাহান পরিভ্রমণ করান। সব জাগতিক বস্তু ও বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করেন তিনি। আল্লাহ তাআলা বলেন— وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا

অর্থ: আর মহান আল্লাহ আদমকে সব জিনিসের নাম শিখিয়ে দিলেন (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৩১)।

ঘ. **শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ:** বস্তু ও বিষয়গত জ্ঞানলাভের পর আল্লাহ তাআলা আদম হযরত (আ.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের ব্যবস্থা নিলেন। তিনি বিশ্বজাহানের সব বস্তু ও বিষয় ফেরেশতাদের সামনে উপস্থিত করে তাদেরকে সেগুলোর নাম বলতে বললেন। ফেরেশতাদের পক্ষে এটা বলা সম্ভব ছিল না। কেননা তারা শুধু তা-ই জানে যা তাদের জানানো হয়। তা-ই শেখে, যা শেখানো হয়। সংগত কারণেই তারা অক্ষমতা প্রকাশ করলেন। আল্লাহ তাআলা হযরত আদম (আ.)-কে সমস্ত সৃষ্টির নাম বলার নির্দেশ দিলেন। তিনি সবকিছুর নাম বলতে পারলেন। আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত খুশি হলেন। উচ্ছ্বসিতভাবে তিনি বললেন—

আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আকাশ ও পৃথিবীর সব অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে আমি সম্যক অবহিত। আর আমি তাও জানি যা তোমরা প্রকাশ করো এবং যা গোপন রাখ (সুরা আল-বাকারা, আয়াত: ৩৩)।

ঙ. **সিজদার নির্দেশ ও ইবলিসের বিরোধিতা:** জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আল্লাহ তাআলা আদম (আ.)-এর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। তিনি সব ফেরেশতাকে নির্দেশ দিলেন হযরত আদম (আ.)-কে সিজদা করার জন্য। এ সিজদা ছিল সম্মানসূচক সিজদা এবং তাও সম্পন্ন হয়েছিল মহান আল্লাহর নির্দেশে। ফেরেশতাদের প্রত্যেকে মহান আল্লাহর নির্দেশ মেনে হযরত আদম (আ.)-কে সিজদা করল। তাদের মধ্যে একজন ছিল জিন। নিজের নিষ্ঠা ও ইবাদতে সে ফেরেশতাদের নেতায় পরিণত হয়েছিল। সে মহান আল্লাহর নির্দেশ পালন করল না। তার ভেতর অহংকার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। সে নিজেকে আগুনের তৈরি বিবেচনা করে মাটির আদমকে সিজদা করতে অস্বীকার করল। তার অবাধ্যতা ও অহংকার তাকে ধ্বংস করে দিল। মহান আল্লাহর নিষ্ঠাবান বান্দা থেকে সে পরিণত হলো অভিশপ্ত শয়তানে।

চ. **জান্নাতে বসবাস ও মহান আল্লাহর নির্দেশ:** পৃথিবীতে প্রেরণের পূর্বে আল্লাহ তাআলা হযরত আদম (আ.)-কে জান্নাতে বসবাসের নির্দেশ দিলেন। তাঁর শান্তি ও নিঃসঙ্গতা দূর করার জন্য সঙ্গী হিসেবে সৃষ্টি করলেন হযরত হাওয়া (আ.)-কে। তারপর নির্দেশ দিলেন– 'তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বাস করতে থাক। আর সেখানকার যা ইচ্ছে খাও, যেখানে খুশি যাও। কিন্তু এ গাছটির কাছেও যেও না। তাহলে তোমরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে' (সুরা আল-বাকারা, আয়াত: ৩৫)।

ছ. **ইবলিসের শত্রুতা:** জান্নাতে আদমদম্পতি মহান আল্লাহর নির্দেশ মেনে সুন্দর, সাবলীল ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনযাপন করতে থাকলেন। তাদের এ সুখ ইবলিসকে হিংসার আগুনে পোড়াতে লাগল। সে নিজের ক্ষতির একমাত্র কারণ হিসেবে আদমকে চিহ্নিত করল। মহান আল্লাহর প্রিয়পাত্র থেকে অভিশপ্ত শয়তানে পরিণত হওয়ার জন্য ইবলিস আদমকেই দায়ী করল। সে তাই যেকোনোভাবে হোক আদমদম্পতির সর্বনাশ করার চেষ্টা শুরু করল। এজন্য সে মহান আল্লাহর কাছে তিনটি বিষয় চেয়ে নিল। কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত আয়ু, যেকোনো আকৃতি ধারণের ক্ষমতা এবং মানুষের শিরা-উপশিরায় চলার সুযোগ। আল্লাহ তাআলা তার আবেদন মঞ্জুর করলেন। ইবলিস বিপুল ক্ষমতা নিয়ে আদমদম্পতির ক্ষতিসাধনে লিপ্ত হলো।

জ. **নিষিদ্ধ বৃক্ষের কাছে গমন:** আদমদম্পতির দৃঢ়তায় ইবলিস হতাশ হলো না। সে প্রতারণা ও প্রলোভনে তার অপচেষ্টা অব্যাহত রাখল। শেষ পর্যন্ত সে সফল হলো। প্রথমত বিবি হাওয়া নিষিদ্ধ বৃক্ষের কাছে গমন করে ফল আহরণ ও ভক্ষণ করেন। পরে আদম (আ.)ও মহান আল্লাহর নির্দেশ বিস্মৃত হয়ে ফল খেয়ে ফেলেন। এ ভুলের জন্য তাদের ওপর আল্লাহ তাআলা অসন্তুষ্ট হন। তাঁদের দুজনের দেহ থেকেই জান্নাতের পোশাক অপসারিত হয়। লজ্জা ও অনুশোচনায় বিষন্ন দম্পতি গাছের পাতায় নিজেদের লজ্জা নিবারণ করেন।

ঝ. **পৃথিবীতে অবতরণ:** আল্লাহ তাআলা আদম (আ.)-কে পৃথিবীতে প্রেরণের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। তাঁদের বেহেশতে বাস ছিল সাময়িক। কিন্তু এ ঘটনা তাদের পৃথিবীতে অবতরণ ত্বরান্বিত করল। মহান আল্লাহ আদম দম্পতিকে জান্নাত থেকে নেমে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন— 'একে অপরের শত্রু হিসেবে তোমরা এখান থেকে নেমে যাও এবং পৃথিবীতে তোমাদের কিছুকালের জন্য অবস্থান ও জীবিকার সংস্থান নির্দিষ্ট রয়েছে' (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৩৬)।

ঞ. **মহান আল্লাহর অঙ্গীকার এবং পৃথিবীতে আদমদম্পতি:** পৃথিবীর অপরিচিত ও অন্ধকার পরিবেশে আসতে আদম (আ.) শঙ্কায় শিহরিত হলেন। প্রিয়জন বিচ্ছেদে তাঁর অন্তর ব্যাকুলতায় কেঁদে উঠল। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আশ্বস্ত করলেন। সুপথের হেদায়েত প্রেরণের অঙ্গীকার করলেন। কুরআন মাজিদে আছে- তারপর আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে যদি হেদায়েত পৌঁছে, তখন যারা সে হেদায়েতের অনুসরণ করবে, তারা না কোনো ভয় পাবে আর না তারা চিন্তিত হবে। কিন্তু যারা কুফরি করবে এবং আমার আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী। তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৩৮-৩৯)। পৃথিবীতে আদম ও হাওয়া দম্পতি নিজেদের ভুলের জন্য লজ্জা ও অনুশোচনায় দগ্ধ হতে লাগলেন। পরিশেষে দয়াময় আল্লাহ তাদের ক্ষমা করলেন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. নিজের ক্ষমতা ও অতুলনীয় সত্তার পরিচয় প্রকাশ করতে আল্লাহ তাআলা কী সৃষ্টি করলেন?
২. জিন জাতি খুব শীঘ্রই কীসে লিপ্ত হয়ে পড়ে?
৩. আদম (আ.)-কে কোন অবস্থা থেকে সৃষ্টি করা হলো?
৪. আদম (আ.)-এর দৈর্ঘ্য কত ছিল?
৫. পৃথিবীতে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে কেন?
৬. ইবলিসকে কীসে ধ্বংস করেছিল?

উত্তরের জন্য দেখো ১১১ পৃষ্ঠা।

খ. একক কাজ

শিক্ষার্থীরা হযরত আদম (আ.) এর সৃষ্টি ও পৃথিবীতে অবতরণের ইতিহাস সম্পর্কে ১০টি বাক্য লিখে তা শ্রেণিশিক্ষকের কাছে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ৪১ ইবলিসের পরিচয়
Identity of Iblis

ইবলিসের নাম আযাযিল। আল্লামা যামাখশারি (রহ.)-এর মতে, সে ছিল 'জিন'। 'শয়তান' ও 'ইবলিস' হলো আযাযিলের অভিশপ্ত দুইটি উপাধি। শয়তান অর্থ হলো— বাতিল, বিভ্রান্ত বা দূরে সরে যাওয়া সত্তা। আযাযিল সীমাহীন অহঙ্কার ও ভয়ানক অবাধ্যতার জন্য মহান আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরে গিয়েছিল বলে তাকে শয়তান বলা হয়েছে।

আবার 'ইবলিস' (اِبْلِيْسٌ) অর্থ হলো নিরাশ ও বঞ্চিত হওয়া। ব্যুৎপত্তিগত বিবেচনায় এ শব্দটি গ্রিক শব্দের অপভ্রংশ। অবশ্য কুরআন মাজিদের পূর্বে পৃথিবীর কোনো ভাষা বা সাহিত্যে 'ইবলিস' শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায় না। আযাযিলকে ইবলিস বলা হয়েছে। কেননা সে মহান আল্লাহর রহমত থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত ও নিরাশ হয়েছে। এজন্য তাকে عَدُوُّ اللّٰهِ বা মহান আল্লাহর শত্রু বলা হয়। আল্লামা তাবারি ও মাসউদি বলেন— ইবলিস জিন জাতির সদস্য ছিল। আর জিনদের সৃষ্টি করা হয়েছে মানবজাতির পূর্বেই এক ধোঁয়াহীন আগুন হতে, আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَالْجَانَّ خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ۔

অর্থ: আর জিন! তাকে আমি আগেই আগুনের উত্তপ্ত শিখা থেকে সৃষ্টি করেছি (সূরা আল-হিজর, আয়াত: ২৭)।

তাই মানবজাতির পূর্বেই জিনের অস্তিত্ব ছিল এবং তাদের একমাত্র দায়িত্ব হলো মহান আল্লাহর দাসত্ব করা। মানুষের মতই জিনদের চিন্তা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা আছে এবং তাদেরকে কৃতকর্মের জন্য মহান আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। অথচ তারা মহান আল্লাহর নাফরমানি করে। পৃথিবীতে জিনদের নাফরমানির পর ফেরেশতারা যখন তাদের হত্যা ও বিতাড়িত করে, সে সময়ে ইবলিস ছিল ফুটফুটে ছোট্ট শিশু। তার বয়স ও সৌন্দর্য বিবেচনায় সে হত্যার হাত থেকে বেঁচে যায় এবং ফেরেশতাদের দলভুক্ত হয়। নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদতে আযাযিল মহান আল্লাহর প্রিয় বান্দায় পরিণত হয়। এর মধ্যে আল্লাহ তাআলা আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করেন। জ্ঞানগত দিক দিয়ে ফেরেশতাদের ওপর আদম (আ.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। মহান আল্লাহ ফেরেশতাদের আদেশ করেন সিজদার মাধ্যমে তাকে সম্মান জানাতে। সব ফেরেশতা মহান আল্লাহর নির্দেশ পালন করেন। কেবল অবাধ্যতা করে আযাযিল। সে পরিণত হয় অভিশপ্ত শয়তানে।

শয়তানের উদ্দেশ্য

শয়তান হলো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। আল্লাহ তাআলা বলেন— 'হে বনি আদম আমি কি তোমাদের বলে রাখিনি যে, শয়তানের ইবাদত কর না। সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু' (সূরা ইয়াসিন, আয়াত: ৬০)।

মহান আল্লাহর এটা অশেষ দয়া যে তিনি মানুষকে শয়তানের উদ্দেশ্য, কর্মপদ্ধতি ও এর থেকে পরিত্রাণের উপায় বলে দিয়েছেন। শয়তানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন—

اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا اِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهٗ لِيَكُوْنُوْا مِنْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ۔

অর্থ: শয়তান তোমাদের শত্রু। অতএব তাকে শত্রুরূপেই গ্রহণ করো। সে তার অনুসারীদের আহ্বান করে যেন তারা জাহান্নামী হয় (সূরা আল-ফাতির, আয়াত: ৬)। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলাকে অবিশ্বাস, শিরক ও বিভিন্ন পাপ কাজের মাধ্যমে শয়তান মানুষকে জাহান্নামের আগুনের দিকে ঠেলে দেয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ইবলিসের মূল নাম কী?
২. 'শয়তান' ও 'ইবলিস' কী?
৩. 'শয়তান' শব্দের অর্থ কী?

উত্তরের জন্য দেখো ১১১ পৃষ্ঠা।

পাঠ ৪২ ফিরাউনের পরিচয়
Identity of Feraun

প্রাচীনকালে আমালিকা বংশ থেকে যে ব্যক্তিই তাদের শাসক মনোনীত হতো তার রাষ্ট্রীয় উপাধি হতো 'ফিরাউন'। কাজেই ফিরাউন কোনো ব্যক্তিবিশেষের নাম ছিল না। বরং এটা ছিল রাজা-বাদশাহদের উপাধি। যেমন— রোমের শাসক 'কাইসার', পারস্যের শাসক 'কিসরা', ইয়েমেনের শাসক 'তুব্বা' এবং হাবশার বাদশাহ 'নাজ্জাসি' উপাধিতে বিভূষিত ছিলেন। এখন প্রশ্ন হলো, হযরত মুসা (আ.)-এর যুগে ফিরাউন কে ছিলো? সে কোন বংশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলো?

সাধারণ আরব ইতিহাসবেত্তাগণ এবং কুরআন মাজিদের মুফাস্সিরগণ এই ফিরাউনকেও আমালিক বংশোদ্ভূত বলে থাকেন। কেউ তার নাম ওলিদ বিন মুসআব বিন রাইয়ান বলেন আর কেউ বলেন মুসআব বিন রাইয়ান। তাদের মধ্যে তত্ত্বজ্ঞানীদের অভিমত এই যে, তার নাম ছিলো 'রাইয়ান' অথবা 'রাইয়ানে আব্বা'। ইবনে কাসির বলেন, তার উপনাম ছিলো 'আবু মুররাহ'।

প্রাচীনকালে ইতিহাসবেত্তাদের বিশ্লেষণমূলক বর্ণনার ওপর ভিত্তি করেই উপরিউক্ত উক্তিগুলো করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমান কালে নতুন মিসরীয় তত্ত্বানুসন্ধানে এবং প্রাপ্ত শিলালিপির ভাষ্যের আলোকে এ সম্পর্কে ভিন্ন ধরনের অভিমত সামনে এসেছে। তা এই যে, হযরত মুসা (আ.)-এর যুগে ফিরাউন (বাদশাহ) ছিলো দ্বিতীয় রিমসিসের পুত্র মিনফাতাহ। তার শাসনকাল খ্রিস্টপূর্ব ১২৯২ সাল থেকে শুরু করে খ্রিস্টপূর্ব ১২২৫ সালে শেষ হয়। এই গবেষণামূলক বর্ণনা সম্পর্কে আহমদ ইউসুফ একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখেছেন। তিনি মিসরের দারুল আসারের একজন চিত্রশিল্পী ছিলেন এবং প্রত্নতত্ত্ব ও শিলালিপির অনুসন্ধান ও গবেষণায় একজন বড় মাপের পণ্ডিত ছিলেন। তার ওই প্রবন্ধের সারমর্ম আবদুল ওয়াহ্হাব নাজ্জার মিসরি তার 'কাসাসুল আম্বিয়া' গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন।

ফিরাউনের কাছে মহান আল্লাহ মুসা (আ.)-কে প্রেরণ করেন। তিনি ফিরাউনকে সত্যের আহ্বান জানান। এর সপক্ষে বিপুল মুজিযা প্রদর্শন করেন কিন্তু সে তার ভ্রষ্টতায় দৃঢ় থাকে।

শেষে মুসা (আ.) বনি ইসরাইলের মুক্তি দাবি করেন। চূড়ান্ত মুহূর্তে ফিরাউন ইসরাইলিদের পশ্চাৎধাবনের সিদ্ধান্ত নেয়। সে বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে মুসা (আ.) ও তাঁর অনুসারীদের অনুগামী হয়। লোহিত সাগরতীরে এ বাহিনী বনি ইসরাইল জাতিকে ঘিরে ফেলে। পেছনে উন্মত্ত শত্রুসেনা, সামনে উত্তাল সাগর– মুসা (আ.) ও তাঁর জাতিকে নিদারুণ বিপদে ফেলে দিল। এমতাবস্থায় মহান আল্লাহ ওহি পাঠালেন, 'নিজ লাঠি সাগরে নিক্ষেপ করো।' মুসা (আ.) তা-ই করলেন। ফলে লোহিত সাগরের বুক চিরে বের হলো প্রশস্ততম সড়ক।

ব্যাপার দেখে ফিরাউন ও তার বাহিনী এ আলৌকিক সড়কে পা রাখল। তারা সবাই সড়কে ওঠে যাওয়ার পর মহান আল্লাহর নির্দেশে তা লোহিত সাগরের অথই জলরাশিতে মিশে গেল। নিজের সেনাবাহিনীসহ পাপী ফিরাউনের সলিলসমাধি ঘটল। বস্তুত পাপী ও অত্যাচারী যত প্রবল ও ক্ষমতাশালীই হোক — মহান আল্লাহর ক্ষমতার কাছে সে নিতান্তই অসহায়। ফিরাউনের কাহিনি এ বক্তব্যের একটি জীবন্ত দৃষ্টান্ত।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. প্রাচীনকালে আমালিকা বংশ থেকে মনোনীত শাসকদের উপাধি কী হতো?
২. মুসা (আ.)-এর সমসাময়িক ফিরাউনের আরবি নাম কী ছিল?
৩. আধুনিক ইতিহাসে মুসা (আ.)-এর সমসাময়িক ফিরাউনকে কী নামে অভিহিত করা হয়?
৪. ফিরাউনের কাছে দাওয়াত দিয়ে আল্লাহ তাআলা কাকে পাঠান?
৫. মুসা (আ.) সাগরে লাঠি নিক্ষেপ করলে কী ঘটে?
৬. ফিরাউনের কী পরিণতি ঘটে?

উত্তরের জন্য দেখো ১১১ পৃষ্ঠা।

পাঠ ৪৩ বনি ইসরাইল জাতি ও তাদের প্রতি মহান আল্লাহর অনুগ্রহ
The tribe Bani Israil (Children of Israil) and Favour of Allah to them

'বনি ইসরাইল' হলো ইসরাইলের সন্তান-সন্ততি বা বংশধর। ইসরাইল অর্থ: আব্দুল্লাহ বা মহান আল্লাহর বান্দা। এটি হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর উপাধি। ইয়াকুব (আ.) হলেন হযরত ইসহাক (আ.)-এর পুত্র এবং ইবরাহিম (আ.)-এর পৌত্র। আল্লাহ তাআলা তাঁকে এ উপাধি দিয়েছিলেন। তাঁর বংশধররা ইতিহাসে 'বনি ইসরাইল' হিসেবে পরিচিতি পায়। এদের আদিবাস ছিল ফিলিস্তিনে। সেখান থেকে তারা আমালিকাদের কাছে পরাজিত ও বিতাড়িত হয়। পরে তাদের বসতি গড়ে ওঠে মিসরে। এখানে কিবতিরা তাদেরকে দাসত্ব বরণে বাধ্য করে। তাদের সন্তানদের মধ্যে মেয়েদের জীবিত রেখে ছেলেদের হত্যা করে। হযরত মুসা (আ.) আবির্ভূত হন তাদের ত্রাণকর্তা হিসেবে এবং মহান আল্লাহর সাহায্যে তাদেরকে গ্লানিময় এ জীবন থেকে মুক্ত করেন। পরে বনি ইসরাইল জাতি স্বাধীন আবাসভূমি গড়ে তোলে। তারা ফিলিস্তিন পুনর্দখল করে। হযরত মুসা (আ.)-এর পরেও তাদের কাছে অসংখ্য নবি-রাসুল প্রেরিত হন।

বনি ইসরাইলের প্রতি মহান আল্লাহর অনুগ্রহ

বনি ইসরাইল জাতিকে আল্লাহ তাআলা বিপুল নিয়ামত দান করেন। এত প্রত্যক্ষভাবে আর কোনো জাতির প্রতি মহান আল্লাহর অনুগ্রহ দানের কথা জানা যায় না। এখানে তাদের প্রতি মহান আল্লাহর অনুগ্রহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো।

ক. **নির্যাতন ও দাসত্ব থেকে মুক্তি:** ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়ের লোকেরা বনি ইসরাইল জাতির ওপর অসহনীয় নির্যাতন চালাত। তারা তাদের কন্যাদের জীবিত রেখে পুরুষদের হত্যা করত। তাদের জন্য দাসত্ব ও নির্যাতন ভোগ বাধ্যতামূলক হয়ে পড়েছিল। মহান আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহের নিদর্শন হিসেবে মুসা (আ.) বনি ইসরাইলদের মধ্যে আবির্ভূত হন। মহান আল্লাহর নির্দেশনায় তিনি নিপীড়িত এ জাতিকে স্বাধীন ও নিপীড়নমুক্ত করেন।

খ. **শরিয়ত প্রদান:** ফিরাউন সম্প্রদায়ের দাসত্ব ও নির্যাতন থেকে মুক্তিলাভের পর বনি ইসরাইল হযরত মুসা (আ.)-এর কাছে জীবন পরিচালনার জন্য একটি শরিয়ত বা জীবনবিধানের দাবি জানান। মুসা (আ.) মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলে বনি ইসরাইল জাতিকে তিনি শরিয়ত প্রদান করেন।

গ. **গো-বৎস উপাসনার অপরাধ ক্ষমা:** মহান আল্লাহর নির্দেশে বনি ইসরাইলের জন্য শরিয়ত গ্রহণ করতে হযরত মুসা (আ.) সিনাই পর্বতমালায় গমন করেন। এদিকে সামেরি নামের জনৈক গো-পূজারী স্বর্ণকারের প্ররোচনায় বনি ইসরাইল গরু পূজায় লিপ্ত হয়। এটি ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ ও জঘন্যতম শিরক। আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাইলের এ অপরাধটিও ক্ষমা করেন।

ঘ. **মেঘমালার ছায়াদান:** নির্যাতন ও দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার পর মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের পরিবর্তে বনি ইসরাইল অবাধ্যতা ও পাপাচারের পথ বেছে নেয়। আল্লাহ তাআলা তাই তাদের প্রায়শ্চিত্তের জন্য 'তিহ' উপত্যকায় পাঠান। এখানে তারা রোদে কষ্ট পেয়ে ছায়ার জন্য প্রার্থনা করে। মহান আল্লাহ তাদেরকে হালকা সাদা মেঘের ছায়া দান করেন।

ঙ. **জান্নাতি খাদ্যদান:** তিহ উপত্যকায় অবস্থানকালে বনি ইসরাইল জাতি খাদ্য প্রার্থনা করে। আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য জান্নাতি খাবার মান্না ও সালওয়া নাজিল করেন। তারা মহানন্দে জান্নাতি খাবার গ্রহণ করতে থাকে।

চ. **পানি দান:** বনি ইসরাইল পিপাসায় পানি প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য পানির ব্যবস্থা করেন। তাঁর নির্দেশে মুসা (আ.) একটি বিশেষ পাথরে অলৌকিক লাঠি দিয়ে আঘাত করলেন। ফলে পাথর থেকে বেরিয়ে এলো বারোটি ঝর্ণাধারা। বনি ইসরাইলের বারোটি সম্প্রদায় একেকটি করে ঝর্ণার পানি পান করতে থাকল।

ছ. **শ্রেষ্ঠত্ব দান:** সমকালীন সব জাতির ওপর বনি ইসরাইলকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছিল। তারা প্রথমে আমালিকাদের দ্বারা বিতাড়িত হয়েছিল। পরে কিবতিদের গোলামি করেছিল। মহান আল্লাহর অনুগ্রহে গোটা ব্যবস্থাপনা বদলে গিয়েছিল।

জ. **নবি-রাসুলদের (আ.) আগমন:** বনি ইসরাইলের প্রতি মহান আল্লাহর অনুগ্রহের বিশেষ দিক হলো আল্লাহ তাআলা এ জাতির কাছে বিপুল সংখ্যক নবি-রাসুল পাঠান। হযরত মুসা (আ.) থেকে ঈসা (আ.)-এর মধ্যবর্তী সময়ে অসংখ্য নবি-রাসুল বনি ইসরাইল জাতির পথপ্রদর্শনের কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

ঝ. **ক্ষমালাভ:** বনি ইসরাইলের মুক্তি ও শান্তিলাভের পর তাদেরকে জিহাদের নির্দেশ দেওয়া হয়। আমালিকাদের কাছ থেকে ফিলিস্তিন পুনরুদ্ধারের আদেশ দেওয়া হয় তাদেরকে। কিন্তু তারা যেতে অস্বীকার করে। তা সত্ত্বেও মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করেন।

বনি ইসরাইলের গাভী জবেহের ঘটনা: মুসনাদ ইবনে আবি হাতিমে রয়েছে যে, বনি ইসরাইল গোত্রে নিঃসন্তান এক ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিল। তার ওয়ারিশ হিসেবে একমাত্র ভাতিজা ছাড়া আর কেউ ছিল না। সম্পদের লোভে পড়ে ভাতিজা তার চাচাকে হত্যা করে রাতের বেলায় তাদের এক প্রতিবেশীর ঘরের দরজার সামনে রেখে আসলো। সকাল বেলায় তাদের (প্রতিবেশী) বিরুদ্ধে চাচা হত্যার দাবী উত্থাপন করল। এমনকি তারা অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে পরস্পরের ওপর ধাবিত হলো।

অতঃপর তাদের মধ্য থেকে একজন বয়স্ক ব্যক্তি বললো— তোমাদের মাঝে একজন মহান আল্লাহর রাসুল মুসা (আ.) থাকার পরেও কেন তোমরা লড়াই করবে? একথা শুনে তারা সমস্যা সমাধানের জন্য মুসা (আ.) এর কাছে এসে পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করলো। তখন তিনি তা শুনে মহান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ওহি লাভ করে তাদেরকে একটি গাভী জবেহ করতে বললেন।

অতঃপর তারা মহান আল্লাহর নির্দেশ মতো গাভী জবেহ করল। তখন মুসা (আ.) গাভীর গোশত দিয়ে মৃত ব্যক্তিকে আঘাত করতে বললেন। আঘাত করার সাথে সাথে মৃত ব্যক্তিটি দাঁড়িয়ে গেল। তার হত্যাকারী সম্পর্কে জিজ্ঞাস করলে তার ভাতিজার প্রতি ইঙ্গিত করে আবার মৃত্যুবরণ করল। অতঃপর হত্যাকারী ভাতিজাকে ওয়ারিশের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হলো এবং হত্যার অপরাধে শাস্তি দেওয়া হলো।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. 'বনি ইসরাইল' শব্দের অর্থ কী?
২. 'ইসরাইল' কার উপাধি?
৩. ইয়াকুব (আ.)-কে ছিলেন?
৪. বনি ইসরাইলদের কারা দাসত্ববরণে বাধ্য করে?
৫. আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাইলদের কী দান করেন?
৬. বনি ইসরাইলের প্রতি মহান আল্লাহর অনুগ্রহের বিশেষ দিক কী?

উত্তরের জন্য দেখো ১১১ পৃষ্ঠা।

খ. একক কাজ

বনি ইসরাইলের প্রতি মহান আল্লাহর অনুগ্রহের একটি তালিকা তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ৪৪ বনি ইসরাইলের দুষ্কর্মের বিবরণ
Description of Misdeeds of Bani Israil

বনি ইসরাইল জাতিকে আল্লাহ তাআলা বিপুল নিয়ামত দিয়েছিলেন। কিন্তু বিনিময়ে তারা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেনি। বরং পাপাচারে নিজেদের কলঙ্কিত করে তুলেছিল। এখানে তাদের দুষ্কর্মের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলো।

ক. **গো-বৎস পূজা:** বনি ইসরাইল জাতি ছিল ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়ের দাসানুদাস। নিপীড়িত হওয়াই ছিল তাদের নিয়তি। আল্লাহ তাআলা হযরত মুসা (আ.)-এর মাধ্যমে তাদেরকে এ জীবন থেকে মুক্তি দেন। মুক্তি পাওয়ার পর মহান আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের পরিবর্তে তারা শিরকে লিপ্ত হয়। তাদের জন্য হযরত মুসা (আ.) 'শরিয়ত' আনতে 'তুর' পাহাড়ে গমন করলে বনি ইসরাইল ভয়ঙ্কর রকমের গরু উপাসনায় লিপ্ত হয়।

খ. **মহান আল্লাহকে দেখার শর্তারোপ:** হযরত মুসা (আ.) তুর পাহাড় থেকে 'তাওরাত' কিতাবসহ প্রত্যাবর্তনের পর বনি ইসরাইলকে মহান আল্লাহর প্রতি ইমান আনার আহ্বান জানান। কিন্তু অবাধ্য এ জাতি ঘোষণা করে আল্লাহ তাআলাকে প্রত্যক্ষভাবে না দেখে তারা ইমান আনবে না।

গ. **ক্ষমা প্রার্থনার শব্দ পরিবর্তন:** তিহ উপত্যকায় অবস্থানের শেষ দিকে বনি ইসরাইল জাতি চাল-ডাল-সবজিজাতীয় খাদ্য প্রার্থনা করে। ফলে তাদের জনপদে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। পাশাপাশি নির্দেশ দেওয়া হয়, জনপদে প্রবেশের সময় অবনত মস্তকে 'হিত্ত্বাতুন' বা ক্ষমা চাই শব্দটি উচ্চারণ করতে হবে। কিন্তু অবাধ্য এ জাতি প্রবেশকালীন শব্দটি বদলে ফেলে। তারা হিত্ত্বাতুনের পরিবর্তে বলতে থাকে 'হিন্তাতুন' বা গম চাই।

ঘ. **নবিদের হত্যা:** বনি ইসরাইল জাতির দুষ্কর্মের নিকৃষ্টতম উদাহরণ হলো তারা তাদের কাছে বিভিন্ন সময়ে প্রেরিত অধিকাংশ নবিদের হত্যা করে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন- وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ **অর্থ:** আর তারা নবিদের অন্যায়ভাবে হত্যা করত (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৬১)।

ঙ. **শনিবারের মর্যাদা লঙ্ঘন:** বনি ইসরাইল জাতির সাপ্তাহিক ইবাদতের দিন ছিল শনিবার। এ দিন তাদের জন্য সব কাজ নিষিদ্ধ ছিল। এমনকি তারা মাছ ধরতেও পারত না। কিন্তু বনি ইসরাইল প্রতারণা ও পরোক্ষ পদ্ধতিতে মাছ শিকার করে এ দিনের মর্যাদা লঙ্ঘন করে।

চ. **কিতাবে বিকৃতি সাধন:** তারা নিজেদের ইচ্ছেমতো মহান আল্লাহর কিতাবের বিধান বদলে ফেলে। নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য নির্দ্বিধায় মহান আল্লাহর হুকুম পরিবর্তনের ধৃষ্টতা দেখায় বনি ইসরাইল।

ছ. **শরিয়তের হুকুম পালনে টালবাহানা:** বনি ইসরাইল জাতির দুষ্কর্ম ও অপতৎপরতার কুৎসিততম দিক হলো– তাদেরকে যখনি যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে- তারা সে নির্দেশ লঙ্ঘন করেছে। শরিয়তের যে নতুন হুকুমই এসেছে তা পালনে অসংখ্য অজুহাত তৈরি করে নিয়েছে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আল্লাহ তাআলা কার মাধ্যমে বনি ইসরাইল জাতিকে দাসত্বের জীবন থেকে মুক্তি দেন?
২. মুক্তি পাওয়ার পর মহান আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের পরিবর্তে বনি ইসরাইল কী করে?
৩. বনি ইসরাইলের জন্য মুসা (আ.) তুর পাহাড়ে কী আনতে গিয়েছিলেন?
৪. কারা ইমান আনার জন্য আল্লাহ তাআলাকে প্রত্যক্ষভাবে দেখার শর্ত আরোপ করে?
৫. 'হিত্ত্বাতুন' শব্দের অর্থ কী?
৬. কারা নিজেদের ইচ্ছামতো মহান আল্লাহর কিতাবের বিধান বদলে ফেলে?

উত্তরের জন্য দেখো ১১১ পৃষ্ঠা।

পাঠ ৪৫ গো-বৎস পূজার ঘটনা
The Event of Worshipping Calf (by Bani Israil)

মহান আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহে বনি ইসরাইল জাতি ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়ের দাসত্ব এবং নিপীড়ন থেকে মুক্তি পায়। অত্যাচারী কিবতিরা ধ্বংস হয়ে যায়। এ সময়ে বনি ইসরাইল জাতি মুসা (আ.)-এর কাছে জীবনযাপনের জন্য একটি শরিয়ত প্রার্থনা করে। মুসা (আ.) তাদের পক্ষে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে তাদের জন্য শরিয়ত প্রদানের আবেদন জানান। আল্লাহ তাআলা তাঁর আবেদন মঞ্জুর করেন। তাকে তুর পাহাড়ে গিয়ে এক মাস ইবাদতে নিয়োজিত হওয়ার নির্দেশ দেন। মহান আল্লাহর নির্দেশে হযরত মুসা (আ.) তুর পাহাড়ে গমন করেন। এ সময়ে তিনি হযরত হারুন (আ.)-কে নিজের স্থলাভিষিক্ত করেন।

তুর পাহাড়ে হযরত মুসা (আ.) সালাত, সাওম ও ইতিকাফে আত্মনিয়োগ করেন। এ সময়ে ইতিকাফ অবস্থায় ভুলক্রমে মিসওয়াক করে ফেলেন। এজন্য তাঁকে এক মাসের স্থলে চল্লিশ দিন ইবাদতের নির্দেশ দেওয়া হয়। ফলে হযরত মুসা (আ.) এর পক্ষে ত্রিশ দিন পরে শরিয়তসহ প্রত্যাবর্তন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

ত্রিশ দিন পরে মুসা (আ.) ফিরে না আসায় বনি ইসরাইল জাতি বিচলিত হয়ে উঠল। ক্ষীণ বিশ্বাসীরা শরিয়ত পাওয়ার ব্যাপারে আস্থা হারিয়ে ফেলল। এ অবস্থার সুযোগ নিল সামেরি নামের জনৈক গো-পূজারী। সে মুখে মুসা (আ.)-এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলেও তার মনে ছিল গরুপূজার জীবন্ত বাসনা। সে ছিল নিপুণ স্বর্ণকার। নানা কৌশলে সামেরি লোকদের কাছ থেকে সোনা-রুপা সংগ্রহ করে। তারপর তা দিয়ে একটি নিখুঁত গো-বৎস তৈরি করে। আর তার মধ্যে জিবরাইল (আ.) এর ঘোড়ার খুরের মাটি ঢুকিয়ে দেয়। পূর্বেই সে এ মাটি সংগ্রহ করে রেখেছিল। মাটি ভেতরে রাখতেই মূর্তিটি জীবন্ত হয়ে উঠল। সামেরি ঘোষণা করল, এ মূর্তির মধ্যে বনি ইসরাইল জাতির 'খোদা' আবির্ভূত হয়েছেন। সে লোকদের এর পূজা করার আহ্বান জানাল।

সামেরির আহ্বানে কিছুসংখ্যক লোক গো-উপাসনায় লিপ্ত হলো। তারা অন্যদেরকেও এ ব্যাপারে উৎসাহ দিতে লাগল। তাদের সম্মিলিত উৎসাহে বনি ইসরাইল জাতির মধ্যে এ নিকৃষ্টতম শিরকটি মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ে। হযরত হারুন (আ.) প্রাণান্তকর প্রচেষ্টায়ও তাদেরকে এ পথ থেকে নিবৃত্ত করতে পারলেন না।

চল্লিশ দিন পর আসমানি কিতাব 'তাওরাত' নিয়ে হযরত মুসা (আ.) প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি ইসরাইলিদের গরুপূজা ও গান-বাজনায় মত্ত দেখে অত্যন্ত রাগান্বিত হন। গরুমূর্তিটি আগুনে জ্বালিয়ে তার ছাই নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। তার বক্তব্যে তাদের চেতনা ফিরে আসে। নিদারুণ অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে তারা মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ক্ষমা প্রদর্শনের জন্য একে অপরকে হত্যা করার নির্দেশ দেন।

প্রকাশ্য দিবালোকে আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিত লোকদের হত্যা করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। মুসা (আ.) মহান আল্লাহর কাছে এ অবস্থা নিরসনের প্রার্থনা জানালে দিনের বেলাতেই ঘনকালো অন্ধকার নেমে আসে। তার মধ্যে ইসরাইলিরা একে অপরকে হত্যা করতে থাকে। এভাবে ৭০ হাজার লোক নিহত হয়। হযরত মুসা ও হারুন (আ.) এবং অবশিষ্ট লোকেরা নিহতদের ক্ষমা ও জীবিতদের তওবা কবুলের জন্য করুণ কান্নায় বিগলিত হয়ে ওঠেন। আল্লাহ তাআলা তাদের তওবা কবুল করেন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মহান আল্লাহর নির্দেশে মুসা (আ.) কত দিনের জন্য তুর পাহাড়ে গমন করেন?
২. তুর পাহাড়ে গমনের সময় মুসা (আ.) কাকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন?
৩. মুসা (আ.)-কে তুর পাহাড়ে ত্রিশ দিনের স্থলে চল্লিশ দিন থাকতে হয় কেন?
৪. বনি ইসরাইলকে গো-বৎস পূজায় লিপ্ত করে কে?
৫. সোনা-রুপার তৈরী গো-বৎসের মূর্তিটি জীবন্ত হয়ে উঠল কীভাবে?
৬. মুসা (আ.) অত্যন্ত রাগান্বিত হন কেন?

উত্তরের জন্য দেখো ১১১ পৃষ্ঠা

খ. একক কাজ

বনি ইসরাইল জাতির গো-বৎস পূজার ঘটনা সংক্ষেপে লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ মূল্যায়নের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর

পাঠ-১: ১. সর্বশেষ আসমানি কিতাব; ২. স্বয়ং মহান আল্লাহ প্রদত্ত; ৩. পঠিত; ৪. ৬২৩৬টি মতান্তরে ৬৬৬৬টি; ৫. মক্কি সূরা ৮৬টি, মাদানি সূরা ২৮টি; ৬. হাদিসের আলোকে।

পাঠ-২: ১. স্বকীয় উপস্থাপনা ও বিষয় বৈচিত্র্যের কারণে; ২. মহান আল্লাহ; ৩. সংশয়, সন্দেহ ও ত্রুটিহীনতার ঘোষণা; ৪. হেদায়েত বা মুক্তিপথের দিশারী; ৫. আল-কুরআন; ৬. আল-কুরআনে।

পাঠ-৩: ১. আল-কুরআন; ২. আল-কুরআন; ৩. আল-কুরআন; ৪. ইমানি চেতনা; ৫. জাকাত; ৬. সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের।

পাঠ-৪: ১. ৫৫টি; ২. ৪টি; ৩. হক ও বাতিলের পার্থক্যকারী; ৪. স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থ; ৫. উপদেশ বা স্মারক; ৬. প্রজ্ঞাবান।

পাঠ-৫: ১. মানুষ; ২. মূলনীতি; ৩. ৫টি; ৪. ৬টি; ৫. মুকাদ্দামাতুত তাফসির; ৬. আল-কুরআনকে।

পাঠ-৬: ১. আবৃত্তি বা পাঠ করা, অনুধাবন ও অনুসরণ করা; ২. কুরআন তিলাওয়াত; ৩. অনেক গুরুত্ব ও ফজিলত; ৪. মানুষের কাছে কুরআন পৌঁছে দেওয়া; ৫. প্রশান্তি; ৬. কুরআন তিলাওয়াত।

পাঠ-৭: ১. লাওহে মাহফুজ বা সুরক্ষিত ফলকে; ২. সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত; ৩. ওহির বিরতিকাল; ৪. বায়তুল ইযযাহ; ৫. বায়তুল মামুর; ৬ হযরত দাহিয়া কালবী (রা.)।

পাঠ-৮: ১. আল-কুরআন; ২. আল-কুরআন; ৩. কুরআন; ৪. শিক্ষা দানকারী এবং শিক্ষা গ্রহণকারী; ৫. শূন্য গৃহের মতো; ৬. ফরজ।

পাঠ-৯: ১. দুই প্রকারের; ২. وَحْيٌ (ওহি); ৩. হযরত আদম (আ.)-এর; ৪. আল-কুরআনের সূরা বা আয়াত নাজিলের কারণ; ৫. সববে নজুল; ৬. শানে নুজুলের মাধ্যমে।

পাঠ-১০: ১. سُوْرَةٌ (সূরা); ২. سُوْرَةٌ (সূরা); ৩. ১১৪টি; ৪. মক্কি সূরা ও মাদানি সূরা; ৫. মক্কি সূরা; ৬. মাদানি সূরা।

পাঠ-১১: ১. আল-কুরআন; ২. কদরের রাতে; ৩. মহান আল্লাহ নিজেই; ৪. ৭০ জন; ৫. ৪২ জন; ৬. হযরত উমর (রা.)-এর।

পাঠ-১২: ১. নবি করিম (সা.); ২. ৭০ জন; ৩. হযরত যায়েদ বিন সাবিত (রা.)-এর; ৪. ৪টি; ৫. উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রা.)-এর কাছে; ৬. হযরত উসমান (রা.)-কে।

পাঠ-১৩, ১৪ ও ১৫: ১. আল-কুরআন; ২. সূরা বনি ইসরাইলে; ৩. আল-কুরআন; ৪. অনৈক্য, আস্থাহীনতা এবং জাতীয় দায়িত্ব পালনে অবহেলা; ৫. সূরা আল-আলাক-এর; ৬. নৈতিক অধঃপতন।

পাঠ-১৬: ১. সূরা আল-বাকারা; ২. সূরা আল-বাকারাকে; ৩. বস্তুর উৎকৃষ্টতম অংশ; ৪. ২৮৬; ৫. গাভী; ৬. ৫১-৫৪ ও ৬৭-৭১।

পাঠ-১৭: ১. সূরা আল-বাকারা; ২. ৬২২; ৩. ১০ম হিজরির ১০ যিলহজ; ৪. অবতরণের কারণ বা পরিপ্রেক্ষিত; ৫. মালেক ইবনে সাঈদ নামের এক ইহুদি; ৬. ইসমাইল (আ.)-এর বংশে শেষ নবি প্রেরণ করবেন।

পাঠ-১৮: ১. বিষয়বস্তু ও বিধান বর্ণনার দিক দিয়ে; ২. সূরা আল-বাকারায়; ৩. ১২ বছর; ৪. সূরা আল-বাকারা; ৫. কুরআন মাজিদের সংশয়হীনতা ও সত্যতার অকাট্য প্রমাণ; ৬. মানুষ সৃষ্টির নিগূঢ় তত্ত্ব, উদ্দেশ্য ও ইতিহাস।

পাঠ-১৯, ২০ ও ২১: ১. 'হুরুফে মুকাত্তায়াত' বা বিচ্ছিন্ন বর্ণ; ২. মুত্তাকি তথা পরহেজগারদের; ৩. কুরআন মুত্তাকিদের জন্য পথ প্রদর্শক; ৪. কুরআনকে; ৫. অদৃশ্য বিষয়; ৬. কাফির তথা অবিশ্বাসীদের।

পাঠ-২২, ২৩ ও ২৪: ১. মুনাফিকদের; ২. মুনাফিকদের; ৩. পথভ্রষ্টতা; ৪. মুনাফিকরা; ৫. বিশৃঙ্খলা; ৬. মুনাফিকরা।

পাঠ-২৫, ২৬ ও ২৭: ১. হে মানবসমাজ; ২. বিছানা; ৩. মানুষ ও পাথর; ৪. ঝর্ণাসমূহ; ৫. মশা কিংবা তার চেয়ে ক্ষুদ্র কোনো কিছুর; ৬. আল-কুরআন।

পাঠ-২৮, ২৯ ও ৩০: ১. প্রতিনিধি, স্থলাভিষিক্ত; ২. ফেরেশতা; ৩. সব বিষয়ের নাম; ৪. অহঙ্কারবশত; ৫. হযরত আদম (আ.)-কে; ৬. আল্লাহ তাআলা।

পাঠ-৩১, ৩২ ও ৩৩: ১. হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর বংশধরদের বনি-ইসরাইল বলা হয়; ২. আব্দুল্লাহ বা মহান আল্লাহর বান্দা; ৩. তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করো; ৪. ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে; ৫. সে নিয়ামতের কথা, যা তিনি তাদের দান করেছেন; ৬. সর্বশেষ আসমানি কিতাব ও রাসুল সম্পর্কে।

পাঠ-৩৪, ৩৫ ও ৩৬: ১. তোমরা স্মরণ করো; ২. সত্য-মিথ্যার প্রভেদকারী; ৩. আল্লাহ তাআলা; ৪. বনি ইসরাইলকে; ৫. ফিরাউনের; ৬. একটি বাছুরকে।

পাঠ-৩৭: ১. তাকওয়া; ২. ৫টি; ৩. তারা গায়ব বা অদৃশ্য বিষয়সমূহে ইমান পোষণ করে; ৪. মহান আল্লাহর নির্দেশিত পথে ব্যয় করে; ৫. সত্যতায় বিশ্বাস পোষণ করে; ৬. মুত্তাকিরা।

পাঠ-৩৮: ১. সম্পূর্ণ বিপরীত; ২. অস্বীকার করা, গোপন করা; ৩. কাফিরদের জন্য; ৪. কাফিরদের; ৫. তাদের একগুঁয়ে স্বভাবের কারণে; ৬. শাস্তি।

পাঠ-৩৯: ১. এমন ব্যক্তি যার মধ্যে 'নিফাক' বিদ্যমান থাকে; ২. কপটতা, দ্বিমুখীভাব পোষণ করা; ৩. জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে; ৪. শিরক, কুফরি ও প্রতারণার ব্যাধি; ৫. মুনাফিকরা; ৬. মুনাফিকরা।

পাঠ-৪০: ১. বিশ্বজাহান; ২. কুফরি ও নাফরমানিতে; ৩. নিতান্তই শূন্য অবস্থা থেকে; ৪. ষাট গজ; ৫. মহান আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের জন্য; ৬. তার অহংকার ও অবাধ্যতা।

পাঠ-৪১: ১. আযাযিল; ২. আযাযিলের দুটি অভিশপ্ত উপাধি; ৩. বাতিল, বিভ্রান্ত বা দূরে সরে যাওয়া সত্তা।

পাঠ-৪২: ১. ফিরাউন; ২. ওলিদ বিন মুসআব বিন রাইয়ান; ৩. দ্বিতীয় রামসিসের পুত্র মিনফাতাহ; ৪. হযরত মুসা (আ.)-কে; ৫. সাগরের বুক চিরে প্রশস্ততম সড়ক বের হয়; ৬. সাগরে সলিল সমাধি ঘটে।

পাঠ-৪৩: ১. ইসরাইলের সন্তান-সন্ততি বা বংশধর; ২. হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর; ৩. হযরত ইসহাক (আ.)-এর পুত্র এবং ইবরাহিম (আ.)-এর পৌত্র; ৪. মিসরের ফিরাউনের অনুসারী কিবতিরা; ৫. বিপুল নিয়ামত; ৬. আল্লাহ তাআলা এ জাতির কাছে বিপুল সংখ্যক নবি-রাসুল পাঠান।

পাঠ-৪৪: ১. হযরত মুসা (আ.); ২. শিরকে লিপ্ত হয়; ৩. শরিয়ত; ৪. বনি ইসরাইল; ৫. ক্ষমা চাই; ৬. বনি ইসরাইল।

পাঠ-৪৫: ১. ৩০ দিনের জন্য; ২. হযরত হারুন (আ.)-কে; ৩. ইতিকাফ অবস্থায় ভুলক্রমে মিসওয়াক করে ফেলায়; ৪. সামেরি নামের জনৈক গো-পূজারী; ৫. তার মধ্যে জিবরাইল (আ.)-এর ঘোড়ার খুরের মাটি ঢুকিয়ে দেয়ায়; ৬. বনি ইসরাইলকে গরুপূজা ও গান-বাজনায় মত্ত দেখে।

৫ এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

তিলাওয়াত	তিলাওয়াত শব্দের অর্থ পাঠ করা, আবৃত্তি করা, পড়া, অনুসরণ করা ইত্যাদি। আল-কুরআন পাঠ করাকে ইসলামি পরিভাষায় কুরআন তিলাওয়াত বলা হয়। কুরআন মাজিদ শিখতে হলে প্রথমে দেখে দেখে তা পাঠ করতে হয়। আর এই দেখে পাঠ করাকে নাজিরা তিলাওয়াত বলা হয়। হরফ, হরকত ইত্যাদি চিনে তাজবিদ সহকারে কুরআন তিলাওয়াত করতে হয়।
ওহি	ওহি শব্দের অর্থ ইঙ্গিত করা, সংবাদ দেওয়া, জানিয়ে দেওয়া ইত্যাদি। শরিয়তের পরিভাষায়, আল্লাহ তাআলা কর্তৃক তাঁর নবি-রাসুলদেরকে ফেরেশতার মাধ্যমে স্বপ্নযোগে কিংবা ইলহামের মাধ্যমে কোনো বিষয় জানিয়ে দেওয়াকে ওহি বলা হয়। সর্বশেষ নবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর ওপর দুই প্রকারের ওহি অবতীর্ণ হয়। ১. ওহি মাতলু তথা- কুরআন মাজিদ, ২. ওহি গায়রে মাতলু তথা হাদিস।
মক্কি সূরা	আল-কুরআনের যেসব সূরা পবিত্র মক্কা নগরীতে নাজিল হয়েছে সেগুলো মক্কি সূরা। আল-কুরআনের ১১৪টি সূরার মধ্যে মক্কি সূরা ৮৬টি। এ সূরাগুলো আকারে ছোট এবং আয়াতগুলোও ছোট ছোট। মক্কি সূরায় তাওহিদ, রিসালাত, আখিরাত ও আল কুরআনের সত্যতা প্রমাণের জন্য বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে।
মাদানি সূরা	আল-কুরআনের যেসব সূরা মদিনায় নাজিল হয়েছে সেই সূরাগুলোকে মাদানি সূরা বলে। মাদানি সূরার সংখ্যা ২৮টি। এই সূরাগুলো আকারে বড় এবং আয়াতগুলোও বড়। মাদানি সূরাতে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, লেনদেন ইত্যাদি সম্পর্কিত বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে।
মুত্তাকি	মুত্তাকি শব্দের অর্থ আল্লাহভীরু বা পরহেযগার। সাধারণত মুত্তাকি বলতে ঐ ব্যক্তিকে বোঝায় যিনি একমাত্র মহান আল্লাহর ভয়ে সব ধরনের পাপ কাজ থেকে বিরত থাকেন এবং কুরআন ও সুন্নাহর বিধান অনুসারে জীবনযাপন করেন।
বনি ইসরাইল জাতি	বনি ইসরাইল হলো ইসরাইলের সন্তান-সন্ততি বা বংশধর। ইসরাইল শব্দের অর্থ মহান আল্লাহর বান্দা। এটি হযরত ইয়াকুব (আ.) এর উপাধি। মহান আল্লাহ তাকে এ উপাথি দিয়েছিলেন। তার বংশধররা ইতিহাসে 'বনি ইসরাইল' হিসেবে পরিচিতি পায়। এদের আদিবাস ছিল ফিলিস্তিনে। তারা আমালিকাদের কাছে পরাজিত হয়ে সেখান থেকে বিতারিত হয়ে মিসরে বসতি স্থাপন করে। মিসরের কিবতিরা বনি ইসরাইলদের দাসত্ব বরণে বাধ্য করে। তাদের মেয়েদের হত্যা করে। তাদের এহেন বিপদে হযরত মুসা (আ.) আবির্ভূত হন তাদের ত্রাণকর্তা হিসেবে। পরে তারা মুসা (আ.) এর অবাধ্য হয়। তাদের অবাধ্যতার জন্য শাস্তি হয়। মুসা (আ.)-এর পরেও তাতের কাছে অসংখ্য নবি-রাসুল প্রেরিত হন। অনেক নবি-রাসুল এ অবাধ্য জাতির হাতে নিহত হন। বর্তমানেও এজাতি মুসলমানদের শত্রুতে পরিণত হয়েছে।
তাওবা	তাওবা বলতে বোঝায় পূর্বে কৃত কোনো অন্যায় অপরাধের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে অনুতপ্তচিত্তে ক্ষমা ভিক্ষা চাওয়া এবং ভবিষ্যতে কোনো প্রকার অপরাধ না করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করা। তাওবার তিনটি পর্যায় রয়েছে- ১. অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে কৃত পাপের জন্য ক্ষমা চাওয়া, ২. পাপ না করার জন্য দৃঢ় শপথ নেওয়া, ৩. পাপ পরিহার করে সৎকাজ করা।

সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

ক. জ্ঞানমূলক

■ আল-কুরআনের পরিচয়

প্রশ্ন-১. আল-কুরআন কী? *[রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. '১৮]*
উত্তর: আল-কুরআন সর্বশেষ আসমানি কিতাব, যা হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়।

প্রশ্ন-২. আসমানি কিতাব কী?
উত্তর: মানবজাতির হেদায়েতের জন্য দিকনির্দেশনাস্বরূপ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিলকৃত কিতাবই আসমানি কিতাব।

প্রশ্ন-৩. পবিত্র কুরআনে কয়টি আয়াত রয়েছে? *[রা. বো., সি. বো. '১৯]*
উত্তর: পবিত্র কুরআনে ৬২৩৬টি মতান্তরে ৬৬৬৬টি আয়াত রয়েছে।

প্রশ্ন-৪. রাসুলুল্লাহ (সা.) কোন দুটি জিনিস আঁকড়ে ধরতে বলেছেন?
উত্তর: মহান আল্লাহর কুরআন এবং সুন্নাতে রাসুল তথা হাদিসকে।

■ আল-কুরআনের আলোচ্য বিষয়

প্রশ্ন-৫. আল-কুরআনের মূল আলোচ্য বিষয় কী?
উত্তর: আল-কুরআনের মূল আলোচ্য বিষয় মানুষ।

প্রশ্ন-৬. আল-কুরআনে কী বিশ্লেষিত হয়েছে?
উত্তর: আল-কুরআনে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের অসংখ্য দিক বিশ্লেষিত হয়েছে।

প্রশ্ন-৭. খ্যাতিমান মুহাদ্দিস শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহ.) কোন গ্রন্থে আল-কুরআনের আলোচ্য বিষয়কে পাঁচটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করেছেন?
উত্তর: 'আল-ফাওযুল কাবীর' গ্রন্থে।

প্রশ্ন-৮. বাইতুল ইযযার অপর নাম কী?
উত্তর: বাইতুল মামুর।

■ মক্কি ও মাদানি সূরা

প্রশ্ন-৯. মক্কি সূরা কাকে বলে?
উত্তর: রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর মদিনায় হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত যে সূরা অবতীর্ণ হয়েছে তাকে মক্কি সূরা বলে।

প্রশ্ন-১০. মাদানি সূরা কী?
উত্তর: রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের পর যেসব সূরা নাজিল হয়েছে তাই মাদানি সূরা।

প্রশ্ন-১১. শানে নুজুল কী? *[রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. '১৮]*
উত্তর: আল-কুরআনের সূরা বা আয়াত নাজিলের কারণকে শানে নুজুল বলা হয়।

প্রশ্ন-১২. বায়তুল ইযযাহ কী?
উত্তর: বায়তুল ইযযাহ হলো প্রথম আসমানের একটি বিশেষ স্থান।

■ সূরা আল-বাকারার বিষয়বস্তু

প্রশ্ন-১৩. اَلْبَقَرَةُ শব্দের অর্থ কী?
[ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো. '২৫]
উত্তর: اَلْبَقَرَةُ শব্দের অর্থ গাভী।

প্রশ্ন-১৪. কোন সূরায় গাভীর কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে?
উত্তর: সূরা আল-বাকারায়।

প্রশ্ন-১৫. 'যালিকাল কিতাব' অর্থ কী? *[ঢা. বো., ম. বো., কু. বো. '২২]*
উত্তর: 'যালিকাল কিতাব' অর্থ হলো: এই সেই কিতাব।

প্রশ্ন-১৬. 'মুত্তাকীন' অর্থ কী? *[ঢা. বো. ম. বো., কু. বো. '২২]*
উত্তর: 'মুত্তাকীন' অর্থ হলো— পরহেজগার, মহান আল্লাহর ভয়ে পাপ বর্জনকারী।

প্রশ্ন-১৭. মুত্তাকি (مُتَّقِيْ) কারা?-এর সংজ্ঞা দাও।
[দি. বো., সি. বো., ব. বো. '২৫; রা. বো., দি. বো., কু. বো., সি. বো., য. বো. '১৭]
উত্তর: যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে সব ধরনের অন্যায় ও খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকে তারাই মুত্তাকি।

প্রশ্ন-১৮. সাফল্য লাভের একমাত্র উপায় কোনটি?
উত্তর: তাকওয়া হলো সাফল্য লাভের একমাত্র উপায়।

প্রশ্ন-১৯. কুরআন কাদের জন্য হেদায়াত?
[ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো. '২৫]
উত্তর: কুরআন মুত্তাকিদের জন্য হেদায়াত।

প্রশ্ন-২০. মহান আল্লাহর সাথে কথা বলার মাধ্যম কী?
উত্তর: কুরআন তেলাওয়াত হলো মহান আল্লাহর সাথে কথা বলার মাধ্যম।

প্রশ্ন-২১. আখিরাত শব্দের অর্থ কী?
[ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো. '২৫]
উত্তর: আখিরাত শব্দের অর্থ— পরকাল বা মৃত্যু পরবর্তী জীবন।

প্রশ্ন-২২. 'আল-কিতাব' অর্থ কী?
[ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো. '২৫]
উত্তর: 'আল-কিতাব' অর্থ স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থ।

■ সূরা আল-বাকারার আলোকে মুনাফিকের পরিচয়

প্রশ্ন-২৩. 'মুনাফিক' কারা? *[দি. বো., সি. বো., ব. বো. '২৫]*
উত্তর: অন্তরে কুফরি লালন করে মুখে ইমানের দাবি করা হলো নিফাক। যাদের অন্তরে নিফাক রয়েছে তারা মুনাফিক।

প্রশ্ন-২৪. মুনাফিকের অন্তরে কী রয়েছে?
উত্তর: মুনাফিকের অন্তরে কপটতা রয়েছে।

প্রশ্ন-২৫. মুনাফিকদের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?
উত্তর: মিথ্যা কথা বলা।

প্রশ্ন-২৬. ফাসিক কাকে বলে?
উত্তর: যে কবিরা গুনাহ করে তাকে ফাসিক বলে।

■ **হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টি**

প্রশ্ন-২৭. خَلِيْفَةٌ (খলিফা) অর্থ কী?
[রা. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. '২২]

উত্তর: خَلِيْفَةٌ (খলিফা) অর্থ হলো— প্রতিনিধি, স্থলাভিষিক্ত।

প্রশ্ন-২৮. মানুষকে আল্লাহ তাআলা কীসের মর্যাদা দিয়েছেন?
[ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো. '২৫]
উত্তর: মানুষকে আল্লাহ তাআলা 'খলিফা'র মর্যাদা দিয়েছেন।

প্রশ্ন-২৯. মানবজাতিকে কিসের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে?
উত্তর: মানবজাতিকে খিলাফত বা প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

প্রশ্ন-৩০. مَلٰٓئِكَةٌ (মালাইকা) শব্দের অর্থ কী?
[রা. বো., দি. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. '২২]

উত্তর: مَلٰٓئِكَةٌ (মালাইকা) শব্দের অর্থ হলো— ফেরেশতা।

প্রশ্ন-৩১. হযরত আদম (আ.) এর আকৃতি কেমন ছিল?
উত্তর: আদম (আ.) এর আকৃতি ছিল শোভনীয় এবং তিনি দৈর্ঘ্যে ছিলেন ষাট গজ।

প্রশ্ন-৩২. আদম (আ.) ও তাঁর স্ত্রীকে জান্নাত থেকে বের করা হলো কেন?
উত্তর: নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ার কারণে।

প্রশ্ন-৩৩. কীভাবে সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে?
উত্তর: ধৈর্য এবং নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে।

প্রশ্ন-৩৪. হযরত মুসা (আ.) তুর পাহাড়ে কতদিন অবস্থান করেছিলেন?
উত্তর: চল্লিশ দিন।

প্রশ্ন-৩৫. বনি-ইসরাইল কারা?
[রা. বো., দি. বো., কু. বো., সি. বো., য. বো.'১৭]
উত্তর: হযরত ইয়াকুব (আ.) এর বংশধরদের বনি-ইসরাইল বলা হয়।

প্রশ্ন-৩৬. ইসরাইল শব্দের অর্থ কী?
[রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. '১৮]
উত্তর: ইসরাইল শব্দের অর্থ আব্দুল্লাহ বা মহান আল্লাহর বান্দা।

খ. অনুধাবনমূলক

প্রশ্ন-১. আল কুরআনের পরিচয় দাও।
উত্তর: আল কুরআন আল্লাহ তাআলার পবিত্র কালাম।
মানবজাতির হেদায়েতের জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিলকৃত সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব আল কুরআন। মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর ওপর দীর্ঘ তেইশ বছরে এ কুরআন নাজিল হয়। মহান আল্লাহ এ গ্রন্থকে পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে ঘোষণা করে এ ব্যাপারে যে কোনো ধরনের সংশয়-সন্দেহ খণ্ডন করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন— 'এটি সেই কিতাব (কুরআন) যার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই' (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ০২)।

প্রশ্ন-২. আল-কুরআনকে জ্ঞানের মূল উৎস বলা হয় কেন?
উত্তর: আল-কুরআন সব জ্ঞানের তথ্য ভাণ্ডারসমৃদ্ধ এক অনন্য গ্রন্থ- তাই একে জ্ঞানের মূল উৎস বলা হয়েছে।
আল্লাহ তাআলা কুরআন নাজিল শুরু করেছেন জ্ঞানমূলক শব্দ 'ইকরা' তথা পড় শব্দের মাধ্যমেই। আধুনিক বিজ্ঞানের সার্বিক দিক-দর্শন, শিল্প-সাহিত্য তথা সব জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল উৎস হিসেবে এটি অতুলনীয়। এর মাধ্যমে আমরা জানতে পারি লক্ষ কোটি বছরের পূর্বের জানা-অজানা কাহিনি, চাঁদ, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্রের অবস্থান ও এদের গতিবিধির সূক্ষ্ম বিষয়াবলি সম্পর্কে। ইহকালীন থেকে শুরু করে পরকালীন সুখ-দুঃখের জ্ঞানও এর মাধ্যমে সন্নিবেশিত হয়েছে। তাই আল-কুরআনকে জ্ঞানের মূল উৎস বলা হয়েছে।

প্রশ্ন-৩. 'আল-কুরআন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান'— বুঝিয়ে লেখো। *[ঢা. বো., চ. বো., ব. বো. '১৭]*
উত্তর: মানবজীবনের সব দিকনির্দেশনা থাকায় আল-কুরআনকে পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান বলা হয়।
মানবজীবনের সব সমস্যার পূর্ণাঙ্গ সমাধান গ্রন্থ হিসেবে আল-কুরআন বিশেষ গুরুত্বের দাবিদার। এ গ্রন্থটি আগত, অনাগত, সব মানুষের জন্য আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। মানবজীবনের এমন কোনো দিক ও বিষয় নেই যা আল-কুরআনে পেশ করা হয়নি। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন— 'এ কিতাবে আমি কোনো কিছু লিপিবদ্ধ করা বাকি রাখিনি' (সূরা আনআম: ৩৮)।

প্রশ্ন-৪. আল-কুরআনকে ফুরকান বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।
[ঢা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., ব. বো. '১৯]
উত্তর: কুরআন সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী বলে একে ফুরকান বলা হয়।

'ফুরকান' (اَلْفُرْقَانُ) আরবি শব্দ। এর অর্থ সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী। আল-কুরআন সত্য ও মিথ্যা, ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত হতে উদ্বুদ্ধ করে। এ কারণে আল-কুরআনকে ফুরকান বলা হয়।

প্রশ্ন-৫. শানে নুজুল বলতে কী বোঝায়?
উত্তর: শানে নুজুল বলতে আল-কুরআনের সূরা বা আয়াত নাজিলের কারণ বা পটভূমিকে বোঝায়।
'শান' শব্দের অর্থ কারণ বা পটভূমি। আর নুজুল অর্থ অবতরণ। অতএব শানে নুজুল অর্থ অবতরণের কারণ বা পটভূমি। আল-কুরআনের সূরা বা আয়াতসমূহ বিভিন্ন কারণ বা প্রেক্ষাপটে নাজিল হয়েছে। আর এই কারণ বা প্রেক্ষাপটকেই শানে নুজুল বলা হয়।

প্রশ্ন-৬. আল-কুরআন সর্বপ্রথম কীভাবে সংরক্ষণ করা হয়? ব্যাখ্যা করো।
উত্তর: মুখস্থ করার মাধ্যমে আল-কুরআন সর্বপ্রথম সংরক্ষণ করা হয়।
তৎকালীন আরবদের স্মৃতিশক্তি ছিল খুবই তীক্ষ্ণ। তারা কোনো জিনিস শিখলে তা আর কখনো ভুলত না। মহানবি (সা.)-এর নির্দেশক্রমে সাহাবিগণ কুরআন হেফজ করতেন। তাদের অসাধারণ স্মৃতিশক্তির কারণে এ কুরআন তাদের স্মৃতিতে সহজেই সংরক্ষিত হয়। এভাবেই সর্বপ্রথম আল-কুরআন সংরক্ষণ করা হয়।

প্রশ্ন-৭. কুরআন সংকলনের সময় জায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) কোন পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন?

উত্তর: কুরআন সংকলনের সময় জায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) অত্যন্ত সতর্কতার সাথে চারটি পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন।

জায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) পবিত্র কুরআন সংকলনের সময় প্রথমত, হাফিজ সাহাবিদের তিলাওয়াতের মাধ্যমে প্রতিটি আয়াতের বিশুদ্ধতা ও নির্ভুলতা যাচাই করেন। দ্বিতীয়ত, হযরত উমর (রা.)-এর হিফজের সাথে মিলিয়ে আয়াতের বিশুদ্ধতা যাচাই করেন। তৃতীয়ত, রসুলুল্লাহ (সা.)-এর উপস্থিতিতে লিখিত হওয়ার ব্যাপারে নূন্যতম দুজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। চতুর্থত, চূড়ান্তভাবে লিখিত আয়াতগুলো অন্যান্য সাহাবির সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপির সাথে তুলনা ও যাচাই করেন।

প্রশ্ন-৮. মক্কি সূরাসমূহে তাওহিদের কথা বেশি বর্ণিত হয়েছে কেন? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: তাওহিদের গুরুত্ব বেশি হওয়ায় মক্কি সূরায় তাওহিদের কথা বেশি বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ তাআলার একত্ববাদকে তাওহিদ বলে। এটি শিরকের বিপরীত। তৎকালীন মক্কার অধিকাংশ মানুষ শিরকে লিপ্ত ছিল। তারা মূর্তিপূজা করত। তাদের ধারণা ছিল মূর্তিগুলো মহান আল্লাহর কাজে সহায্য করে। তারা এটাও বিশ্বাস করত যে মূর্তিগুলো তাদের ভালো-মন্দ করার ক্ষমতা রাখে। সেজন্য তারা এগুলোর কাছে সাহায্য চাইত। তাদের এসব অমূলক ধারণা ও বিশ্বাসকে খণ্ডন করার জন্যই মক্কি সূরাগুলোতে তাওহিদের কথা বেশি বর্ণিত হয়েছে।

প্রশ্ন-৯. 'মুত্তাকিদের' গুণাবলি সংক্ষেপে লেখো।

[ঢা. বো., ম. বো., কু. বো., '২২]

উত্তর: সূরা আল-বাকারার প্রথম রুকুতে আল্লাহ তাআলা মুত্তাকিদের কতিপয় গুণাবলি উল্লেখ করেছেন।

মুত্তাকিদের কয়েকটি বিশেষ গুণাবলি হলো— তারা গায়েব বা অদৃশ্য বিষয়সমূহে বিশ্বাস স্থাপন করে, সালাত কায়েম করে, মহান আল্লাহর পথে ও মানুষের কল্যাণে সম্পদ ব্যয় করে, আসমানি কিতাব ও পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করে। সর্বোপরি, মুত্তাকিগণ সৎকাজ করে এবং পরকালীন জীবনে ক্ষতির কারণ হতে পারে এমন কাজ ও বিষয় থেকে নিজেদেরকে সবসময় বিরত রাখে।

প্রশ্ন-১০. মুনাফিক বলতে কাদেরকে বোঝায়? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: যারা মুখে ইমানের কথা বলে কিন্তু অন্তরে কুফুরি লালন করে তাদেরকে মুনাফিক বলা হয়।

মুনাফিক শব্দের অর্থ— কপট বা ভণ্ড। মুনাফিক বলতে তাদেরকে বোঝায়, যারা মৌখিকভাবে ইমানের ঘোষণা দেয় এবং নামাজ, রোজাও পালন করে কিন্তু অন্তরে কুফরি পোষণ করে। অর্থাৎ এদের ইমানের ঘোষণা ও যাবতীয় ইবাদত-বন্দেগি লোক দেখানোর জন্য এবং দুনিয়ার স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য। কখনো কখনো তাদের কর্মকাণ্ড ইসলাম ও মুসলিমদের চরম ক্ষতির সম্মুখীন করে। আল্লাহ তাআলা বলেন— নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৪৫)।

প্রশ্ন-১১. কীভাবে আদর্শ নৈতিক জীবন গঠন করা যায়?

উত্তর: কুরআন মাজিদের অনন্য নির্দেশনা অনুসরণ করে আদর্শ নৈতিক জীবন গঠন করা যায়।

আল কুরআন মানুষকে মহান আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হওয়ার পরামর্শ দেয়। সাথে সাথে সবরকমের পাপাচার, গিবত, হত্যা, অশালীন কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়। এ কুরআনে নৈতিক উৎকর্ষকে মানুষের মর্যাদার মাপকাঠি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। কুরআনে দৈহিক পবিত্রতার পাশাপাশি মানুষের অন্তরের শুদ্ধতাকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এসব নির্দেশনা অনুসরণ করলে একজন মানুষ পুত-পবিত্র আদর্শ নৈতিক জীবন গঠন করতে পারবে।

প্রশ্ন-১২. "আমি যা জানি তা তোমরা জাননা" (إِنِّيْ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ)।— ব্যাখ্যা করো। *[ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো. '২৫; রা. বো., দি. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. '২২]*

উত্তর: মানুষ সৃষ্টির ব্যাপারে ফেরেশতাদের প্রশ্নের প্রতি উত্তরে আল্লাহ তাআলা বলেন— "আমি যা জানি, তা তোমরা জানো না।"

আল্লাহ তাআলা মানব সৃষ্টির পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পূর্বে ফেরেশতাদের কাছে বিষয়টি উত্থাপন করেন। তিনি বলেন— "নিশ্চয়ই পৃথিবীতে আমি আমার খলিফা বানাতে চাই।" এর মাধ্যমে তিনি ফেরেশতাদের অনুমতি বা পরামর্শ নেননি। বরং তাদেরকে এ বিষয়ে অবহিত করেন মাত্র। কিন্তু তাদের মধ্যে নতুন এ সৃষ্টির বিষয়টি এক বিনীত জিজ্ঞাসার জন্ম দিল। তারা বলেন— আমরা থাকতে এমন কাউকে পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলা কেন সৃষ্টি করতে চান, যারা সেখানে অশান্তি সৃষ্টি ও রক্তপাত করবে? তখন আল্লাহ তাআলা তাদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন— إِنِّيْ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (আমি যা জানি, তা তোমরা জানো না।)

প্রশ্ন-১৩. বনি ইসরাইল কারা? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: বনি ইসরাইল হলো ইসরাইলের সন্তানসন্ততি বা বংশধর।

ইসরাইল অর্থ: আব্দুল্লাহ বা মহান আল্লাহর বান্দা, এটি ইয়াকুব (আ.) এর উপাধি। তাঁর বংশধররা ইতিহাসে বনি ইসরাইল নামে প্রকাশ পায়। এদের আদিবাস ছিল ফিলিস্তিনে। পরে তারা মিশরে চলে যায়। এখানে কিবতিরা তাদেরকে নানা রকম অত্যাচার করে। ফলে হযরত মুসা (আ.) ত্রাণকর্তা হিসেবে তাদের মধ্যে আবির্ভূত হন। অবাধ্য জাতি হিসেবে তাদের কুখ্যাতি রয়েছে।

প্রশ্ন-১৪. 'মান্না ও 'সালওয়া' বলতে কী বোঝায়?

[রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. '১৮]

উত্তর: মান্না ও সালওয়া হলো মহান আল্লাহর প্রদত্ত বনি ইসরাইলদের জন্য জান্নাতি খাবার।

মান্না ও সালওয়া দু'ধরনের খাদ্য। মান্না হলো এমন এক প্রকার খাদ্য যা বনি ইসরাইলদের জন্য ঘাসের ওপর অবতরণ করা হতো। তারা সকালে গিয়ে তা জমা করত এবং ইচ্ছামতো খেয়ে নিতো। কারো মতে, শিশিরের সাথে এর সাদৃশ্য ছিল।

আর সালওয়া হলো এক প্রকার ছোট লাল বর্ণের পাখি। এগুলো আসমান থেকে আসার পর এক জায়গায় জমা হতো এবং বনি ইসরাইলের লোকজন ইচ্ছামতো ধরে জবেহ করে খেতো।

? অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. আল-কুরআনে মক্কি সূরার সংখ্যা কত?
ক. ১১৪ খ. ১০৪
গ. ৯৬ ঘ. ৮৬

২. পবিত্র কুরআনে কত জন নবি-রাসুলের নাম উল্লেখ হয়েছে?
ক. ২৭ জন খ. ২৫ জন
গ. ২৩ জন ঘ. ২১ জন

৩. কদরের রাত হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেন?
ক কুরআন নাজিল হয়েছে বলে
খ মানুষ এ রাতে বেশি ইবাদত করে বলে
গ রমজান মাসের রাত বলে
ঘ মুসলমানরা এ রাতে জেগে থাকে বলে

৪. কুরআন মাজিদের আয়াত সংখ্যায় সর্ববৃহৎ সূরা কোনটি?
ক. আল-বাকারা খ. আলে ইমরান
গ. কিয়ামাহ ঘ. বনি ইসরাইল

৫. পবিত্র কুরআনের বিষয়বস্তুকে কয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে?
ক. সাত খ. তিন
গ. নয় ঘ. পাঁচ

৬. কুরআন মাজিদ কতবার সংকলিত হয়েছে?
ক. ১ খ. ২
গ. ৩ ঘ. ৪

৭. 'আল-হিকমা' শব্দের অর্থ কী?
ক. প্রজ্ঞা খ. রায়
গ. আত্মা ঘ. সত্য

৮. অবতরণের সময় বিবেচনায় কুরআনের সূরাসমূহ কয়ভাগে বিভক্ত?
ক. ২ খ. ৩
গ. ৪ ঘ. ৫

৯. হালাল-হারাম, লেনদেন, সমাজিক মেলামেশার রীতি সম্পর্কে জানার জন্য নিচের কোনটি অধ্যয়ন করতে হয়?
ক. মক্কি সূরা খ. মাদানি সূরা
গ. ফিকহশাস্ত্র ঘ. কানুন ফিত-তিব

১০. কোন জীবনের সফলতাই প্রকৃত সফলতা?
ক. পারিবারিক খ. সামাজিক
গ. ইহকালীন ঘ. পরকালীন

১১. কোন অপরাধে ইবলিস কাফিরে পরিণত হয়?
ক. কবিরা গুণাহ করে
খ. নিফাকী আচরণের জন্য
গ. মহান আল্লাহর আদেশ অমান্য করে
ঘ. আদম (আ.) কে ধোঁকা দিয়ে

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন

১২. কুরআন তিলাওয়াত একজন ব্যক্তিকে—
i. নৈতিক গুণাবলিতে ভূষিত করে
ii. মানবিক গুণাবলিতে ভূষিত করে
iii. আধ্যাত্মিক গুণাবলি অর্জনে সাহায্য করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৩. মক্কি সূরা পড়লে আমরা জানতে পারব—
i. তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাত
ii. মুনাফিক ও ইহুদিদের ষড়যন্ত্র
iii. কুফর ও শিরক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৪ ও ১৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
আলম ও কালাম দুই বন্ধু। তারা মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করছিল। আলম বলল, আল্লাহ বলেছেন— إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً কালাম বলল, ফেরেশতাগণ মানুষ সৃষ্টির বিরোধিতা করেছিল। আল্লাহ ফেরেশতাদের পরীক্ষা করলেন। ফেরেশতাগণ ব্যর্থ হয়ে বলল— سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

১৪. আলমের উদ্ধৃত আয়াতে خَلِيفَةً দ্বারা কাকে বোঝানো হয়েছে?
ক. আদম (আ.) খ. নুহ (আ.)
গ. ইবরাহিম (আ.) ঘ. ইসমাইল (আ.)

১৫. কালামের বক্তব্যে ফেরেশতাগণ ব্যর্থ হয়ে কী বলল?
i. আমরা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি
ii. আমাদের কোনো জ্ঞান নাই কেবল আপনি যা দিয়েছেন তা ছাড়া
iii. আপনি মহাজ্ঞানী ও মহাবিজ্ঞানী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

খ. বোর্ড পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৬. আল-কুরআনে মোট কতটি সূরা রয়েছে? [সকল বোর্ড ২০২৩]
ক. ১১১টি খ. ১১২টি
গ. ১১৩টি ঘ. ১১৪টি

১৭. সামাজিক সমস্যা সমাধানের মূল উৎস কোনটি? [সকল বোর্ড ২০২৩; ২০২১]
ক. আল-কুরআন খ. আল-হাদিস
গ. ইজমা ঘ. কিয়াস

১৮. اَلذِّكْرُ শব্দের অর্থ কী? [সকল বোর্ড ২০১৯]
ক. ধ্যান খ. উপদেশ
গ. গুণগান ঘ. প্রশংসা

১৯. 'ফাতরাতুল ওহি' অর্থ কী? [সকল বোর্ড ২০১৮]
ক. ওহির বিরতি কাল খ. ওহির অবতরণ কাল
গ. ওহির প্রথম অবতরণ ঘ. ওহির সমাপ্তি কাল

২০. সূরা আল-বাকারার আয়াত সংখ্যা কত? [সকল বোর্ড ২০২৫]
ক. ১৭৬ খ. ২০০
গ. ২৮৪ ঘ. ২৮৬

২১. আল্লাহ জমিনকে মানুষের জন্য করেছেন—[সকল বোর্ড ২০২২]
ক. ছাদ খ. বিছানা
গ. জীবিকা ঘ. বাসস্থান

২২. هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ -এর মর্মকথা হলো— [সকল বোর্ড ২০২১]
ক. কুরআন সকলের জন্য উন্মুক্ত
খ. কুরআন মুত্তাকিদের জন্য পথপ্রদর্শক
গ. কুরআন সকলের জন্য পথপ্রদর্শক
ঘ. কুরআন রহমতস্বরূপ অবতীর্ণ

২৩. সূরা আল-বাকারার প্রথম রুকুতে উল্লেখিত 'অদৃশ্যের উপর বিশ্বাস করা' কাদের বৈশিষ্ট্য? [সকল বোর্ড ২০২১]
ক. হাফেজগণের খ. মুজাহিদগণের
গ. শহিদগণের ঘ. মুত্তাকিগণের

২৪. সূরা আল-বাকারার আলোকে সালাত কায়েম ও পরকালে বিশ্বাস কাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য? [সকল বোর্ড ২০২২]
ক. আবিদ খ. মুজতাহিদ
গ. মু'মিন ঘ. মুত্তাকি

২৫. "তাঁদের অন্তরসমূহের মধ্যে রয়েছে ব্যাধি।"— এখানে কাদের কথা বলা হয়েছে? [সকল বোর্ড ২০২২]
ক. মুনাফিক খ. কাফির
গ. ফাসিক ঘ. জালিম

২৬. صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ আয়াতে কাদের কথা বলা হয়েছে? [সকল বোর্ড ২০১৯]
ক. আউস সম্প্রদায় খ. খাজরাজ সম্প্রদায়
গ. মুনাফিক সম্প্রদায় ঘ. কুরাইশ সম্প্রদায়

২৭. মানব সৃষ্টির পর মহান আল্লাহ কাকে সিজদা করার নির্দেশ দেন? [সকল বোর্ড ২০২২]
ক. হযরত ঈসা (আ.) খ. হযরত মুহাম্মাদ (সা.)
গ. হযরত সুলায়মান (আ.) ঘ. হযরত আদম (আ.)

২৮. ফাসাদ বলতে বোঝায়— [সকল বোর্ড ২০২২]
ক. হত্যা খ. মারামারি
গ. বিশৃঙ্খলা ঘ. হিংসা

২৯. اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ আয়াতে আল্লাহ তাআলা সর্ব বিষয়ে— [সকল বোর্ড ২০১৭]
ক. সর্বজ্ঞানী খ. সর্বশক্তিমান
গ. সর্বশ্রোতা ঘ. সর্বদ্রষ্টা

৩০. মুসলিমের অন্তর সবসময় ব্যপ্ত থাকে— [সকল বোর্ড ২০২১]
i. নিজের উন্নতি ও সমৃদ্ধির চিন্তায়
ii. মুসলিমগণের কল্যাণ কামনায়
iii. একনিষ্ঠভাবে মহান আল্লাহর নির্দেশ পালনে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩১. 'আল-কুরআন বিশ্ববাসীর জন্য সর্বজনীন পথপ্রদর্শক'-এর কারণ এটি— [সকল বোর্ড ২০২১]
i. সকল জাতির হেদায়েতের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে
ii. আরব জাতির হেদায়েতের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে
iii. সর্বকালের সকল মানুষের জন্য সমাধান দেয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩২ ও ৩৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
আ. রহিম তার সহপাঠী আ. করিমকে আল-কুরআনের বিশুদ্ধতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন— "এটা এমন কিতাব যার সম্পর্কে কোনোই সন্দেহ নাই।" বরং এটা মুত্তাকিদের জন্য পথপ্রদর্শক। [সকল বোর্ড ২০২৩]

৩২. আ. রহিমের বক্তব্যটি আল-কুরআনের কোন সূরার অংশ বিশেষ?
ক. আল-বাকারা খ. আলে-ইমরান
গ. আর-রহমান ঘ. আল-হুজরাত

৩৩. মুত্তাকির বৈশিষ্ট্য হলো—
i. অদৃশ্যে বিশ্বাস করা
ii. সালাত প্রতিষ্ঠা করা
iii. সম্পদ গচ্ছিত রাখা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩৪ ও ৩৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
অধ্যাপক রেজাউল করিম নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করেন—
صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ [সকল বোর্ড ২০২৫]

৩৪. অধ্যাপক রেজাউল করিমের তেলাওয়াতকৃত আয়াতে কাদের বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে?
ক. কাফির খ. মুশরিফ
গ. ফাসিক ঘ. মুনাফিক

৩৫. উক্ত আয়াতে বর্ণিত ব্যক্তিদের পরিণতি হলো—
i. তাদের অন্তঃকরণ ব্যাধিগ্রস্ত হবে
ii. তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ আযাব
iii. পরিশেষে তারা মুক্তি পাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩৬ ও ৩৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
ফাতিমা ওয়াজে পবিত্র কুরআনের একখানি আয়াত শুনলেন। যার অর্থ— "তারা বলল, আপনি পূত-পবিত্র মহান। আপনি যা আমাদের শিখিয়েছেন তা ছাড়া আমাদের কোনো জ্ঞান নেই।" অতঃপর তিনি এ আয়াতখানিও শুনলেন— *[সকল বোর্ড ২০২২]*

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ۔

৩৬. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রথম আয়াতখানিতে 'তারা' বলতে কাদেরকে বোঝানো হয়েছে?
ক. আদম (আ.) খ. জিবরাইল (আ.)
গ. ইবলিশ ঘ. ফিরিশতা

৩৭. উদ্দীপকে উদ্ধৃত দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে—
i. তোমরা আদমকে সিজদা কর
ii. ইবলিশ অমান্য করল এবং অহঙ্কার করল
iii. সে সব বিষয়ের নাম বলে দিল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i,ii, ও iii

উত্তরমালা

১	ঘ	২	খ	৩	ক	৪	ক	৫	ঘ	৬	খ	৭	ক	৮	ক	৯	খ	১০	ঘ	১১	গ	১২	ঘ
১৩	খ	১৪	ক	১৫	ঘ	১৬	ঘ	১৭	ক	১৮	খ	১৯	ক	২০	ঘ	২১	খ	২২	খ	২৩	ঘ	২৪	ঘ
২৫	ক	২৬	গ	২৭	ঘ	২৮	গ	২৯	খ	৩০	গ	৩১	গ	৩২	ক	৩৩	ক	৩৪	ঘ	৩৫	ক	৩৬	ঘ
৩৭	ক																						

গ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. কুরআন তিলাওয়াতের ফজিলত সংক্ষেপে লেখো।
২. কুরআন নাজিলের পদ্ধতি সংক্ষেপে লেখো।
৩. মক্কি ও মাদানি সূরার পরিচয় দাও।
৪. আল-কুরআন সংকলনের কারণ ব্যাখ্যা করো।
৫. নৈতিক সমস্যা সমাধানে আল-কুরআনের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।
৬. সূরা আল-বাকারার নামকরণের কারণ ব্যাখ্যা করো।
৭. সংক্ষেপে মুনাফিকের পরিচয় দাও।
৮. সংক্ষেপে মুত্তাকির পরিচয় দাও।
৯. বনি ইসরাইলদের প্রতি মহান আল্লাহর অনুগ্রহের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
১০. বনি ইসরাইলরা কী কী দুষ্কর্ম করেছিল? সংক্ষেপে লেখো।

ঘ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. **কলেজ ছাত্র রায়হান প্রতিদিন সকালে একটি ঐশী গ্রন্থের কিছু অংশ অধ্যয়ন করে, যার প্রতিটি বর্ণের বিনিময়ে সে সাওয়াব প্রত্যাশা করে। তার পিতা জনাব আব্দুর রহীম সাহেব একদিন তাকে বললেন, 'বাবা, এটি সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ গ্রন্থ ও সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস এবং এতে কোনো প্রকার ভুল-ত্রুটি ও সন্দেহ নেই।' তিনি আরো বললেন, 'এই গ্রন্থটির প্রধান আলোচ্য বিষয় হলো মানবজাতি'। তাই মানুষের উচিত হলো, তা বেশি বেশি অধ্যয়ন করে এর প্রকৃত শিক্ষা বাস্তব জীবনে যথাযথভাবে প্রয়োগ করা।** *[রা. বো., সি. বো., য. বো. '২৩]*
ক. 'কিতাব' শব্দের অর্থ কী?
খ. 'আল-কুরআন'কে 'ফুরকান' বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।
গ. রায়হান প্রতিদিন কোন গ্রন্থ পাঠ করে? গ্রন্থটির মর্যাদা বিশ্লেষণ করো।
ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত গ্রন্থটির শিক্ষা সমাজ জীবনে কী ধরনের পরিবর্তন আনতে সক্ষম? বিশ্লেষণ করো।

২. দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী শাফিন ক্লাস শেষে তার সহপাঠী ফেরদৌসকে বলল, পবিত্র কুরআনের অনেক সূরায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইহুদি ও মুনাফিকদের নানা চক্রান্তের বিষয় যেমন উল্লেখ রয়েছে, তেমনি শান্তি প্রতিষ্ঠায় পারস্পরিক লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিচার-ব্যবস্থা ও দণ্ডবিধি ইত্যাদি বিষয়েরও বর্ণনা করা হয়েছে। তখন ফেরদৌস বলল, কখনো এক বা একাধিক আয়াত, কখনো একটি সূরা অবতীর্ণ হয়ে কুরআনের অবতরণ পূর্ণতা লাভ করেছে। এভাবে পবিত্র কুরআন মানবজাতির নিকট সহজবোধ্য একটি ঐশীগ্রন্থ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। *[ব. বো. '২১]*
ক. আখিরাত অর্থ লেখো।
খ. সূরা আল-বাকারার নামকরণের যথার্থতা ব্যাখ্যা করো।
গ. উদ্দীপকে ফেরদৌসের আলোচনায় পবিত্র কুরআনের কোন প্রকারের সূরার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে বর্ণনা করো।
ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত শাফিনের শেষোক্ত উক্তির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।

৩.

মহান আল্লাহর

ক অংশ	খ অংশ
i. অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন করা	i. মু'মিনদের ধোঁকা দেয়া
ii. সালাত কায়েম করা	ii. অন্তঃকরণ ব্যাধিগ্রস্ত
iii. দান-সাদকা করা	iii. মিথ্যাচারে নির্লিপ্ততা
iv. কিতাবে বিশ্বাস স্থাপন	iv. সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি
v. পরকালে নিশ্চিত বিশ্বাসী	v. নির্বোধ জনগোষ্ঠী

[ঢা. বো., ম. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. '২৩]

ক. আল-বাকারাহ (اَلْبَقَرَةُ) কী?

খ. মাদানি সূরা কীভাবে চেনা যায়? ব্যাখ্যা করো।

গ. 'ক' অংশে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যের বান্দাহদের পরিচয় তুলে ধরো।

ঘ. 'খ' অংশে বর্ণিত লোকদের পরিচয় ও তাদের করুণ পরিণতি বর্ণনা করো।

৪. দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র ইকরাম টিফিনের সময় বন্ধুদের নিয়ে ইবাদতগৃহে একসাথে প্রার্থনা করল। এক দরিদ্র বন্ধুর ফরম পূরণের টাকা সংগ্রহের জন্য নিজের টিফিনের টাকা দিয়ে দিল। তার বন্ধু ইঞ্জিল হতে একটি উদ্ধৃতি দিলে সে বলল, কুরআন সত্যয়ন করলে আমি এটা অবশ্যই মেনে নেব। অপরদিকে তার বন্ধু আসলামকে বার বার সত্য মেনে নেয়ার আহ্বান জানালেও সে অস্বীকার করে। সে সত্য শুনেও শোনে না। স্রষ্টার নিদর্শন দেখেও দেখে না।

[ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো. '২৩]

ক. اَلْبَقَرَةُ শব্দের অর্থ কী?

খ. আদর্শ সমাজ গঠনে কুরআনের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।

গ. ইকরামের কার্যক্রমে কী ফুটে উঠেছে? সূরা আল-বাকারার প্রথম পাঁচ আয়াতের আলোকে ব্যাখ্যা করো।

ঘ. আসলামের পরিণাম পবিত্র কুরআনের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

৫. এমন একটি গ্রন্থ সম্পর্কে বলা হয়েছে, যাতে কোনো সন্দেহ নেই। যা একাধারে জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল উৎস এবং সঠিক পথের দিশারী। কিয়ামত পর্যন্ত এটা অবিকৃত থাকবে। এ গ্রন্থ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, "নিশ্চয় আমিই আল-যিকরা অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষক"।

[দি. বো., সি. বো., ব. বো. '২৩]

ক. মুত্তাকী কারা?

খ. "সালাত মুমিনের জন্য মিরাজস্বরূপ"— ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত গ্রন্থের পরিচয় দাও।

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত গ্রন্থটি কীভাবে অবিকৃত থাকবে বলে তুমি মনে কর? ইসলামের আলোকে জবাব দাও।

৬. জনাব শাকির ও নাহিদ দুজন ব্যবসায় বাণিজ্যের সাথে জড়িত। শাকির সততার সাথে বাণিজ্য করেন। তিনি অদৃশ্যে বিশ্বাস করেন। সালাত কায়েম করেন, যাকাত আদায় করেন ও দান সদকা করেন। তিনি দৃঢ়ভাবে আখিরাতের অনন্ত জীবনেও বিশ্বাস করেন। তবে জনাব নাহিদ ওজনে কম দেন। মালে ভেজাল মেশান। এলাকায় দুষ্টু লোকদের হাতে রেখে নেতা হতে চান ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেন।

[ঢা. বো., ম. বো., কু. বো. '২২]

ক. 'যালিকাল কিতাব'— অর্থ কী?

খ. আদর্শ পরিবার গঠনে আল-কুরআনের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।

গ. জনাব শাকিরের মধ্যে কাদের গুণাবলি রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. জনাব নাহিদের বাণিজ্যিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করো।

৭. ধনাঢ্য ব্যবসায়ী আরিফ সাহেব গ্রামে আসলে নামাজ-কালাম পড়েন এবং দান-সাদকাহ করেন। অন্যদিকে তিনি তাঁর ব্যবসায়ী বন্ধুদের সাথে ঢাকা শহরে থাকলে নামাজ-কালাম তো দূরের কথা আরো নানা প্রকার অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন। তিনি তাঁর বাল্যবন্ধু মালেককে বলেন, "সফলতা অর্জন করতে হলে আমার সাথে যোগ দাও।" মালেক বলল, "কেবল প্রাচুর্য ও বিলাসিতায় তো সফলতা নির্ভর করে না; বরং সফলতা প্রাপ্তি কতিপয় গুণাবলি অর্জনের ওপর নির্ভরশীল, যা পবিত্র কুরআনের সূরা আল-বাকারার শুরুতে বর্ণিত আছে"। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন: أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

[ঢা. বো., চ. বো., ব. বো. '১৭]

ক. 'কুরআন' শব্দের অর্থ কী?

খ. "আল-কুরআন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান"—বুঝিয়ে লেখো।

গ. আরিফের চরিত্র পবিত্র কুরআনের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

ঘ. মালেকের বক্তব্যের সাথে তুমি কি একমত? তোমার মতামতের সপক্ষে যুক্তি উপস্থান করো।

৮. জনাব 'গ' সমাজে নেতৃত্ব দেন। বিভিন্ন সময় মানুষের সাথে ওয়াদা করেন কিন্তু একটিও বাস্তবে পূরণ করেননি। মসজিদের ইমাম সাহেব জুমআ'র খুৎবায় জনাব 'গ' কে উদ্দেশ করে আয়াত পাঠ করে শোনান—

فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ.

[রা. বো., দি. বো., স. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. '২২]

ক. خَلِيْفَةً (খলিফা) অর্থ কী?

খ. اِنِّىْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (আমি যা জানি তা তোমরা জানো না)— ব্যাখ্যা করো।

গ. জনাব 'গ' এর চরিত্রে কাদের সামঞ্জস্যতা রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত আয়াতের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করো।

৯. আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরসমূহে এবং শ্রবণশক্তির উপর মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তাদের চোখের সামনে টেনে দিয়েছেন পর্দা, আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। *[রা. বো., দি. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. '২২]*

ক. اَلسُّفَهَآءُ (আসসুফাহা) এর অর্থ কী?

খ. 'তারা বধির, বোবা ও অন্ধ'— ব্যাখ্যা লেখো।

গ. বর্ণিত আয়াতে কাদের কথা বলা হয়েছে? তাদের কর্মকাণ্ড উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত আয়াতটির সামাজিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করো।

১০. তাজুল ইসলাম তার দুই প্রতিবেশীর মধ্যে কথা লাগালাগি করে প্রচন্ড ঝগড়া বাঁধিয়ে দিল। সাইফুল এ ধরনের কার্যক্রম থেকে বিরত থাকতে বললে প্রতি উত্তরে তাজুল বলল, আমিতো শান্তি স্থাপনকারী মাত্র। তাদের বন্ধু বিপ্লব সব শুনছিল। সে বলল, রাখ তোর কুরআন, আল্লাহ আর পরকাল। আমি এর কোনটাই বিশ্বাস করি না। আমার কোনো চিন্তা নেই। আমার যা মনে আসে তাই করি। *[ব. বো. '২১]*

ক. খাতামুন (خَتَمَ) অর্থ কী?

খ. সালাত কায়েম বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো।

গ. সূরা আল-বাকারার আলোকে তাজুলের কার্যক্রম কোন ধরনের অনাচার? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. ব্যক্তিজীবনে বিপ্লবের চিন্তাধারার প্রভাব বিশ্লেষণ করো।

১১. "আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে যদি তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকে, তাহলে এর মতো একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এসো।" তিনি বললেন, "নিশ্চয়ই আমি যা জানি, তোমরা তা জান না"। *[ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., দি. বো. '২১]*

ক. 'কুরআন' অর্থ কী?

খ. "এটা সেই কিতাব যাতে কোনো সন্দেহ নেই"— ব্যাখ্যা করো।

গ. দ্বিতীয় বাক্যের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বর্ণনা করো।

ঘ. উদ্দীপকে কোন বিষয়ের চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে? কারো পক্ষে এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা সম্ভব কি না? ব্যাখ্যা করো।

১২. মহান আল্লাহ একটি জাতিকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি হিসেবে পাঠাতে চাইলেন, কিন্তু ফেরেস্তারা আপত্তি জানালেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা সেই জাতিকে সৃষ্টি করলেন এবং সব কিছু শিক্ষা দিলেন। অতঃপর ফেরেস্তাদেরকে আদেশ দিলেন সেই প্রতিনিধিকে সম্মানসূচক সিজদা করার জন্য। ইবলিশ ব্যতীত সবাই সিজদা করলেন। *[রা. বো., দি. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. '২২]*

ক. مَلٰٓئِكَةُ (মালাইকা) শব্দের অর্থ কী?

খ. 'তোমরা একসাথে এখান থেকে নেমে যাও'—ব্যাখ্যা লেখো।

গ. فَتَلَقّٰٓى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ (অতঃপর আদম (আ.) তার প্রভুর নিকট থেকে কিছু বাক্য শিখলেন) এর প্রেক্ষাপট বর্ণনা করো।

ঘ. 'সে অমান্য করলো এবং অহংকার করলো'—আল-কুরআনের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

১৩. প্রভাবশালী ব্যক্তি জনাব আশরাফ আলী তার এলাকায় একজন মোড়ল নিয়োগ করতে চাইলে এলাকার সাধারণ জনগণ বিভিন্ন অজুহাত উত্থাপন করে বলেন, তিনি সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারেন বলে তাদের ধারণা। অপরদিকে মাওলানা আকবর ইসলামি জলসায় জনৈক নবি (সা.) এর জান্নাতে থাকা ও বহিষ্কার হওয়া সম্বন্ধে বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেন— 'তাঁর একটিমাত্র ভুলের কারণে তাঁকে বহুদিন অনুতাপ করতে হয় এবং মহান আল্লাহর শেখানো একটি বাক্যের বদৌলতে তিনি মুক্তি পান।' *[রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. '১৮]*

ক. ইসরাইল শব্দের অর্থ কী?

খ. 'মান্না' ও 'সালওয়া' বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকের ঘটনাটি কুরআনের কোন আয়াতের ঘটনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. মাওলানা আকবরের বক্তব্যের নবিকে চিহ্নিত করে তাঁর মুক্তি পাওয়ার বিষয়টি সবিস্তারে আলোচনা করো।

২

আল-হাদিস

Al-Hadith

প্রধান প্রধান শব্দ

- রাবি
- সনদ
- মতন
- উসওয়াতুন হাসানা
- মুনাফিক
- সহিহ
- সুনান
- সিহাহ সিত্তাহ

ইসলামি জীবন বিধান তথা শরিয়তের প্রধান দুটি উৎস হলো আল-কুরআন ও আল-হাদিস। হাদিস কুরআন মাজিদের সর্বোৎকৃষ্ট ভাষ্য, সর্বোত্তম ব্যাখ্যা। হাদিস তথা সুন্নাহ অনুসরণের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জন্য দীনের পথে চলা খুব সহজ হয়। ইসলামি জীবন দর্শন ও জীবনব্যবস্থার অবয়ব নির্মাণে হাদিস সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আল-কুরআনের নির্দেশাবলির মর্মার্থ অনুধাবন এবং বাস্তব জীবনে এর যথার্থ অনুশীলনে হাদিসের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা একান্ত অপরিহার্য। এ কারণেই যুগে-যুগে, দেশে-দেশে হাদিসের সংকলন, অনুবাদ ও বিশ্লেষণের উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায় হাদিসসমূহকে সাধারণত মুখস্থকরণের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষাদান, শিক্ষাগ্রহণ এবং বাস্তবজীবনে অনুশীলনের মাধ্যমেও হাদিস সংরক্ষিত হয়েছে। হিজরি দ্বিতীয় শতকের শুরুতেই হাদিস সংগ্রহের কাজ শুরু হয় এবং তৃতীয় শতকে ব্যাপক আকারে হাদিস সংকলন করা হয়। এ সময় সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম, জামে তিরমিযি, সুনান আবু দাউদ, সুনান নাসাঈ, সুনান ইবনে মাজাহ নামক বিশ্ববিখ্যাত হাদিসের গ্রন্থসমূহ সংকলিত হয়। ইসলামি জীবনব্যবস্থায় কুরআনের পরেই হাদিসের স্থান। ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানে কুরআন যেন প্রদীপসম আর হাদিস সে প্রদীপের বিচ্ছুরিত আলোক রশ্মি। বস্তুত মহানবি (সা.)-এর হাদিস আমাদের জীবন গঠনের অন্যতম পাথেয়। আল-কুরআনের পরেই হাদিসের অবস্থান। শরিয়তের অন্যতম দলিল হিসেবে হাদিসে বর্ণিত মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর আদেশ নিষেধ মেনে চলা, সব কাজে তাঁর আনুগত্য করা ইমানের নিদর্শন, পরিচায়ক।

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে যা যা শিখব

- হাদিসের পরিচয়, সংরক্ষণ, সংকলন, গুরুত্ব এবং প্রকারভেদ
- আল কুরআনের সাথে হাদিসের সম্পর্ক ও পার্থক্য
- সিহাহ সিত্তাহ ও প্রসিদ্ধ ছয় ইমামের জীবন এবং কর্ম
- নৈতিক জীবন গঠনে হাদিসের ভূমিকা এবং বাস্তব জীবনে তা প্রয়োগ
- নির্বাচিত পঁচিশটি হাদিসের অনুবাদ ও শিক্ষা এবং বাস্তবজীবনে তা প্রয়োগ

পাঠ পরিকল্পনা

পাঠ ১	হাদিসের পরিচয়
পাঠ ২	রাবি, সনদ ও মতন
পাঠ ৩	হাদিস, সুন্নাহ, আছার ও খবর
পাঠ ৪	আল-কুরআনের সাথে হাদিসের সম্পর্ক ও পার্থক্য
পাঠ ৫	ইতিহাস রচনায় হাদিসের ভূমিকা
পাঠ ৬	হাদিস সংরক্ষণ
পাঠ ৭ ও ৮	হাদিস সংকলন
পাঠ ৯ ও ১০	সিহাহ সিত্তাহ ও প্রসিদ্ধ ছয় ইমাম
পাঠ ১১ ও ১২	হাদিসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা
পাঠ ১৩	হাদিসের প্রকারভেদ
পাঠ ১৪ ও ১৫	নৈতিক জীবন গঠনে হাদিসের ভূমিকা
পাঠ ১৬	মহানবি (সা.)-এর পঁচিশটি হাদিসের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা: হাদিস নম্বর-১ (ইসলামের মূলভিত্তি সম্পর্কিত)
পাঠ ১৭	হাদিস নম্বর-২ (ইমানের শাখা-প্রশাখা সম্পর্কিত)
পাঠ ১৮	হাদিস নম্বর-৩ (রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা সম্পর্কিত)
পাঠ ১৯	হাদিস নম্বর-৪ (মুনাফিকদের নিদর্শন সম্পর্কিত)
পাঠ ২০	হাদিস নম্বর-৫ (সত্য গ্রহণ ও মিথ্যা বর্জন সম্পর্কিত)
পাঠ ২১	হাদিস নম্বর-৬ (মহান আল্লাহর পথে দান ও জ্ঞানী ব্যক্তি সম্পর্কিত)
পাঠ ২২	হাদিস নম্বর-৭ (ভ্রাতৃত্ববোধ সম্পর্কিত)
পাঠ ২৩	হাদিস নম্বর-৮ (বন্ধু নির্বাচন সম্পর্কিত)
পাঠ ২৪	হাদিস নম্বর-৯ (কর্তব্য ও পরোপকার সম্পর্কিত)
পাঠ ২৫	হাদিস নম্বর-১০ (ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত)
পাঠ ২৬	হাদিস নম্বর-১১ (জুলুমের প্রতিরোধ ও মজলুমের সাহায্য সম্পর্কিত)
পাঠ ২৭	হাদিস নম্বর-১২ (অশ্লীলতা সম্পর্কিত)
পাঠ ২৮	হাদিস নম্বর-১৩ (ইমানের প্রতিবন্ধক দোষাবলি সম্পর্কিত)
পাঠ ২৯	হাদিস নম্বর-১৪ (বৃক্ষরোপণ সম্পর্কিত)
পাঠ ৩০	হাদিস নম্বর-১৫ (ব্যবসায়ে সততা সম্পর্কিত)
পাঠ ৩১	হাদিস নম্বর-১৬ (ঋণের অশুভ পরিণতি সম্পর্কিত)
পাঠ ৩২	হাদিস নম্বর-১৭ (দাতার মর্যাদা সম্পর্কিত)
পাঠ ৩৩	হাদিস নম্বর-১৮ (দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতা সম্পর্কিত)
পাঠ ৩৪	হাদিস নম্বর-১৯ (মহান আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ সম্পর্কিত)
পাঠ ৩৫	হাদিস নম্বর-২০ (হালাল উপার্জন সম্পর্কিত)
পাঠ ৩৬	হাদিস নম্বর-২১ (মাদকদ্রব্যের অশুভ পরিণতি সম্পর্কিত)
পাঠ ৩৭	হাদিস নম্বর-২২ (হারামের পরিণতি সম্পর্কিত)
পাঠ ৩৮	হাদিস নম্বর-২৩ (মৃত্যুপরবর্তীতেও আমলনামা জারি সম্পর্কিত)
পাঠ ৩৯	হাদিস নম্বর-২৪ (জ্ঞানার্জন সম্পর্কিত)
পাঠ ৪০	হাদিস নম্বর-২৫ (রাসুলের নামে মিথ্যাচারের সতর্কতা সম্পর্কিত)

পাঠ ১ হাদিসের পরিচয়
Introduction to Hadith

আল-হাদিস ইসলামি শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস। এটি আল-কুরআনের মূলনীতিসমূহের বাস্তবরূপ ও ব্যাখ্যা। কুরআন মাজিদে আল্লাহ তাআলা যে জীবনবিধান ও আদর্শ উপস্থাপন করেছেন— সাধারণ মানুষের পক্ষে সবসময় তা সহজবোধ্য নয়। সেজন্য এ থেকে তাদের উপকৃত হওয়াও কষ্টকর। এজন্য কুরআনের বক্তব্যসমূহ সর্বসাধারণের উপযোগী করে হাদিস পরিবেশন করেছে। হাদিসকে তাই বলা যায় কুরআনেরই ব্যাখ্যাগ্রন্থ। কার্যত কুরআন ইসলামের মূলপ্রদীপ এবং হাদিস তার বিচ্ছুরিত আলো।

হাদিসের শাব্দিক পরিচয়

আভিধানিকভাবে হাদিস (حَدِيْثٌ) শব্দটি কাদিম (قَدِيْمٌ) শব্দের বিপরীতার্থক। কাদিম অর্থ প্রাচীন বা পুরোনো। কাজেই হাদিস বলতে নতুন ও আধুনিক বিষয়কে বোঝায়।

এগারো শতকের মুসলিম পণ্ডিত **ইমাম রাগিব ইসফাহানী বলেন**— "কোনো একটি অস্তিত্বহীন জিনিসের অস্তিত্ব লাভ করা হচ্ছে হাদিস। জিনিসটি মৌলিক কিংবা অমৌলিক হতে পারে।"

কুরআন মাজিদে হাদিস শব্দটিকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন–

ক. স্বপ্নকালীন কথাবার্তা। কুরআনে এসেছে– وَعَلَّمْتَنِيْ مِنْ تَأْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ

অর্থ: স্বপ্নের কথার ব্যাখ্যা তুমি আমাকে শিখিয়েছ (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ১০১)।

খ. কথা বা বাণী। মহান আল্লাহ বলেন– فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ

অর্থ: এরপর তারা কোন কথাকে বিশ্বাস করবে (সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ১৮৫)।

গ. নতুন সংবাদ, খবর বা নতুন কথা। কুরআন মাজিদে আছে– هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ

অর্থ: সেনাবাহিনীর খবর কি তোমার কাছে পৌঁছেছে? (সূরা আল-বুরুজ, আয়াত: ১৭)।

ঘ. বর্ণনা করা, প্রকাশ করা বা কথা বলা। মহান আল্লাহ বলেন– وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

অর্থ: তুমি তোমার রবের নিয়ামতের কথা বর্ণনা করো (সূরা আদ-দুহা, আয়াত: ১১)।

ঙ. আল্লাহ তাআলা শাব্দিক অর্থে কুরআন মাজিদকেও 'হাদিস' হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন– اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا **অর্থ:** আল্লাহ তাআলা পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ কিতাব হিসেবে সুন্দরতম 'হাদিস' নাজিল করেছেন (সূরা আল-যুমার, আয়াত: ২৩)।

তবে হাদিস শব্দের সাধারণ অর্থ বাণী বা কথা। এ অর্থেই শব্দটির বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যায়। আরবি ভাষায় সুন্নাহ, আছার, খবর প্রভৃতি শব্দকে কখনো কখনো হাদিসের পরিবর্তে ব্যবহার হতে দেখা যায়।

হাদিসের পারিভাষিক পরিচয়

রাসুলুল্লাহ (সা.) মহান আল্লাহর দীন মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন কথা বলতেন, নানা বিষয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতেন এবং বক্তৃতা ও আলোচনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বিষয় তুলে ধরতেন। তাঁর এসব কিছুই হাদিস। তিনি তাঁর জীবনে ইসলামের সব বিধান পালন, লোকদের সাথে লেনদেন এবং প্রয়োজনীয় বৈষয়িক কাজ সম্পাদন করেছেন- এগুলোও হাদিস। সাহাবিদের কথা এবং কাজও হাদিসেরই অন্তর্ভুক্ত যেগুলোর প্রতিবাদ রাসুলুল্লাহ (সা.) করেননি।

কাজেই সংক্ষেপে হাদিসের যে পরিচয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হলো— রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কথা, কাজের বিবরণ এবং মৌন সমর্থনই হচ্ছে হাদিস।

হাদিসের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বিখ্যাত হাদিস বিশারদ ড. **মাহমুদ আত-তহান** বলেন—

اَلْحَدِيْثُ مَا اُضِيْفَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ اَوْفِعْلٍ اَوْتَقْرِيْرٍ۔

অর্থ: যে কথা, কাজ ও সমর্থনের সম্বন্ধ মহানবি (সা.)-এর দিকে করা হয়েছে, তাকে হাদিস বলে।

বুখারি শরিফের ব্যাখ্যাকারী ফাতহুল বারির লেখক **আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.)** বলেন– 'মহানবি (সা.)-এর কথা, কাজ ও মৌন সম্মতিকে হাদিস বলে।'

মিযানুল আখবার প্রণেতা **মুফতি আমিমুল ইহসান** বলেন–

اَلْحَدِيْثُ هُوَ اَعَمُّ مِنْ اَنْ يَّكُوْنَ قَوْلَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحَابِيِّ وَالتَّابِعِيِّ وَفِعْلَهٗ وَتَقْرِيْرَهٗ۔

অর্থ: সাধারণ অর্থে রাসুলুল্লাহ (সা.), সাহাবি ও তাবেয়িগণের বাণী, কাজ ও মৌন সম্মতিকে হাদিস বলে।

সহিহ বুখারি'র ভূমিকায় আছে, হাদিস এমন জ্ঞান, যার সাহায্যে নবি (সা.)-এর কথা, কাজ এবং তাঁর অবস্থা জানা যায়।

জেনে রাখো

ব্যাপক অর্থে রাসুলুল্লাহ (সা.), সাহাবি ও তাবেয়িদের কথা, কাজ ও মৌন সম্মতিকে হাদিস বলা হলেও এদের মর্যাদা ভিন্ন। যেমন- রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাদিসকে **'মারফু'**, সাহাবাদের হাদিসকে **'মাওকুফ'** এবং তাবেয়িদের হাদিসকে **'মাকতু'** বলা হয়।

বহুল প্রচলিত জাল (বানোয়াট) হাদিসগুলোর মধ্য থেকে ৫টি—

- জ্ঞান অর্জনের জন্য সুদূর চীনে যেতে হলেও যাও।
- জ্ঞানীর কলমের কালি শহিদের রক্তের চেয়ে বেশি পবিত্র।
- দেশপ্রেম ইমানের অঙ্গ।
- সবুজ গাছপালা, শস্যের দিকে তাকিয়ে থাকলে দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায়।
- এক ঘণ্টা গভীরভাবে চিন্তা করা ৬০ বছর ইবাদতের সমান।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ইসলামি শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস কী?
২. আল কুরআনের মূলনীতিসমূহের বাস্তবরূপ ও ব্যাখ্যা কী?
৩. হাদিস শব্দের অর্থ কী? *[সকল বোর্ড ২০২৫; ঢা. বো., চ. বো., ব. বো. ২০১৭]*
৪. হাদিস কী? *[রা. বো. কু. বো., চ. বো., ব. বো. ২০১৮]*
৫. হাদিসকে কুরআনের কী বলা হয়?
৬. ব্যাপক অর্থে রাসুলুল্লাহ (সা.), সাহাবি (রা.) ও তাবেয়িগণের (রহ.) বাণী, কাজ ও মৌন সম্মতিকে কী বলে?

উত্তরের জন্য দেখো ১৮২ পৃষ্ঠা।

খ. একক কাজ

শিক্ষার্থীরা হাদিসের পরিচয় সম্পর্কে ১০টি বাক্য খাতায় লিখে শ্রেণিশিক্ষকের কাছে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ২ রাবি, সনদ ও মতন
Rawi, Sanad and Matan

রাবি (رَاوِيٌّ)

রাবি (رَاوِيٌّ) আরবি ভাষায় বিশেষণ শ্রেণির শব্দ। এর অর্থ বর্ণনাকারী (Narrator)। উসুলে হাদিসের পরিভাষায়, যিনি হাদিস বর্ণনা করেন তাকে রাবি বলা হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) যখন কোনো কথা বলতেন উপস্থিত সাহাবিগণ তা মুখস্থ করে রাখতেন। পরে তারা অন্য সাহাবিদের কাছে উক্ত হাদিস বর্ণনা করতেন। তারা আবার অন্য সাহাবির কাছে বা তাবেয়িদের কাছে বর্ণনা করতেন। তাবেয়িরা আবার অন্য তাবেয়িদের কাছে বর্ণনা করতেন। এভাবে যিনিই হাদিস বর্ণনা করেছেন তিনিই রাবি।

সনদ (سَنَدٌ)

সনদ (سَنَدٌ) আরবি বিশেষ্যবাচক শব্দ। এর অর্থ নির্ভর করা, ভরসা করা, বর্ণনাসূত্র ইত্যাদি।

উসুলে হাদিসের পরিভাষায়– هُوَالطَّرِيْقُ الْمُوْصِلَةُ اِلَى الْمَتْنِ **অর্থ:** হাদিস মূল বক্তব্যে পৌঁছা পর্যন্ত পথ তথা ধারাবাহিকতাকে সনদ বলে। বিখ্যাত হাদিস বিশারদ **ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) বলেন**— 'সনদ হলো রাবিদের নামের ধারাবাহিক তালিকা, যা রাসুলুল্লাহ (সা.) পর্যন্ত পৌঁছেছে।'

মতন (مَتْنٌ)

মতন (مَتْنٌ) আরবি বিশেষ্যবাচক শব্দ। এর অর্থ (اَلْاَصْلُ) বা মূল, দৃঢ়, মজবুত ইত্যাদি। উসুলে হাদিসের পরিভাষায়— اَلْمَتْنُ هُوَ اَلْفَاظُ الْحَدِيْثِ **অর্থ:** হাদিসের মূল শব্দাবলিকে মতন বলা হয়। অর্থাৎ হাদিসকে বলা হয় মতন। অন্যভাবে বলা যায়, হাদিস বর্ণনাকারী যা বর্ণনা করেছেন তাকে মতন বলা হয়। রাবি, সনদ ও মতন এর উদাহর—

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيِّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. (صَحِيْحُ الْبُخَارِىْ)

অর্থ: আলকামা বিন ওক্কাছ আল-লাইছি (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন— আমি উমর বিন খাত্তাব (রা.) হতে শুনেছি যে তিনি (উমর বিন খাত্তাব রা.) মসজিদের মিম্বারে বসে বলেছেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই কর্মসমূহ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল (সহিহ বুখারি)।

এ হাদিসে عَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيِّ এবং عُمَرَبْنُ الْخَطَّابِ হচ্ছেন রাবি। عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيِّ থেকে سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ পর্যন্ত অংশটুকু সনদ। اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ অংশটি মতন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. রাবি (رَاوِيٌّ) শব্দের অর্থ কী? *[ঢা. বো., চ. বো., ব. বো. ২০১৭]*
২. উসুলে হাদিসের পরিভাষায়, যিনি হাদিস বর্ণনা করেন তাকে কী বলে?
৩. হাদিস বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতাকে কী বলা হয়? *[সকল বোর্ড ২০১৮]*
৪. হাদিসের মূল বক্তব্যে পৌঁছা পর্যন্ত পথ তথা ধারাবাহিকতাকে কী বলে?
৫. মতন (مَتْنٌ) কী? *[সকল বোর্ড ২০১৯]*
৬. হাদিসের মূল বক্তব্যকে কী বলা হয়? *[সকল বোর্ড ২০১৭]*

উত্তরের জন্য দেখো ১৮২ পৃষ্ঠা।

পাঠ ৩ হাদিস, সুন্নাহ, আছার ও খবর
Hadith, Sunnah, Aasar and Khabar

হাদিসের চারটি পরিভাষা হচ্ছে– হাদিস, সুন্নাহ, খবর ও আছার। এ চারটির পরিচয়, পার্থক্য ও সম্পর্ক নিম্নরূপ–

১. **আভিধানিক অর্থে–** হাদিস (حَدِيْثٌ) অর্থ– কথা, বাণী, ঘটনা; সুন্নাহ (سُنَّةٌ) অর্থ– চলার পথ, কর্মের নীতি ও পদ্ধতি; আছার (اَثَرٌ) অর্থ– চিহ্ন, নিদর্শন; খবর (خَبَرٌ) অর্থ– সংবাদ।

২. **পরিভাষায়–** نُزْهَةُ النَّظَرِ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে,

- اَلْحَدِيْثُ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ **অর্থ:** নবি করিম (সা.)-এর থেকে যা এসেছে তাকে হাদিস বলে। অর্থাৎ নবি করিম (সা.)-এর কথা, কাজ ও মৌন সম্মতি হচ্ছে হাদিস।
- اَلسُّنَّةُ هِيَ طَرِيْقَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَّتِي يَتَحَرَّاهَا
  অর্থ: নবি করিম (সা.) যে কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করতেন তাকে সুন্নাহ বলা হয়।
- وَالْاٰثَارُ مَا جَاءَ عَنِ الصَّحَابِيِّ وَالتَّابِعِيِّ **অর্থ:** সাহাবি ও তাবেয়িদের থেকে যা এসেছে তাকে আছার বলে। অর্থাৎ সাহাবি ও তাবেয়িদের কথা, কাজ ও মৌন সম্মতি হচ্ছে আছার।
- اَلْخَبَرُ مَا جَاءَ عَنْ غَيْرِهِمْ **অর্থ:** নবি করিম (সা.), সাহাবিদের ও তাবেয়িদের ছাড়া অন্যদের কথা ও কাজকে বলা হয় খবর।

৩. জুমহুর মুহাদ্দিসের মতে, হাদিস, সুন্নাহ, আছার ও খবরের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। একেক স্থানে একেক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। মূলত সবগুলো শব্দ দিয়ে একই জিনিস বোঝায়।

৪. **ইবন হাজার আসকালানি (রহ.)** বলেছেন, সব হাদিসই খবর। কিছু কিছু খবর হাদিসের অন্তর্ভুক্ত আর কিছু কিছু খবর হাদিসের অন্তর্ভুক্ত নয়।

৫. উসুলবিদগণ বলেছেন, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বাণীসমূহকে হাদিস বলা হয়। পক্ষান্তরে তাঁর কর্ম, অনুমোদন এবং সাহাবিদের বক্তব্য ও আমলকে বলা হয় সুন্নাহ। শেষ পর্যায়ের (মুতাআখখিরিন) মুহাদ্দিসগণ হাদিস ও সুন্নাহকে একই অর্থে ব্যবহার করেছেন। কুরআন মজিদে اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ বা সর্বোত্তম আদর্শ বলতে সুন্নাহকেই বোঝানো হয়েছে। আবার রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর মহান আদর্শ অনুসরণ করতে মহান আল্লাহ যে নির্দেশ দিয়েছেন তা জানা যায় হাদিস থেকে। এক্ষেত্রে হাদিস ও সুন্নাহ পরস্পর নির্ভরশীল।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সুন্নাহ শব্দের অর্থ কী?
২. আছার শব্দের অর্থ কী?
৩. খবর শব্দের অর্থ কী?
৪. নবি করিম (সা.) যে কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করতেন তাকে কী বলা হয়?

উত্তরের জন্য দেখো ১৮২ পৃষ্ঠা।

খ. একক কাজ

হাদিস, সুন্নাহ, খবর ও আছার-এর পরিচয় লিখে শ্রেণিশিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৪

আল-কুরআনের সাথে হাদিসের সম্পর্ক ও পার্থক্য
Relationship and Difference between Al-Quran and Hadith

কুরআনের সাথে হাদিসের সম্পর্ক

কুরআন মাজিদের সাথে হাদিসের রয়েছে সুগভীর সম্পর্ক। কুরআন ইসলামি জীবনব্যবস্থার হৃৎপিণ্ড, হাদিস তার গুরুত্বপূর্ণ ধমনী। বিভিন্নভাবে এ সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা যায়।

১. **উৎসগত অভিন্নতা:** কুরআন ও হাদিস উভয়ই আল্লাহ তাআলার অবিনশ্বর সত্তা থেকে উৎসারিত। অবশ্য কুরআন প্রত্যক্ষ ওহি; কিন্তু হাদিস পরোক্ষ।

২. **উদ্দেশ্যগত অভিন্নতা:** কুরআন মাজিদ ও হাদিস এক এবং অভিন্ন উদ্দেশ্যে এসেছে। বিশ্বমানবকে চিরকল্যাণের সিরাতুল মুস্তাকিম বা সরল-সঠিক পথপ্রদর্শনই এদের একমাত্র লক্ষ্য।

৩. **বিষয়গত অভিন্নতা:** কুরআনের পর সব ধরনের জ্ঞানের মধ্যে সবচেয়ে উন্নত তথ্য ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ জ্ঞান হলো হাদিস। কুরআনে যে বিষয়ের বর্ণনা এসেছে হাদিসে সে বিষয়েরই বিস্তৃত বর্ণনা স্থান পেয়েছে। হাদিস নতুন কোনো বিষয়ের তাৎপর্যহীন আলোচনা পেশ করেনি।

৪. **বিধানগত অভিন্নতা:** কুরআন মাজিদ ও হাদিস প্রবর্তিত বিধানাবলির মধ্যেও রয়েছে চমৎকার মিল। কুরআন যে বিষয়কে হালাল ঘোষণা করেছে হাদিসে তা হারাম ঘোষিত হয়নি। আবার কুরআনে হারাম ঘোষিত কোনো বিষয়ও হাদিস হালাল ঘোষণা করেনি।

৫. **নির্ভরশীলতার সম্পর্ক:** হাদিস কুরআন মাজিদের ব্যাখ্যা ও বাস্তবরূপ। যে জন্য হাদিস ছাড়া আল-কুরআন বোঝা সম্ভব নয়। আবার কুরআনকে বাদ দিয়ে হাদিসেরও নিজস্ব কোনো মান নেই। তাই হাদিস ও কুরআন পরস্পর নির্ভরশীলতার সম্পর্কে আবদ্ধ।

৬. **উপযোগিতাগত অভিন্নতা:** হেদায়েতের পথে চলা এবং গোমরাহি থেকে বেঁচে থাকা কুরআন ও হাদিস উভয়ই মেনে চলার ওপর নির্ভর করে। কেউ এককভাবে যেকোনো একটির ওপর আমল করে হেদায়েতের ওপর টিকে থাকতে পারে না।

৭. **অন্যান্য অভিন্নতা:** কুরআন শিক্ষা, পাঠ এবং যত্ন নেওয়ার ব্যাপারে হাদিসে উৎসাহিত করা হয়েছে; সওয়াবের কথা বলা হয়েছে। যেমন— রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন— 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে ও অন্যকে শিক্ষা দেয়' (বুখারি)।

তিনি আরো বলেন— 'যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআনের একটি অক্ষর পড়বে, সে একটি নেকি পাবে। আর একটি নেকি দশটি নেকির সমপরিমাণ' (তিরমিযি)।

কুরআন মজিদ ও হাদিস শরিফ একটি অপরটির পরিপূরক। কুরআন ও হাদিস মেনে চলে ব্যক্তি যেমন মুমিন হয়- তেমনি এর যেকোনো একটিকে অস্বীকার বা অমান্য করলে সে হয় কাফির। এসব কারণে হাদিসকে কুরআন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার উপায় নেই।

কুরআনের সাথে হাদিসের পার্থক্য

ইসলামি শরিয়তের প্রধান দুটি উৎস কুরআন ও হাদিসের মধ্যে পরিপূরক সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও উভয় উৎসের মধ্যে মৌলিক কিছু পার্থক্যও বিদ্যমান।

কুরআন	হাদিস
১. কুরআন মহান আল্লাহর বাণীসমষ্টি।	১. রাসুলুল্লাহ (সা.) এর বাণীকে বলা হয় হাদিস।
২. কুরআন অর্থ পঠিত।	২. হাদিস অর্থ কথা, বাণী, নতুন, ঘটনা ইত্যাদি।
৩. কুরআন প্রত্যক্ষ ওহির মাধ্যমে নাজিল হয়েছে।	৩. হাদিস মুহাম্মাদ (সা.)-এর অন্তরে সরাসরি এসেছে।
৪. কুরআনকে وَحْيٌ مَتْلُوٌّ বলা হয়।	৪. হাদিসকে وَحْيٌ غَيْرُ مَتْلُوٍّ বলা হয়।

কুরআন	হাদিস
৫. কুরআনের ভাব, ভাষা ও শব্দাবলি স্বয়ং মহান আল্লাহর।	৫. হাদিসের ভাব মহান আল্লাহর তবে ভাষা ও শব্দাবলি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর।
৬. সালাতে কুরআন তিলাওয়াত করা ফরজ।	৬. হাদিস দিয়ে সালাত আদায় করা যায় না।
৭. কুরআনের সব আয়াত মুতাওয়াতির পর্যায়ের।	৭. হাদিসের মধ্যে কিছু মুতাওয়াতির পর্যায়ের, আবার কিছু আহাদ পর্যায়ের।
৮. কুরআন শাশ্বত ও চিরন্তন।	৮. হাদিস শাশ্বত ও চিরন্তন নয়।
৯. কুরআন ফেরেশতার মাধ্যমে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিল হয়েছে।	৯. হাদিস ফেরেশতার মাধ্যমে নাজিল হয়নি।
১০. কুরআন স্পর্শ করতে হলে পবিত্র হওয়া জরুরি।	১০. হাদিস স্পর্শ করতে হলে পবিত্র হওয়া জরুরি নয়, তবে উত্তম।
১১. কুরআন ইসলামি শরিয়তের প্রথম ও প্রধান উৎস।	১১. হাদিস ইসলামি শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস।
১২. কুরআনের সব আয়াতের মর্যাদা সমান।	১২. হাদিসের মধ্যে সহিহ, হাসান, যঈফ, মুতাওয়াতির, আহাদ ইত্যাদি বিবেচনায় মর্যাদাগত পার্থক্য বিদ্যমান।
১৩. কুরআন হচ্ছে তাত্ত্বিক বা Theoritical.	১৩. হাদিস হচ্ছে ব্যাবহারিক বা Practical.
১৪. কুরআনে সব বিষয় সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করা হয়েছে।	১৪. হাদিসে কুরআনের সংক্ষিপ্ত বিষয়াবলিকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।
১৫. কুরআন মহানবি (সা.)-এর সর্বশ্রেষ্ঠ মুজিযা।	১৫. হাদিস কুরআনের মতো মুজিযা নয়।
১৬. কুরআন হিফাজতের দায়িত্বের কথা মহান আল্লাহ নিজে ঘোষণা করেছেন।	১৬. হাদিস হিফাজতের ব্যাপারে সেরকম কোনো ঘোষণা দেওয়া হয়নি।
১৭. কুরআনের প্রতিটি হরফ তিলাওয়াত করলে দশটি নেকি লাভের কথা বলা হয়েছে।	১৭. হাদিস পড়ার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ নেকি লাভের কথা বলা হয়নি।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. হাদিস কোন প্রকারের ওহি?

২. কুরআনের পর সব ধরনের জ্ঞানের মধ্যে সবচেয়ে উন্নত তথ্য ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ জ্ঞান কী?

৩. কুরআন মজিদ ও হাদিস শরিফ একটি অপরটির নাম কী?

৪. কুরআন ও হাদিসের যেকোনো একটি অস্বীকারকারী ব্যক্তি কী?

৫. হাদিসের ভাব মহান আল্লাহর, তবে ভাষা ও শব্দাবলি কার?

৬. কুরআন বুঝতে হলে কোনটি অধ্যয়ন করতে হবে? *[সকল বোর্ড ২০২৫]*

উত্তরের জন্য দেখো ১৮২ পৃষ্ঠা।

খ. একক কাজ

শিক্ষার্থীরা দু'টি দলে বিভক্ত হবে। প্রথম দল কুরআনের সাথে হাদিসের সম্পর্ক এবং দ্বিতীয় দল কুরআনের সাথে হাদিসের পার্থক্য বলবে।

পাঠ ৫ ইতিহাস রচনায় হাদিসের ভূমিকা
Role of Hadith in Composing History

হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) এর জীবদ্দশা থেকে শুরু করে হাদিস গ্রন্থাবদ্ধ হওয়া পর্যন্ত সময়ের জীবনযাত্রা ও শাসনব্যবস্থার নিখুঁত চিত্র পাওয়া যায়। আবার এগুলোর মাধ্যমে অতীত দিনের বিভিন্ন জাতি ও শাসকদের জীবনযাত্রার বিশ্বাসযোগ্য বিবরণও জানা যায়। যে জন্য ইতিহাস রচনায় হাদিসের ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

১. **হাদিস ইতিহাস রচনার প্রেরণা:** হাদিস সংগ্রহকারী মুহাদ্দিসদের কর্মপদ্ধতি ইতিহাস রচনার প্রধান প্রেরণা ছিল। তাদের অক্লান্ত শ্রম, আন্তরিকতা, ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, সাধনা এবং হাদিস সংগ্রহ ও সংকলনের ক্ষেত্রে দিন, মাস, বছর হিসেবের নির্ধারিত পদ্ধতি ইতিহাস রচনার নেপথ্য উৎসাহে পরিণত হয়।

২. **হাদিস ইতিহাসের রসদ সরবরাহকারী:** রাসুলুল্লাহ (সা.) ও হাদিসের সাথে সম্পৃক্ত অন্যরা অতীত বা সমকালীন জীবনযাত্রা সম্পর্কে বিস্তারিত এবং প্রামাণ্য বিবরণ উপস্থাপন করেছেন। পাশাপাশি সে সম্পর্কে ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির বিশ্লেষণ পেশ করে ইতিহাসের প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ করেছেন। আর এর পথ ধরে গড়ে উঠেছে ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টাসমূহ।

জেনে রাখো

মানুষের সাথে কথা বলার দিক-নির্দেশনা—

- কথা বলার উদ্দেশ্য হতে হবে উত্তম ও কল্যাণকর।
- কথাবার্তার মাধ্যমে মহান আল্লাহর বিরুদ্ধাচারণ করা যাবে না।
- কথা বলার সময় অসত্য, গিবত তথা পরচর্চা থেকে বিরত থাকতে হবে।
- নিজের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পরিসীমার মধ্যে থেকে কথা বলতে হবে।
- কথায় কথায় কসম খাওয়া যাবে না।
- অন্যকে ছোটো করে কথা বলা যাবে না।
- অনর্থক তর্ক থেকে বিরত থাকতে হবে।
- মানুষের সামনে নিজের প্রশংসা করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

৩. **হাদিস তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে:** মুহাদ্দিসগণ হাদিস সংগ্রহ করে সনদের গ্রহণযোগ্যতা ও সত্যতা নিরূপণে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরিচালনা করেন এবং সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তা গ্রহণ করেননি। মুহাদ্দিসদের এ পদ্ধতি থেকে ঐতিহাসিকগণ তথ্য সংগ্রহ ও ঐতিহাসিক ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ের পদ্ধতি শিক্ষা নিয়েছেন।

৪. **হাদিস ইসলামের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস:** ইসলাম প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠা এবং বিভিন্ন যুদ্ধ-বিগ্রহ, চুক্তি-সন্ধি, ইসলামি গণতন্ত্রের বিদায়, রাজতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তন, মুসলিমদের ভাগ্য বিপর্যয় প্রভৃতি বিষয়ের সর্বাধিক বিশ্বাসযোগ্য উৎস হলো হাদিস। তাই একে বলা যায়, ইসলামের পরিপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য ইতিহাস।

৫. **ব্যক্তিকেন্দ্রিক ইতিহাস রচনার প্রেরণা:** হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পুরো ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় প্রভৃতি জীবনচরিত চিত্রিত হয়েছে, যা ব্যক্তিকেন্দ্রিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নিরন্তর অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কী থেকে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনযাত্রা ও শাসনব্যবস্থার নিখুঁত চিত্র পাওয়া যায়?
২. হাদিস সংগ্রহকারী মুহাদ্দিসগণের কর্মপদ্ধতি কী রচনার প্রধান প্রেরণা ছিল?
৩. কীসের পথ ধরে গড়ে উঠেছে ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টাসমূহ?
৪. কারা হাদিস সংগ্রহ করে সনদের গ্রহণযোগ্যতা ও সত্যতা নিরূপণে ব্যাপক পরীক্ষা-নীরিক্ষা পরিচালনা করেন?
৫. ঐতিহাসিকগণ কোথা থেকে তথ্য সংগ্রহ ও ঐতিহাসিক ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ের পদ্ধতি শিক্ষা নিয়েছেন?
৬. ইসলামের পরিপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য ইতিহাস বলা যায় কাকে?

উত্তরের জন্য দেখো ১৮২ পৃষ্ঠা।

পাঠ ৬ হাদিস সংরক্ষণ
Preservation of Hadith

'আল-হাদিস' ইসলামি শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস। এটি কুরআন মাজিদের পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত। সঙ্গত কারণে কুরআনের মতো তাই হাদিস সংরক্ষণও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। হাদিস সংরক্ষিত হয়েছে মূলত মুখস্থকরণ প্রক্রিয়ায়। এ ছাড়া পারস্পরিক আলোচনা ও শিক্ষাদান এবং বাস্তব জীবনে অনুশীলনের মাধ্যমে সাহাবিগণ হাদিসের সংরক্ষণ অব্যাহত রেখেছিলেন। সর্বসাকুল্যে হাদিস সংরক্ষণের পদ্ধতি ছিল চারটি।

১. **হিফয বা মুখস্থকরণ পদ্ধতি:** হযরত আনাস (রা.) বলেন— 'মহানবি (সা.) কোনো গুরুত্বপূর্ণ কথা বললে তিনি তা তিনবার করে বলতেন, যেন তা মুখস্থ করার ব্যাপারে সাহাবিদের কোনো অসুবিধা না হয়' (বুখারি)। সাহাবিদের জীবনের পাথেয় ছিল মহানবি (সা.)-এর হাদিস। কুরআনের পরে তাঁরা একেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন। এজন্য হাদিস মুখস্থ করে রাখার ক্ষেত্রে তাঁদের সর্বোচ্চ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা ছিল। যেসব সাহাবায়ে কিরাম হাদিস সংরক্ষণে ঐতিহাসিক অবদান রেখে গেছেন, তাঁদের মধ্যে মুকছিরিন (অধিক) হাদিস বর্ণনাকারী ৭ জন সাহাবি হলেন—

ক. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) (মৃত্যু ৫৯ হিজরি), তাঁর বর্ণিত হাদিস সংখ্যা ৫৩৭৪।
খ. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) (মৃত্যু ৭৩ হিজরি), বর্ণিত হাদিস সংখ্যা ২৬৩০।
গ. হযরত আনাস (রা.) (মৃত্যু ৯৩ হিজরি), বর্ণিত হাদিস সংখ্যা ২২৮৬।
ঘ. হযরত আয়েশা (রা.) (মৃত্যু ৫৮ হিজরি), বর্ণিত হাদিস সংখ্যা ২২১০।
ঙ. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) (মৃত্যু ৬৮ হিজরি), বর্ণিত হাদিস সংখ্যা ১৬৬০।
চ. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) (মৃত্যু ৭৮ হিজরি), বর্ণিত হাদিস সংখ্যা ১৫৪০।
ছ. হযরত আবু সাঈদ খুদরি (রা.) (মৃত্যু ৭০ হিজরি), বর্ণিত হাদিস সংখ্যা ১১৭০।

সাহাবায়ে কিরামের পরবর্তী সময়ে হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম হতে তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম সময় পর্যন্ত তাবেয়িগণ হাদিস মুখস্থকরণ এবং ব্যাপক চর্চার মাধ্যমে হাদিস সংরক্ষণের সর্বোত্তম ধারার সূচনা করেন। তাদের সময়ে অসংখ্য হাফিজে হাদিস (হাদিস মুখস্থকারী) বিদ্যমান ছিলেন। এ যুগে হাদিস সংরক্ষণে অবিস্মরণীয় অবদানের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন— ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ি ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)।

২. **লিখন পদ্ধতি:** মুখস্থ করার পাশাপাশি লিখেও হাদিস সংরক্ষণ করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) কুরআন নাজিলের প্রথম পর্যায়ে ঘোষণা দিয়েছিলেন, 'তোমরা আমার পক্ষ থেকে কিছু লিখ না। কুরআন মাজিদ ছাড়া কেউ যদি কিছু লিখে রাখ তাহলে তা মুছে ফেল' (সহিহ মুসলিম)।

তবে এটি কোনো স্থায়ী নির্দেশ ছিল না এবং আম (সাধারণ) নির্দেশনাও নয়। এটি ছিল একটি বিশেষায়িত নির্দেশ। যাদের কাছে কুরআন মাজিদ লিখার পাশাপাশি হাদিস লিখে রাখলে উভয়ের মিলে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল, তাদের জন্য নিষেধাজ্ঞা বহাল ছিল। পরে এ নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়।

ফলে লিখে হাদিস সংরক্ষণের প্রক্রিয়া শুরু হয়। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রা.), আবু বকর (রা.), উমর বিন খাত্তাব (রা.), উসমান (রা.), আলি বিন আবু তালিব (রা.), আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.), আনাস বিন মালিক (রা.), আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.) প্রমুখ সাহাবিগণ হাদিস লিখে সংরক্ষণ করেন।

প্রথম যুগে লিখিত কয়েকটি সহিফা হলো— সহিফায়ে সাদিক, সহিফায়ে আলি, সহিফায়ে সহিহাহ, সহিফায়ে উবাদাহ, সহিফায়ে দাওয়াতে রিসালাহ প্রভৃতি। নিচে এ আলোচনা করা হলো—

ক. **সহিফায়ে সাদিক:** হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) প্রায় এক হাজার হাদিস নিয়ে একটি হাদিসের সংকলন বের করেন যার নাম 'সহিফায়ে সাদিকাহ'। মূলত এটি ছিল একটি নোট বই যেখানে তিনি হাদিস সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করতেন।

খ. **সহিফায়ে আলি:** হযরত আলি (রা.) হাদিস সংগ্রহ ও লিপিবন্ধ করতে পিছিয়ে ছিলেন না। তিনি অল্প সময়ে হলেও বেশকিছু হাদিস লিপিবন্ধ করেন। তাঁর লিপিবন্ধ হাদিসের নামকরণ করা হয় 'সহিফায়ে আলি'।

গ. **সহিফায়ে সহিহাহ:** প্রখ্যাত সাহাবি আবু হোরায়রা (রা.)-এর ছাত্র হুমাম বিন মুনাব্বিহ বেশকিছু হাদিস লিপিবন্ধ করেন। তার নাম হলো 'সহিফায়ে সহিহাহ'।

ঘ. **সহিফায়ে উবাদাহ:** হযরত সাদ ইবনে উবাদা (রা.) যেসব হাদিস লিপিবন্ধ করেন তাকে সহিফায়ে উবাদাহ বলা হয়।

ঙ. **সহিফায়ে দাওয়াতে রিসালাহ:** মহানবি (সা.) বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানদের যেসব চিঠি প্রদান করেছেন এগুলো একত্রিত করে একটি গ্রন্থে রূপ দিয়ে এর নামকরণ করা হয় 'সহিফায়ে দাওয়াতে রিসালাহ'। মূলত এভাবেই মহানবি (সা.)-এর জীবদ্দশায় হাদিস সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কাজ চলতে থাকে।

উপরে উল্লিখিত সহিফা ছাড়াও রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর চিঠিপত্র, সন্ধিপত্র, চুক্তিনামা, সনদ, বিভিন্ন ফরমান ও মক্কা বিজয়ের ভাষণ, বিদায় হজের ভাষণ ইত্যাদি লিখিত আকারে সংরক্ষিত ছিল।

৩. **হাদিস শিক্ষাদান ও চর্চা:** হাদিস সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম ছিল সাহাবিগণের পারস্পরিক হাদিসচর্চা ও শিক্ষাদান। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কোনো বাণী শোনার পরপরই সাহাবিগণ তা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতেন। একে অন্যকে নিজের শোনা হাদিস অবহিত করতেন। কেননা এ মর্মে মহানবি (সা.)-এর সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল। তিনি বলেন— بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ اٰيَةً

অর্থ: একটি আয়াত বা বাণীও যদি হয়, আমার পক্ষ থেকে তা অন্যের কাছে পৌঁছে দাও (সহিহ বুখারি)।

পারস্পরিক শিক্ষাদান ও চর্চা যে হাদিস সংরক্ষণের একটি বড় উপায় আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.)-এর বক্তব্য থেকেও তা প্রতীয়মান হয়। তিনি সব সময় বলতেন— "তোমরা পরস্পর হাদিসচর্চা ও পর্যালোচনা করো। কেননা এর মাধ্যমে হাদিস মুখস্থ করা ও স্মরণ রাখা সম্ভব" (মারিফাতু উলুমিল হাদিস)।

৪. **হাদিসের বাস্তব অনুশীলন:** রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবিগণ নিজেদের জীবনে হাদিসের শিক্ষা ও দর্শন পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিজেদের জীবনকে হাদিস সংরক্ষণের জীবন্ত পদ্ধতিতে পরিণত করেন। নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় এসেছে— সাহাবিগণ রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর যে নির্দেশই পেতেন সাথে সাথে তা পালন করতেন। নিজেদের আচরণ ও কর্মতৎপরতা সে অনুযায়ী গড়ে তুলতেন। এভাবে জীবনে, আচরণে, লেনদেনে এবং চরিত্রে হাদিসের শিক্ষা ও দর্শন ফুটিয়ে তুলে সাহাবিগণ মহানবি (সা.)-এর হাদিস সংরক্ষণ করেন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. হাদিস সংরক্ষিত হয়েছে মূলত কোন প্রক্রিয়ায়?
২. সর্বসাকুল্যে হাদিস সংরক্ষণের পদ্ধতি কয়টি?
৩. মহানবি (সা.) কোনো গুরুত্বপূর্ণ কথা বললে তা কয়বার উচ্চারণ করতেন?
৪. মুকছিরিন (অধিক) হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবি কয়জন?
৫. সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবির নাম কী? *[ঢা. বো., চ. বো., ব. বো. ২০১৭]*
৬. 'সহিফায়ে সাদিকাহ' কার লিখিত হাদিস পুস্তিকা?

উত্তরের জন্য দেখো ১৮২ পৃষ্ঠা।

খ. একক কাজ

শিক্ষার্থীরা দু'টি দলে বিভক্ত হবে। প্রথম দল হাদিস সংরক্ষণে মুখস্থ পদ্ধতি এবং দ্বিতীয় দল লিখন পদ্ধতি সংক্ষেপে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে। শিক্ষক ভালো দলকে পুরস্কৃত করবেন।

পাঠ ৭ ও ৮ হাদিস সংকলন
Compilation of Hadith

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায় হাদিস সংকলন বাস্তব কারণেই সম্ভব ছিল না। হযরত আবু বকর (রা.)-এর সময়ে কুরআন গ্রন্থাবদ্ধ হলে হাদিস সংকলনের পথ প্রশস্ত হয়। খুলাফায়ে রাশেদিনের স্বর্ণযুগে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে হাদিস সংকলনের কিছু উদ্যোগও নেওয়া হয়। প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) নিজে পাঁচশত হাদিসের একখানা সংকলন তৈরি করেন। পরে অবশ্য নিজেই তা বিনষ্ট করে দেন। দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.) শাসনকাজ পরিচালনার জন্য হাদিস লিপিবন্ধ করে শাসকদের কাছে পাঠাতেন। হযরত আলি (রা.) খলিফা অবস্থায় 'সহিফা' নামে একটি সংক্ষিপ্ত হাদিস গ্রন্থ লেখেন।

কিন্তু হাদিসের সর্বজনীন ও ব্যাপক সংকলন এ সময়ে শুরু হয়নি। হাদিসের ধারক-বাহক হওয়ার কারণে সাহাবিগণও গ্রন্থাকারে হাদিস সংকলনের কোনো ব্যাবহারিক প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। যে জন্য হিজরি প্রথম শতাব্দীতে হাদিস সংকলনের কোনো ব্যাপক উদ্যোগ গৃহীত হয়নি।

উমাইয়ারা ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ইসলামি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ব্যাহত হয়। মুসলিম সমাজে বিভিন্ন দল-উপদলের সৃষ্টি হয়। ক্ষমতাসীন শক্তি ও অন্যান্য দল-উপদল নিজেদের ইচ্ছামতো বিভিন্ন হাদিস ব্যবহার করা শুরু করে। তারা এমন সব পদক্ষেপ গ্রহণ করে যাতে ইসলামি শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস হাদিসের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে ওঠে। হিজরি প্রথম শতাব্দীর শেষ দশকে এ অপতৎপরতা আরও বৃদ্ধি পায়। ফলে হাদিসের গ্রন্থাবদ্ধ সংকলন অনিবার্য হয়ে ওঠে। এ সময়ে যেসব অন্যায় তৎপরতা পরিলক্ষিত হয় তা হলো—

ক. শিয়া সম্প্রদায় রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নামে হাদিস তৈরি করে। তারা ঘোষণা দেয় যে, মুহাম্মাদ (সা.)-এর পরে একমাত্র বৈধ খলিফা হলেন হযরত আলি (রা.)। সুতরাং অন্যদের খিলাফত অবৈধ।

খ. ক্ষমতাসীনরা নিজেদের অবৈধ কাজ বৈধ করার জন্য রাসুলের নামে মিথ্যা ও জাল হাদিস তৈরি করে।

গ. ক্ষমতাসীনদের আনুকূল্য ও সাহায্য-সমর্থন পেতে অনেকে তাদের মতানুযায়ী হাদিস তৈরি করে।

ঘ. নিতান্তই ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের জন্য কেউ কেউ হাদিস জালের জঘন্য কাজ শুরু করে।

এ অপতৎপরতা ও অব্যবস্থা সহিহ হাদিসের গ্রন্থাবদ্ধ সংকলন অপরিহার্য করে তোলে। এর ফলে হাদিস সংকলনের ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গৃহীত হয়।

উমর বিন আব্দুল আযিযের শাসনামলে হাদিস সংকলন

হযরত উমর বিন আব্দুল আযিয (রহ.) উমাইয়া খলিফা মনোনীত হওয়ার পর (৯৯-১০১হিজরি) হাদিস সংকলনের বিষয়টি প্রথম রাষ্ট্রীয় মনোযোগ পায়। তিনি সরকারি ঘোষণায় সংশ্লিষ্ট সবাইকে হাদিস সংকলনের নির্দেশ দেন। মদিনার গভর্নর আবু বকর ইবন হাযম (রহ.)কে তিনি লিখে পাঠান— রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাদিসের প্রতি নজর দিন এবং তা লিখে পাঠান।
দ্বিতীয় উমর নামে খ্যাত এই শাসক সাধারণভাবে সবাইকে নির্দেশ দেন— আপনারা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাদিসের প্রতি দৃষ্টি দিন এবং তা সংকলন করুন (ফতহুল বারি)।

হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর হাদিস সংকলন

হিজরি তৃতীয় শতকের খ্যাতিমান ঐতিহাসিক ইবনুল নাদিম তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে হিজরি দ্বিতীয় শতকে সংকলিত প্রায় অর্ধশত হাদিস গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন। এ শতকেই প্রথম পূর্ণাঙ্গ সহিহ সংকলন হিসেবে ইমাম মালিক (রহ.) 'মুয়াত্তা' প্রণয়ন করেন। দ্বিতীয় শতাব্দীতে সংকলিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে ইমাম মাকহুল শামী, ইমাম আব্দুর রাজ্জাক, ইমাম আওযাঈ ও ইমাম আব্দুল্লাহর 'কিতাবুস সুনান,' ইমাম আবু হানিফার 'কিতাবুল আসার', ইমাম মুহাম্মদ ও ইবন ওহাবের 'মুয়াত্তা', ইমাম আহমদ ও ইমাম শাফিয়ির 'মুসনাদ' ও 'কিতাবুল উম্ম', ইমাম সুফিয়ান সাওরির 'জামিউল কবীর' ও 'জামিউস সগীর' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

হিজরি তৃতীয় শতকের হাদিস সংকলন

হিজরি সনের তৃতীয় শতাব্দীকে বলা হয় হাদিস সংকলনের স্বর্ণযুগ। এ শতকের মুহাদ্দিসগণ হাদিস অনুসন্ধানে মুসলিম জাহানের প্রতিটি শিক্ষাকেন্দ্র তন্নতন্ন করে খোঁজেন। তাঁরা পূর্ণ সনদসম্পন্ন হাদিসসমূহ স্বতন্ত্রভাবে সজ্জিত ও বিন্যাস্ত করেন। এ সময়ে সনদের তারতিব ও বিশুদ্ধতার ওপর পূর্ণমাত্রায় গুরুত্বারোপ করা হয়। এ প্রয়োজনের প্রেক্ষিতেই 'আসমাউর রিজাল' নামে রাবিদের বিশ্বাসযোগ্যতা পরীক্ষণ বিজ্ঞান তৈরি হয়। 'ইলমুল জারাহ ওয়াত তা'দীল' এবং 'তানকীদুল

হাদিস' শীর্ষক হাদিস নিরীক্ষার সূক্ষ্ম তত্ত্ব আলাদা বিভাগ হিসেবে গড়ে ওঠে। এ শতাব্দীতেই হাদিস সংশ্লিষ্ট জ্ঞান ও সংস্কৃতি জগতের এক একটি অক্ষয় পিরামিড 'সিহাহ সিত্তাহ' প্রণীত হয়। ইমাম বুখারি, ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযি, ইমাম নাসাঈ, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম ইবন মাজাহ, আলী বিন মাদানি আবু হাতিম, ইবন জারীর তাবারী, ইবন খুযাইমা, আহমদ বিন হাম্বল (রহ) প্রমুখ মুহাদ্দিস এ শতাব্দীর হাদিস সংকলন কাজে পূর্ণতা দান করেন।

পরবর্তী যুগের হাদিস সংকলন: হিজরি তৃতীয় শতাব্দীর পরে হাদিস সংকলনের ওপর কোনো মৌলিক কাজ সম্পন্ন হয়নি এবং হওয়ার প্রয়োজনও ছিল না। এ সময়ে হিজরি দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকের হাদিস গ্রন্থসমূহের ব্যাখ্যা-টীকা ও সম্পাদনা অব্যাহত থাকে। নতুন করে লেখা হয় 'হাদিস সংকলনের ইতিহাস বা তারিখে হাদিস।' এ সময়ে সম্পাদিত হাদিসগ্রন্থের মধ্যে 'মিশকাতুল মাসাবিহ' অত্যন্ত জনপ্রিয়তা পায়।

বিভিন্ন রকমের হাদিসগ্রন্থ

হাদিসগ্রন্থে সংকলিত হাদিসের গুণগত মান, গ্রন্থনা ও বিন্যাসের পদ্ধতি প্রভৃতি বিবেচনায় মুহাদ্দিসগণ নিজ নিজ হাদিস গ্রন্থগুলোকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করেছেন। যেমন—

১. **সহিহ:** যে হাদিসগ্রন্থে সংকলিত হাদিসের রাবিগণ আদিল বা পূর্ণাঙ্গ ন্যায়নিষ্ঠ, প্রখর স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন, সংকলিত হাদিসসমূহের সনদ মুত্তাসিল বা অবিচ্ছিন্ন এবং হাদিসসমূহ সব ধরনের ত্রুটি ও আপত্তিমুক্ত– সে হাদিসগ্রন্থকে 'সহিহ' বলা হয়। যেমন— 'সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম'। এ দুটোকে একত্রে 'সহিহাইন' বলা হয়।

২. **জামি:** যে হাদিসগ্রন্থে আকাইদ, আহকাম, আদব, তাফসির, মানাকিব, ফিতান এবং ছিয়ার ও রিকাক বিষয়ে স্বতন্ত্র অধ্যায়ে হাদিস সংকলিত হয়েছে তাকে 'জামি' গ্রন্থ বলে। যেমন— জামি তিরমিযি।

৩. **সুনান:** যে গ্রন্থে ফিকহশাস্ত্রের তারতিব অনুসারে বিষয়ভিত্তিক হাদিস সংকলিত হয়েছে তাকে সুনান বলে। যেমন- সুনানে নাসাঈ, সুনানে ইবন মাজাহ, সুনানে আবু দাউদ প্রভৃতি।

৪. **মুসনাদ:** যে গ্রন্থে বর্ণনাকারী সাহাবিদের নামের ক্রমানুসারে হাদিসসমূহ বিন্যস্ত করা হয় তাকে 'মুসনাদ' বলে। যেমন- মুসনাদে আহমদ।

৫. **মুজাম:** যে গ্রন্থে হাদিসের শিক্ষকগণের নামের ক্রমানুসারে হাদিসসমূহ বিন্যস্ত করা হয় তাকে মুজাম বলে। যেমন– মুজামে তাবারানি।

৬. **রিসালাহ:** যে গ্রন্থে কেবল কোনো একটি বিষয়ের হাদিসসমূহ সংকলিত হয় তাকে রিসালাহ বলে। যেমন- রিসালাতুত তাওহিদ লি ইবনে খুযাইমা।

৭. **তাসনিফ:** যে হাদিসগ্রন্থ বিষয়বস্তু অনুসারে বিভিন্ন অধ্যায় ও উপঅধ্যায়ে বিন্যস্ত হয় তাকে তাসনিফ বলে। মিশকাতুল মাসাবিহ একটি তাসনিফ গ্রন্থ।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কোন খলিফা পাঁচশত হাদিসের একখানা সংকলন তৈরি করেন?
২. 'সহিফা' নামে একটি সংক্ষিপ্ত হাদিসগ্রন্থ কোন খলিফা লিপিবদ্ধ করেন?
৩. কোন আমলে মুসলিম সমাজে বিভিন্ন দল-উপদলের সৃষ্টি হয়?
৪. ইমাম মালিক রচিত হাদিসগ্রন্থ কোনটি? /সকল বোর্ড ২০২২, ২০১৭/
৫. কে ইসলামের ইতিহাসে 'দ্বিতীয় উমর' নামে খ্যাত?
৬. হিজরি কোন শতককে হাদিস সংকলনের স্বর্ণযুগ বলা হয়?

উত্তরের জন্য দেখো ১৮২ পৃষ্ঠা।

খ. একক কাজ

শিক্ষার্থীরা উমর বিন আব্দুল আযিযের শাসনামলে হাদিস সংকলন সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৯ ও ১০ সিহাহ সিত্তাহ ও প্রসিদ্ধ ছয় ইমাম
Sihah Sittah and Six Eminent Imams

সিহাহ সিত্তাহ হলো— বিশুদ্ধ ছয়টি গ্রন্থ। হিজরি তৃতীয় শতকে হাদিস সংকলনের ক্ষেত্রে ছয়জন মুহাদ্দিস এবং তাদের সংকলিত গ্রন্থ বিশেষভাবে প্রাধান্য পায়। এগুলো সর্বজনীন ও সর্বাঙ্গীণ বিশুদ্ধতার স্বীকৃতি লাভ করে। ইলমে হাদিসের পরিভাষায় এ ছয়টি বিশুদ্ধতম হাদিস গ্রন্থকেই 'সিহাহ সিত্তাহ' বলা হয়। এগুলো হলো— সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম, সুনানে তিরমিযি, সুনানে নাসাঈ, সুনানে ইবন মাজাহ ও সুনানে আবু দাউদ। এগুলোর মধ্যে প্রথম দুটি গ্রন্থকে 'সহিহাইন' (صَحِيْحَيْن) আর অন্য চারটিকে 'সুনানে আরবাআ' (سُنَنِ اَرْبَعْ) বলা হয়ে থাকে। বুখারি ও মুসলিম শরিফের সম্মিলিত বর্ণনাকে 'মুত্তাফাকুন আলাইহি' (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) বলা হয়। এ গ্রন্থগুলোর সংকলক হিসেবে যথাক্রমে ইমাম বুখারি, মুসলিম, তিরমিযি, নাসাঈ, আবু দাউদ ও ইমাম ইবন মাজাহ (রহ.) কালোত্তীর্ণ কীর্তিমান পুরুষের সম্মানে ভূষিত হন। নিচে বিশ্বখ্যাত এ ছয়জন মুহাদ্দিস এবং তাদের সংকলিত হাদিসগ্রন্থগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো।

ইমাম বুখারি (রহ.) ও সহিহ বুখারি

ইমাম বুখারি (রহ.): তাঁর নাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল-বুখারি (রহ.)। ১৯৪ হিজরির ১৩ শাওয়াল মোতাবেক ৮১০ খ্রিষ্টাব্দের ২১ জুলাই শুক্রবার মুসলিম অধ্যুষিত উজবেকিস্তানের 'বুখারা' শহরে এক ধর্মভীরু ও শিক্ষানুরাগী মুসলিম পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বুখারায় জন্মগ্রহণের জন্যেই তিনি বিশ্বখ্যাত হন ইমাম বুখারি (রহ.) নামে। শৈশবেই তিনি পিতৃহারা হন। এ সময়ে এক কঠিন রোগে তিনি অন্ধ হয়ে যান। মায়ের দোয়ায় ও মহান আল্লাহর রহমতে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান। শৈশবে কুরআন, হাদিস, আরবি সাহিত্য, আকাইদ ও ফিকহ সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞানলাভ করেন। ৯ বছর বয়সে তিনি আল-কুরআন হেফজ (মুখস্থ) করেন। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। তাঁর মেধা ও স্মরণশক্তি সম্বন্ধে বলা হয়, তিনি মাত্র একবার পড়লে যে কোনো কিতাব মুখস্থ হয়ে যেত। মক্তবে পড়ার সময়ই তাঁর মনে হাদিস মুখস্থ করার বাসনা জাগ্রত হয়। এ সময় তাঁর বয়স কত ছিল তা জিজ্ঞাসা করায় তিনি নিজে জবাব দিয়েছেন; 'দশ বছর কিংবা তার কম'। ইমাম বুখারি ১১ বছর বয়স থেকেই হাদিস শিক্ষা ও চর্চা শুরু করেন। ১৬ বছর বয়সে বুখারার সব মুহাদ্দিসের কাছে তার হাদিস শিক্ষা সমাপ্ত হয়। এ সময়ে তাঁর ৭০ হাজার হাদিস মুখস্থ ছিল। ২১০ হিজরিতে ইমাম বুখারি মক্কা গমন করেন। এখানে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসদের কাছে তিনি হাদিস শেখেন। হাদিস সংগ্রহের জন্য ইমাম বুখারি বলখ, বাগদাদ, বসরা, কুফা, আসকালান, দামেস্ক, মিসর, সিরিয়া, খোরাসান প্রভৃতি এলাকা সফর করেন। শিক্ষাগ্রহণ শেষে ইমাম বুখারি অধ্যাপনা শুরু করেন। ৯০ হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থী তাঁর কাছ থেকে হাদিসের শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে ইমাম মুসলিম, ইমাম নাসাঈ, ইমাম তিরমিযি (রহ.) অন্যতম। ইমাম বুখারি হাদিসশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে অনেকবার পরীক্ষার সম্মুখীন হন। একবার তিনি সমরকন্দে উপস্থিত হলে প্রায় চারশ মুহাদ্দিস তাঁর কাছে সমবেত হন। তাঁরা আগেই হাদিসশাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি শুনেছিলেন, তাঁরা ইমাম বুখারিকে পরীক্ষা করার জন্য কতগুলো হাদিসের মতন (মূলকথা) তাদের সনদ বা সূত্রসমূহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে অন্য হাদিসের সনদের সাথে জুড়ে দিয়েছিলেন এবং সনদগুলোও উল্টা-পাল্টা করে রেখেছিলেন। ইমাম বুখারি অতি অল্প সময়ের মধ্যে হাদিসগুলোতে কোথায় কী ওলট পালট করা হয়েছে তা ধরিয়ে দিলেন এবং হাদিসগুলো নির্ভুলভাবে সনদসহ সাজিয়ে দিলেন। মুহাদ্দিসগণ বিস্মিত ও মুগ্ধ হলেন এবং তাঁর পাণ্ডিত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। বাগদাদেও তিনি অনুরূপ পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন। ইমাম মুসলিম তাঁকে 'হাদিসের রোগের চিকিৎসক' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ২৫৬ হিজরিতে তিনি ইন্তিকাল করেন।

সহিহ বুখারি: হাদিসশাস্ত্রে ইমাম বুখারি (রহ.)-এর অসামান্য অবদান হলো তাঁর সংকলিত 'সহিহ বুখারি'। একে 'জামি বুখারি'ও বলা হয়। ২১৭ হিজরি সনে ইমাম বুখারি (রহ.) এ অমর গ্রন্থখানি সংকলনে আত্মনিয়োগ করেন। নিজ সংগ্রহের ৬ লক্ষাধিক হাদিস সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে যাচাই-বাছাই করে মাত্র ৭২৭৫টি হাদিসের সমন্বয়ে ২৩৩ হিজরিতে এ

গ্রন্থের রচনা সম্পন্ন করেন। ইমাম বুখারি (রহ.)-এর 'সহিহ বুখারি' হাদিস গ্রন্থগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধ বলে বিবেচনা করা হয়। এর গ্রন্থনা, হাদিস সংকলন পদ্ধতি, সনদের ধারাবাহিকতা প্রভৃতি এ গ্রন্থটিকে সর্বজনগ্রাহ্যতা দিয়েছে। এ জন্যই বলা হয়– "আকাশের নিচে মহান আল্লাহর কিতাবের পর সবচেয়ে বিশুদ্ধ গ্রন্থ হলো 'সহিহ বুখারি'।"

ইমাম মুসলিম (রহ.) ও সহিহ মুসলিম

ইমাম মুসলিম (রহ.): তাঁর নাম আবুল হুসায়ন আসাকারুদ্দীন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রি (রহ.)। তবে তিনি বিখ্যাত হন ইমাম মুসলিম নামে। তিনি ২০৪ হিজরিতে খুরাসানের নিশাপুরে (বর্তমান ইরান) জন্মগ্রহণ করেন। এ জন্য তাকে নিশাপুরীও বলা হয়। ইমাম মুসলিম (রহ.) প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন নিশাপুরে। শৈশবেই হাদিস বিষয়ে তিনি বিশেষ আগ্রহী হয়ে ওঠেন। পরিণত বয়সে তিনি হিজায, ইরাক, সিরিয়া, মিসর প্রভৃতি শহর সফর করেন। শিক্ষাজীবন শেষে ইমাম মুসলিম শিক্ষকতা শুরু করেন। এক্ষেত্রে তুলনাহীন জ্ঞান ও প্রজ্ঞার জন্য খুব শীঘ্রই তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। দেশ-দেশান্তর থেকে অসংখ্য হাদিসপ্রিয় শিক্ষার্থী তাঁর মজলিসে সমবেত হতে থাকেন। ইমাম মুসলিম হাদিসের ওপর বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেন। সহিহ মুসলিম ছাড়া তাঁর উল্লেখযোগ্য দু'টি গ্রন্থ হলো— মুসনাদুল কবীর ও জামিউল কবীর। ২৬১ হিজরিতে মাত্র ৫৭ বছর বয়সে ইমাম মুসলিম (রহ.) ইন্তেকাল করেন। তাঁকে নিশাপুরেই সমাহিত করা হয়।

সহিহ মুসলিম: হাদিসশাস্ত্রে ইমাম মুসলিমের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হলো তার 'সহিহ মুসলিম' গ্রন্থখানা। গ্রহণযোগ্যতার বিচারে সহিহ বুখারির পরেই এর অবস্থান। ইমাম মুসলিম সরাসরি তাঁর ওস্তাদদের কাছ থেকে শ্রুত তিন লক্ষ হাদিস থেকে যাচাই-বাছাই করে দীর্ঘ পনের বছরের অবিশ্রান্ত চেষ্টা-গবেষণায় এ সংকলন কাজ সমাপ্ত করেন। সাম্প্রতিককালে মিসরের প্রখ্যাত হাদিস বিশেষজ্ঞ মুহাম্মদ ফুয়াদ আব্দুল বাকি সহিহ মুসলিমের হাদিসসমূহের ওপর ধারাবাহিক নম্বর বসিয়েছেন। তাতে দেখা যাচ্ছে, সহিহ মুসলিমে ৩০৩৩টি হাদিস রয়েছে। সহিহ মুসলিমের সংকলন সমাপ্ত হওয়ার পর ইমাম মুসলিম (রহ.) তা সমকালীন মুহাদ্দিসদের কাছে পেশ করেন। তাঁরা সবাই ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর নিশ্চিত হন যে, এতে সংকলিত সব হাদিসই সহিহ।

ইমাম তিরমিযি (রহ.) ও সুনানে তিরমিযি

ইমাম তিরমিযি (রহ.): তাঁর নাম আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা আত-তিরমিযি। হিজরি ২০২ সনে মধ্য এশিয়ার ট্রান্স অক্সিয়ানার পাশে ও খোরাসানের জায়হুন নদীর বেলাভূমে অবস্থিত প্রাচীন 'তিরমিয' শহরে (বর্তমান উজবেকিস্তান) জন্মগ্রহণ করেন। জন্মভূমির সাথে সম্পৃক্ত করেই তাঁর নাম 'তিরমিযি' হয় এবং এ নামেই তিনি খ্যাতি লাভ করেন। পারিবারিক প্রথা অনুযায়ী শৈশবে তিনি কুরআন, হাদিস এবং আরবি ভাষা ও সাহিত্যের প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করেন। উচ্চশিক্ষা ও হাদিস সংগ্রহের জন্য ইমাম তিরমিযি হেজাজ, খোরাসান, বসরা, কুফা, ইরাক, রাই প্রভৃতি শহর সফর করেন। প্রায় এক হাজার মুহাদ্দিসের কাছে তিনি হাদিস অধ্যয়ন করেন।

শিক্ষাগ্রহণ শেষে ইমাম তিরমিযি অধ্যাপনা শুরু করেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতা ও প্রজ্ঞা সমসাময়িক আরব বিশ্বে বিপুল আলোড়ন তোলে। পৃথিবীর বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে শিক্ষার্থীরা তাঁর মজলিসে উপস্থিত হতে থাকেন। হাদিসের ওপর তিনি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ সংকলন করেন। 'সুনানে তিরমিযি' ছাড়া তাঁর উল্লেখযোগ্য আরো কয়েকটি গ্রন্থ হলো— শামায়েলে তিরমিযি, কিতাবুল ইলাল, কিতাবুয যুহদ, আসমা ওয়াল কুনা প্রভৃতি।

ইমাম তিরমিযি (রহ.) ২৭০ হিজরির ১৩ রজব ৬৮ বছর বয়সে জন্মভূমি ও কর্মভূমি তিরমিযেই ইন্তেকাল করেন। এখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

সুনানে তিরমিযি: ইমাম তিরমিযি (রহ.)-এর হাদিস সংকলনের নাম 'সুনানে তিরমিযি'। একে 'জামি আত্-তিরমিযি'ও বলা হয় এবং অধিকাংশ মুহাদ্দিস গ্রন্থটিকে এ নামেই গ্রহণ করেছেন। দীর্ঘ শিক্ষার্থী ও শিক্ষকতাজীবনে নিজের বিশাল সংগ্রহ থেকে মাত্র ৩৮৯০টি হাদিস নিয়ে ইমাম তিরমিযি (রহ.) এ সংকলনখানি তৈরি করেছেন। ফিকহশাস্ত্রের ক্রমধারা অনুযায়ী অধ্যায় বিন্যস্ত করে তিনি এতে ব্যাবহারিক প্রয়োজন সম্পন্ন হাদিসসমূহ সন্নিবেশিত করেছেন। পাশাপাশি অন্যান্য অধ্যায়ের হাদিসও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন।

ইমাম নাসাঈ (রহ.) ও সুনানে নাসাঈ

ইমাম নাসাঈ (রহ.): ইমাম নাসাঈ (রহ.)-এর পূর্ণ নাম আব্দুর রহমান আহমদ বিন শুআইব আন-নাসাঈ। ২১৫ হিজরিতে খোরাসানের নাসা নামক শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। নাসার সাথে সম্পৃক্ত করেই তাঁকে বলা হয় নাসাঈ এবং এ নামেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পনের বছর বয়স পর্যন্ত তিনি খোরাসানেই পড়াশোনা করেন। এরপর উচ্চ শিক্ষাগ্রহণের জন্য প্রথমে কুতায়বা বিন সাঈদ বালখীর কাছে ও পরে মিসর গমন করেন। জীবনের অধিকাংশ সময়ই তিনি মিসরে কাটান। ঐ সময়ে তিনি বেশ কিছু গ্রন্থ লেখেন। লোকেরা এ সময়ে তার কাছ থেকে হাদিস শুনতে শুরু করেন। ৩০২ হিজরিতে ইমাম নাসাঈ (রহ.) মিসর ত্যাগ করে দামেস্কে চলে আসেন। এখানে তাঁর লেখায় তিনি হযরত রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বংশধর ও আলি (রা.) এর উচ্চ মর্যাদার কথা তুলে ধরলে উমাইয়া বংশীয় লোকেরা তাঁর ওপর নির্মম নির্যাতন চালায়। তিনি অসুস্থ ও আহত অবস্থায় লোকদের কাছে তাকে মক্কায় পৌঁছে দেওয়ার আবেদন জানান। ৩০৩ হিজরিতে মক্কায় ইমাম নাসাঈ (রহ.) ইন্তেকাল করেন। সাফা-মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

সুনানে নাসাঈ: হাদিসশাস্ত্রে ইমাম নাসাঈ (রহ.)-এর শ্রেষ্ঠতম অবদান তাঁর 'সুনানে নাসাঈ।' ইমাম নাসাঈ প্রথমে 'সুনানে কুবরা' নামে একটি হাদিসগ্রন্থ সংকলন করেন। এতে সহিহ ও দোষযুক্ত দুই রকমের হাদিসই ছিল। পরে এর থেকে কেবল সহিহ হাদিস নিয়ে তিনি একটি সংক্ষিপ্ত সংকলন তৈরি করেন। এর নাম 'সুনানে সুগরা'। এটিই পরে 'সুনানে নাসাঈ' হিসেবে সিহাহ সিত্তাহে অন্তর্ভুক্ত হয়। গ্রন্থখানাতে সংকলিত হাদিসসংখ্যা ৪৪৮২টি। এ গ্রন্থের অপর নাম 'মুজতবা' বা সঞ্চয়িতা। সুনান পর্যায়ে হাদিসের যতগুলো গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে তার মধ্যে সুনানে নাসাঈর পদ্ধতি স্বতন্ত্র। সংযোজন ও বিন্যাসের দিক থেকেও এটি একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

ইমাম আবু দাউদ (রহ.) ও সুনানে আবু দাউদ

ইমাম আবু দাউদ (রহ.): তাঁর নাম সুলায়মান বিন আশআস সিজিস্তানি। তবে তিনি বিশ্বখ্যাত হয়েছেন আবু দাউদ নামে। ২০২ হিজরিতে আফগানিস্তানের কান্দাহার ও চিশত শহরের নিকটবর্তী 'সিজিস্তান' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই তিনি হাদিস শিক্ষা ও সংগ্রহের উদ্দেশ্যে হেজাজ, ইরাক, সিরিয়া, মিসর, খোরাসান প্রভৃতি হাদিসের কেন্দ্রসমূহ সফর করেন। হাদিসে ইমাম আবু দাউদ ছিলেন সমকালীন মুহাদ্দিসদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তার এ শ্রেষ্ঠত্ব ছিল নিরঙ্কুশ ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি যেমন প্রখর স্মরণশক্তির অধিকারী ছিলেন তেমনি তাঁর তাকওয়া বা পরহেজগারীও ছিল সর্বজন স্বীকৃত। এ প্রসঙ্গে ইমাম হাকেম বলেন— 'ইমাম আবু দাউদ তাঁর যুগের হাদিসবিদদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ছিলেন'। ইমাম তিরমিযি ও নাসাঈ (রহ.) হাদিসে তাঁর ছাত্র ছিলেন। ইমাম আবু দাউদের শিক্ষক ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ও ইমাম আহমদের উস্তাদগণ পর্যন্ত তাঁর কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। এ থেকেই হাদিসে তাঁর দক্ষতা ও দখল সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। ২৭৫ হিজরির ১৬ শাওয়াল বসরা নগরীতে ইমাম আবু দাউদ (রহ.) ইন্তেকাল করেন।

সুনানে আবু দাউদ: হাদিসশাস্ত্রে ইমাম আবু দাউদ (রহ.)-এর শ্রেষ্ঠ অবদান তাঁর 'সুনান' গ্রন্থখানি। নিজ সংগ্রহের ৫ লক্ষাধিক হাদিস যথাযথভাবে যাচাই-বাছাই করে মাত্র ৪৮০০টি হাদিস দিয়ে তিনি এ সংকলনটি সম্পন্ন করেন। বস্তুত ফিকহ সম্পর্কিত হাদিসসমূহ সামগ্রিক ও নিরঙ্কুশভাবে সংকলিত হওয়ার কারণে সুনানে আবু দাউদের যে বিশেষত্ব তা সিহাহ সিত্তাহর অন্য কোনো গ্রন্থে নেই।

ইমাম ইবন মাজাহ (রহ.) ও সুনানে ইবন মাজাহ

ইমাম ইবন মাজাহ (রহ.): তাঁর নাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইবন মাজাহ আল-কাজভিনি। ২০৯ হিজরিতে কাজভিন শহরে তাঁর জন্ম হয়। এর সাথে সম্পৃক্ত করে তাঁকে কাজভিনি বলা হলেও তিনি ইবন মাজাহ (রহ.) নামেই প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠেন। তিনি হাদিস, তাফসির ও ইতিহাসের বড় আলেম ছিলেন। শিক্ষাগ্রহণ, শিক্ষাদান এবং হাদিস সংগ্রহের জন্য তিনি মক্কা, মদিনা, বসরা, কুফা, বাগদাদ, ওয়াসত, দামেস্ক, হিমস, মিসর, তিন্নিস, ইস্পাহান, নিশাপুর প্রভৃতি শিক্ষাকেন্দ্রে গমন করেন। তিনি অগণিত শিক্ষকের কাছে হাদিস, তাফসির ও ইতিহাস অধ্যয়ন করেন। তাঁর শিক্ষার্থীর সংখ্যাও অনেক। তাঁর অপর একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'তারিখে মলীহ'। ২৭৩ হিজরি সনে ইমাম ইবন মাজাহ (রহ.) ইন্তেকাল করেন।

সুনানে ইবন মাজাহ: সিহাহ সিত্তার ৬ষ্ঠ গ্রন্থ ইমাম ইবন মাজাহ (রহ.)-এর সুনানে ইবন মাজাহ। এ গ্রন্থে ৪০০০টি মতান্তরে ৪৩৪১টি হাদিস সন্নিবেশিত হয়েছে। ইবন মাজাহ (রহ.)-এর গ্রন্থখানি রচনা, সংযোজন, বিন্যাস ও সৌন্দর্যে সিহাহ সিত্তার অন্য গ্রন্থগুলোর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এতে কোনো অধ্যায় বা হাদিসের পুনরাবৃত্তি করা হয়নি। তাছাড়া এ গ্রন্থে এমন সব হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে, যা সিহাহ সিত্তাহর অন্য গ্রন্থগুলোতে উল্লিখিত হয়নি। এ জন্য ইবন মাজাহ (রহ.)-এর 'সুনান' গ্রন্থখানির ব্যাবহারিক মূল্য সীমাহীন।

এক নজরে সিহাহ সিত্তাহর গ্রন্থগুলোর নাম, সংকলকদের জীবনকাল, জন্মস্থান ও বয়স:

ক্রম	কিতাবের নাম	হাদিস সংখ্যা	সংকলকের নাম	জন্ম (হিজরি)	মৃত্যু (হিজরি)	জন্মস্থান	বয়স (বছর)
১	সহিহ বুখারি	৭২৭৫	আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল-বুখারি রহ.	১৯৪	২৫৬	উজবেকিস্তানের বুখারা শহরে	৬২
২	সহিহ মুসলিম	৩০৩৩	আবুল হুসাইন আসকারুদ্দীন মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল-কুশাইরি রহ.	২০৪	২৬১	খোরাসানের নিশাপুরে	৫৭
৩	জামিউত তিরমিযি	৩৮৯০	আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযি রহ.	২০২	২৭০	খোরাসানের তিরমিয শহরে	৬৮
৪	সুনানে নাসাঈ	৪৪৮২	আবদুর রহমান আহমাদ ইবন শুআইব আন-নাসাঈ রহ.	২১৫	৩০৩	খোরাসানের নাসা শহরে	৮৮
৫	সুনান আবু দাউদ	৪৮০০	সুলাইমান ইবন আশআস আস-সিজিস্তানি রহ.	২০২	২৭৫	চিশত শহরের নিকটবর্তী সিজিস্তানে	৭৩
৬	সুনান ইবনে মাজাহ	৪০০০	আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াজিদ ইবন মাজাহ আল কাজভিনি রহ.	২০৯	২৭৩	কাজভিন শহরে	৬৪

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. 'সিহাহ সিত্তাহ' কী? *[রা. বো., সি. বো. ২০১৯]*
২. বুখারি ও মুসলিম শরিফের সম্মিলিত বর্ণনাকে কী বলা হয়?
৩. 'সহিহুল বুখারি' কে সংকলন করেন? *[সকল বোর্ড ২০১৯]*
৪. সহিহ বুখারিতে কতটি হাদিস রয়েছে?
৫. ইমাম মুসলিম কত হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন? *[ঢা. বো., য. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. ২০১৯]*
৬. গ্রহণযোগ্যতার বিচারে সহিহ বুখারির পরে কোন হাদিস গ্রন্থের অবস্থান?

উত্তরের জন্য দেখো ১৮২ পৃষ্ঠা।

খ. একক কাজ

শিক্ষার্থীরা সিহাহ সিত্তাহ এবং সংকলকদের নামের একটি তালিকা তৈরি করে শ্রেণিশিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ১১ ও ১২ হাদিসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা
Importance and Necessity of Hadith

ইসলামি শরিয়তের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে, এখানে হাদিসকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একে রাখা হয়েছে কুরআন মাজিদের পরেই। শরিয়তের বিধান প্রণয়ন ও প্রবর্তন এবং মূলনীতি ও কর্মপন্থা নির্ধারণের ক্ষেত্রে হাদিস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় উৎস।

১. **মহান আল্লাহর নির্দেশ:** হাদিস মেনে চলার এবং হাদিসের অনুসরণ ও অনুশীলন করার নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন— وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ. وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا.

অর্থ: আর রাসুলুল্লাহ (সা.) তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক (সূরা আল-হাশর, আয়াত: ৭)। সে জন্য হাদিস মূলত মহান আল্লাহরই নির্দেশ। কোনো মুসলিমই একে উপেক্ষা বা অস্বীকার করতে পারেন না।

২. **শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস:** আল-কুরআন ইসলামি শরিয়তের প্রথম এবং প্রধান উৎস। কেননা এ হলো মহান আল্লাহর প্রত্যক্ষ ওহি। তাঁর শাশ্বত কালাম। হাদিস শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস। কারণ মহান আল্লাহর ওহি হলেও এটি প্রত্যক্ষ নয়। এ হলো পরোক্ষ ওহি। মহানবি (সা.) মানুষের উপযোগী করে এ ওহি নিজস্ব ভাষায় পরিবেশন করেছেন। একে বাদ দিয়ে ইসলামি শরিয়ত গতিহীন ও ব্যর্থ হতে বাধ্য।

৩. **আল-কুরআনের তাফসির:** হাদিস হলো আল-কুরআনের সংক্ষিপ্ত মূলনীতিসমূহের ব্যাখ্যা। কুরআন মাজিদের ব্যাখ্যাদানের এ দায়িত্ব নিয়েই মহানবি (সা.) আবির্ভূত হয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ.

অর্থ: আর আপনার কাছে আমি কুরআন নাজিল করেছি যেন মানুষের সামনে আপনি সেসব বিষয় বর্ণনা করেন যেগুলো তাদের প্রতি নাজিল করা হয়েছে, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে (সূরা নাহল, আয়াত: ৪৪)।
সাহাবিগণ কুরআনের বিভিন্ন বিধান সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সা.)কে প্রশ্ন করেছেন। তিনি তার জবাব দিয়েছেন। এভাবে হাদিস পরিণত হয়েছে কুরআন মাজিদের ব্যাখ্যা গ্রন্থে। সে জন্য হাদিসের সাহায্য গ্রহণ ছাড়া কুরআন মাজিদের যথাযথ ব্যাখ্যা, অর্থ, এর সঠিক উদ্দেশ্য ও ভাবধারা নিরূপণ করা এক কথায় অসম্ভব।

৪. **রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনাদর্শ:** হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কথা, কাজ, মৌন সম্মতি, নিদ্রিত ও জাগ্রত অবস্থা এবং অন্যান্য তৎপরতা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে নিখুঁতভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে। হাদিস তাই রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনাদর্শ ও জীবনদর্শনের বাস্তব প্রতিকৃতি। এর মধ্যেই তাঁর জীবন যেন বিমূর্ত হয়ে উঠেছে। আর বিশ্বমানবের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ হলেন রাসুলুল্লাহ (সা.)। মহান আল্লাহ বলেন— لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

অর্থ, আয়াত: নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রাসুলুল্লাহ (সা.) এর জীবনে রয়েছে সুন্দরতম আদর্শ (সূরা আল-আযহাব, আয়াত: ২১)। মহানবি (সা.)-এর জীবনাদর্শের বিপুল গুরুত্বের কারণেও হাদিস গুরুত্বপূর্ণ।

৫. **রিসালাতের অন্যতম উপাদান:** হযরত মুহাম্মাদ (সা.) মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসুল হিসেবে যে সব বিষয় নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন হাদিস তার অন্যতম। আল্লাহ তাআলা বলেন—

هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ.

অর্থ: তিনি মহান আল্লাহ, যিনি নিরক্ষর লোকদের কাছে তাদের মধ্য থেকেই একজন রাসুল পাঠিয়েছেন। তিনি (রাসুল) মহান আল্লাহর আয়াতসমূহ তাদের সম্মুখে তিলাওয়াত করেন। তাদেরকে পরিশুদ্ধ ও সুসংগঠিত করেন এবং তাদেরকে শিক্ষা দেন কুরআন ও হিকমাহ (সূরা আল-জুমুআহ, আয়াত: ২১)। আয়াতে 'হিকমাহ' বলে হাদিসের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৬. **জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস:** রাসুলুল্লাহ (সা.) নিরক্ষর ছিলেন। কিন্তু তিনি জ্ঞানহীন ছিলেন না বরং আল্লাহ তাআলা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় তাঁকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী মানুষে পরিণত করেন। যে জন্য রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী মানুষের প্রয়োজনীয় পার্থিব ও অপার্থিব জ্ঞানের এক নির্ভরযোগ্য উৎস।

৭. **ঐতিহাসিক দলিল, আয়াত:** ইতিহাসের প্রামাণ্য উৎস হাদিস। স্বাভাবিকভাবেই হাদিসে রাসুল চরিত সংরক্ষিত ছিল। সমকালীন মানুষের চিন্তা-ভাবনা, রুচি, যুদ্ধ-বিগ্রহ, সাধনা প্রভৃতির বিচরণও হাদিসের অন্তর্ভুক্ত। পূর্ববর্তী নবি-রাসুল ও তাদের উম্মতদের জীবনযাত্রার নির্ভরযোগ্য বিবরণ আছে হাদিসে। তা ছাড়া হাদিস সংরক্ষণ, সংগ্রহ, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ পরবর্তীকালের মানুষের কাছে ইতিহাস চর্চার প্রেরণা হয়ে ওঠে। বিশ্বাসযোগ্য পদ্ধতি এবং ইমানি দায়িত্বের সাথে হাদিস সংরক্ষিত হয়েছে বলে একে বলা যায় ইতিহাসের সর্বাধিক নির্ভরতাসমৃদ্ধ উপাত্ত ও দলিল।

৮. **মহান আল্লাহর ভালোবাসা লাভের উপায়, আয়াত:** মহান আল্লাহর ভালোবাসা ও সন্তুষ্টি লাভের ক্ষেত্রে হাদিস বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেননা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর অনুসরণ করলে মহান আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়া যাবে। আর রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর অনুসরণের অর্থ হলো হাদিসের অনুসরণ। মহান আল্লাহ বলেন— قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ **অর্থ, আয়াত:** হযরত মুহাম্মাদ (সা.) তুমি বল, যদি তোমরা মহান আল্লাহর ভালোবাসা পেতে চাও, তাহলে আমার অনুসরণ কর। তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমাদের ভালোবাসবেন (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৩১)।

৯. **মুমিন হওয়ার শর্ত:** বিনা প্রশ্নে, নির্দ্বিধায় রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বিচার-ফয়সালা ও আদেশ-নিষেধ মেনে না নিলে মুমিন হওয়া যাবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন— 'তোমার রবের কসম, তারা কখনোই মুমিন হতে পারবে না যদি না তারা তাদের পারস্পরিক সব ব্যাপারে তোমাকে সিদ্ধান্তকারীরূপে মেনে নেয় এবং তোমার ফয়সালা নিঃশর্তে পালন করে' (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৬৫)। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বিধি-নিষেধ ও বিচার-ফয়সালা বিবৃত হয়েছে হাদিসে। তাই পূর্ণাঙ্গ মুমিন হওয়ার ক্ষেত্রেও হাদিস গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়।

হাদিস হলো ইসলামি জীবনব্যবস্থায় পূর্ণতার জীবন্ত দৃষ্টান্ত। গতিশীল মানবজীবনে প্রতিনিয়ত উদ্ভূত নানা সমস্যার যৌক্তিক সমাধানের পথ উন্মুক্ত রেখে হাদিসই ইসলামকে পরিপূর্ণতার মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে।

১০. **ধর্মীয় গুরুত্ব:** হাদিসের ধর্মীয় গুরুত্ব অপরিসীম। এতে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বিধি-নিষেধ এবং মহান আল্লাহর আইনের ব্যাখ্যা অন্তর্ভুক্ত থাকে। হাদিস মেনে চলা মানে মহান আল্লাহকে মেনে চলা। একে অস্বীকার করা তাই মহান আল্লাহকে অস্বীকারেরই নামান্তর। কেননা আল্লাহ তাআলাই রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে হাদিস দিয়ে পাঠিয়েছেন। এ জন্য কেউ যদি হাদিস অস্বীকার করে সে মুমিন থাকবে না। সে কাফির হয়ে যাবে।

জেনে রাখো

হাদিস তথা সুন্নাহ অনুসরণের মাধ্যমে মানুষ উপকৃত হতে পারে। যেমন:

- সালাম দেওয়ার মাধ্যমে মানুষের সাথে সু-সম্পর্ক তৈরি হয়।
- মেসওয়াক করার মাধ্যমে মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়, দাঁত মজবুত হয়।
- ডান কাত হয়ে শয়নের দ্বারা হৃদপিণ্ড সুস্থ থাকে।
- আহারের পর মিষ্টি খাওয়া খাবার হজম হওয়ার জন্য সহায়ক।
- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র থাকলে দেহ ও মন ভালো থাকে ইত্যাদি।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কুরআন মাজিদের পরেই কীসের অবস্থান?
২. হাদিস মেনে চলার এবং হাদিসের অনুসরণ ও অনুশীলন করার নির্দেশ কে দিয়েছেন?
৩. কোন বিষয়কে বাদ দিয়ে ইসলামি শরিয়ত গতিহীন ও ব্যর্থ হতে বাধ্য?
৪. বিশ্বমানবের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ কে?
৫. আল্লাহ তাআলা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী মানুষে পরিণত করেন?
৬. ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় পূর্ণতার জীবন্ত দৃষ্টান্ত কী?

উত্তরের জন্য দেখো ১৮২ পৃষ্ঠা।

খ. একক কাজ

শিক্ষার্থীরা হাদিসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ১০টি কথা শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ১৩ হাদিসের প্রকারভেদ
Types of Hadith

হাদিসের সনদ, মতন, রাবিদের সংখ্যা, হাদিস বর্ণনার প্রেক্ষিত প্রভৃতি বিবেচনায় মুহাদ্দিসগণ হাদিসকে নানা শ্রেণিতে বিন্যস্ত করেছেন। এখানে পর্যায়ক্রমে এ প্রকারগুলো উল্লেখ করা হলো।

মতনের ভিত্তিতে হাদিসের প্রকারভেদ

মতন বা হাদিসের মূল বক্তব্যের ধরন ও প্রকৃতি অনুযায়ী হাদিস তিন প্রকার।

১. **হাদিসে কওলি (اَلْحَدِيْثُ الْقَوْلِيْ):** কওলি হলো বিবৃতিমূলক হাদিস। যে হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রত্যক্ষ উক্তি স্থান পেয়েছে, তাকে কওলি হাদিস বলে। যেমন— নবি (সা.) বলেন— 'সব কাজ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল'।

২. **হাদিসে ফি'লি (اَلْحَدِيْثُ الْفِعْلِيْ):** ফি'লি হাদিস হলো কর্মমূলক হাদিস। যে হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কোনো কাজ বা তৎপরতার বিবরণ স্থান পেয়েছে তাকে ফি'লি হাদিস বলে। যেমন— হযরত মুগিরা ইবনে শুবা (রা.) থেকে বর্ণিত— তিনি বলেন— আমি নবি (সা.) কে পাগড়ির ওপর মাসেহ করতে দেখেছি।

৩. **হাদিসে তাকরিরি (اَلْحَدِيْثُ التَّقْرِيْرِيْ):** তাকরিরি হাদিস হলো অনুমোদনমূলক হাদিস। সাহাবিগণ রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সামনে কোনো কথা বলেছেন বা কোনো কাজ করেছেন কিন্তু তিনি তাতে বাধা দেননি। এরূপ বিষয়ের বর্ণনা যে হাদিসে স্থান পেয়েছে তাকে তাকরিরি হাদিস বলে। যেমন— ইবন আবু আওফা (রা.) বলেন— 'রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে থেকে আমরা জারাদ বা ফড়িং জাতীয় চড়ুই খেয়েছি।'

সনদের ভিত্তিতে হাদিসের প্রকারভেদ

হাদিসের সনদ বিবেচনায় হাদিসকে তিনটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে। যেমন—

১. **মারফু হাদিস (اَلْحَدِيْثُ الْمَرْفُوْعُ):** যে হাদিসের বর্ণনাধারা মহানবি (সা.) পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে মারফু হাদিস বলে। অর্থাৎ যে হাদিসের মতন বা মূল বক্তব্য মহানবি (সা.)-এর নিজের তাই মারফু হাদিস। যেমন– আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত— তিনি বলেন— রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'মানুষ তার বন্ধুর ধর্ম দিয়ে প্রভাবিত হয়।'

২. **মাওকুফ হাদিস (اَلْحَدِيْثُ الْمَوْقُوْفُ):** যে হাদিসের বর্ণনাধারা কোনো সাহাবি (রা.) পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে মাওকুফ হাদিস বলে। অর্থাৎ সাহাবি (রা.)দের হাদিসই মাওকুফ হাদিস। যেমন– হযরত আলি (রা.) থেকে বর্ণিত— তিনি বলেন— 'মানুষ যা জানে তার ভিত্তিতে তোমরা তাদের সাথে কথা বল।'

৩. **মাকতু হাদিস (اَلْحَدِيْثُ الْمَقْطُوْعُ):** যে হাদিসের বর্ণনাধারা কোনো তাবেয়ি পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে মাকতু হাদিস বলে। অর্থাৎ যে হাদিসের বক্তব্য তাবেয়িদের নিজস্ব-তাই মাকতু হাদিস। যেমন— বিদআতি লোকদের পেছনে সালাত আদায় প্রসঙ্গে প্রখ্যাত তাবেয়ি হাসান বসরি (রহ.) বলেন— صَلِّ وَعَلَيْهِ بِدْعَتُهُ **অর্থ:** 'তুমি তার পেছনে সালাত আদায় কর। কেননা তার বিদআতের দায় তারই ওপর।'

সনদের ধারাবাহিকতার ভিত্তিতে হাদিসের প্রকারভেদ

সনদের (সূত্র) ধারাবাহিকতা বিচারে হাদিসকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—

১. **মুত্তাসিল হাদিস (اَلْحَدِيْثُ الْمُتَّصِلُ):** মুত্তাসিল অর্থ সংযুক্ত বা অবিচ্ছিন্ন। হাদিস বর্ণনার সব স্তরে যে হাদিসে রাবির ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ ও অবিচ্ছিন্ন রয়েছে, কোনো স্তরেই কোনো রাবির নাম বাদ পড়েনি তাকে মুত্তাসিল হাদিস বলে।

২. **মুনকাতি হাদিস (اَلْحَدِيْثُ الْمُنْقَطِعُ):** মুনকাতি অর্থ বিচ্ছিন্ন, বিভক্ত। হাদিস বর্ণনার বিভিন্ন স্তরে যেটির সনদ পুরোপুরি অবিচ্ছিন্ন নয় বরং কোনো না কোনো পর্যায়ে রাবির নাম বাদ পড়েছে তাকে মুনকাতি হাদিস বলে।

রাবির সংখ্যার ভিত্তিতে হাদিসের প্রকারভেদ

রাবি বা বর্ণনাকারীর সংখ্যা বিবেচনায় হাদিস দুই প্রকার। যেমন– ১. মুতাওয়াতির ২. আহাদ

১. **মুতাওয়াতির হাদিস (اَلْحَدِيْثُ الْمُتَوَاتِرُ):** "মুতওয়াতির (مُتَوَاتِرٌ) শব্দের অর্থ— ধারাবাহিকতা, একের পর এক অনুগামী হওয়া, একের পর এক আসা।

পারিভাষিক সংজ্ঞায় আল-মানার প্রণেতা বলেন— মুতাওয়াতির এমন হাদিসকে বলে, যার বর্ণনাকারীর সংখ্যা এত অধিক যে, যাদের সংখ্যা নিরূপণ করা যায় না এবং মিথ্যার ওপর এত অধিক সংখ্যক ব্যক্তির ঐকমত্য হওয়ার ধারণা করা যায় না। আর এ বর্ণনার ধারাবাহিকতা সর্বদা বহাল থাকবে তথা সর্বাবস্থায় বর্ণনাকারীর সংখ্যা সমান হবে।" যেমন— রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন— 'নিশ্চয়ই সব কাজ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল' (বুখারি ও মুসলিম)। এই হাদিসটির বর্ণনাকারী এতো বেশি যে তারা সবাই ভুল বলেছেন তা কোনোভাবেই বলা যাবে না।

২. **হাদিসে আহাদ:** আহাদ শব্দের অর্থ-এক, অদ্বিতীয়, নিরবিচ্ছিন্ন। হাদিসে আহাদের পারিভাষিক সংজ্ঞায় আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) বলেন— "যে হাদিসে মুতাওয়াতির হাদিসের শর্তাবলি পাওয়া যায়নি তাকে হাদিসে আহাদ বলে।" যেমন— রাসুলুল্লাহ (সা.) এর বাণী, তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ ইমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না তার কাছে আমি তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও সব মানুষের চেয়ে প্রিয় হব (বুখারি ও মুসলিম)।

হাদিসে আহাদ তিন প্রকার। যথা—

১. **হাদিসে মাশহুর (اَلْحَدِيْثُ الْمَشْهُوْرُ):** মাশহুর শব্দের অর্থ-প্রসিদ্ধ। পারিভাষিক সংজ্ঞায় আল্লামা মুফতি আমিমুল ইহসান (রহ.) বলেন— যে হাদিসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা দুয়ের অধিক, তবে মুতাওয়াতির পর্যন্ত পৌঁছেনি তাকে মাশহুর হাদিস বলে।

২. **হাদিসে আযিয (اَلْحَدِيْثُ الْعَزِيْزُ):** "আযিয শব্দের অর্থ-মজবুত, শক্তিশালী, বিজয়ী। পারিভাষিক সংজ্ঞায় আল্লামা ড. মাহমুদ আত-ত্বহান (রহ.) বলেন— আযিয ঐ হাদিসকে বলে যার বর্ণনাকারী কোনো স্তরে দু'য়ের অধিক হয়নি।" মুফতি আমিমুল ইহসান বলেন— "যে হাদিসের বর্ণনাকারী দু'জন তাকে আযিয হাদিস বলে।"

৩. **গরিব হাদিস (اَلْحَدِيْثُ الْغَرِيْبُ):** গরিব শব্দের অর্থ-বিরল, অপরিচিত, দুষ্প্রাপ্য। পারিভাষিক সংজ্ঞায় আল্লামা মুফতি আমিমুল ইহসান (রহ.) বলেন— "যে হাদিসের বর্ণনাকারী একজন তাকে গরিব হাদিস বলে।"

রাবির গুণাগুণের ভিত্তিতে হাদিসের প্রকারভেদ

রাবির গুণাগুণ বিবেচনায় মুত্তাসিল হাদিসকে আবার তিনটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে। যেমন–

১. **সহিহ হাদিস (اَلْحَدِيْثُ الصَّحِيْحُ):** যে হাদিসের রাবি পূর্ণস্মৃতিশক্তির অধিকারী ও ন্যায়নিষ্ঠ, যে হাদিস ত্রুটিযুক্ত (মুআল্লাল) নয় এবং কোনো নির্ভরযোগ্য রাবির বর্ণনার বিপরীত (শায)ও নয় সেই মুত্তাসিল হাদিসকে বলা হয় সহিহ হাদিস।

২. **হাসান হাদিস (اَلْحَدِيْثُ الْحَسَنُ):** যে মুত্তাসিল হাদিস ও হাদিসের রাবির মধ্যে সহিহ হাদিসের সব গুণাবলি বিদ্যমান থাকে, কেবল রাবির পূর্ণস্মৃতিশক্তির ক্ষেত্রে কিছুটা ঘাটতি থাকে সে হাদিসকে হাসান হাদিস বলা হয়।

৩. **জঈফ হাদিস (اَلْحَدِيْثُ الضَّعِيْفُ):** যে মুত্তাসিল হাদিস ও হাদিসের রাবির মধ্যে সহিহ হাদিসের এক বা একাধিক গুণ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকে তাকে জঈফ হাদিস বলে।

সনদের রাবির নাম বাদ পড়ার ধরনের ভিত্তিতে হাদিসের প্রকারভেদ

সনদে রাবির নাম বাদ পড়ার ধরন বিবেচনায় মুনকাতি হাদিসকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়।

১. **মুরসাল হাদিস (اَلْحَدِيْثُ الْمُرْسَلُ):** যে হাদিসে প্রথমদিকে রাবির নাম বাদ পড়েছে। তাবেয়ি, সাহাবি (রা.) এর নাম বাদ দিয়ে নিজে সরাসরি রাসুলুল্লাহ (সা.) থেকে হাদিস বর্ণনা করেছে এরকম হাদিসকে মুরসাল হাদিস বলে।

২. **মুআল্লাক হাদিস (اَلْحَدِيْثُ الْمُعَلَّقُ):** যে হাদিসে রাবির নাম বাদ পড়েছে মাঝখান থেকে। সাহাবি (রা.) এর নামের পর এক বা একাধিক রাবির নাম বাদ দিয়ে বর্ণনা করা হাদিসের নাম মুআল্লাক হাদিস।

৩. **মু'দাল হাদিস (اَلْحَدِيْثُ الْمُعْضَلُ):** সনদের যেকোনো জায়গা থেকে দুই বা ততোধিক রাবির নাম বাদ দিয়ে যে হাদিস বর্ণিত হয় তাকে মু'দাল হাদিস বলে।

উল্লিখিত প্রকারগুলো ছাড়াও হাদিসের আরো বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। যেমন—

১. **মুআল্লাল হাদিস (اَلْحَدِيْثُ الْمُعَلَّلُ):** যে হাদিসে এমন গোপন দুর্বলতা বা কারণ থাকে যা তার গ্রহণযোগ্যতার পথে অন্তরায় সে হাদিসকে মুআল্লাল হাদিস বলে।

২. **মুনকার হাদিস (اَلْحَدِيْثُ الْمُنْكَرُ):** যে হাদিসের রাবির বিরুদ্ধে পাপাচার, অমনোযোগিতা এবং বেশি বেশি ভুলের অভিযোগ আছে তাকে মুনকার হাদিস বলে।

৩. **মুদতারিব হাদিস (اَلْحَدِيْثُ الْمُضْطَرِبُ):** যে হাদিসের রাবি হাদিসের সনদে বা মতনে এমন বিশৃঙ্খলাপূর্ণ অবস্থা সৃষ্টি করে যা থেকে প্রকৃত বিষয় অনুধাবন করা বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিস ছাড়া অসম্ভব, এমন রাবির বর্ণিত হাদিসই মুদতারিব হাদিস।

৪. **শাজ ও মাহফুজ হাদিস:** দুই বা ততোধিক ছিকা বা বিশ্বস্ত রাবির বর্ণনার বিরুদ্ধে একজন ছিকা রাবির বর্ণিত হাদিসকে শাজ হাদিস বলে। আর দুই বা ততোধিক ছিকা রাবির হাদিসকে বলে মাহফুজ হাদিস।

হাদিসে কুদসি (اَلْحَدِيْثُ الْقُدْسِيُّ):

হাদিসের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকার হলো হাদিসে কুদসি। কুদসি শব্দের অর্থ— পূত-পবিত্র। এটি মহান সত্তার সাথে সম্বন্ধযুক্ত। এটি মহান প্রভুর সুন্দরতম নাম।

পারিভাষিক সংজ্ঞায় মু'জামুল লুগাতিল ফুকাহা প্রণেতা বলেন— "রাসুলুল্লাহ (সা.) মহান আল্লাহর পক্ষ হতে অবহিত হয়ে বর্ণনা করে থাকেন। যার ভাবার্থ মহান আল্লাহর পক্ষ হতে ইলহাম বা নিদ্রার মাধ্যমে নবি (সা.)-কে জানিয়ে দেয়া হয় আর রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজে তার প্রকাশ ঘটাতেন।"

অর্থাৎ যে হাদিসের ভাব, অর্থ ও কথা মহান আল্লাহর, কিন্তু শব্দ ও ভাষা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর, তাকে হাদিসে কুদসি বলে। যেমন— রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন— মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন, 'রোজা আমার জন্য, আর আমিই এর প্রতিদান দেব।'

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. যে হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রত্যক্ষ উক্তি স্থান পেয়েছে তাকে কী বলে?
২. যে হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কর্মতৎপরতার বিবরণ স্থান পেয়েছে তাকে কী বলে?
৩. সনদ বিবেচনায় হাদিস কত প্রকার? *[সকল বোর্ড ২০১৮]*
৪. যে হাদিসের বর্ণনা ধারা মহানবি (সা.) পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে কী বলে?
৫. মুত্তাসিল (مُتَّصِلٌ) শব্দের অর্থ কী?
৬. মুতাওয়াতির (مُتَوَاتِرٌ) শব্দের অর্থ কী?

উত্তরের জন্য দেখো ১৮২ পৃষ্ঠা।

খ. একক কাজ

শিক্ষার্থীরা 'ক' ও 'খ' নামে দু'টি দলে বিভক্ত হবে। 'ক' দল মতনের ভিত্তিতে হাদিসের প্রকারভেদ এবং 'খ' দল সনদের ভিত্তিতে হাদিসের প্রকারভেদ লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ১৪ ও ১৫ নৈতিক জীবন গঠনে হাদিসের ভূমিকা
Role of Hadith in Forming Moral Life

রাসুলুল্লাহ (সা.) এর গোটা জীবনাদর্শ হাদিসের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর জীবনটা ছিল নৈতিকতায় পরিপূর্ণ। মহান আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ـ

অর্থ: নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ (সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ২১)। আল্লাহ তাআলা তাঁকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন মানুষের হেদায়েতের জন্য। মানুষকে নৈতিকতায় উজ্জীবিত করার জন্য। মানুষের চরিত্রকে সংশোধন করার জন্য। তাদেরকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করার জন্য। মহান আল্লাহ বলেন— 'অবশ্যই মহান আল্লাহ মুমিনদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন; তিনি তাদের মধ্য থেকে তাদের কাছে একজন রাসুল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন' (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৬৪)। রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজেও বলেছেন—

اِنَّمَا بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ ـ

অর্থ: উত্তম চারিত্রিক (নৈতিক) গুণাবলিকে পূর্ণতা দানের জন্যই আমি প্রেরিত হয়েছি (বায়হাকি)।

রাসুলুল্লাহর (সা.)-এর বাণীসমূহ এবং তাঁর কর্মপন্থায় আমরা নৈতিক জীবন গঠনের সব উপাদান খুঁজে পাই। যেমন—

সততা ও সত্যবাদিতা অবলম্বনে: সততা ও সত্যবাদিতা নৈতিক জীবন গঠনের অন্যতম উপাদান। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সারা জীবনে আমরা সততা ও সত্যবাদিতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। তিনি তাঁর জীবনে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সততা ও সত্যবাদিতার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বাল্যকাল থেকে সবাই তাঁকে আল-আমিন বা সত্যবাদী বলে ডাকত। তিনি তাঁর বাণীতেও সত্যবাদিতা অবলম্বনের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন–

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَاِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِىْ اِلَى الْبِرِّ ـ

অর্থ: তোমাদের উচিত সত্যের অনুশীলন করা। কেননা সত্য পুণ্যের পথে পরিচালিত করে (বুখারি ও মুসলিম)।

ব্যবসায়ে বিশ্বস্ততা অবলম্বনে: ব্যবসায়-বাণিজ্য উত্তম পেশা। রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজে ব্যবসায় করেছেন। তিনি সর্বকালের ব্যবসায়ীদের জন্য নৈতিকতার পথ দেখিয়েছেন। তাঁর বাণীমূলক হাদিসেও তিনি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে নৈতিকতা ও বিশ্বস্ততা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন–

اَلتَّاجِرُ الْاَمِيْنُ الصَّدُوْقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَآءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

অর্থ: বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী মুসলিম ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন শহিদদের সাথে থাকবেন (মুসতাদরাক লিল হাকেম)।

তাকওয়া অবলম্বনে: তাকওয়া নৈতিক জীবন গঠনে দুর্গস্বরূপ। তাকওয়াবান ব্যক্তি প্রকাশ্য ও গোপনে সদাসর্বদা নৈতিক জীবনযাপন করে। রাসুলুল্লাহ (সা.) ছিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি তাকওয়াবান ব্যক্তি। তাঁর বাণীমূলক হাদিসেও তিনি বারবার তাকওয়া অবলম্বনের প্রতি উৎসাহিত করেছেন।

তিনি বলেছেন, "তোমরা কি জান কোন জিনিস মানুষকে বেশি জান্নাতে প্রবেশ করাবে? তা হলো তাকওয়া ও উত্তম চরিত্র" (তিরমিযি ও ইবন মাজাহ)।

আমানতদারি অর্জনে: আমানতদারি একটি মহৎ গুণ এবং নৈতিকতার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মহানবি (সা.) ছিলেন আমানতদারির মূর্ত প্রতীক। হিজরতের প্রাক্কালে ভয়াবহ বিপদের মুহূর্তেও তিনি আমানতদারির কথা ভুলে যাননি। শত্রুদের আমানত ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি হযরত আলি (রা.)কে নিজের বিছানায় রেখে যান। বাণীমূলক হাদিসেও আমানতদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অসংখ্য বার। যেমন— তিনি বলেছেন, لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهٗ **অর্থ:** যার মধ্যে আমানতদারি নেই তার ইমান নেই (মুসনাদে আহমাদ)।

ওয়াদা পালনের গুণ অর্জনে: প্রকৃত মুমিন ব্যক্তি ওয়াদা পালনে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। কারণ ওয়াদা পালন নৈতিক জীবনের জন্য আবশ্যক। আমাদের প্রিয় নবি (সা.) নিজে যেমন শতভাগ ওয়াদা পালন করেছেন তেমনি তাঁর উম্মতদেরকে ওয়াদা পালনের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন। ওয়াদা পালন না করার পরিণতিও জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

لَا دِيْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ.

অর্থ: যে ব্যক্তি ওয়াদা পালন করে না তার দীন নেই (মুসনাদে আহমাদ)। মহানবি (সা.)-এর হাদিস অনুসরণ করলে ওয়াদা পালনের গুণ অর্জন করা সহজ হয়।

শালীনতা অর্জনে: শালীন ব্যক্তিকে সবাই ভালোবাসেন ও শ্রদ্ধা করেন। শালীনতা আমাদের নবি (সা.)-এর আদর্শ; যা নৈতিকতার জন্য একান্ত প্রয়োজন। মহানবি (সা.) বাণীসূচক হাদিসে শালীনতার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেছেন—

اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ.

অর্থ: শালীনতা বা লজ্জাশীলতা ইমানের একটি বিশেষ অঙ্গ বা শাখা (বুখারি ও মুসলিম)।

প্রতারণা বর্জনে: নৈতিক জীবন গঠনের যে সব অন্তরায়সমূহ রয়েছে তন্মধ্যে প্রতারণা অন্যতম। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর জীবনে কখনো প্রতারণার আশ্রয় নেননি। তিনি এটি বর্জনের প্রতি কঠোর ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি তিনি বলেছেন—

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّيْ.

অর্থ: যে ব্যক্তি প্রতারণা করে সে আমার উম্মত নয় (মুসলিম)।

হিংসা-বিদ্বেষ পরিহারে: হিংসা-বিদ্বেষ পরিহার করা নৈতিকতাপূর্ণ সুষ্ঠু সুন্দর জীবন গঠনের অন্যতম শর্ত। হাদিসে হিংসা-বিদ্বেষের কুফল আলোচনা করা হয়েছে এভাবে— "তোমরা হিংসা-বিদ্বেষ থেকে বেঁচে থাক। কারণ আগুন যেমন শুকনো কাঠকে খেয়ে ফেলে তেমনি হিংসা-বিদ্বেষ পুণ্যকে খেয়ে ফেলে" (সুনানে আবু দাউদ)।

কর্তব্যপরায়ণতা অবলম্বনে: কর্তব্যে ফাঁকি দেওয়া নৈতিকতার পরিপন্থি। সে কারণে হাদিসে কর্তব্যপরায়ণ হওয়ার প্রতি অত্যধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন— كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

অর্থ: তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। আর তোমাদের প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে (বুখারি)।

সর্বোপরি হাদিস থেকেই নৈতিকতা উৎসারিত। হাদিস অনুযায়ী জীবন গঠন করলে নৈতিকতা পরিপূর্ণতা লাভ করে। জীবন হয় সুন্দর ও আদর্শবান।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাল্যকাল থেকে সবাই রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে কী নামে ডাকত?
২. তাকওয়াবান ব্যক্তি প্রকাশ্য ও গোপনে কেমন জীবনযাপন করেন?
৩. হিজরতের প্রাক্কালে ভয়াবহ বিপদের মুহূর্তেও রাসুলুল্লাহ (সা.) কীসের কথা ভুলে যাননি?
৪. যে ব্যক্তি ওয়াদা পালন করেনা তার কী নেই?
৫. যে ব্যক্তি প্রতারণা করে সে কার উম্মত নয়?
৬. কর্তব্যে ফাঁকি দেওয়া কীসের পরিপন্থি?

উত্তরের জন্য দেখো ১৮২ পৃষ্ঠা।

খ. একক কাজ

শিক্ষার্থীরা নৈতিক জীবন গঠনে হাদিসের ভূমিকা সম্পর্কে ১০টি বাক্য লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ১৬

মহানবি (সা.)-এর পঁচিশটি হাদিসের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা:
১ নম্বর হাদিসের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা
Translation, Explanation and Learning of Hadith No.1

[ইসলামের মূলভিত্তি সম্পর্কিত হাদিস]

অনুবাদ	আরবি
হযরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন— রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। সাক্ষ্য দেওয়া যে, মহান আল্লাহ ছাড়া উপাসনাযোগ্য আর কেউ নেই এবং সুনিশ্চিতভাবেই হযরত মুহাম্মাদ (সা.) মহান আল্লাহর রাসুল, সালাত কায়েম করা, জাকাত আদায় করা, হজ পালন এবং রমজান মাসে সাওম পালন করা (বুখারি ও মুসলিম)।	عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

শব্দার্থ-: عَنِ – থেকে, ابْنِ عُمَرَ – ইবনে উমর/হযরত উমর (রা.)-এর ছেলে আব্দুল্লাহ, رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – মহান আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পুরুষ সাহাবিদের নামের শেষে দোয়া হিসেবে এটি ব্যবহৃত হয়। মহিলা সাহাবির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় رَضِيَ اللهُ عَنْهَا (রাদিয়াল্লাহু আনহা)। قَالَ – তিনি (ইবন উমর) বলেছেন, قَالَ رَسُوْلُ اللهِ – রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন— صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – মহান আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন। (নবি করিম (সা.)-এর নামের শেষে দোয়া হিসেবে এটি ব্যবহৃত হয়)। بُنِيَ – প্রতিষ্ঠিত হয়/স্থাপিত হয়, اَلْاِسْلَامُ – ইসলাম, عَلٰى خَمْسٍ – পাঁচটি ভিত্তির ওপর, شَهَادَةِ – সাক্ষ্য দেওয়া, اَنْ لَا اِلٰهَ – কোনো ইলাহ নেই/উপাসনার যোগ্য কেউ নেই, اِلَّا اللهُ – মহান আল্লাহ ব্যতীত, وَاَنَّ مُحَمَّدًا – এবং নিশ্চয়ই হযরত মুহাম্মাদ (সা.), رَسُوْلُ اللهِ – মহান আল্লাহর রাসুল/প্রেরিত পুরুষ, وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ – আর সালাত কায়েম করা, وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ – আর জাকাত আদায় করা, وَالْحَجِّ – এবং হজ পালন করা, وَصَوْمِ رَمَضَانَ – আর রমজানে সাওম রাখা, مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ – সর্বসম্মত। যে হাদিস ইমাম বুখারি ও মুসলিম (রহ.) এক ও অভিন্ন সনদে নিজ নিজ গ্রন্থে সংকলন করেছেন তাকে 'মুত্তাফাকুন আলায়হি' বলা হয়।

ব্যাখ্যা: মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এ হাদিসে দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইসলামকে পাঁচটি স্তম্ভের ভিত্তিতে স্থাপিত এক প্রাসাদের সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বলেন— ইসলামের রূপক প্রাসাদটি এই পাঁচটি স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান। কাজেই কোনো মুসলমানই এই পাঁচটি মৌলিক কাজ যথাযথরূপে সম্পন্ন করা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র অবজ্ঞা বা অবহেলা দেখাতে পারে না। যদি দেখায় তবে সে ইসলামের মূলকেই উৎপাটিত করে।

ইসলামের প্রথম কথা হলো— মহান আল্লাহর প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব জীবনের সবক্ষেত্রের জন্য স্বীকার করা এবং সেই সাথে হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে সর্বশেষ নবি হিসেবে বিশ্বাস করা ও তাঁর কাছ থেকে পাওয়া বিধি-বিধান সর্বতোভাবে স্বীকার করা। একজন মানুষ যখন মহান আল্লাহর প্রভুত্ব, সার্বভৌমত্ব ও হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর নবুওয়তকে স্বীকার করে নেয়, তখন সর্বপ্রথম তার উপর দিনরাত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পাঁচটি নির্দিষ্ট সময়ে পাঁচবার নামাজ পড়ার কর্তব্য আরোপিত হয়। মনে রাখতে হবে, হাদিসে নামাজ পড়ার কথা বলা হয়নি। এখানে বলা হয়েছে নামাজ কায়েম করার কথা। অর্থাৎ একজন লোক আল্লাহ তাআলা ও রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি ইমান এনে ব্যক্তিগতভাবে নিজে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েই দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারে না, বরং সমাজে নামাজের সুষ্ঠু ব্যবস্থা কায়েম করার চেষ্টাও তাকে অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে কোনো মুসলমানের মধ্যে নামাজ থেকে গাফিল হওয়ার মানসিকতা তৈরি না হয়। কারো মধ্যে গাফিলতি তৈরি হলেও যাতে সে সংশোধিত হয়।

হাদিসে নামাজের পরই জাকাতের উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, ইসলামে নামাজের পরই জাকাতের স্থান ও গুরুত্ব। বস্তুত কুরআন মাজিদ হতে বোঝা যায় যে, ইসলামে নামাজের যতখানি গুরুত্ব, জাকাতের গুরুত্বও ততোখানি। আল-কুরআনের যে যে স্থানে নামাজের উল্লেখ আছে, প্রায় সব স্থানে জাকাতেরও উল্লেখ আছে। জাকাত সম্পর্কে এ কথাও মনে রাখা আবশ্যক যে, ইসলামি রাষ্ট্রে এটা কোনো ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, ব্যক্তিগতভাবে এটা আদায় করলে চলবে না; বরং ইসলামি রাষ্ট্রে জাকাত আদায় করতে হবে বায়তুলমাল বা সরকারি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে। উপরন্তু ইসলামি সমাজে কোনো মুসলমান জাকাত দিতে অস্বীকার করলে ইসলামি রাষ্ট্র তার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করতে বাধ্য।

বস্তুত নামাজকে যদি বলা হয় শারীরিক ইবাদত, তবে জাকাতকে বলতে হবে ধন-সম্পদের ইবাদত। সাওম শারীরিক এবং হজ অনুরূপভাবে শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত। মহান আল্লাহর নির্দেশিত পদ্ধতিতে একাধারে মহান আল্লাহ ও বান্দা উভয়ের হক আদায় করার এটা এক অপূর্ব ব্যবস্থা।

হাদিসে বলা হয়েছে: 'ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি স্তম্ভের উপর স্থাপিত করা হয়েছে।' এর মাধ্যমে স্পষ্টরূপে বোঝা যায় যে, কলেমা, সালাত, জাকাত, সাওম ও হজ ইসলামের 'ভিত্তি' মাত্র। এটাই সমগ্র ইসলাম নয়।

হাদিসটি স্পষ্ট ভাষায় বলছে যে, এই পাঁচটি হচ্ছে ইসলামের ভিত্তিস্তম্ভ; এর উপর ইসলামের বিরাট ও সম্পূর্ণ প্রাসাদটি স্থাপিত হয়েছে। কেউ যদি শুধু ভিত্তি তৈরি করে প্রাসাদের কার্যকারিতা লাভ করতে চায়, তবে সে হয় নির্বোধ, না হয় ইচ্ছা করে নিজেকে ও অন্যান্য মানুষকে ধোঁকা দিতে চায়। কারণ, শুধু ভিত্তি কায়েম হলেই তা কারো বসবাসের যোগ্য হতে পারে না। শুধু এই পাঁচটি কাজ করেই যেমন কেউ ইসলামি পুরো জীবনব্যবস্থার উপকার লাভ করতে পারে না, তেমনি শুধু এতটুকু দ্বারাই কেউ দায়িত্ব এড়াতে পারে না।

জেনে রাখো

ইসলামের প্রতিটি বিষয় অন্তরে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকার করা ও কাজে পরিণত করা ইমানের দাবি। ইমান মানুষকে ভালো কাজে উৎসাহিত করে ও মন্দ কাজ পরিহারে সহায়তা করে। ইমানকে মানুষের আমল তথা নামাজ, রোজা, হজ ও জাকাত ইত্যাদির চালিকা শক্তিও বলা যায়।

শিক্ষা: এ হাদিসের শিক্ষা হলো—

১. ইসলাম যেন একটি প্রাসাদ। পাঁচটি খুটির ওপর তা প্রতিষ্ঠিত। কালেমা, সালাত, জাকাত, সাওম ও হজ ঠিক রেখে ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

২. সালাত ও সাওম সর্বজনীন ইবাদত। ধনী-নির্ধন সবার সমান অংশীদারিত্ব রয়েছে এতে। কেবল মুসলিম হওয়া ছাড়া সালাত ও সাওম আদায় করার জন্য অতিরিক্ত কোনো যোগ্যতার দরকার নেই।

৩. জাকাত অর্থনৈতিক ইবাদত। আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন লোকদের ওপর জাকাত ফরজ করা হয়েছে।

৪. সাওম ধৈর্য, সহনশীলতা ও আত্মিক পরিশুদ্ধতার এক মহান প্রশিক্ষণ।

৫. হজ বিশ্বভ্রাতৃত্বের এক মহাসম্মেলন। এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সাহায্য-সহযোগিতা, সহানুভূতি ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পায়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ইসলাম কয়টি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত?
২. ইসলামে নামাজের পরই কীসের স্থান?
৩. জাকাত কোন ধরনের ইবাদত?
৪. হজ কোন ধরনের ইবাদত?

উত্তরের জন্য দেখো ১৮২ পৃষ্ঠা।

খ. একক কাজ

শিক্ষার্থীরা ইসলামের ভিত্তি সম্পর্কে হাদিসটি লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ১৭

২ নম্বর হাদিসের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা
Translation, Explanation and Learning of Hadith No. 2

[ইমানের শাখা-প্রশাখা সম্পর্কিত হাদিস]

অনুবাদ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন— রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, ইমানের সত্তরটিরও বেশি শাখা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম হলো 'মহান আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই' একথা বলা। আর এগুলোর সর্বনিম্ন শাখা হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা (কাঁটা, পাথর ইত্যাদি) এবং লজ্জাশীলতা ইমানের একটি বিশেষ শাখা (বুখারি ও মুসলিম)।

আরবি

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَّسَبْعُوْنَ شُعْبَةً فَاَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ۔ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

শব্দার্থ: عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ – হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ – মহান আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, قَالَ – তিনি বলেন— قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ – রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, اَلْاِيْمَانُ – ইমান, بِضْعٌ وَّسَبْعُوْنَ – সত্তরটিরও বেশি, شُعْبَةً – শাখা, فَاَفْضَلُهَا – এগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম হলো, قَوْلُ – বলা, لَا اِلٰهَ – কোনো ইলাহ নেই, اِلَّا اللّٰهُ – মহান আল্লাহ ছাড়া, وَاَدْنَاهَا – আর এগুলোর মধ্যে সর্বনিম্ন হলো, اِمَاطَةُ – সরিয়ে দেওয়া/দূর করা, الْاَذٰى – কষ্ট বা কষ্টদায়ক বস্তু, عَنِ الطَّرِيْقِ – রাস্তা থেকে, وَالْحَيَاءُ – আর লজ্জাশীলতা, شُعْبَةٌ – শাখা, مِّنَ الْاِيْمَانِ – ইমানের, مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ – সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম।

ব্যাখ্যা: এ হাদিসে মহানবি (সা.) ইমানের বিভিন্ন শাখা, পর্যায় বা স্তর সম্পর্কে আলোকপাত করে তার একটি শাখার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। ইসলামের মূল স্তম্ভ ইমানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন যে, তা সত্তরেরও অধিক। হাদিসে বিষয়টি বোঝানোর জন্য 'বিদউন' শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। ইবন হাজার আসকালানিসহ বেশিরভাগ শব্দতত্ত্ববিদ মনে করেন 'বিদউন' শব্দটি তিন থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যা নির্দেশ করে। সুতরাং ইমানের সম্ভাব্য শাখা হতে পারে ৭৩ থেকে ৭৯ পর্যন্ত যেকোনো একটি বিজোড় সংখ্যা।

হাদিসে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বা আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের সাক্ষ্যদানকে ইমানের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোন্নত শাখা এবং তার সর্বনিম্ন শাখা বলা হয়েছে লোক চলাচলের রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলাকে। হাদিসে এরকম দুটি শাখা বর্ণনা করে মূলত হক্কুল্লাহ ও হক্কুল ইবাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্দেশ করা হয়েছে। যার তাৎপর্য হচ্ছে, কেবল মহান আল্লাহর হক আদায় করলে কিংবা শুধু মানুষের হক আদায় করলে মুমিন হওয়া যাবে না; বরং মুমিন হতে হলে এ দু'রকম হকের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে।

এ হাদিসে ইমানের দুটি প্রান্তিক সীমা বিবৃত হয়েছে। তাই এ দু সীমানার মাঝখানে যত কিছু ভালো কাজ ধারণা করা সম্ভব তা সবই ইমানের বিভাগ ও শাখা-প্রশাখা মাত্র। এ কাজের মধ্যে যেমন আছে মহান আল্লাহর হক সংশ্লিষ্ট সালাত, জাকাত, হজ, সাওম, কুরবানি প্রভৃতি রয়েছে তেমনি আছে মানুষের প্রতি ভালোবাসা, সদাচার ও সহযোগিতা। এ কারণে মহান আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা যেমন মুমিনের জন্য অনিবার্য ও অলঙ্ঘনীয় দায়িত্ব তেমনি খিদমাতে খালক বা সৃষ্টির সেবায় নিবেদিত হওয়াও ইমানের অপরিহার্য অংশ। পরিপূর্ণ মুমিন হতে হলে ইমানের এ দাবি উপেক্ষা করা যাবে না।

হাদিসের শেষাংশে লজ্জাকে ইমানের সাথে সম্পৃক্ত করে মহানবি (সা.) ইমানের সাথে মানুষের এ বৈশিষ্ট্যের নিবিড় ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। কারণ, লজ্জাশীলতাই লোককে মহান আল্লাহর নাফরমানি, পাপাচার ও অন্যান্য অন্যায় আচরণ থেকে বিরত রেখে মুমিন থাকতে সাহায্য করে। একমাত্র নির্লজ্জ মানুষের পক্ষেই সম্ভব আল্লাহ তাআলার অসংখ্য নিয়ামতের মধ্যে থেকেও তাঁর অবাধ্য হওয়া। যে জন্য লজ্জাশীলতাই ইমান।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, তাওহিদে বিশ্বাস, খিদমাতে খালক ও হাক্কুল ইবাদ আদায় এবং লজ্জাশীলতা বা শালীনতাবোধের মাধ্যমে ব্যক্তি প্রকৃত ও যথার্থ মুমিনে পরিণত হতে পারে।

শিক্ষা: রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর এ অমিয়বাণী থেকে যে শিক্ষা পাওয়া যায়, তা হলো—

১. ইমান যেন মানুষের অন্তরে রোপিত এক সুবিশাল বৃক্ষ। মহান আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী জীবনযাপন ও অভ্যাস গড়ে তোলায় এর সবকিছুই সেই বৃক্ষের শাখা-প্রশাখায় পরিণত হয়।

২. ইমানের সত্তরটিরও বেশি শাখা থাকার অর্থ অসংখ্য শাখা থাকা। কারণ, সত্তর একটি পরিভাষা। যেমন বাংলায় 'শত শত লোক' একটি পরিভাষা। এর মাধ্যমে অসংখ্য শাখা উদ্দেশ্য।

৩. পরিপূর্ণ মুমিন হতে হলে জীবনে ইমানের সব শাখারই বাস্তবায়ন করা অপরিহার্য।

৪. ইমান মানুষকে লজ্জাশীল করবে। লজ্জাশীলতা ইমানের বিশেষ শাখা অথবা লজ্জাশীলতাই ইমান।

৫. মুমিনের জীবনে মহান আল্লাহর নির্দেশিত যত কাজ তার সবকিছুই ইমানের অঙ্গ।

জেনে রাখো

ইমানের শাখাগুলো ৩ প্রকার। যথা—

১. কিছু শাখা অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত। এ ধরনের বিশ্বাসের সংখ্যা ২৪টি। যথা—
মহান আল্লাহর প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি, আসমানি কিতাব ও নবি-রাসুলদের প্রতি ইমান ইত্যাদি।

২. কিছু শাখা জবানের সাথে সম্পৃক্ত। এ ধরনের বিশ্বাসের সংখ্যা ৭টি। যথা—
তাওহিদের বাক্য বলা, কুরআন তিলাওয়াত, ইলম শিক্ষা ইত্যাদি।

৩. কিছু শরীরের সাথে সম্পৃক্ত। এ ধরনের বিশ্বাসের সংখ্যা ৩৮টি। যথা—
পবিত্রতা অর্জন, অসহায়কে খাদ্য দান, ফরজ রোজা, ইনসাফ করা, দণ্ডবিধি কায়েম করা, শাসকের আনুগত্য করা ইত্যাদি।

এই হলো (২৪ + ৭ + ৩৮) = ৬৯টি শাখা।

কয়েকটি শাখাকে অন্য শাখার সাথে একত্রিত গণনা না করে আলাদাভাবে হিসাব করলে ৭৭টি হবে। যদিও আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ইমানের কতটি শাখা রয়েছে?
২. ইমানের সর্বোত্তম শাখা কোনটি? *[ঢা. বো., য. বো., কু. বো. ২০২২]*
৩. ইমান (اَلْإِيْمَانُ) শব্দের অর্থ কী? *[রা. বো., দি. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০২২]*
৪. লজ্জাশীলতা ইমানের কী?
৫. লোক চলাচলের রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা কী?
৬. খিদমতে খালক বা সৃষ্টির সেবায় নিবেদিত হওয়া কী?

উত্তরের জন্য দেখো ১৮২ পৃষ্ঠা।

খ. একক কাজ

শিক্ষার্থীরা দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে একটি দল হাদিসটির ব্যাখ্যা এবং অন্য দল হাদিসের শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা উপস্থাপন করবে।

পাঠ ১৮ ৩ নম্বর হাদিসের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা
Translation, Explanation and Learning of Hadith No. 3

[রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা সম্পর্কিত হাদিস]

অনুবাদ	আরবি
হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন— রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তার কাছে আমি তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও সব মানুষের চেয়ে বেশি প্রিয় হব (বুখারি ও মুসলিম)।	عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

শব্দার্থ: عَنْ اَنَسٍ – হযরত আনাস থেকে বর্ণিত, رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ – মহান আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, قَالَ – তিনি বলেছেন, قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ (ص) – রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, لَا يُؤْمِنُ – ইমানদার হতে পারবে না, اَحَدُكُمْ – তোমাদের কেউ, حَتّٰى – যতক্ষণ না, اَكُوْنَ – আমি হব, اَحَبَّ – অধিক প্রিয়, اِلَيْهِ – তাঁর কাছে, مِنْ وَّالِدِهٖ – তাঁর পিতা-মাতার চেয়ে, وَوَلَدِهٖ – এবং তাঁর সন্তান-সন্ততি চেয়ে, وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ – আর সব মানুষ থেকে, مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ – সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম।

ব্যাখ্যা: এ হাদিসে মুমিনের জীবনে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসার গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং অবস্থান নির্দেশ করা হয়েছে।

রাসুলে করিম (সা.) ঘোষণা দিয়েছেন, যেকোনো ব্যক্তির মুমিন হওয়ার জন্য পূর্বশর্ত হলো তার মধ্যে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি অনেক বেশি ভালোবাসা থাকতে হবে। কারণ, নবি (সা.)-এর প্রতি একনিষ্ঠ ভালোবাসা ছাড়া বাস্তবজীবনে তাঁর আদর্শের বাস্তবায়ন করার আন্তরিক ইচ্ছা থাকা অসম্ভব।

ইসলামি জীবনদর্শনে মুহাব্বাত বা ভালোবাসা প্রবণতাকে তিনটি ভাগে বিন্যস্ত করা হয়। এগুলো হলো—

১. মুহাব্বাতে তব'ঈ বা স্বাভাবিক ভালোবাসা। বাহ্যিক কোনো প্রভাব বা চাপ ব্যতীত কেবল স্বভাব ও অন্তরের দাবিতে কাউকে ভালোবাসা। যেমন— সন্তান ও মা-বাবার পারস্পরিক ভালোবাসা।
২. মুহাব্বাতে আকলি বা বুদ্ধিভিত্তিক ভালোবাসা। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর গুণ, বুদ্ধিমত্তা, উপকারিতা প্রভৃতি বিবেচনায় তার প্রতি ভালোবাসা পোষণ। যেমন— সুস্থতার জন্য ঔষধ বা জ্ঞানলাভের জন্য জ্ঞানীকে ভালোবাসা।
৩. মুহাব্বাতে ইমানি বা বিশ্বাসভিত্তিক ভালোবাসা। অর্থাৎ ইমান আনয়নের পর ইমানের অনিবার্য দাবিতে যে ভালোবাসা পোষণ করা হয়। যেমন— নবি, রাসুল ও মুমিনদের পারস্পরিক ভালোবাসা।

হাদিসের সাধারণ মর্মার্থ হলো মুহাব্বাতে তব'ঈ, আকলি কিংবা মুহাব্বাতে ইমানি সব রকমের ভালোবাসার ক্ষেত্রেই নবি (সা.) হবেন অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব। এটা ছাড়া ইমানের পরিপূর্ণতা অর্জন সম্ভব হবে না।

আল্লাহ তাআলা কুরআনের একাধিক আয়াতে রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে সৃষ্টি জগতের সবার চেয়ে বেশি ভালোবাসতে বলেছেন। মানুষ একে অপরকে ভালোবাসে হৃদয়ে ও বিশ্বাসে। যার প্রতিচ্ছবি দেখা যায় তার আচার-আচরণ ও কাজকর্মে। নবি (সা.)-কে ভালোবাসলে আমাদের আচার-আচরণ ও সংস্কৃতিতে তার প্রতিচ্ছবিই প্রস্ফুটিত হতে হবে।

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কল্পনা করলে অন্তর যেন খুশি হয়, তাঁর আলোচনা আত্মার জন্য খাদ্য হয়, জবান স্বাদ ও আনন্দ হাসিল করে এবং তাঁর বরকতময় নাম দ্বারা অন্তর যেন প্রশান্তি লাভ করে।

এখানে জানা আবশ্যক যে, রাসুলুল্লাহর (সা.) জন্য কেন সৃষ্টি জগতের সর্বাধিক ভালোবাসা হওয়া উচিত। এ প্রসঙ্গে হাদিস বিশেষজ্ঞ আল্লামা ইসহাক (রহ.) 'দরসে মিশকাত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন কারো প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হওয়ার কারণ হলো চারটি: ১. সৌন্দর্য, ২. পরিপূর্ণতা, ৩. ইহসান বা অনুগ্রহ ও ৪. আত্মীয়তা। উল্লিখিত কারণসমূহের যেকোনো একটি থাকলেই যদি ভালোবাসা সৃষ্টি হয়; তাহলে রাসুলুল্লাহর (সা.) মধ্যে উক্ত চারটি কারণ ও গুণ পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান থাকার পরও তাঁর প্রতি ভালোবাসা তৈরি হবে না তো কার প্রতি হবে!

সৌন্দর্য: রাসুলুল্লাহ (সা.) ছিলেন সর্বাপেক্ষা সৌন্দর্যের অধিকারী। তাঁর সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিল পরিমিত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা (রহ.) বলেন— একটি সূর্য রয়েছে আমার জন্য আর অন্য সূর্যটি রয়েছে সমগ্র জগতবাসীর জন্য। কিন্তু আমার সূর্য আকাশের সূর্য থেকে উত্তম। জগতের সূর্যটি ফজরের পর উদিত হয়, আর আমার সূর্য রাতে এশার পর উদয় হন।

পরিপূর্ণতা: রাসুলুল্লাহ (সা.) ছিলেন আপন মহিমায় মানবীয় গুণাবলীর পূর্ণতার সুউচ্চ শিখরে সমাসীম; তা ইলম ও আমলের দিক থেকে হোক কিংবা চারিত্রিক ব্যাপারে হোক।

ইহসান বা অনুগ্রহ: রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর দয়া, অনুগ্রহ এবং নম্রতা এত বেশি যে, পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরুপই প্রেরণ করেছি (সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ১০৭)।

আত্মীয়তা: গভীর দৃষ্টিতে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে মুমিনের আত্মীয়তার সম্পর্ক অন্যদের চেয়ে বেশি। কারণ, অন্যদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক 'জিসমানী' বা শারীরিক, আর রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে রুহানি বা আত্মিক। আত্মাহীন দেহ মূল্যহীন। রাসুলুল্লাহ (সা.) হলেন আমাদের মূল্যবান আত্মার পরম আত্মীয়।

প্রত্যেক কাজে রাসুলের আনুগত্য করাই হচ্ছে রাসুলের প্রতি ভালোবাসা। রাসুলের প্রতি ভালোবাসা যতো বাড়বে তাঁর আনুগত্যও ততো বাড়বে।

হযরত আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তিনটি জিনিস এমন, যার মধ্যে সেগুলো পাওয়া যাবে, সে ইমানের স্বাদ পাবে।

১. মহান আল্লাহ ও তার রাসুল তার কাছে অন্য সবকিছু থেকে প্রিয় হওয়া।
২. কাউকে শুধু মহান আল্লাহর জন্য ভালবাসা এবং
৩. জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে যেভাবে অপছন্দ করে, তেমনি পুনরায় কুফরির দিকে প্রত্যাবর্তন করাকে অপছন্দ করে (বুখারি)।

জেনে রাখো

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি নিজের অন্তরে ভালোবাসা অনুভূত হওয়া ইমানের পরিচায়ক। এর মাধ্যমে ব্যক্তি নিজেকে যাচাই করতে পারে যে, সে ইমানদার কিনা। রাসুলুল্লাহর (সা.) প্রতি ভালোবাসা ব্যক্তিকে রাসুলুল্লাহর (সা.) সুন্নাত অনুযায়ী জীবন-যাপনে উৎসাহিত করে।

শিক্ষা: বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর তাৎপর্যবহ এ হাদিসের শিক্ষাগুলো হলো—

১. পিতামাতা, সন্তান এবং সব মানুষের চেয়ে বেশি ভালোবাসতে হবে হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে।
২. ইমানের প্রথম ও প্রধান কথাই হলো মহান আল্লাহর পরে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা পোষণ।
৩. মানুষের সব রকমের ভালোবাসার সর্বোচ্চ সমন্বিত রূপ লাভ করা দরকার মহানবি (সা.)-এর ক্ষেত্রে। কারণ, ইমান ও বিবেকের স্বাভাবিক দাবি হলো তাঁর প্রতি ভালোবাসা পোষণ।
৪. রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশিত হবে তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. أَحَبَّ (আহাব্বা) শব্দের অর্থ কী?
২. مِنْ وَّالِدِهٖ (মিন ওয়ালিদিহি) অর্থ কী?
৩. ইসলামি জীবনদর্শনে মুহাব্বাত বা ভালোবাসা প্রবণতাকে কয়টি ভাগে বিন্যস্ত করা হয়?
৪. ইহসান ও কৃতজ্ঞতায় মানুষের মুক্তির দূত কে?
৫. কাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করা হয়েছে?
৬. রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসার অর্থ কী?

উত্তরের জন্য দেখো ১৮৩ পৃষ্ঠা।

খ. একক কাজ

শিক্ষার্থীরা মুমিনের জীবনে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসার গুরুত্ব সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ১৯ ৪ নম্বর হাদিসের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা
Translation, Explanation and Learning of Hadith No. 4

[মুনাফিকদের নিদর্শন সম্পর্কিত হাদিস]

অনুবাদ	আরবি
হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবি (সা.) থেকে তিনি বর্ণনা করেন। নবি (সা.) বলেন— মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি। যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন সে প্রতিশ্রুতি দেয়, তা ভঙ্গ করে আর যখন তার কাছে কোনো কিছু আমানত রাখা হয়, সে তা আত্মসাৎ করে। (বুখারি ও মুসলিম)	عَنْ اَبِيْ هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْـهُ عَنِ النَّبِـيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اٰيَةُ الْـمُنَافِقِ ثَلَاثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

শব্দার্থ: اٰيَةُ – নিদর্শন/চিহ্ন, الْـمُنَافِقِ – মুনাফিকদের, ثَلَاثٌ – তিনটি, اِذَا – যখন, حَدَّثَ – সে কথা বলে, كَذَبَ – সে মিথ্যা বলে, وَاِذَا – আর যখন, وَعَدَ – সে প্রতিশ্রুতি দেয়/অঙ্গীকার করে, اَخْلَفَ – সে খেলাফ করে/ভঙ্গ করে, وَاِذَا – আর যখন, اؤْتُمِنَ – তার কাছে (কোনো কিছু) আমানত রাখা হয়, خَانَ – সে খিয়ানত করে/আত্মসাৎ করে, مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ – সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম।

ব্যাখ্যা: অন্তরে কুফরি লালন করে মুখে ইমানের দাবি করা হলো নিফাক। যাদের মধ্যে নিফাক রয়েছে তারা মুনাফিক। ইসলামের জন্য কাফির মুশরিকদের চেয়ে বেশি ক্ষতিকর হলো মুনাফিকরা। কেননা আল্লাহদ্রোহিতায় কাফির-মুশরিকদের ভূমিকা সুস্পষ্ট। তাই তাদের থেকে আত্মরক্ষা করা সম্ভব। কিন্তু মুনাফিকদের ভূমিকা অস্পষ্ট বলে তাদের ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষা করা কষ্টকর।

আলোচ্য হাদিসে মুনাফিকের লক্ষণ বলে দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে যেমন মুনাফিক কে, তা জানতে পারা যায়; তেমনি কী ধরনের কাজ করলে মুনাফিকি হয়, তাও জানা যায়। বস্তুত মুনাফিকি ইমানের সম্পূর্ণ বিপরীত জিনিস। যেখানে ইমান খালেস রয়েছে সেখানে মুনাফিকি থাকতে পারে না।

মহানবি (সা.) মুনাফিকদের শনাক্ত করার জন্য তিনটি বিশেষ লক্ষণ উল্লেখ করেছেন। তিনটি লক্ষণের প্রত্যেকটির পূর্বে اِذَا (যখন) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেকটি ঘটনা সংঘটিত হওয়া এবং সেই সাথে এ কথাও বুঝিয়ে দেওয়া যে, এই সবগুলোই মুনাফিক ব্যক্তির অভ্যাসের অন্তর্ভুক্ত এবং প্রত্যেকটি কাজের মধ্য দিয়েই সে মুনাফিকির পরিচয় দেবে। লক্ষণ তিনটি নিম্নরূপ:

১. **মিথ্যা বলা:** মিথ্যা সব পাপের মূল। মিথ্যা বলার কারণেই ব্যক্তি নিজের মনের কুফরি গোপন রেখে ইমানের কথা বলতে পারে। এজন্য মিথ্যাবাদিতা মুনাফিকদের প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য। একজন মুনাফিক যখন কথা বলে তখন মিথ্যা বলে। অর্থাৎ সে সবসময় মিথ্যাই বলে।

২. **ওয়াদা ভঙ্গ করা:** কথা দিয়ে তা না রাখা বা ওয়াদার বিপরীত কাজ করা মুনাফিকদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। তারা মহান আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যের বিপরীত কাজ করে ওয়াদার খেলাফ করে। কারণ, সব মানুষই মহান আল্লাহকে ইলাহ মেনে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে পৃথিবীতে এসেছে। পরবর্তীকালে পাপ কাজ করে তারা এ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে।

৩. **খিয়ানত করা:** মুনাফিকদের কাছে কোনো আমানত রাখা হলে তারা তা আত্মসাৎ করে। তারা যেমন কোনো কথার নিরাপত্তা দেয় না তেমনি তারা সম্পদও হেফাজত করে না। এমনকি তারা মানুষের ইজ্জত ও সম্মানের হেফাজতও করে না। ফলে মুনাফিকদের ওপর কোনো বিষয়েই আস্থা রাখা যায় না।

প্রসঙ্গত, মনে রাখা দরকার যে, ওয়াদা করার সময় যদি খেলাফ করার মনোভাব না থাকে, আর পরবর্তীকালের বাহ্যিক ও অভাবিতপূর্ণ বাধা বা অসুবিধার কারণে ওয়াদা পূরণ করা যদি সম্ভব না হয়, তবে তা মুনাফিকি হবে না।

মুনাফিকির পরিণাম

মহান আল্লাহ বলেন— 'নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্থানে অবস্থান করবে, তুমি সেদিন তাদের জন্য কোনো সাহায্যকারী খুঁজে পাবে না' (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৪৫)।

মহান আল্লাহ আরো বলেন— 'হে নবি! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের সম্পর্কে কঠোর নীতি অবলম্বন করুন। আর তাদের পরিণতি হচ্ছে জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্থান' (সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ৭৩)।

মহান আল্লাহ ওয়াদা করেছেন— মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীদের এবং কাফেরদের জন্য রয়েছে দোজখের আগুন। তাতে তারা চিরদিন থাকবে। সেটাই তাদের জন্য যথেষ্ট। আর মহান আল্লাহ তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আজাব (সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ৬৮)।

হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামা (রা.) বলেন— নিফাক বা মুনাফিক রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে ছিল আজকের দিনেও আছে, আর সেটা হলো ইমানের পরে কুফরি করা অর্থাৎ ইমান প্রকাশ করে মহান আল্লাহর দীনের বিরোধী কাজ করা (বুখারি)।

শিক্ষা: এ হাদিস থেকে মুসলিম জাতির শিক্ষণীয় হলো—

১. মিথ্যা কথা বলা, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা ও আমানতের খিয়ানত করা এমন তিনটি অপরাধ; যেগুলো ব্যক্তিকে অন্য সব অপরাধমূলক কাজের প্রেরণা দেয়। মিথ্যায় অভ্যস্ত ব্যক্তিরা যেকোনো অন্যায় করে অস্বীকার করতে পারে। সে কারণেই মুমিনদের এ সব আচরণ থেকে দূরে থাকতে হবে।

২. মিথ্যাবাদিতা সম্পূর্ণ পরিহার করতে হবে। কথায় ও আচরণে সত্যবাদিতাই হবে মূলনীতি।

৩. মুমিনের কথা ও কাজে মিল থাকতে হবে।

৪. মুমিন সবসময়ই তার প্রতিশ্রুতি রক্ষায় যত্নবান হবে। যেকোনো মূল্যে ওয়াদা পূরণ করা হবে তার মূল প্রচেষ্টা। সে যেমন মহান আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করবে, তেমনি পূর্ণ করবে মানুষের সাথে কৃত অঙ্গীকার।

জেনে রাখো

মুনাফিকি চরিত্র পরিহার করে ইসলামি চরিত্র ধারণ করতে হবে। ইসলামি চরিত্রের মৌলিক বিষয়সমূহ:

- সত্যবাদিতা
- আমানতদারিতা
- অঙ্গীকার পূর্ণ করা
- বিনয়
- মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার
- আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা
- প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর ব্যবহার
- মেহমানের আতিথেয়তা
- দান ও বদান্যতা
- ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা
- মানুষের সাথে সমঝোতা ও সংশোধন
- লজ্জা
- দয়া ও করুণা
- ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা
- চারিত্রিক পবিত্রতা

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. آيَةٌ (আয়াত) শব্দের অর্থ কী?
২. মুনাফিকের চিহ্ন কয়টি? *[ঢা. বো., য. বো., রা. বো., কু. বো., চ. বো.; য. বো. ২০২৫]*
৩. মহান আল্লাহ দ্রোহিতায় কাদের ভূমিকা সুস্পষ্ট?
৪. অন্তরে কুফরি লালন করে মুখে ইমানের দাবি করাকে কী বলে?
৫. যাদের মধ্যে নিফাক আছে তারা কী?
৬. সব পাপের মূল কী?

উত্তরের জন্য দেখো ১৮৩ পৃষ্ঠা।

খ. একক কাজ

শিক্ষার্থীরা মুনাফিকের নিদর্শনগুলো নিয়ে পর্যালোচনা করবে।

পাঠ ২০

৫ নম্বর হাদিসের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা
Translation, Explanation and Learning of Hadith No. 5

[সত্য গ্রহণ ও মিথ্যা বর্জন সম্পর্কিত হাদিস]

আরবি

عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَاِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِىْ اِلَى الْبِرِّ وَاِنَّ الْبِرَّ يَهْدِىْ اِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيْقًا- وَاِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ فَاِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِىْ اِلَى الْفُجُوْرِ وَاِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِىْ اِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكِذْبَ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا- (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবি (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, নবি (সা.) ইরশাদ করেন, তোমাদের সত্যের অনুশীলন করা উচিত। কেননা, সত্য পুণ্যের পথে পরিচালিত করে আর পুণ্য নিশ্চিতভাবেই জান্নাতের পথে পরিচালিত করে। আর ব্যক্তি যখন সত্য বলতে থাকে এবং সত্য বলা তার অভ্যাসে পরিণত হয়, এমনকি মহান আল্লাহর কাছে তার নাম পরম সত্যবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়। তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে মিথ্যা পরিহার করা। কেননা, নিশ্চয়ই মিথ্যা পরিচালিত করে পাপের পথে, আর পাপ পরিচালিত করে দোজখের পথে। আর ব্যক্তি যখন মিথ্যা বলতে থাকে তখন মিথ্যা বলা তার অভ্যাসে পরিণত হয়। এমনকি মহান আল্লাহর কাছে তার নাম চরম মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়। (বুখারি ও মুসলিম)

শব্দার্থ: عَلَيْكُمْ – তোমাদের উচিত, بِالصِّدْقِ – সত্যকে ধারণ করা, اِنَّ الصِّدْقَ – নিশ্চয়ই সত্য, يَهْدِىْ – পরিচালিত করে, اِلَى الْبِرِّ – পুণ্যের পথে, وَاِنَّ الْبِرَّ – আর নিশ্চয়ই পুণ্য, يَهْدِىْ – পরিচালিত করে, اِلَى الْجَنَّةِ – জান্নাতের পথে, وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ – আর ব্যক্তি যখন সত্য বলতে থাকে, وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ – আর সে সত্যের অনুশীলন ও চর্চা করতে থাকে, حَتّٰى يُكْتَبَ – এমনকি তার নাম লেখা হয়, عِنْدَ اللهِ – মহান আল্লাহর কাছে, صِدِّيْقًا – পরম সত্যবাদী হিসেবে, وَاِيَّاكُمْ – আর তোমরা বেঁচে থাক, وَالْكِذْبَ – মিথ্যা থেকে, فَاِنَّ الْكِذْبَ – কেননা নিশ্চয়ই মিথ্যা, يَهْدِىْ – পরিচালিত করে, اِلَى الْفُجُوْرِ – পাপের পথে, وَاِنَّ الْفُجُوْرَ – আর নিশ্চয়ই পাপ, يَهْدِىْ – পরিচালিত করে, اِلَى النَّارِ – দোজখের পথে, وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ – আর ব্যক্তি যখন মিথ্যা বলতে থাকে, وَيَتَحَرَّى الْكِذْبَ – এবং সে মিথ্যা বলায় অভ্যস্ত হয়, حَتّٰى يُكْتَبَ – এমনকি তার নাম লেখা হয়, عِنْدَ اللهِ – মহান আল্লাহর কাছে, كَذَّابًا – চরম মিথ্যাবাদী হিসেবে, مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ – সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম।

ব্যাখ্যা: সত্য মানুষকে শাশ্বত ন্যায়ের পথে পরিচালিত করে। সে মিথ্যা বলার অভিশাপ থেকে মুক্তি পায়। ইসলামের বিধি-বিধান ও নীতিমালা সত্যবাদিতারই পরম প্রকাশ। স্বাভাবিকভাবে সত্যের অনুশীলন তাই ইসলামেরই অনুশীলন। মানব জীবনে সত্যবাদিতার প্রভাব সীমাহীন। সত্যবাদিতা মানুষকে নৈতিক চরিত্র গঠনে সাহায্য করে। পাপ ও অশালীন কাজ থেকে রক্ষা করে। সত্যবাদী ব্যক্তি কোনোরূপ অন্যায় ও অত্যাচার করতে পারে না। সত্যবাদিতা মানুষকে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে সাহায্য করে। সত্যবাদিতার সুফল হলো সফলতা ও মুক্তি। যেমন বলা হয়, اَلصِّدْقُ يُنْجِىْ وَالْكِذْبُ يُهْلِكُ-

অর্থ: সত্যবাদিতা মুক্তি দেয়, আর মিথ্যা ধ্বংস ডেকে আনে। (আবু দাউদ)

সত্যবাদিতার ফলে মানুষ দুনিয়াতে সম্মানিত হয়, মর্যাদা লাভ করে। আর আখিরাতে সত্যবাদিতার প্রতিদান হলো জান্নাত। আল্লাহ তাআলা বলেন— هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ - **অর্থ:** এ তো সেই দিন, যে দিন সত্যবাদীদের তাদের সত্যবাদিতা বিশেষ উপকার দান করবে। তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত: ১১৯)।

মহানবি (সা.) বলেন— 'তোমরা সত্যবাদী হও। কেননা সত্য পুণ্যের পথ দেখায়। আর পুণ্য জান্নাতের পথে পরিচালিত করে' (বুখারি ও মুসলিম)।

ব্যক্তি যখন সত্য বলে, সত্যবাদিতায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে এমনকি তার নাম মহান আল্লাহর কাছে পরম সত্যবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়, তখন তার জান্নাত লাভ সুনিশ্চিত হয়। এমনিভাবে মিথ্যাবাদিতাও ব্যক্তির দোজখে যাওয়া নিশ্চিত করে। কেননা মিথ্যাবাদিতা পাপের পথে, আর পাপ দোজখের পথে পরিচালিত করে।

জেনে রাখো

সত্যের ফল:

১. সত্য নেক আমলের দিকে ধাবিত করে আর নেক আমল জান্নাতের পথ দেখায়।

২. সত্যবাদীকে আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন এবং মানুষের মধ্যেও সে প্রিয়পাত্র।

৩. সত্য মানুষকে ইহকাল ও পরকালের ক্ষতি থেকে হেফাজত করে।

মিথ্যার পরিণতি:

১. মিথ্যার সর্বপ্রথম শাস্তি হলো তার সত্য কথাও গ্রহণ না করা।

২. মিথ্যা যে ব্যক্তির অভ্যাসে পরিণত হয় মহান আল্লাহর কাছে তার নাম মিথ্যাবাদীর কাতারে লেখা হয়।

৩. ইসলামি আদালতে মিথ্যাবাদীর সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য।

কীভাবে মিথ্যা বলা থেকে বাঁচা যায়:

মিথ্যা থেকে মুক্তি লাভের জন্য নিম্নোক্ত ৮টি উপায় অবলম্বন করতে হবে। ১. এটা অন্তরের রোগ মনে করে মুক্তি লাভের জন্য মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া। ২. মিথ্যাবাদীর ভয়াবহ পরিণতির কথা চিন্তা করা। ৩. সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, মহান আল্লাহ সবকিছু দেখছেন এবং তাঁর ফেরেশতা সবকিছু লিপিবদ্ধ করছেন। ৪. মানুষের কাছে অপমানিত হওয়ার কষ্টও বিবেচনা করা। ৫. চিন্তা করা যে, প্রকৃত শান্তি ও মুক্তি একমাত্র সত্যের মধ্যেই নিহিত। ৬. মিথ্যার দিকে আহ্বানকারী সকল কাজ থেকে দূরে থাকা। ৭. কথায় কথায় অঙ্গীকার না করা। ৮. মিথ্যাবাদী বন্ধুদের সাথে ওঠা-বসা না করা।

সত্যবাদিতা নৈতিক গুণাবলির অন্যতম প্রধান গুণ। এটি মানুষকে প্রভূত কল্যাণ ও সফলতা দান করে। সুতরাং আমাদের সবারই সত্যবাদী ও সত্যাশ্রয়ী হওয়া একান্ত কর্তব্য।

শিক্ষা: এ হাদিসের শিক্ষা হলো—

১. মুমিন ব্যক্তি সত্যের অনুশীলন করবে। সত্য বলাকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করবে।

২. একজন মুমিনের পক্ষে সত্যানুশীলন সহজ হয়ে ওঠে।

৩. মিথ্যা বলা ব্যক্তিকে মিথ্যাবাদী হিসেবে পরিচিতি দেয়। মহান আল্লাহর কাছেও সে মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়।

৪. সত্যবাদিতার অনুশীলন মূলত ইসলামের অনুশীলন। আর মিথ্যাবাদিতায় অভ্যস্ত হওয়ার মানে হলো কুফরি করা, নিফাক করা।

৫. সত্যবাদিতা ব্যক্তিকে পরম সাফল্য এনে দেয়। সে পৃথিবীতে মানুষের আস্থা ও ভালোবাসা পায়। পরকালেও তার জান্নাত লাভ সুনিশ্চিত হয়।

৬. মিথ্যাবাদীর সত্য কথাও গ্রহণ করা হয় না।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সত্য কোন পথে পরিচালিত করে?

২. কী নিশ্চিতভাবেই জান্নাতের পথে পরিচালিত করে?

৩. মিথ্যা কোন পথে পরিচালিত করে?

৪. ব্যক্তি যখন মিথ্যা বলতে থাকে তখন কী ঘটে?

৫. كَذَّابٌ (কাজ্জাব) শব্দের অর্থ কী?

৬. সত্যবাদিতা মানুষকে কেমন চরিত্রের অধিকারী হতে সাহায্য করে?

উত্তরের জন্য দেখো ১৮৩ পৃষ্ঠা।

পাঠ ২১ ৬ নম্বর হাদিসের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা
Translation, Explanation and Learning of Hadith No. 6

[মহান আল্লাহর পথে দান ও জ্ঞানী ব্যক্তি সম্পর্কিত হাদিস]

অনুবাদ	আরবি
হযরত ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন— নবি করিম (সা.) ইরশাদ করেছেন, দু'ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাউকে হিংসা করা যায় না। একজন হচ্ছেন সেই ব্যক্তি মহান আল্লাহ যাকে সম্পদ দিয়েছেন আর তাকে সে সম্পদ মহান আল্লাহর পথে ব্যয় করার তাওফিক দিয়েছেন। অপর ব্যক্তি হচ্ছেন সেই জন যাকে মহান আল্লাহ গভীর জ্ঞান দিয়েছেন আর সে জ্ঞান অনুসারে বিচার ফায়সালা করে ও তা অন্যকে শিক্ষা দেয় (বুখারি ও মুসলিম)।	عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا حَسَدَ اِلَّا فِيْ اِثْنَتَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلٰى هَلَكَتِهٖ فِى الْحَقِّ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِىْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

শব্দার্থ: لَاحَسَدَ – হিংসা নেই/হিংসা করা যায় না, اِلَّا – ব্যতীত, فِيْ اِثْنَتَيْنِ – দু'ক্ষেত্রে/দুজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে, رَجُلٌ – পুরুষ বা এমন ব্যক্তি, اٰتَاهُ اللهُ – মহান আল্লাহ যাকে দিয়েছেন, مَالًا – সম্পদ, فَسَلَّطَهُ – এরপর তাকে সামর্থ্য দিয়েছেন, عَلٰى هَلَكَتِهٖ – তা ব্যয় করার/উৎসর্গ করার, فِى الْحَقِّ – সত্য পথে/মহান আল্লাহর পথে, وَرَجُلٌ – আর পুরুষ বা সেই ব্যক্তি, اٰتَاهُ اللهُ – মহান আল্লাহ যাকে দিয়েছেন, الْحِكْمَةَ – জ্ঞান/প্রজ্ঞা, فَهُوَ يَقْضِىْ – এরপর সে বিচার ফায়সালা করে, بِهَا – সে জ্ঞান দ্বারা, وَيُعَلِّمُهَا – এবং তা শিক্ষাদান করে, مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ – সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম।

ব্যাখ্যা: এ হাদিসে মহানবি (সা.) দু'জন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছেন, যাদেরকে ঈর্ষা করা যায়। যেমন—

১. সেই সম্পদশালী মুসলিম ব্যক্তি, মহান আল্লাহ যাকে বিপুল ধন-সম্পদ দিয়েছেন। পাশাপাশি ব্যক্তিকে অপব্যয়ী না হয়ে ইসলামি আদর্শ ও বিধানানুযায়ী সেই সম্পদ থেকে মানুষের কল্যাণে ব্যয় করার তৌফিক দিয়েছেন।

২. সেই প্রজ্ঞাবান মুসলিম ব্যক্তি, আল্লাহ তাআলা যাকে পার্থিব ও পারলৌকিক বিষয়ের গভীর জ্ঞান দিয়েছেন। পাশাপাশি ব্যক্তিকে জ্ঞানের জন্য অহংকারী না করে বরং সে জ্ঞান দিয়ে মানুষের মধ্যে বিরাজিত সমস্যার ন্যায়নিষ্ঠ সমাধান দানের এবং মানুষকে সে জ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার দক্ষতা দিয়েছেন।

শিক্ষা: মহানবি (সা.)-এর অত্যন্ত তাৎপর্যবাহী ও গুরুত্বপূর্ণ এ হাদিসের শিক্ষা হলো—
১. সাধারণভাবে ইসলামে হাসাদ বা হিংসা, পরশ্রীকাতরতা ও ঈর্ষা হারাম। ২. যে ঈর্ষা ও হিংসায় ব্যক্তি এবং সমাজের ক্ষতির পরিবর্তে উপকারের সম্ভাবনা থাকে সে ঈর্ষা হারাম হবে না। ৩. সম্পদ ও প্রজ্ঞা মানুষের প্রতি মহান আল্লাহর এক বিশেষ রহমত। ৪. এ ধরনের শ্রেষ্ঠ মানুষের মতো মানুষ হওয়ার জন্য তাদেরকে ঈর্ষা করা যায়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. اَلْحَسَدُ (আল-হাসাদ) শব্দের অর্থ কী? *[ঢা. বো., ম. বো., কু. বো. ২০২২; ঢা. বো., ম. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. ২০১৯]*
২. কয় ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাউকে হিংসা করা যায় না?
৩. ইসলামে হিংসার বিধান কী?

উত্তরের জন্য দেখো ১৮৩ পৃষ্ঠা।

খ. একক কাজ

শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে ১০টি বাক্য খাতায় লিখে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিতে পেশ করবে।

পাঠ ২২

৭ নম্বর হাদিসের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা
Translation, Explanation and Learning of Hadith No. 7

[ভ্রাতৃত্ববোধ সম্পর্কিত হাদিস]

আরবি

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ

হযরত নু'মান ইবন বশীর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন— রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, তুমি মুমিনদেরকে তাদের পারস্পরিক দয়া, তাদের মধ্যস্থিত ভালোবাসা ও তাদের পারস্পরিক সহানুভূতি প্রদর্শনে একটি দেহসদৃশ দেখতে পাবে। যখন দেহের কোনো একটি অঙ্গ কষ্ট অনুভব করে, তখন তার পুরো দেহই জ্বর ও নিদ্রাহীনতায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে। (বুখারি ও মুসলিম)

শব্দার্থ: تَرَى – তুমি দেখবে/দেখতে পাবে, الْمُؤْمِنِيْنَ – মুমিনদের, فِيْ تَرَاحُمِهِمْ – তাদের পারস্পরিক দয়া প্রদর্শনের মধ্যে, وَتَوَادِّهِمْ – এবং তাদের পারস্পরিক ভালোবাসা প্রদর্শনের ভেতর, وَتَعَاطُفِهِمْ – এবং তাদের পারস্পরিক সহানুভূতি প্রদর্শনের মধ্যে, كَمَثَلِ الْجَسَدِ – যেন একটি দেহ, إِذَا اشْتَكَى – যখন কষ্ট অনুভব করে, عُضْوٌ – অংগ, تَدَاعَى – সাড়া দেয়/আক্রান্ত হয়ে পড়ে, لَهُ – তার জন্য, سَائِرُ الْجَسَدِ – সমস্ত শরীর, بِالسَّهَرِ – নিদ্রাহীনতায়, وَالْحُمَّى – এবং জ্বরে, مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ – সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম।

ব্যাখ্যা: এ হাদিসে মহানবি (সা.) মুমিন-মুসলিমদের মধ্যে বিরাজমান ইসলামি ভ্রাতৃত্বের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। মুমিনদেরকে আল্লাহ তাআলা ভ্রাতৃত্বের সুমহান সম্পর্কে বেঁধে দিয়েছেন। কুরআন মজিদে তিনি ঘোষণা দিয়েছেন, 'মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই' (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১০)। ইসলামি ভ্রাতৃত্ব এক আদর্শিক ভ্রাতৃত্ব। দেশ, কাল, অঞ্চল, জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষ ইসলামি আদর্শ ও মূলনীতিতে বিশ্বাসের প্রেক্ষিতে এক অবিচ্ছেদ্য ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ।

কোনো স্বার্থচিন্তা, শত্রুতা, কোনো পক্ষ অপর পক্ষকে হেয় করা বা ঠকানোর মানসিকতা ইসলামি ভ্রাতৃত্বে নেই, বরং ইসলামি ভ্রাতৃত্ব বিশ্বের সব এলাকার প্রতিজন মুসলিমকে এক অখণ্ড-অবিচ্ছিন্ন দেহে পরিণত করে। সাধারণ অবস্থায় একটি দেহের কোনো একটি অঙ্গের প্রতি যত্ন নেওয়া, ভালোবাসা, দয়া বা সহানুভূতি প্রদর্শনে যেমন কোনো বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় না, বরং গুরুত্ব পায় পুরো দেহ; মুসলিম ভ্রাতৃত্বেও ব্যক্তি নয়, বরং গুরুত্ব পায় গোটা মুসলিম উম্মাহ। আবার বিশেষ অবস্থায় দেহের কোনো একটি অঙ্গের অসুস্থতায়ও যেমন পুরো দেহ আলোড়িত হয়, ব্যথিত হয়, বেদনাহত হয়ে সেই বিশেষ অঙ্গের অসুবিধা নিরাময়ে আত্মনিয়োগ করে, ইসলামি ভ্রাতৃত্বেও কোনো ব্যক্তি অসুবিধায় পড়লে গোটা মুসলিম উম্মাহ তার সমস্যা দূর করার সর্বাত্মক চেষ্টা করে।

ইসলামি ভ্রাতৃত্বের বৈশিষ্ট্য

তাওহিদ ও রিসালাতভিত্তিক: ইসলামি ভ্রাতৃত্ব হলো তাওহিদ বা আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস নির্ভর ভ্রাতৃত্ব। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর রিসালাত এবং রিসালাতের মাধ্যমে আনীত বিষয় অনুশীলনের মাধ্যমে এ ভ্রাতৃত্ব গড়ে ওঠে।

পারস্পরিক ভালোবাসাভিত্তিক: ইসলামি ভ্রাতৃত্বে অধিকতর ভালোবাসার প্রকাশ থাকে। কারণ, শুধু ভালোবাসার ভিত্তিতে ইসলামি ভ্রাতৃত্ব গড়ে ওঠে এবং টিকে থাকে।

সুদৃঢ় একতাভিত্তিক: ইসলামি ভ্রাতৃত্ব বিশ্বাস, জীবনদর্শন ও জীবনবিধান অনুশীলনের অভিন্নতার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। সে জন্য এ ভ্রাতৃত্ব মুসলমানদের মধ্যে সুদৃঢ় ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা করে।

নিঃস্বার্থ ভ্রাতৃত্ব: ইসলামি ভ্রাতৃত্বে কোনো স্বার্থচিন্তা বা লোভ থাকে না। কারণ, মিথ্যা ও স্বার্থপরতার কৃত্রিম ঐক্য কোনো স্থায়ী বন্ধন গড়ে তুলতে পারে না।

দয়া ও কল্যাণভিত্তিক: ইসলামি ভ্রাতৃত্ব পারস্পরিক কল্যাণকামিতা ও দয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে এক ভাই অপর ভাইয়ের কল্যাণ কামনা করে।

জেনে রাখো

মুমিনের অন্তরের ভালোবাসা তাকে অন্য মুমিনের প্রতি সহানুভূতিশীল করে তোলে। একজন মুমিন অন্য মুমিনের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতিতে তার কল্যাণ কামনা করে। তাকে সাহায্য করার চেষ্টা করে। মুমিন হিসেবে আমাদেরকেও অন্য মুমিনের কল্যাণ কামনা ও সহযোগিতা করার চেষ্টা করতে হবে।

উদারতা ও সাম্যভিত্তিক: ইসলামি ভ্রাতৃত্ব মূলত বিশ্বভ্রাতৃত্বেরই আদর্শিক রূপ। এ ভ্রাতৃত্বে সব জাতির কাছে প্রেরিত মহান আল্লাহর নবি-রাসুলদের প্রতি ইমান পোষণ করা হয়।

তাছাড়া ইসলামি ভ্রাতৃত্ব সাম্যবাদের সুমহান আদর্শভিত্তিক। শুধু মানুষ হিসেবে এ ভ্রাতৃত্বে কারো কোনো শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা হয়নি। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "মানুষ চিরুনির দাঁতের মতো। কোনো আরবের ওপর অনারবদের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কোনো আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই অনারবের ওপর। শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হতে পারে কেবল তাকওয়ার ভিত্তিতে" (বুখারি)।

শিক্ষা: মহানবি (সা.)-এর এ হাদিস থেকে নিম্নোক্ত শিক্ষাসমূহ পাওয়া যায়—

১. মুমিনদের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রভুত্ব বা দাসত্বের নয়, বরং তাদের সম্পর্ক সুমহান ভ্রাতৃত্বের।
২. মুমিনের ভ্রাতৃত্ব ইমানের অনিবার্য দাবির ফল। একে বাদ দিয়ে তাই মুমিন হওয়া সম্ভব নয়।
৩. সুখ-দুঃখ উপলব্ধি এবং আচার-আচরণ, বিশ্বাস ও চিন্তার ঐক্যে মুমিনরা যেন এক অভিন্ন দেহ।
৪. কোনো কারণে মুমিনদের কারো মাঝে সম্পর্কের অবনতি হলে অপর মুমিনের দায়িত্ব হলো তা মীমাংসার জন্য মধ্যস্থতা করা। আল্লাহ তাআলা বলেন— إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. **অর্থ:** সুনিশ্চিতভাবেই মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমরা তোমাদের ভাইদের সম্পর্ক সংশোধন করে দাও (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১০)।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মুমিনদেরকে পারস্পরিক দয়া, ভালোবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শনে কীরূপ দেখা যায়?
২. فِيْ تَرَاحُمِهِمْ (ফি-তারাহুমিহিম) অর্থ কী?
৩. كَمَثَلِ الْجَسَدِ (কামাছলিল জাছাদ) অর্থ কী?
৪. মুমিনদেরকে আল্লাহ তাআলা কীসের দ্বারা বেঁধে দিয়েছেন?
৫. কুরআন মাজিদে মুমিনদের পরস্পর কী ঘোষণা করা হয়েছে?
৬. মুসলিম ভ্রাতৃত্বে কী গুরুত্ব পায়?

উত্তরের জন্য দেখো ১৮৩ পৃষ্ঠা।

খ. একক কাজ

ভ্রাতৃত্ববোধ সম্পর্কিত হাদিসের শিক্ষা সম্পর্কে ৫টি বাক্য খাতায় লিখে শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ২৩

৮ নম্বর হাদিসের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা
Translation, Explanation and Learning of Hadith No. 8

[বন্ধু নির্বাচন সম্পর্কিত হাদিস]

অনুবাদ	আরবি
হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন— রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, মানুষ তার বন্ধুর দীন বা জীবনাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়। কাজেই তোমাদের প্রত্যেকেই যেন যাচাই করে নেয় কার সাথে সে বন্ধুত্ব করছে। (মুসনাদ আহমদ, সুনান আবু দাউদ, জামি আত-তিরমিযি)	عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلْمَرْءُ عَلٰى دِيْنِ خَلِيْلِهٖ فَلْيَنْظُرْ اَحَدُكُمْ مَنْ يُّخَالِلُ. (اَحْمَدُ. اَبُوْدَاؤُدَ تِرْمِذِيْ)

শব্দার্থ: اَلْمَرْءُ – মানুষ, عَلٰى – উপর/অনুসারী হয়, دِيْنِ خَلِيْلِهٖ – তার বন্ধুর আদর্শের/ধর্মের, فَلْيَنْظُرْ – কাজেই সে যেন লক্ষ করে/ভালোভাবে যাচাই-বাছাই করে নেয়, اَحَدُكُمْ – তোমাদের কেউ, – مَنْ يُّخَالِلُ – কে তার বন্ধু বা কার সাথে সে বন্ধুত্ব করছে, اَحْمَدُ – মুসনাদ আহমদ, اَبُوْدَاؤُدَ – সুনান আবু দাউদ, تِرْمِذِيْ – জামি আত-তিরমিযি।

ব্যাখ্যা: এ হাদিসে মহানবি (সা.) বন্ধু নির্বাচনের গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করেছেন।

বন্ধুর প্রভাবে প্রভাবিত হওয়া, বন্ধুর সংস্পর্শে তার কর্মপদ্ধতি ও আদর্শের প্রতি আগ্রহী হওয়া মানুষের সাধারণ স্বভাব। এজন্য বন্ধু নির্বাচনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সাবধান ও সতর্ক হতে হয়। মহানবি (সা.) বলেন— 'যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের অনুসারী হয়, কিয়ামতের দিন সে সেই সম্প্রদায়ভুক্ত হবে।' তাই ধর্মপ্রাণ, সৎ ও আল্লাহভীরু ব্যক্তিরা বন্ধু নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য।

বন্ধু নির্বাচন সম্পর্কে বহুল প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত সত্য একটি প্রবাদ রয়েছে। বলা হয়, 'সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ।' রাসুলুল্লাহ (সা.) সৎসঙ্গ ও অসৎসঙ্গের উপমা দিতে গিয়ে আতর বিক্রেতা ও কামারের কথা উল্লেখ করেছেন। কোনো ব্যক্তি আতরওয়ালার কাছে গেলে সুঘ্রাণ পাবে আর কেউ কামারের কাছে গেলে দুর্গন্ধ পাবে। এক বন্ধু যদি মুত্তাকি ও সৎস্বভাবের ভালো মানুষ হয়, তাহলে দেখা যায় তার অনুসারী বন্ধুও তার মতোই হয়ে যায়। এমনিভাবে বন্ধু যদি পাপাচারী ও খারাপ স্বভাবের হয়, তার বন্ধুও পাপাচারিতায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। যেজন্য বন্ধু নির্বাচনের আগে অবশ্যই সম্ভাব্য ব্যক্তি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান করা কর্তব্য। কুরআন ও হাদিসে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু লোকের সঙ্গ ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরা হলো— শত্রুস্থানীয় মুশরিক, ইহুদি, খ্রিষ্টান এবং এমন মুসলিম যারা অত্যধিক পাপের কাজে লিপ্ত। এদের সাথে মেলামেশায় আত্মিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে নেক কাজের প্রতি ব্যক্তির আগ্রহ কমে যায়।

হযরত আলি (রা.) এক কবিতায় বলেন—

সেই তোমার সত্যিকার বন্ধু যে তোমার সাথে থাকে, তোমার কল্যাণের জন্য নিজের ক্ষতি করে। দৈব-দুর্বিপাকে পড়ে তোমার অবস্থা শোচনীয় হলে সে নিজের সুখ বিসর্জন দিয়ে তোমাকে সুখ দান করে।

তিনি আরো বলেন— বন্ধু অবশ্যই বানাও, কারণ বন্ধু দুনিয়াতেও উপকারে আসে এবং আখিরাতেও।

হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রহ.) বলেন—

পাঁচ ব্যক্তির সঙ্গ (বন্ধুত্ব) অবলম্বন কোরো না। যথা— ১. মিথ্যাবাদী, ২. নির্বোধ, ৩. কৃপণ, ৪. কাপুরুষ ও ৫. ফাসেক।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰى اَوْلِيَاءَ۔

অর্থ: হে ইমানদার লোকেরা! তোমরা (কখনো) ইয়াহুদি ও খ্রিষ্টানদের নিজেদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ কোরো না (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত: ৫১)।

ইমাম গাজজালি (রহ.) বলেন— যার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে তার মধ্যে পাঁচটি গুণ থাকা চাই। আর তা হলো— বুদ্ধিমত্তা, সৎ স্বভাবের অধিকারী হওয়া, পাপাচারী না হওয়া, বেদআতি না হওয়া এবং দুনিয়াসক্ত না হওয়া।

তাই আমাদের বন্ধু নির্বাচনে সচেতনতা অবলম্বন করতে হবে।

শিক্ষা: এ হাদিস থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়, তা হলো—

১. মুমিন অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে কেবল মুমিনকেই গ্রহণ করবে।

২. কোনো শত্রুস্থানীয় মুশরিক, কাফির, ইহুদি, খ্রিষ্টান বা পাপাচারী মুসলিমের সাথে মুমিনের স্বাভাবিক বন্ধুত্ব হবে না। কেননা, এরকম বন্ধুত্ব মহান আল্লাহ নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন—

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاۤءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ۔

অর্থ: মুমিনগণ যেন অন্য মুমিনকে ছেড়ে কোনো কাফিরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ২৮)।

৩. যদি হেদায়েতের আলোয় উদ্ভাসিত করা উদ্দেশ্য থাকে তা হলে শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে নিজেকে অমুসলিমদের কাছে উপস্থাপন করা যাবে এবং করা কর্তব্য। কেননা, মানুষ হিসেবে সব মানুষই সাধারণ ভালোবাসা পাবে। কিন্তু এর সাথে অবশ্যই বন্ধুত্বের সম্পর্কের পার্থক্য বজায় থাকতে হবে।

৪. যেসব ব্যক্তির নিজের আত্মবিশ্বাস প্রবল, পাপাচারী ও অমুসলিমের সাথে মিললেও যাদের বিশ্বাসের ঘাটতি হওয়ার ন্যূনতম সম্ভাবনা নেই, তারা অন্যদের পরিশোধনের কাজ করবেন। দুর্বলচিত্ত মুমিনের একাজ করতে যাওয়া উচিত নয়।

৫. ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের পাশাপাশি পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও বন্ধু নির্বাচনে একই গুণাবলির ওপর জোর দিতে হবে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মানুষ কার দীন বা জীবনাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়?

২. دِيْنِ خَلِيْلِهٖ (দীনু খলিলিহি) অর্থ কী?

৩. বন্ধুর দ্বারা প্রভাবিত হওয়া কার সাধারণ স্বভাব?

৪. কী নির্বাচনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সাবধান ও সতর্ক হতে হয়?

৫. কারা বন্ধু হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য?

৬. ইমাম জাফর সাদেক (রহ.) কয় ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব না করার কথা বলেছেন?

উত্তরের জন্য দেখো ১৮৩ পৃষ্ঠা।

খ. একক কাজ

শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে বন্ধু নির্বাচনের কৌশল সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করবে।

পাঠ ২৪

৯ নম্বর হাদিসের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা
Translation, Explanation and Learning of Hadith No. 9

[কর্তব্য ও পরোপকার সম্পর্কিত হাদিস]

আরবি

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِىْ حَاجَةِ اَخِيْهِ كَانَ اللهُ فِىْ حَاجَتِهٖ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ

হযরত ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন— রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, একজন মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে তার ভাইয়ের ওপর জুলুম করে না, তার ভাইকে তার শত্রুর হাতে তুলে দেয় না। আর যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে নিয়োজিত থাকে, আল্লাহ তাআলা সে ব্যক্তির প্রয়োজন পূরণে নিয়োজিত থাকেন। (বুখারি ও মুসলিম)

শব্দার্থ: اَلْمُسْلِمُ – একজন মুসলিম, اَخُو – ভাই, الْمُسْلِمِ – অপর মুসলিমের, لَا يَظْلِمُهُ – সে তার প্রতি জুলুম করে না, وَلَا يَسْلِمُهُ – আর সে তাকে তুলে দেয় না, مَنْ كَانَ فِىْ – আর যে ব্যক্তি নিয়োজিত থাকে, حَاجَةِ اَخِيْهِ – তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে, كَانَ اللهُ – আল্লাহ তাআলা থাকেন, فِىْ حَاجَتِهٖ – তার অভাব পূরণে নিয়োজিত, مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ – সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম।

ব্যাখ্যা: ইসলামে সর্বসাকুল্যে তিন রকমের ভ্রাতৃত্বের স্বীকৃতি রয়েছে। যথা— বিশ্বভ্রাতৃত্ব, আদর্শিক ভ্রাতৃত্ব ও ঔরসজাত ভ্রাতৃত্ব। সব মানুষ এক ও অভিন্ন উৎস থেকে উৎসারিত। তাদের পিতা-মাতা হলেন আদম ও হাওয়া (আ.)। এ হিসেবে গোটা বিশ্বের মানুষ এক সর্বজনীন ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। মানুষের মধ্যে রয়েছে আদর্শিক ভ্রাতৃত্ব। একই ধর্ম বা আদর্শে বিশ্বাস এবং অনুশীলনের জন্য তাদের মধ্যে এ ভ্রাতৃত্ব গড়ে ওঠে। আর ঔরসজাত ভ্রাতৃত্ব গড়ে ওঠে একই পিতার ঔরসে বা মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণের মাধ্যমে। মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই এবং এ ভ্রাতৃত্ব আদর্শিক। সে জন্য এ ভ্রাতৃত্ব সংরক্ষণ করা ইমানের অনিবার্য দাবি।

শিক্ষা: রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ক্ষুদ্র এ হাদিসটি মুসলিম জাতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও শিক্ষাপ্রদ। এ হাদিসের শিক্ষাগুলো হচ্ছে— ১. ইসলাম গ্রহণ করার কারণে মুসলিমদের মধ্যে এক আদর্শিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সম্পর্ক হলো ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দের সম্পর্ক। তাই মুসলিমরা পরস্পর ভাই ভাই। ২. মুসলিমদের ভ্রাতৃত্ব ইমানি। এ ভ্রাতৃত্বের কিছু অনিবার্য দাবি রয়েছে। মুমিনদেরকে এ দাবি পূরণে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হবে। ৩. মুসলিম ভাইয়ের অভাব ও প্রয়োজন পূরণ করলে মহান আল্লাহর সাহায্য পাওয়া যাবে। আল্লাহ তাআলা নিজে দায়িত্ব নিয়ে ব্যক্তির অভাব ও প্রয়োজন পূরণ করেন। ৪. মুসলিম তার ভাইয়ের ওপর জুলুম করবে না, তার সাথে ইহসান ও ইনসাফপূর্ণ আচরণ করবে। তার ওপর কোনো রকম অন্যায় আচরণ করবে না, অন্যকেও জুলুম করতে দেবে না। ৫. মুসলিম তার ভাইয়ের বিপদে পাশে দাঁড়াবে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কে তার ভাইয়ের ওপর জুলুম করে না?
২. আল্লাহ তাআলা কোন ব্যক্তির প্রয়োজন পূরণে নিয়োজিত থাকেন?
৩. لَا يَظْلِمُهُ (লা ইয়াজলিমুহু) শব্দের অর্থ কী?
৪. ইসলামে সর্বসাকুল্যে কয় রকমের ভ্রাতৃত্বের স্বীকৃতি রয়েছে?
৫. গোটা বিশ্বের মানুষ কীসের বন্ধনে আবদ্ধ?
৬. মুমিনদের আদর্শিক ভ্রাতৃত্ব সংরক্ষণ করা কীসের অনিবার্য দাবি?

উত্তরের জন্য দেখো ১৮৩ পৃষ্ঠা।

পাঠ ২৫ ১০ নম্বর হাদিসের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা
Translation, Explanation and Learning of Hadith No. 10

[ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত হাদিস]

আরবি	অনুবাদ
عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِىْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)	হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন— রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, সেই ব্যক্তি শক্তিমান নয় যে মল্লযুদ্ধে সক্ষম, বরং শক্তিমানতো সেই ব্যক্তি যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। (বুখারি ও মুসলিম)

শব্দার্থ: لَيْسَ – না/নয়, الشَّدِيْدُ – বীর/শক্তিমান, بِالصُّرَعَةِ – মল্লযুদ্ধে/কুস্তিতে, إِنَّمَا الشَّدِيْدُ – নিশ্চয়ই শক্তিমান সে, اَلَّذِىْ – যে/যিনি, يَمْلِكُ – আয়ত্তে রাখে/নিয়ন্ত্রণ করে, نَفْسَهُ – নিজেকে, عِنْدَ الْغَضَبِ – ক্রোধের সময়, مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ – সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম।

ব্যাখ্যা: শারীরিক শক্তিমত্তাই মানুষের মূলশক্তি নয়। ব্যক্তি মল্লযুদ্ধে দৈহিক ক্ষমতা দিয়ে প্রতিপক্ষকে সহজেই পরাজিত করতে পারে। কেননা কায়িক শক্তির প্রদর্শনী ছাড়া ব্যক্তিকে এখানে কিছুই করতে হয় না। আসল শক্তিমান সেই ব্যক্তি, যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ক্রোধ একটি রিপু। এর ফলে ব্যক্তি উত্তেজিত হয়ে ওঠে। যথাযথ আচরণ করতে পারে না। নিজের ওপর ও নিজের কাজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে না। তার সাথে অন্যের সম্পর্ক খারাপ হয়। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ক্রোধের কারণে সে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হয়। বাইরে থেকে কোনো প্রভাবক না থাকায় ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। কারণ দৈহিক ক্ষমতা থাকলে কুস্তিতে বিজয়ী হওয়া যায়, যুদ্ধে বীরত্ব দেখানো যায়, কিন্তু প্রবৃত্তির সাথে বিজয়ী হওয়ার জন্য দৈহিক শক্তি যথেষ্ট নয়; এজন্য প্রয়োজন আত্মশুদ্ধি ও আত্মসংশোধন। বস্তুত এটা অত্যন্ত কঠিন কাজ। রাসুলুল্লাহ (সা.) একে 'আল-জিহাদুল আকবর' বা বৃহত্তম জিহাদ বলেছেন। সেজন্য ক্রোধ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যারা জয়ী হয়, নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখে, তারাই প্রকৃত শক্তিমান এবং বিজয়ী বীর।

শিক্ষা: এ হাদিসের শিক্ষা হলো–

১. ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। কেননা এ অবস্থায় কোনো কাজ বা সিদ্ধান্তই যথার্থ হয় না। ২. ক্রোধ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় আত্মিক শুদ্ধতা অর্জনের সাধনা করতে হবে। আত্মাকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জয়ী হওয়ার শক্তি অর্জন করতে হবে। ৩. প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার মাধ্যমে মুসলিম ব্যক্তি চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করতে পারে। সুতরাং মুমিনের সাধনা হবে আত্মশুদ্ধি ও আত্ম-উন্নয়নের সাধনা। ৪. মানুষের ক্রোধ মহান আল্লাহ প্রদত্ত এক বিশেষ মানবিক প্রবৃত্তি। একে নির্মূল করা সম্ভব নয়, তবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ৫. সামাজিক শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি। তা না হলে পারস্পরিক সম্পর্ক বিনষ্ট হয়। অহেতুক উত্তেজনা ও অর্থহীন আবেগ স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত করে। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে অনিয়ন্ত্রিত ক্রোধ দেশ, জাতি ও সমাজ ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। সুতরাং ক্রোধ নিয়ন্ত্রণে রাখাই শ্রেষ্ঠ নীতি।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. হাদিসের আলোকে প্রকৃত বীর কে? *[সকল বোর্ড ২০২১]*

২. اَلشَّدِيْدُ (শাদিদ) শব্দের অর্থ কী?

৩. কোন অবস্থায় কোনো কাজ বা সিদ্ধান্ত যথার্থ হয় না?

৪. প্রবৃত্তির সাথে বিজয়ী হওয়ার জন্য কী প্রয়োজন?

উত্তরের জন্য দেখো ১৮৩ পৃষ্ঠা।

পাঠ ২৬ ১১ নম্বর হাদিসের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা
Translation, Explanation and Learning of Hadith No. 11

[জুলুমের প্রতিরোধ ও মজলুমের সাহায্য সম্পর্কিত হাদিস]

অনুবাদ	আরবি
হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন— রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, তোমার অত্যাচারী এবং অত্যাচারিত ভাইকে সাহায্য করো। যদি সে অত্যাচারী হয়, তা হলে তাকে অত্যাচার থেকে নিবৃত্ত করো। আর যদি সে অত্যাচারিত হয় তবে তাকে সাহায্য কর (সুনান দারিমি)।	عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اُنْصُرْ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْمَظْلُوْمًا اِنْ يَّكُ ظَالِمًا فَارْدُدْهُ مِنْ ظُلْمِهِ وَاِنْ يَّكُ مَظْلُوْمًا فَانْصُرْهُ. (اَلدَّارِمِيُّ)

শব্দার্থ: اُنْصُرْ – তুমি সাহায্য করো, اَخَاكَ – তোমার ভাইকে, ظَالِمًا – অত্যাচারী অবস্থায়, اَوْمَظْلُوْمًا – অথবা অত্যাচারিত অবস্থায়, اِنْ يَّكُ – যদি সে হয়, ظَالِمًا – অত্যাচারী, فَارْدُدْهُ – তবে তুমি তাকে রুখে দাঁড়াও/বিরত রাখ, مِنْ ظُلْمِهِ – তার অত্যাচার থেকে, وَاِنْ يَّكُ – আর যদি সে হয়, مَظْلُوْمًا – নিপীড়িত, فَانْصُرْهُ – তাহলে তাকে সাহায্য করো, اَلدَّارِمِيُّ – সুনান দারিমি।

ব্যাখ্যা: এ হাদিসে মহানবি (সা.) ইসলামি ভ্রাতৃত্বের সুমহান চেতনায় অত্যাচার-জুলুম মূলোৎপাটনের পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। জুলুম একটি অমার্জনীয় গর্হিত কাজ। ব্যক্তি থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন পক্ষকে প্রাপ্য হক ও অধিকার থেকে বঞ্চিত করা, কাউকে নিপীড়ন করা প্রভৃতি জুলুমের অন্তর্ভুক্ত। জুলুমের সাথে দুধরনের লোক সম্পৃক্ত: ১. জালিম বা যে জুলুম করে, ২. মজলুম বা যার ওপর জুলুম করা হয়। মহানবি (সা.) সাধারণভাবে মুসলিমদের নির্দেশ দিয়েছেন মুমিন ব্যক্তি জালিম হোক কিংবা মজলুম হোক তাকে রক্ষা করা অপর মুমিনের দায়িত্ব। কেননা এক মুমিন অপর মুমিনের ভাই। আল্লাহ তাআলা বলেন—

'সুনিশ্চিতভাবেই মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে সম্পর্ক সংশোধন করে দাও' (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১০)।

ভ্রাতৃত্ববোধের ইমানি দাবি পূরণেই মুমিন ব্যক্তি জালিম বা মজলুম মুমিন ভাইয়ের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। তবে দু'জনের সাহায্যের প্রকৃতি এক রকম হবে না। জালিম ব্যক্তি জুলুম করে নিজের পার্থিব কল্যাণ ও পরকালীন সাফল্যের সম্ভাবনা ধ্বংস করছে। এ কারণে জালিমের প্রতি মমত্ববোধের কারণেই তাকে সদুপদেশ দিয়ে জুলুম থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করতে হবে। সদুপদেশে কাজ না হলে ব্যক্তিগত পর্যায়ে শক্তি প্রয়োগ করতে হবে এবং তা না পারলে সামষ্টিক শক্তি দিয়ে হলেও জালিমকে চিরস্থায়ী ধ্বংস তথা জুলুমের পথ থেকে ফেরাতে হবে। আর জুলুমের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। জালিমকে প্রতিরোধহীনভাবে অপরাধ করতে দেওয়া মানে তাকে জুলুম করার অবাধ অধিকার দেওয়া। এর দায় কেবল জালিম বহন করবে না, বরং যারা প্রতিরোধের চেষ্টা করেনি, তারাও বহন করবে। মুমিনদের ক্ষেত্রে এ দায় আরো বহুগুণ বেশি। কারণ, মানবিক দায়িত্বের পাশাপাশি তার আছে ইমানি দায়িত্ব। এ সম্পর্কে মহানবি (সা.) বলেন— 'তুমি মুমিনদেরকে তাদের পরস্পরের প্রতি দয়া প্রদর্শন, ভালোবাসা পোষণ ও সহানুভূতি দেখানোর ব্যাপারে একই দেহের মতো দেখতে পাবে। যখন দেহের কোনো একটি অঙ্গ কষ্ট অনুভব করে তখন এর জন্য গোটা দেহই অনিদ্রা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়ে সাড়া প্রদান করে থাকে' (বুখারি ও মুসলিম)।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি, জালিমকে জুলুম করতে না দিয়ে সাহায্য করতে হবে আর মজলুমকে সাহায্য করতে হবে সে যেন আর জুলুমের শিকার না হয়।

শিক্ষা: এ হাদিস থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায় তা হলো—

১. আল্লাহ তাআলা ন্যায়বিচারক। তিনি কারো প্রতি জুলুম করেন না। এজন্য তিনি জালিমদের বিরুদ্ধে কঠিন ও নির্মম শাস্তির অঙ্গীকার করেছেন।

২. জুলুম বা অন্যায়-অত্যাচার ও নিপীড়ন একটি মারাত্মক গর্হিত আচরণ ও পাপের কাজ।

৩. প্রত্যেক ব্যক্তির দায়িত্ব হলো অন্যের ওপর জুলুম না করা।

৪. নিজে জুলুম না করলেই অবশ্য এ সম্পর্কিত দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না, বরং সমাজে যাতে জুলুম চলতে না পারে, জালিমরা যেন মজলুমদের আমৃত্যু মজলুম না রাখতে পারে, তা নিশ্চিত করাও মুসলিমের দায়িত্ব।

৫. ব্যক্তিগত উদ্যোগে জুলুম নির্মূল অসম্ভব বিধায় এক্ষেত্রে সামষ্টিক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

জেনে রাখো

জুলুম:
জুলুম শব্দের শাব্দিক অর্থ অত্যাচার। কোনো বস্তুকে তার আসল স্থানে না রেখে অন্য স্থানে রাখার নাম জুলুম। জুলুম ৩ প্রকার। যথা—

১. মহান আল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রে জুলুম: মূর্তি, গাছ, পাথর ইত্যাদিকে মহান আল্লাহর সাথে শরিক করা। আমাদের বাংলাদেশসহ আরও অনেক মুসলিম দেশের মাজারগুলোতে যে ধরনের শিরকের বাজার জমে উঠেছে তা সুস্পষ্ট ও বিরাট একটি জুলুম।

২. স্বীয় নফসের ওপর জুলুম: মানুষ তার কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ করে নানা পাপকাজে লিপ্ত হয় এবং ফরজ, ওয়াজিব ইত্যাদি ইবাদতগুলো পালনে অলসতা করে। এটা এক প্রকার জুলুম।

৩. মহান আল্লাহর সৃষ্টি ও তাঁর বান্দাদের ওপর মানুষের জুলুম: মানুষকে অন্যায়ভাবে মারপিট, সম্পদ আত্মসাৎ, সম্মানহানি, গালিগালাজ ইত্যাদির মাধ্যমে এ প্রকারের জুলুম সংঘটিত হয়।

জালিম: যে ব্যক্তি জুলুম করে বা অত্যাচারী।

মজলুম: যার ওপর জুলুম করা হয় বা অত্যাচারিত।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. একজন মুসলিম হিসেবে অত্যাচারিত ভাইকে কী করতে হবে?

২. একজন মুসলিম হিসেবে অত্যাচারী ভাইকে কীভাবে সাহায্য করবে?

৩. اُنْصُرْ (উনসুর) শব্দের অর্থ কী?

৪. مَظْلُوْمٌ (মাজলুম) শব্দের অর্থ কী?

৫. জুলুম কী ধরনের কাজ?

৬. কে জালিমের বিরুদ্ধে কঠিন ও নির্মম শাস্তির অঙ্গীকার করেছেন?

উত্তরের জন্য দেখো ১৮৩ পৃষ্ঠা।

খ. দলীয় কাজ

শিক্ষার্থীরা ২টি দলে বিভক্ত হয়ে জালিম ও মজলুমকে সাহায্য করা সম্পর্কে ধারণা পেশ করবে।

পাঠ ২৭ ১২ নম্বর হাদিসের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা
Translation, Explanation and Learning of Hadith No. 12

[অশ্লীলতা সম্পর্কিত হাদিস]

অনুবাদ	আরবি
হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন— রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন— নিশ্চয়ই মানুষের মধ্যে নিকৃষ্টতম হচ্ছে সে ব্যক্তি যার অশ্লীলতা থেকে বেঁচে থাকার জন্য মানুষ তাকে পরিত্যাগ করে। (বুখারি ও মুসলিম)	عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اِتِّقَاءَ فَحْشِهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

শব্দার্থ: قَالَتْ – তিনি বলেন— اِنَّ – নিশ্চয়ই, شَرَّ – নিকৃষ্ট/খারাপ, النَّاسِ – মানুষের মধ্যে, مَنْ تَرَكَهُ – যে ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে, النَّاسُ – মানুষেরা, اِتِّقَاءَ – বেঁচে থাকার জন্য/রক্ষা পাওয়ার জন্য, فَحْشِهِ – তার অশ্লীলতার জন্য, مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ – সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম।

ব্যাখ্যা: ইসলাম একটি সর্বজনিন, মার্জিত ও সুশীল জীবনব্যবস্থা। উন্নত নৈতিকতা ও চারিত্রিক মাধুর্যের ওপর এর নীতি ও আদর্শ প্রতিষ্ঠিত। এর মধ্যে অশ্লীল ও অসভ্য কোনো কিছুর স্থান নেই। আল্লাহ তাআলা অশ্লীলতা হারাম করেছেন। কুরআনে বলা হয়েছে, "মুহাম্মাদ (সা.) আপনি বলুন, নিশ্চয়ই আমার রব সব প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা হারাম করেছেন" (সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ৩৩)। ইসলামে অশ্লীলতাকে যেমন হারাম করা হয়েছে, তেমনি হারাম করা হয়েছে অশ্লীল সজ্জা। ফলে প্রকৃত মুসলিম অশ্লীল সজ্জা ত্যাগ করে। কারণ, অশালীন সংসর্গ অশালীন কাজেই উদ্বুদ্ধ করে।

শিক্ষা: এ হাদিসের শিক্ষা হলো—
১. ইসলাম শালীনতার ধর্ম। এ জন্যেই ইসলামের জীবনদর্শন ও শিক্ষা অত্যন্ত উন্নততর আদর্শের ওপর নির্ভরশীল। ২. অশ্লীলতা, অশোভন আচরণ, নৈতিক জীবনকে ধ্বংস করে। ৩. অশ্লীলতা একটি মারাত্মক নৈতিক ত্রুটি। এ থেকে মুমিনদের বেঁচে থাকতে হবে। ৪. অশ্লীলতার সাথে সংশ্লিষ্ট লোকদের পরিত্যাগ করতে হবে। ৫. অশ্লীলতা প্রতিরোধে মুমিনদের সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। এর সাথে সংশ্লিষ্টদের নৈতিকতা পরিশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা করতে হবে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মানুষের মধ্যে নিকৃষ্টতম ব্যক্তি কে? *[রা. বো., দি. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০২২]*
২. شَرٌّ (শাররুন) শব্দের অর্থ কী?
৩. فُحْشِهِ (ফুহশিহি) শব্দের অর্থ কী?
৪. আল্লাহ তাআলা অশ্লীলতাকে কী করেছেন?
৫. অশ্লীলতা, অশোভন আচরণ নৈতিক জীবনকে কী করে?

উত্তরের জন্য দেখো ১৮৩ পৃষ্ঠা।

খ. দলীয় কাজ

শিক্ষার্থীরা দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে অশ্লীলতা প্রতিরোধ সংক্রান্ত পাঁচটি বাক্য লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ২৮ ১৩ নম্বর হাদিসের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা
Translation, Explanation and Learning of Hadith No. 13

[ইমানের প্রতিবন্ধক দোষাবলি সম্পর্কিত হাদিস]

অনুবাদ	আরবি
হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন— রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মুমিন ব্যক্তি পরনিন্দুক ও দোষান্বেষক হবে না। সে অভিশাপকারী নয়। সে নয় অশালীন, আর না সে নির্লজ্জ। (তিরমিযি)	عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا بِاللَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيِّ- (اَلتِّرْمِذِيُّ)

শব্দার্থ: لَيْسَ – না/নয়, اَلْمُؤْمِنُ – মুমিন ব্যক্তি, بِالطَّعَّانِ – পরনিন্দুক, ছিদ্রান্বেষী, وَلَا بِاللَّعَّانِ – আর না অভিশম্পাতকারী, وَلَا الْفَاحِشِ – আর না অশালীন, وَلَا الْبَذِىْ – এবং না নির্লজ্জ, اَلتِّرْمِذِيُّ– তিরমিযি।

ব্যাখ্যা: এ হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) চারটি মন্দগুণের উল্লেখ করে চরিত্রে এগুলোর পরিত্যাগকে মুমিনের বৈশিষ্ট্য বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন— মুমিন হওয়া এবং পরনিন্দা, অভিশাপ, অশালীনতা ও নির্লজ্জতা একত্র হবে না। মুমিন হতে হলে অনিবার্যভাবে এ চারিত্রিক ত্রুটিগুলো থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে হবে। কারণ, ইসলামে এ চারটি আচরণকে অত্যন্ত নিকৃষ্ট পর্যায়ের হারাম হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

ব্যক্তির দোষ বলা বা খুঁজে খুঁজে তার ত্রুটি বের করা, কিংবা কেবল খারাপ দিক খুঁজে বের করার জন্য তার পেছনে লেগে থাকা বড় রকমের চারিত্রিক ত্রুটি। এর মাধ্যমে ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়। তার সাথে অন্যদের সম্পর্কের অবনতি হয়। এমনকি তার স্বাধীন ব্যক্তিজীবনও বিঘ্নিত হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন— "মুমিনগণ! তোমরা বেশি বেশি ধারণা করা থেকে বিরত থাক। কেননা কোনো কোনো ধারণা পাপ। তোমরা একে অন্যের দোষান্বেষণ কোরো না এবং একজন অপরজনের অনুপস্থিতিতে নিন্দা কোরো না (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১২)।

শিক্ষা: এ হাদিসের মূল শিক্ষাগুলো হলো—

১. মহান আল্লাহর প্রতি মানুষের ইমান পোষণের অর্থই হলো তার সাথে স্বেচ্ছাকৃত সব পাপাচারের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। সে মহান আল্লাহর বান্দা হিসেবে সব নিষিদ্ধ কাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখবে। হারাম কাজ এবং ইমান একীভূত হবে না। ২. মুমিন ব্যক্তি অন্যের নিন্দা করবে না। খুঁজে খুঁজে কারো দোষ বের করবে না। ৩. মুমিন অন্য মুমিনকে অভিশাপ দেবে না। তার ধ্বংস ও অকল্যাণ কামনা করবে না। ৪. মুমিন কোনো অশালীন, অসভ্য ও অশ্লীল কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করবে না। ৫. মুমিন নির্লজ্জ হবে না। তার মধ্যে মহান আল্লাহর কাছে লজ্জিত ও অপদস্থ হওয়ার ভয় থাকবে।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি, পূর্ণাঙ্গ ও খাঁটি মুমিন হতে হলে মুমিনকে অবশ্যই এসব ত্রুটি থেকে মুক্ত হতে হবে। তাহলে একজন মানুষ মুমিন হবে, না হলে মুনাফিক। কারণ, মুনাফিকেরই কেবল কথা ও কাজে মিল থাকে না।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কে পরনিন্দুক ও দোষান্বেষক হবে না?
২. وَلَا بِاللَّعَّانِ (ওয়া লা-বিল্লাআ'আন) অর্থ কী?
৩. وَلَا الْبَذِىْ (ওয়া-লা-বাজা) অর্থ কী?
৪. পরনিন্দা ও দোষান্বেষণের মাধ্যমে ব্যক্তির কী ক্ষুণ্ন হয়?
৫. হারাম কাজ এবং ইমান কী হবে না?

উত্তরের জন্য দেখো ১৮৩ পৃষ্ঠা।

পাঠ ২৯

১৪ নম্বর হাদিসের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা
Translation, Explanation and Learning of Hadith No. 14

[বৃক্ষরোপণ সম্পর্কিত হাদিস]

অনুবাদ	আরবি
হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন— রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, কোনো একজন মুসলিম যদি একটি গাছ লাগায় বা ফসল উৎপাদন করে; পরে তা থেকে যদি কোনো মানুষ কিংবা কোনো পশু বা পাখি আহার করে, তবে তা অবশ্যই সে ব্যক্তির জন্য সদকা হয়ে যায় (বুখারি ও মুসলিম)।	عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا اَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَاْكُلُ مِنْهُ اِنْسَانٌ اَوْ طَيْرٌ اَوْ بَهِيْمَةٌ اِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

শব্দার্থ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ – মুসলিমদের কেউ/যেকোনো মুসলিম, يَغْرِسُ – সে রোপণ করে, غَرْسًا – চারা/গাছ, اَوْ يَزْرَعُ – অথবা সে চাষ করে, زَرْعًا – বীজ/শস্য, يَاْكُلُ – ভক্ষণ করে/খায়, مِنْهُ – সেখান থেকে, اِنْسَانٌ – মানুষ, اَوْ طَيْرٌ – অথবা পাখি, اَوْ بَهِيْمَةٌ – কিংবা চতুষ্পদ জন্তু, كَانَتْ لَهُ – তার জন্য তা হবে, صَدَقَةً সদকা/দান, مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ – সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম।

ব্যাখ্যা: আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও পরিবেশ রক্ষার গুরুত্ব বর্ণনায় হাদিসটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ হাদিসে মহানবি (সা.) বৃক্ষরোপণ ও ফসল উৎপাদনের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন।

মানুষের জীবনযাত্রায় সবুজ বৃক্ষ ও ফসলের অবদান অপরিসীম। এর মাধ্যমে মানুষের প্রতি মহান আল্লাহর রহমত অফুরান ধারায় বর্ষিত হয়। মানুষ নানাভাবে উপকৃত হয়। বেঁচে থাকার জন্য মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান প্রয়োজন। বৃক্ষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমাদের সে প্রয়োজন পূরণ করে। বৃক্ষ থেকে আমরা খাদ্য, ঔষধ, পোশাক, কাঠ, ফল ইত্যাদি পাই। বৃক্ষ আমাদের আর্থিক সচ্ছলতাও প্রদান করে। পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষায়ও বৃক্ষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অক্সিজেনের সরবরাহ বৃদ্ধি, জলবায়ুর উষ্ণতা রোধ, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, মৌসুমি ফলমূল উৎপাদন, অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি রোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও বৃক্ষের অবদান অনস্বীকার্য। আলোচ্য হাদিসে বৃক্ষরোপণের নির্দেশ দানের মাধ্যমে মহানবি (সা.) আমাদের এসব নিয়ামত ও উপকার লাভের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন।

বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে মানুষ পার্থিব লাভের পাশাপাশি পরকালীন কল্যাণও লাভ করতে পারে। কারণ, পশু-পাখি, জীব-জন্তু ও কীট-পতঙ্গ বৃক্ষের ফল, ক্ষেতের ফসল খায়। এতে বৃক্ষরোপণকারী ও ফসল আবাদকারী সাওয়াব লাভ করে। ঐ ফল-ফসল সদকা করে দিলে যে সাওয়াব হতো, পশুপাখি বা মানুষের খাওয়ার ফলে আল্লাহ তাআলা তার আমলনামায় সে পরিমাণ সাওয়াব লিখে দেন। কেউ যদি চুরি করে নিয়ে যায় তাও সদকা হবে। নিজের জন্য ফল-ফসল চাষ করতে গিয়েই এক মহান দায়িত্ব পালন হয়ে যায়। ফলে সে নিজের অজান্তেই অনেক সাওয়াবের অধিকারী হয়ে যায়।

খিলাফতের সুমহান দায়িত্ব পালনের জন্য মানুষ পৃথিবীতে আগমন করেছে। সে জন্য মহান আল্লাহর খলিফা হিসেবে পৃথিবীর সব সৃষ্টির সেবা ও কল্যাণ সাধন করা মানুষের কর্তব্য। অতএব এমন সব কাজ যা দিয়ে সৃষ্টিজগৎ উপকৃত হয়, তা সেই খিলাফতের দায়িত্ব পালনের শামিল। বৃক্ষরোপণ বা ফসল ফলানো এমন একটি কাজ যা দিয়ে শুধু মানুষই নয়, পশুপাখি এবং অন্যান্য প্রাণীরাও উপকৃত হয়। এজন্য মহানবি (সা.) বৃক্ষরোপণ ও ফসল ফলানোকে সদকা হিসেবে

ঘোষণা করেছেন। গাছ থেকে আমাদের উপকার লাভের তালিকা অনেক দীর্ঘ। এর মধ্যে মৌলিক লাভগুলো হলো— গাছ আমাদের ফল ও ফসল দেয় যা খেয়ে আমরা আমাদের জীবনধারণ করি। এ থেকে আমরা বাহারি রঙের মনকাড়া সুবাসের ফুল লাভ করি। গাছ আমাদের ছায়া দেয়। প্রয়োজনে এর কাঠ দিয়ে আমরা প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র তৈরি করি, আবার জ্বালানি হিসেবেও ব্যবহার করি। তাছাড়া গাছ আমাদের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে। আমাদের বেঁচে থাকার মূল উপাদান যে অক্সিজেন সেটাও আমরা এ গাছ থেকেই পাই। পাশাপাশি আমাদের শরীর থেকে নির্গত ক্ষতিকর কার্বন ডাই-অক্সাইড এই গাছই শুষে নেয়। বিভিন্ন ঔষধি গাছ ও লতাপাতা দিয়ে আমরা বিভিন্ন রোগের ওষুধ তৈরি করি ইত্যাদি।

পরিশেষে বলা যায়, বৃক্ষরোপণ ও ফসল উৎপাদনে সব মাখলুকাত অর্থাৎ মানুষ ও পশুপাখিসহ যাবতীয় জীবজন্তুর প্রতি মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা হয়।

শিক্ষা: রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর এ হাদিসের শিক্ষা হলো—

১. বৃক্ষরোপণ পুণ্যের কাজ।

২. বৃক্ষরোপণ করে মানুষ আর্থিকভাবে লাভবান হয়। পরিবেশ সংরক্ষিত থাকে।

৩. আখিরাতেও এর প্রতিদান পাওয়া যাবে।

৪. মহানবি (সা.) আমাদের বৃক্ষরোপণের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন।

৫. উৎপাদিত ফল ও ফসল থেকে কোনো প্রাণী কিছু ভক্ষণ করলে তা বিনষ্ট হয় না, বরং তা সদকা হিসেবে আবাদকারীর আমলনামায় লেখা হয়।

৬. মানুষের গাছ ও ফসল উৎপাদনে তার পাশাপাশি বিভিন্ন পশুপাখিরও অধিকার আছে।

পরিশেষে বলা যায়, ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক উপকার এবং সর্বাত্মক স্বার্থ সুরক্ষার জন্যেই ব্যাপক বৃক্ষরোপণ ও শস্য উৎপাদন করা উচিত।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. يَغْرِسُ (ইয়াগরিছু) শব্দের অর্থ কী?

২. صَدَقَةٌ (সদাকাহ) শব্দের অর্থ কী?

৩. কী থেকে আমরা খাদ্য, ঔষধ, পোশাক, কাঠ, ফল ইত্যাদি পাই?

৪. পরিবেশ রক্ষায় কী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে?

৫. অক্সিজেনের সরবরাহ বৃদ্ধি এবং জলবায়ুর উষ্ণতারোধে কীসের অবদান অনস্বীকার্য?

৬. বৃক্ষরোপণ বা ফসল ফলানোকে মহানবি (সা.) কী হিসেবে ঘোষণা করেছেন?.

উত্তরের জন্য দেখো ১৮৩ পৃষ্ঠা।

খ. একক কাজ

শিক্ষার্থীরা বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত একটি অনুচ্ছেদ লিখে শ্রেণিতে পেশ করবে।

গ. বাড়ির কাজ

আলম একজন শিক্ষিত মানুষ। তিনি চাষাবাদ করেন, ফসল ফলান, গাছ-পালা রোপণ করেন। তিনি একজন সফল কৃষক। শিক্ষিত হয়েও এসব কাজের কারণে অনেকে তাকে লজ্জা দিতে চায়। কিন্তু তিনি তাদের বলেন— আমি একজন মুসলমান। আর একজন মুসলমানের মহান উদ্দেশ্য হচ্ছে মহান আল্লাহর সৃষ্টির উপকার করা।

১. হাদিসের আলোকে আলমের কাজটি কী হিসেবে বিবেচিত হবে? ব্যাখ্যা করো।

২. আলমের বক্তব্যের আলোকে বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করো।

পাঠ ৩০

১৫ নম্বর হাদিসের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা
Translation, Explanation and Learning of Hadith No. 15

[ব্যবসায়ে সততা সম্পর্কিত হাদিস]

অনুবাদ	আরবি
হযরত উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন— রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী মুসলিম ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন শহিদদের সাথে থাকবেন (মুসতাদরাক হাকিম)।	عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلتَّاجِرُ الْاَمِيْنُ الصَّدُوْقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (اَلْمُسْتَدْرَكُ لِلْحَاكِمِ)

শব্দার্থ: اَلتَّاجِرُ – ব্যবসায়ী বণিক, اَلْاَمِيْنُ – বিশ্বস্ত/বিশ্বাসী, اَلصَّدُوْقُ – সত্যবাদী, اَلْمُسْلِمُ – মুসলিম, مَعَ – সাথে থাকবে/সঙ্গী হবে, اَلشُّهَدَاءِ – শহিদদের, يَوْمَ الْقِيَامَةِ – কিয়ামতের দিন।

ব্যাখ্যা: ব্যবসায় বাণিজ্য একটি পবিত্র পেশা। এ হাদিসে ব্যবসায়ীদের সৎ ও বিশ্বস্ত থাকার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মানুষের জীবনযাত্রায় ব্যবসায়ের সম্পৃক্ততা খুব বেশি। জীবনধারণের জন্যেই তাকে ক্রয়-বিক্রয় করতে হয়। মূলত ব্যবসা হলো— জীবিকা উপার্জনের সেই বিশেষ পদ্ধতি যার মাধ্যমে ব্যক্তি মহান আল্লাহর দেওয়া অঢেল নিয়ামত প্রয়োজন মতো উৎপাদন ও বিপণনের সুযোগ পায়। এজন্যেই মহানবি (সা.) ইরশাদ করেন, 'জীবিকার দশ ভাগের নয় ভাগই আছে ব্যবসায়ের মধ্যে।' আর আল্লাহ তাআলা একে সুস্পষ্ট ঘোষণায় হালাল সাব্যস্ত করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে— "আল্লাহ তাআলা ব্যবসা হালাল করেছেন, আর সুদ হারাম করেছেন" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৭৫)। যে জন্য জীবিকা উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে মহানবি (সা.) ব্যবসা বেছে নিয়েছিলেন। খুলাফায়ে রাশিদার সব সদস্যের ব্যবসায় সম্পৃক্ততার কথা জানা যায়। তা সত্ত্বেও ব্যবসায় যদি অসততা থাকে, ওজনে কম দেওয়া, পণ্যে ভেজাল দেওয়া বা অন্য কোনোভাবে ভোক্তাকে ঠকানো হয়, তাহলে তা হবে প্রতারণা। আর এ শ্রেণির ব্যবসায় হলো হারাম ব্যবসা। মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে অবৈধ উপায়ে সম্পদ উপার্জন করে সাময়িকভাবে লাভবান হওয়া গেলেও এর শেষ পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। কাজেই অন্যায়, জুলুম, ধোঁকাবাজি, প্রতারণা, মুনাফাখোরী, কালোবাজারী, মজুতদারি ইত্যাদি অবৈধ ও ইসলাম বিরোধী কার্যাবলী পরিহার করে সততার সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে হবে।

ব্যবসায়ের পদ্ধতি ও প্রকৃতিই এমন যে, ব্যবসায়ী ইচ্ছে করলে এর মধ্যে প্রতারণা করার প্রচুর সুযোগ রয়েছে। যে জন্য ব্যবসায়িক প্রক্রিয়ায় বিশ্বস্ত ও সৎ থাকা তুলনামূলক একটু বেশি কঠিন। এ জন্যেই সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত মুসলিম ব্যবসায়ীর জন্য পুরস্কারের ঘোষণাও বিপুল। তারা কিয়ামতের কঠিন দিনে শহিদদের সাথে আনন্দে আরশের ছায়ার নিচে অবস্থান করবে। তবে এজন্য ব্যবসায়ীদের দুটি শর্ত পূরণ করতে হবে। প্রথমত, সততা ও সত্যবাদিতার সাথে ব্যবসা পরিচালনা করতে হবে। দ্বিতীয়ত, তাদেরকে বিশ্বস্ত ও আমানতদার হতে হবে। ব্যবসায়ীদের এ বিশেষ মর্যাদা দেওয়ার এটাও একটা কারণ যে, তাদের বিশ্বস্ত ও সৎ থাকার অনুকূলে এর মাধ্যমে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। কারণ, কেনা-বেচায় দ্রব্য সঠিক দেওয়া এবং তার মান ঠিক রাখার ব্যাপারে ব্যবসায়ী অসৎ হলে সাধারণ মানুষ বিভিন্ন রকম ক্ষতির মধ্যে পড়তে বাধ্য। তাই মানবিক ও সামাজিক স্বার্থে এবং পরকালীন বিপুল মর্যাদার কথা বিবেচনা করে ব্যবসায়ীদের কর্তব্য হলো সৎ থাকা।

শিক্ষা: মহানবি (সা.)-এর বৈষয়িক ও পারলৌকিক জীবনের নীতিনির্ধারণী গুরুত্বপূর্ণ এ হাদিসের শিক্ষা হলো-

১. ব্যবসায়ে মানুষের সাথে প্রতারণার অনেক সুযোগ থাকে। এ জন্যেই রাসুলুল্লাহ (সা.) ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সততা ও বিশ্বস্ততাকে শহিদের সমান মর্যাদা দিয়েছেন।

২. সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করা প্রত্যেক মুসলিম ব্যবসায়ীর অনিবার্য কর্তব্য।

৩. মুসলিম ব্যবসায়ী পণ্য উৎপাদন, বিপণন ও ভোক্তার নিকট অর্পণের প্রতিটি পর্যায়ে সৎ এবং বিশ্বস্ত থাকবেন। ওজনে কম দেওয়া, পণ্যে ভেজাল দেওয়া বা অন্য কোনোভাবে ভোক্তাকে তিনি ঠকাবেন না।

৪. মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি মজুত করে পণ্যমূল্য বাড়িয়ে মুনাফা লাভের প্রবণতা থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

৫. ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করলে ব্যবসায়ী এবং ক্রেতা উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

কাজেই পরিস্থিতি যতই প্রতিকূলে থাকুক, মুসলিম ব্যবসায়ীর দায়িত্ব হলো— সততা ও বিশ্বস্ততা রক্ষা করা, ন্যায় ও বৈধপথে অবিচল থাকা, ধোঁকা ও প্রতারণা থেকে দূরে থাকা। তাহলেই তাঁর জন্য অপেক্ষা করবে নিশ্চিত সাফল্য ও মহাপুরস্কার।

জেনে রাখো

হালাল ব্যবসায় বাণিজ্য:

নিম্নোক্ত পাঁচটি পদ্ধতিতে ব্যবসায় করলে তা ইসলামি শরিয়ত কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

ক. **বাই মুরাবাহা:** লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে নগদ মূল্যে ক্রয়-বিক্রয়ের একক ব্যবসা।

খ. **বাই মুআজজাল:** ভবিষ্যতে নির্ধারিত কোনো সময়ে একসাথে অথবা কিস্তিতে উভয় পক্ষের সম্মতিতে মূল্য পরিশোধের শর্তে ক্রয়-বিক্রয়।

গ. **বাই সালাম:** ভবিষ্যতে নির্ধারিত কোনো সময়ে সরবরাহের শর্তে এবং তাৎক্ষণিক উপযুক্ত মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে নির্দিষ্ট পরিমাণ শরিয়ত অনুমোদিত পণ্যসামগ্রীর অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়।

ঘ. **বাই মুজারাবা:** এক পক্ষের মূলধন এবং অপরপক্ষের দৈহিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রমের সমন্বয়ে যৌথ ব্যবসা।

ঙ. **বাই মুশারাকা:** মূলধন ও লভ্যাংশের ব্যাপারে দুই বা ততোধিক অংশীদারের মধ্যকার চুক্তি অনুসারে ব্যবসা।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী মুসলিম ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন কার সাথে থাকবেন? *[সকল বোর্ড ২০২১]*

২. اَلتَّاجِرُ (আত-তাজির) শব্দের অর্থ কী?

৩. اَلْاَمِيْنُ (আল-আমিন) শব্দের অর্থ কী?

৪. ব্যবসায় বাণিজ্য কীরূপ পেশা?

৫. জীবিকার দশ ভাগের কয় ভাগ ব্যবসায়ের মধ্যে আছে?

৬. ইসলামে ব্যবসায়ে মিথ্যা, প্রতারণা কী?

উত্তরের জন্য দেখো ১৮৩ পৃষ্ঠা।

খ. একক কাজ

শিক্ষার্থীরা সৎ ব্যবসায়ী সম্পর্কে ৫টি বাক্য খাতায় লিখে শ্রেণিশিক্ষকের কাছে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ৩১ ১৬ নম্বর হাদিসের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা
Translation, Explanation and Learning of Hadith No. 16

[ঋণের অশুভ পরিণতি সম্পর্কিত হাদিস]

অনুবাদ	আরবি
হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন— রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমরা ঋণ থেকে বেঁচে থাক। কেননা নিশ্চয়ই ঋণ হলো রাতের দুশ্চিন্তা ও দিনের লাঞ্ছনা (বায়হাকি, ইমানের শাখা-প্রশাখা অনুচ্ছেদ হতে)।	عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِيَّاكُمْ وَالدَّيْنَ فَاِنَّهُ هَمٌّ بِاللَّيْلِ وَمُذِلَّةٌ بِالنَّهَارِ-(بَيْهَقِيٌّ مِنْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

শব্দার্থ: اِيَّاكُمْ – তোমরা বেঁচে থাক, وَالدَّيْنَ – ঋণ থেকে, فَاِنَّهُ – নিশ্চয়ই তা (ঋণ), هَمٌّ – দুশ্চিন্তা, بِاللَّيْلِ – রাতের, وَمُذِلَّةٌ – এবং লাঞ্ছনা/অপমান, بِالنَّهَارِ – দিনের।

ব্যাখ্যা: ঋণ হলো দায়বদ্ধতা। এর মাধ্যমে অন্যের কাছে নিজেকে ছোট করা হয়। নিজের স্বাধীন মত প্রকাশ অনেক সময়ই বিঘ্নিত হয়। ঋণ ব্যক্তির আর্থিক উন্নতি ব্যাহত করে। ক্ষেত্রবিশেষে ব্যক্তির স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যায়। কেবল ঋণের জন্যই কখনো কখনো ব্যক্তির আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়। ঋণের বোঝা ব্যক্তিকে স্বস্তি দেয় না। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি শান্তিতে ঘুমোতে পারে না। ফলে ব্যক্তির স্বাস্থ্যহানি ঘটে। দিনে ঠিকমতো কাজকর্ম করতে পারে না। দিনে তার চলাফেরাও আনন্দের হয় না। তার মধ্যে সবসময় ঋণদাতার উপস্থিতির ভীতি কাজ করে। কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে তার অংশগ্রহণ আনন্দের হয় না, বরং কখনো কখনো ঋণদাতা ও সংশ্লিষ্ট লোকদের কাছে অপমানিত হতে হয়। এজন্য রাসুলুল্লাহ (সা.) ঋণ করা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। কারণ, ঋণ ব্যক্তির জীবনে রাতের দুশ্চিন্তা ও দিনের লাঞ্ছনা-অপমানের কারণ হয়।

শিক্ষা: রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাদিস খানার শিক্ষা হলো—

১. ঋণকারী মানসিক দিক থেকে অস্বস্তি ও কষ্টে থাকেন। মুমিন ব্যক্তি সাধ্যমতো চেষ্টা করবে ঋণ না নিতে।

২. তবে ঋণ করা অপরাধ বা নিষিদ্ধ নয়। নিতান্ত প্রয়োজনে ঋণ করা যাবে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে ঋণ পরিশোধের সময়সীমা ও অন্যান্য চুক্তি ঠিকমতো সম্পাদন করে নিতে হবে এবং যথাসময়ে ঋণ পরিশোধ করে দিতে হবে।

৩. মুমিনরা পরস্পর পরস্পরকে ঋণ দেবে। ক্ষমতা থাকলে 'করজে হাসানা' বা উত্তম ঋণ দেবে। যাতে গ্রহীতার পক্ষে যখন সম্ভব তখন ঋণ পরিশোধের সুযোগ থাকবে। এতে ব্যক্তির প্রয়োজন যেমন মিটবে তেমনি অহেতুক দুশ্চিন্তায় তার জীবন দুর্বিষহ হবে না।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. রাতের দুশ্চিন্তা ও দিনের লাঞ্ছনা কী?
২. রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে ঋণ সম্পর্কে কী বলেছেন?
৩. وَالدَّيْنَ (ওয়াদ দায়ন) শব্দের অর্থ কী?
৪. وَمُذِلَّةٌ (ওয়া মুজিল্লাহ) শব্দের অর্থ কী?
৫. ঋণের বোঝা ব্যক্তিকে কী দেয় না?

উত্তরের জন্য দেখো ১৮৩ পৃষ্ঠা।

খ. একক কাজ

শিক্ষার্থীরা ঋণের পরিণতি সম্পর্কে খাতায় লিখে শ্রেণিশিক্ষকের কাছে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ৩২ ১৭ নম্বর হাদিসের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা
Translation, Explanation and Learning of Hadith No. 17

[দাতার মর্যাদা সম্পর্কিত হাদিস]

আরবি

عَنْ حَاكِمِ ابْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَمَنْ يَّسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ وَمَنْ يَّسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ

(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ

হযরত হাকিম বিন হিজাম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন— রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, উপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে উত্তম। আর যারা তোমাদের আয়ত্তাধীন— তাদের থেকে দান আরম্ভ কর। সম্পদের প্রাচুর্য থেকে যে দান করা হয়, তা হচ্ছে উত্তম দান। যে ব্যক্তি অন্যের কাছে কিছু চাওয়া থেকে নিষ্কৃতি চায়, মহান আল্লাহ তাকে নিষ্কৃতি দেন। আর যে ব্যক্তি অমুখাপেক্ষী থাকতে চায়, মহান আল্লাহ তাকে অমুখাপেক্ষী করেন (বুখারি ও মুসলিম)।

শব্দার্থ: اَلْيَدُ – হাত, الْعُلْيَا – উপরের, خَيْرٌ – উত্তম, مِّنَ – থেকে, الْيَدِ – হাত, السُّفْلَى – নিচের, وَابْدَأْ – আর দান শুরু কর, بِمَنْ تَعُوْلُ – যারা তোমার আয়ত্তে আছে তাদের থেকে, وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ – আর উত্তম সদকা হলো, مَا كَانَ – যা দেওয়া হয়, عَنْ ظَهْرِ غِنًى – ধনী অবস্থা থেকে/প্রাচুর্য থেকে, وَمَنْ – আর যে ব্যক্তি, يَّسْتَعْفِفْ – ভিক্ষা থেকে রক্ষা পেতে চায়, يُعِفَّهُ اللهُ – মহান আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখেন, وَمَنْ – আর যে ব্যক্তি, يَّسْتَغْنِ – অমুখাপেক্ষী থাকতে চায়, يُغْنِهِ اللهُ – মহান আল্লাহ তাকে অমুখাপেক্ষী করেন।

ব্যাখ্যা: এ হাদিসে দানগ্রহীতার হাতের ওপর দান প্রদানকারীর হাতকে প্রাধান্য দিয়ে দান গ্রহণকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, দানকারীর উপরের হাত (দান করার সময় দাতার হাতউ উপরে থাকে) দান গ্রহীতার নিচের হাতের (দান গ্রহণকারী হাত পেতে নেয় বলে, তার হাত নিচে থাকে) চেয়ে উত্তম। মর্যাদার এ পার্থক্যের কারণ হলো- দাতা তার দানের মাধ্যমে দানগ্রহীতার উপকার করে থাকে এবং দানের অর্থে তার প্রয়োজন পূরণ হয় বলে অন্তত দাতার কাছে দানগ্রহীতা হেয় ও মর্যাদাহীন বিবেচিত হয়। এজন্যই প্রিয় নবি (সা.) দাতাকে তার অভাবগ্রস্ত নিকটাত্মীয়দের কাছে থেকে দান করার কাজ শুরু করার নির্দেশ দিয়ে, নিঃস্ব বা অসচ্ছল আত্মীয়দেরকে অন্যের কাছে হাত পাতার গ্লানি থেকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেছেন।

রাসুলুল্লাহ (সা.) ব্যক্তিকে দান করে দেউলিয়া হওয়ার মনোবৃত্তি ত্যাগ করতে বলেছেন। সম্পদ দান করার পর দাতাকে যেন দান গ্রহণের অবস্থায় পড়তে না হয়। সেজন্য পরিবারের সচ্ছলতা নিশ্চিত করতে একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সম্পদ জমা রাখা উচিত। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন—

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا

অর্থ: কখনো নিজের (ব্যয়ের) হাত নিজের গর্দানের সাথে বেঁধে রেখো না (যাতে কার্পণ্য প্রকাশ পায়), আবার তা সম্পূর্ণ খুলেও রেখো না, অন্যথায় (বেশি খরচ করার কারণে) তুমি নিন্দিত নিঃস্ব হয়ে যাবে (সূরা বনি ইসরাইলঃ ২৯)।

আয়াতের মর্মার্থ হলো- মুমিনগণ তাদের উপার্জন ও দানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করবেন। যার ফলে সংসারও চলে আবার দানশীলতাও অব্যাহত থাকে।

শিক্ষা: রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর এ হাদিসের শিক্ষা হলো—

১. ব্যক্তির ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা চেষ্টানির্ভর একটি বিষয়। ব্যক্তি যদি নিজেকে হীন ও অন্যের অনুগৃহীত রাখতে চান— মহান আল্লাহ তাকে তেমন ক্ষমতা দেন। আবার ব্যক্তি যদি সচ্ছল থাকতে চান আল্লাহ তাআলা তাকে সেই ক্ষমতা দেন। এজন্য শুধু আকাঙ্ক্ষাই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন যথাযথ উদ্যোগ। মুমিনগণ এমন উদ্যোগ গ্রহণে আগ্রহী থাকবেন।

২. ভিক্ষাবৃত্তি ও অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়া একটি নিন্দনীয় জীবিকার্জন ব্যবস্থা।

৩. দানশীলতা একটি মহৎগুণ, আর নিকটাত্মীয়দের দান করা হচ্ছে সর্বোত্তম কাজ।

৪. নিজের আর্থিক প্রয়োজন মেটাতে কারো কাছে হাত না পেতে কায়িক শ্রমের বিনিময়ে স্বাবলম্বী হওয়া উচিত। কেননা ভিক্ষাবৃত্তি ও ঋণগ্রহণ ব্যক্তির মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব ক্ষুণ্ন করে।

৫. দান গ্রহণের চেয়ে দান করার যোগ্যতা ও মানসিকতা অর্জন করতে হবে। কেননা দাতা মর্যাদাবান।

জেনে রাখো

ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে সম্পত্তির মালিকানা

- কিয়ামতের দিন যে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কোনো মানুষ সামনে যেতে পারবে না, তার মধ্যে দুটি প্রশ্নই ধন-সম্পদ বিষয়ক। প্রশ্ন করা হবে— কোন পথে সম্পদ উপার্জন করেছ এবং কোন পথে তা ব্যয় করেছ?
- মানুষ বলে আমার সম্পদ অথচ তিনটি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সম্পদই শুধু তার। যেমন—

ক. যা খেয়ে শেষ করেছে।

খ. যা পরিধান করে নষ্ট করেছে।

গ. যা দান করে জমা করেছে।

আর অবশিষ্ট সম্পদ সে ছেড়ে যাবে, আর মানুষ তা নিয়ে যাবে।

দান-সদকার ফজিলত:

ক. দান-সদকা গুনাহ মিটিয়ে ফেলে যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে ফেলে।

খ. দান-সদকা করলে সম্পদ কমে না।

গ. দান সম্পদকে বৃদ্ধি করে।

ঘ. দানকারীর জন্য ফেরেশতারা দোয়া করে।

ঙ. দানকারীর দুনিয়া ও আখিরাতের সব বিষয় সহজ করে দেওয়া হয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. "উপরের হাত নিচের হাত হতে উত্তম"— হাদিসে উপরের হাত বলতে কী বোঝানো হয়েছে? *[সকল বোর্ড ২০২২, ২০১৯]*

২. কাদের থেকে দান আরম্ভ করতে হবে?

৩. সম্পদের প্রাচুর্য থেকে যে দান করা হয় তা কী?

৪. মহান আল্লাহ কাকে নিষ্কৃতি দেন?

৫. মহান আল্লাহ কাকে অমুখাপেক্ষী করেন?

৬. ভিক্ষাবৃত্তি বা অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়া কী?

উত্তরের জন্য দেখো ১৮৩ পৃষ্ঠা।

খ. একক কাজ

দানকারীর মর্যাদা সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখে শ্রেণিশিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৩৩ ১৮ নম্বর হাদিসের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা
Translation, Explanation and Learning of Hadith No. 18

[দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতা সম্পর্কিত হাদিস]

আরবি

عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ فَالْاِمَامُ الَّذِيْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِهٖ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ وَالْمَرْاَةُ رَاعِيَةٌ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهٖ وَهِيَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلٰى مَالِ سَيِّدِهٖ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُ اَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন— আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতঃপর ইমাম বা নেতা, যিনি জনগণের ওপর দায়িত্ববান তিনি তার প্রজাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবেন। আর ব্যক্তি তার পরিবারের সদস্যদের ওপর দায়িত্বশীল। সে তার পরিবারের সদস্যদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। নারী দায়িত্বশীল তার স্বামীর সম্পদ, সন্তান এবং সংসারের। সে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। আর দাস ব্যক্তি তার মনিবের সম্পদের দায়িত্বশীল এবং সে এ মালের দায়িত্ব সম্পর্কেই জিজ্ঞাসিত হবে। কাজেই সতর্ক হও! প্রত্যেকেই তোমরা সংরক্ষক এবং তোমাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে (বুখারি ও মুসলিম)।

শব্দার্থ: اَلَا – সাবধান/জেনে রাখ, كُلُّكُمْ – তোমাদের প্রত্যেকেই, رَاعٍ – দায়িত্বশীল, وَكُلُّكُمْ – আর তোমরা প্রত্যেকেই, مَسْئُوْلٌ – জিজ্ঞাসিত হবে, عَنْ رَعِيَّتِهٖ – তার দায়িত্ব সম্পর্কে/অধীনস্থ বিষয় সম্পর্কে, فَالْاِمَامُ – ইমাম/নেতা, اَلَّذِيْ – যিনি, عَلَى النَّاسِ – মানুষের ওপর, رَاعٍ – রক্ষণাবেক্ষণকারী/দায়িত্বশীল, وَهُوَ مَسْئُوْلٌ – তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন, عَنْ رَعِيَّتِهٖ – তার দায়িত্ব সম্পর্কে, وَالرَّجُلُ – আর ব্যক্তি, عَلٰى اَهْلِ بَيْتِهٖ – তার বাড়ির সদস্যদের ওপর, وَالْمَرْاَةُ – আর স্ত্রী, عَلٰى اَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا – তার স্বামীর পরিবারের সদস্যদের ওপর, وَوَلَدِهٖ – এবং তার সন্তানদের ওপর, وَهِيَ مَسْئُوْلَةٌ – আর তারা জিজ্ঞাসিত হবে, عَنْهُمْ – তাদের সম্পর্কে, وَعَبْدُ الرَّجُلِ – আর মানুষের চাকর, عَلٰى مَالِ سَيِّدِهٖ – তার মনিবের সম্পদের ওপর।

ব্যাখ্যা: এ হাদিসে মহানবি (সা.) উম্মাতে মুহাম্মাদির প্রতিজন সদস্যকে তার নিজ নিজ দায়িত্বপালনে নিষ্ঠাবান হওয়ার জন্য পরকালীন জবাবদিহিতা সম্পর্কে অবহিত করেছেন।

তিনি বলেছেন, পৃথিবীতে মানুষ মহান আল্লাহর খলিফা। যে জন্য তার জীবনযাপন যেমন লাগামহীন হতে পারে না, তেমনি সে দায়িত্বহীনও হতে পারে না। খিলাফতের খলিফা থেকে শুরু করে গৃহস্থ ঘরের অতি নগণ্য চাকরটি পর্যন্ত

দায়িত্বশীল ব্যক্তিত্ব। মর্যাদা ও অবস্থানগত কারণে হয়তো কারো দায়িত্বের বিস্তৃতি কম, আর কারো বিস্তৃতি ব্যাপক, কিন্তু সবাই দায়িত্বশীল এবং কিয়ামতের কঠিন ময়দানে সব ব্যক্তিকেই তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

এ হাদিসে যদিও বিভিন্ন পর্যায়ে কিছু সংখ্যক লোকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তিরই অপরের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। কিয়ামতে সামগ্রিকভাবে এবং এককভাবে সবাইকেই এ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।

জেনে রাখো

প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় কিছু দায়িত্ব রয়েছে। যে দায়িত্বগুলো পালনের মাধ্যমে ব্যক্তির মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। তাই প্রত্যেকেরই উচিত নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া।

শিক্ষা: এ হাদিস থেকে নিম্নোক্ত শিক্ষাসমূহ পাওয়া যায়–

১. মুমিন ব্যক্তি নিজেকে কখনোই দায়িত্বহীন ভাবতে পারেন না, বা দায়িত্বহীনের মতো কাজ করা তার জন্য শোভা পায় না। মুমিন নিজেই নিজের কর্তব্য ঠিক করে নিয়ে নিষ্ঠার সাথে তা পালন করবে।

২. সমাজের সব মানুষই দায়িত্বশীল। কোনো মানুষই দায়িত্বহীন নয়।

৩. পরকালে প্রত্যেক মানুষকে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

৪. পরকালে পার্থিব দায়িত্ব সম্পর্কে যারা সন্তোষজনক জবাব দিতে পারবে, তাঁরা পুরস্কারে ভূষিত হবে।

৫. পার্থিব দায়িত্ব পালন সম্পর্কে যাদের জবাব সন্তোষজনক হবে না, তাদেরকে চিরস্থায়ী শাস্তির স্থান জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাদের প্রত্যেককে কী সম্পর্কে সতর্ক করেছেন?
২. ইমাম বা নেতা কার ওপর দায়িত্ববান?
৩. ব্যক্তি কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে?
৪. স্বামীর সম্পদ, সন্তান এবং সংসারের বিষয়ে কে দায়িত্বশীল?
৫. দাস কোন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে?
৬. আমাদের প্রত্যেকেই কী সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে?

উত্তরের জন্য দেখো ১৮৩ পৃষ্ঠা।

খ. একক কাজ

শিক্ষার্থীরা দায়িত্বশীলতার গুরুত্ব সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

গ. বাড়ির কাজ

জনাব এম ইসলাম একটি বহুজাতিক কোম্পানির জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা। তিনি তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন এবং কর্তৃপক্ষের কাছে জবাবদিহি করেন না। ফলে কোম্পানি আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। অপরদিকে জনাব এন ইসলাম আরেকটি কোম্পানির সাধারণ ব্যবস্থাপক। তিনি তার দায়িত্ব পালনে কোনোরূপ অবহেলা করেন না এবং কর্তৃপক্ষের কাছে জবাবদিহিও করেন। এতে কর্তৃপক্ষ তার ওপর সন্তুষ্ট এবং কোম্পানি অধিক মুনাফা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। এছাড়া তিনি মনে করেন, প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজস্ব অবস্থানে স্বীয় দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন।

১. জনাব এম ইসলামের কর্মকাণ্ড কি ইসলামে সমর্থনযোগ্য? ব্যাখ্যা করো।
২. দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতা সম্পর্কিত হাদিসটির আলোকে জনাব এন ইসলামের বক্তব্যের যথার্থতা মূল্যায়ন করো।

পাঠ ৩৪ ১৯ নম্বর হাদিসের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা
Translation, Explanation and Learning of Hadith No. 19

[মহান আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ সম্পর্কিত হাদিস]

আরবি	অনুবাদ
عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللهِ اَىُّ النَّاسِ اَفْضَلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ بِنَفْسِهٖ وَمَالِهٖ. (بُخَارِىْ).	হযরত আবু সাঈদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন— রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসুল, মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি কে ? রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, সেই মুমিন যে নিজের জীবন ও তার সম্পদ দিয়ে মহান আল্লাহর পথে জিহাদ করে (সহিহ বুখারি)।

শব্দার্থ: قِيْلَ – বলা হলো/জিজ্ঞাসা করা হলো, يَارَسُوْلَ اللهِ – হে আল্লাহর রাসুল, اَىُّ النَّاسِ – কোন ব্যক্তি/মানুষের মধ্যে কে, اَفْضَلُ – সর্বোত্তম, مُؤْمِنٌ – মুমিন, يُجَاهِدُ – যে জিহাদ করে/চেষ্টা-সাধনা করে, فِىْ سَبِيْلِ اللهِ – মহান আল্লাহর পথে, بِنَفْسِهٖ – আর জীবন দিয়ে, وَمَالِهٖ – এবং তার ধন-সম্পদ দিয়ে।

ব্যাখ্যা: ইসলামে জন্ম, বংশ, বর্ণ, অঞ্চল বা ধন-সম্পদের বিবেচনায় কোনো মানুষ শ্রেষ্ঠ বা নীচ নয়। মানুষের মন্দ বা ভালো হওয়াও এগুলোর ওপর নির্ভর করে না, বরং কর্মই তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয় এবং মর্যাদা দেয়। এ হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) সর্বশ্রেষ্ঠ বলেছেন সে মুমিনকে, যে নিজের জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ করে মহান আল্লাহর পথে জিহাদ করে। কেননা তাকওয়ার শ্রেষ্ঠতম প্রকাশই জিহাদ। আল্লাহ তাআলার প্রতি পরম প্রেম ও তীব্র ভয় ছাড়া জীবন ও সম্পদ দিয়ে তাঁর পথে জিহাদ করা সম্ভব নয়। মহান আল্লাহর জমিনে মহান আল্লাহর দীন ইসলামকে বিজয়ীশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য জ্ঞান, সম্পদ, মেধা, ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও জীবন নিয়োজিত করার নাম জিহাদ। শুধু যুদ্ধকে জিহাদ বলা হয় না, বরং যুদ্ধ হলো জিহাদের চূড়ান্ত পর্যায়। সাধারণভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠার যেকোনো প্রচেষ্টাই জিহাদ। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রদর্শিত পথই মহান আল্লাহর পথ। সেই পথই ইসলাম। তাই ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে ব্যক্তি নিজের জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ করে তার শ্রেষ্ঠত্ব অনিবার্য।

শিক্ষা: এ হাদিসে মুমিনদের জন্য যে শিক্ষাগুলো নিহিত রয়েছে তা হলো—

১. কোনো বিষয়ে কারো কাছে প্রশ্ন করতে হলে, সে বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকেই প্রশ্ন করতে হবে। অন্যথায় বিভ্রান্তির আশঙ্কা থাকে। ২. সাধারণভাবে সকল মানুষের মানবিক মর্যাদা ও অধিকার এক হলেও, মানুষের কাজ তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব এবং মর্যাদার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। ৩. সমাজে মহান আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন এবং মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য মহান আল্লাহর নির্দেশিত পথে চেষ্টা-সাধনা করাই জিহাদ। ৪. মহান আল্লাহর দীন প্রচার, প্রসার, প্রতিষ্ঠা এবং তার প্রতিষ্ঠার ধারা অব্যাহত রাখার জন্য জিহাদ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. যে মুমিন নিজের জীবন ও তার সম্পদ দিয়ে মহান আল্লাহর পথে জিহাদ করে তিনি কেমন?
২. যুদ্ধ জিহাদের কী?
৩. সাধারণভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠার যেকোনো প্রচেষ্টাই কী?

উত্তরের জন্য দেখো ১৮৩ পৃষ্ঠা।

খ. একক কাজ

শিক্ষার্থীরা বড় জিহাদ সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৩৫ ২০ নম্বর হাদিসের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা
Translation, Explanation and Learning of Hadith No. 20

[হালাল উপার্জন সম্পর্কিত হাদিস]

অনুবাদ	আরবি
হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন— রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, হালাল উপার্জন অন্বেষণ করা ফরজের পরে ফরজ। অর্থাৎ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফরজ (বায়হাকি-ইমানের শাখা-প্রশাখা অনুচ্ছেদ হতে)।	عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ. (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

শব্দার্থ: كَسْبُ – উপার্জন করা – اَلْحَلَالِ – হালাল, فَرِيْضَةٌ – ফরজ, بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ – ফরজের পরে।

ব্যাখ্যা: হালাল বলতে আমরা সাধারণত যাবতীয় বৈধ পন্থাকেই বুঝি। যা কল্যাণকর ও হিতকর এবং যাবতীয় অবৈধ ও অকল্যাণকর হতে মুক্ত। ইসলামে হালাল উপার্জনের গুরুত্ব অপরিসীম। ইবাদতগুলো কবুল হওয়া বা না হওয়া নির্ভর করে ব্যক্তির উপার্জনের ধরনের ওপর। ব্যক্তির উপার্জন যদি হালাল হয়, তাহলে তার ইবাদত কবুলযোগ্য হবে। অবৈধ উপার্জনকারীর ইবাদত কবুল হয় না। যে জন্য হালাল উপার্জন করা অন্যান্য ফরজের মতো শুধু ফরজ মাত্র নয়, বরং এটি ফরজের চেয়েও বেশি কিছু। হালাল উপায়ে জীবিকা উপার্জনের ফলে সমাজ ব্যবস্থায় ধনী-দরিদ্রের মাঝে সুষম ভারসাম্য ফিরে আসে; কৃষক, দিনমজুর, ক্রেতা-বিক্রেতা, শ্রমিক-মালিক এবং অধস্তনদের সাথে উর্ধ্বতনদের সুদৃঢ় ও সংগতিপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হয়।
হালাল রিজিক অন্বেষণ করা জিহাদে নিয়োজিত থাকার মতো। মহানবি (সা.) বলেন— 'যে ব্যক্তি হালাল উপার্জন দিয়ে তার পরিবার প্রতিপালনের চেষ্টায় থাকে, সে মহান আল্লাহর পথে মুজাহিদের মতো।' ইবাদত কবুলের মাপকাঠি হিসেবে হালাল উপার্জন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফরজ।

শিক্ষা: এ হাদিসের শিক্ষা হলো—

১. মুমিনদের সার্বক্ষণিক কর্তব্য হলো হালাল উপার্জন করা। ২. ইবাদত কবুলের জন্য রিজিক হালাল হওয়া শর্ত। সুতরাং হালাল জীবিকা অন্বেষণও ইবাদত। ৩. সমাজে শান্তির পরিবেশ প্রতিষ্ঠায় হালাল উপার্জন অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ৪. পরকালে হালাল উপার্জন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ৫. উপার্জনের ক্ষেত্রে ইসলাম যেসব পন্থাকে হালাল করেছে সেগুলোর মূলনীতি জেনে আমল করতে হবে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কোনটি ফরজের পর ফরজ? *[সকল বোর্ড ২০২২]*
২. كَسْبٌ (কাসাব) শব্দের অর্থ কী?
৩. بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ (বা'দাল ফারিদাহ) অর্থ কী?
৪. হালাল বলতে আমরা সাধারণত কী বুঝি?
৫. ইবাদত কবুল হওয়া বা না হওয়া নির্ভর করে কীসের উপর?
৬. ইবাদত কবুলের মাপকাঠি হিসেবে হালাল উপার্জন কী?

উত্তরের জন্য দেখো ১৮৩ পৃষ্ঠা।

পাঠ ৩৬ — ২১ নম্বর হাদিসের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা
Translation, Explanation and Learning of Hadith No. 21

[মাদকদ্রব্যের অশুভ পরিণতি সম্পর্কিত হাদিস]

আরবি

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللّٰهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُوْلَةَ اِلَيْهِ۔ (رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ)

অনুবাদ

হযরত ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন— রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা মদের প্রতি, মদপানকারীর প্রতি, মদ যে পান করায় তার প্রতি, যে বিক্রি করে, যে মদ ক্রয় করে, মদ যে প্রস্তুত করে, যে মদ প্রস্তুতির নির্দেশ দেয়, মদ বহনকারী এবং যার কাছে মদ বহন করে নিয়ে যাওয়া হয় তার প্রতি অভিশাপ দেন (সুনানে আবু দাউদ ও ইবন মাযাহ)।

শব্দার্থ: لَعَنَ اللّٰهُ – আল্লাহ তাআলা অভিশাপ দেন, اَلْخَمْرَ – মদের প্রতি, وَشَارِبَهَا – যে মদ্যপান করে তার প্রতি, وَسَاقِيَهَا – যে মদ পান করায় তার প্রতি, وَبَائِعَهَا – যে মদ বিক্রি করে তার প্রতি, وَعَاصِرَهَا – যে মদ প্রস্তুত করে তার প্রতি, وَمُبْتَاعَهَا – যে মদ ক্রয় করে তার প্রতি, وَمُعْتَصِرَهَا – মদ প্রস্তুতের নির্দেশদাতার প্রতি, وَحَامِلَهَا – যে মদ বহন করে তার প্রতি, وَالْمَحْمُوْلَةَ اِلَيْهِ – যার নিকট মদ বহন করে নিয়ে যাওয়া হয় তার প্রতি।

ব্যাখ্যা: মদ ও নেশাগ্রস্ততা মানবচরিত্র ধ্বংসের এবং সব অশ্লীল ও অনৈতিক কাজের মূল প্রেরণা। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মদ সব অপকর্ম ও অশ্লীলতার জননী বা মূল। কুরআন মাজিদে আল্লাহ তাআলা একে نَجَسٌ বা অপবিত্র বস্তু বলে আখ্যা দিয়েছেন। মদ কেবল নিজে অপবিত্র নয় বরং আরো অসংখ্য অপবিত্র ও নিষিদ্ধ কাজের উৎস। এর ফলে মানুষের বোধ-বিবেচনা ও বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়। কোনো অশালীন ও অন্যায় কাজ করতে তার দ্বিধা হয় না। হত্যা, ব্যভিচার, লুণ্ঠন বা ত্রাস সৃষ্টির মতো ঘটনার নেপথ্যে প্রায়ই মদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা থাকে। স্বাস্থ্য, অর্থ, চরিত্র ও ধর্মীয় দিক থেকে মদের ক্ষতির কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। তাই একে শয়তানের কাজ হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষা: এ হাদিস থেকে যে শিক্ষা পাওয়া যায় তা হলো—

১. মদ এবং মদসংশ্লিষ্ট সব কিছু হারাম। কোনো মুমিনই এ ধরনের কাজ করতে পারে না। ২. মুমিনের পক্ষে মদ উৎপাদন, বিপণন, বহন, পরিবেশন, ক্রয় বা বিক্রয়ের কাজ করা সরাসরি হারাম। মদপান করার মতো এ কাজগুলোও অবশ্যই বর্জন করতে হবে। ৩. মদের জন্য সহায়ক বা মদ প্রতিষ্ঠা পায় এ ধরনের কাজ নিষিদ্ধ। এর সাথে মুমিনের সম্পর্ক থাকবে না। ৪. মুমিন কেবল নিজে মদ থেকে বেঁচে থাকবে না বরং সমাজকেও বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করবে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সব অপকর্ম ও অশ্লীলতার জননী বা মূল কী?
২. কুরআন মাজিদে আল্লাহ তাআলা মদকে কী বলে আখ্যা দিয়েছেন?
৩. মদপানকে কার কাজ হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে?

উত্তরের জন্য দেখো ১৮৩ পৃষ্ঠা।

খ. একক কাজ

শিক্ষার্থীরা মদ ও নেশাগ্রস্ততার অপকারিতা সম্পর্কে একটি তালিকা প্রস্তুত করে শ্রেণিশিক্ষকের কাছে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ৩৭ ২২ নম্বর হাদিসের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা
Translation, Explanation and Learning of Hadith No. 22

[হারামের পরিণতি সম্পর্কিত হাদিস]

অনুবাদ

হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন— রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, হারাম সম্পদে তৈরি মাংস (শরীর) বেহেশতে প্রবেশ করবে না এবং হারাম সম্পদে তৈরি প্রতি টুকরো মাংসের জন্য দোজখই যথোপযুক্ত আবাস (মুসনাদে আহমদ)।

আরবি

عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ اَوْلٰى بِهٖ . (مُسْنَدُ اَحْمَدَ)

শব্দার্থ: لَا يَدْخُلُ – সে প্রবেশ করবে না, الْجَنَّةَ – জান্নাতে, لَحْمٌ – গোশত, نَبَتَ উৎপন্ন হয়/গড়ে ওঠে, مِنَ السُّحْتِ – অবৈধ উপার্জন থেকে/হারাম সম্পদ থেকে, وَكُلُّ لَحْمٍ – আর প্রতিটি গোশত, نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ – যা হারাম থেকে উৎপন্ন হয়, كَانَتِ النَّارُ – জাহান্নাম হলো, اَوْلٰى بِهٖ – তার জন্য যথার্থ/যথোপযুক্ত।

ব্যাখ্যা: মুমিন হওয়া এবং মুমিন থাকার জন্য অন্যতম প্রধান শর্ত হলো হালাল উপার্জন করা এবং হালাল জীবিকা গ্রহণ করা। হারাম উপার্জন করে, হারাম গ্রহণ করে মুমিন থাকা যায় না। হারাম উপার্জনের পর সে উপার্জন দিয়ে ইবাদত করার মতো নাফরমানি ও পাপাচার আর হয় না। এ হলো— মহান আল্লাহর হুকুমের প্রতি এবং তাঁর আনুগত্যের প্রতি চরম অবাধ্যতা। নবি (সা.) এজন্যই এ হাদিসে হারাম উপার্জনের ব্যাপারে চূড়ান্ত হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন, 'হারাম রিজিকে যে শরীর বেড়ে উঠেছে, যে শরীরের রক্ত-মাংস গঠিত হয়েছে হারাম সম্পদ দিয়ে, সে শরীর ও গোশত কোনোদিনই জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তার ইবাদতও মহান আল্লাহর কাছে কবুলের যোগ্য বিবেচিত হয় না।' হারাম অর্থের এই কুফল সন্তানের মাঝেও প্রভাব সৃষ্টি করে। তাই সন্তান বখে যাওয়ার পিছনে অনেক কারণের একটি হারাম উপার্জন।

হালাল জীবিকা গ্রহণের জন্য আল্লাহ তাআলার সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। তিনি বলেন— মানুষেরা! পৃথিবীতে হালাল ও পবিত্র যা কিছু আছে, তা থেকে আহার কর (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৬৮)।

শিক্ষা: এ হাদিসের শিক্ষা হলো—

১. ইবাদত কবুলের জন্য রিজিক হালাল হওয়া শর্ত। সুতরাং হালাল জীবিকা অন্বেষণও ইবাদত।
২. মুমিনদের সার্বক্ষণিক কর্তব্য হলো হালাল উপার্জন করা।
৩. হারাম ভক্ষণকারীর অন্তরে হেদায়েত প্রবেশ করে না এবং নেক আমলের স্বাদ পাওয়া যায় না।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. হারাম সম্পদে তৈরি মাংস কোথায় প্রবেশ করবে না?
২. হারাম সম্পদে তৈরি প্রতি টুকরো মাংসের জন্য যথোপযুক্ত আবাস কী?
৩. মুমিন হওয়া এবং মুমিন থাকার জন্য অন্যতম প্রধান শর্ত কী?
উত্তরের জন্য দেখো ১৮৩ পৃষ্ঠা।

খ. একক কাজ

হারাম উপার্জনের কুফল সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৩৮ ২৩ নম্বর হাদিসের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা
Translation, Explanation and Learning of Hadith No. 23

[মৃত্যুপরবর্তীতেও আমলনামা জারি সম্পর্কিত হাদিস]

আরবি

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهٗ اِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : اِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهٖ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهٗ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

অনুবাদ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন— রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মানুষ যখন মরে যায় তার কাজের (আমলের) সাথে তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কেবল তিন রকমের কাজের (আমলের) সাথে তার সম্পর্ক থাকে। এগুলো হলো— সদকায়ে জারিয়া বা অবিরত দান, কল্যাণ লাভ হয় এমন জ্ঞান এবং সৎ সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে (সহিহ মুসলিম)।

শব্দার্থ: اِذَا – যখন, مَاتَ – মৃত্যুবরণ, الْاِنْسَانُ – মানুষ, اِنْقَطَعَ – বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়/নিঃশেষ হয়ে যায়, عَنْهُ – তার থেকে, عَمَلُهٗ – তার আমল, اِلَّا ব্যতীত, مِنْ ثَلَاثَةٍ – তিন রকমের কাজ থেকে, صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ – নিরবচ্ছিন্ন দান/অবিরত সদকা, اَوْ عِلْمٍ – অথবা জ্ঞান, يُنْتَفَعُ بِهٖ – যার দ্বারা কল্যাণ লাভ হয়, اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ – অথবা সৎ সন্তান, يَدْعُوْ لَهٗ – যে তার জন্য দোয়া করে।

ব্যাখ্যা: আল্লাহ তাআলা একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বসবাসের জন্য পৃথিবীতে মানুষকে প্রেরণ করেন। নির্ধারিত এ সময়ে করা কাজের (আমলের) ওপরই তার আখিরাতের অবস্থা নির্ভর করে। ব্যক্তি ভালো কাজ (আমল) করলে আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাত দিয়ে পুরস্কৃত করেন। মন্দ কাজ (আমল) করলে দেবেন জাহান্নামের শাস্তি। মৃত্যুর মাধ্যমে মানুষের পার্থিব জীবন শেষ হয়। এরপর আর কোনো ভালো-মন্দ কাজ (আমল) করার সুযোগ থাকে না তার। এরপর সে শুধু কৃতকর্মের ফলভোগ করে। সাধারণত এর কোনো ব্যতিক্রম নেই, হওয়া সম্ভবও না। তবে এ হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) এমন তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন; যাতে ব্যক্তির সরাসরি কাজ করার ক্ষমতা না থাকলেও কাজের অর্জিত সওয়াব লাভের সুযোগ রয়েছে। বিষয় তিনটি হলো—

১. সদকায়ে জারিয়া বা অবিরত দান। এটা এমন দান ব্যক্তির মৃত্যুর পরও মানুষ যার মাধ্যমে উপকৃত হতে থাকে। যেমন— বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, মসজিদ, ইয়াতিমখানা, হাসপাতাল, সড়ক, সেতু, বনায়ন প্রভৃতি।

২. কল্যাণধর্মী শিক্ষা বা এমন শিক্ষা যার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ উপকৃত হয়। যেমন— সাধারণের উপযোগী করে কুরআন-হাদিসের ব্যাখ্যাগ্রন্থ লেখা। সর্বসাধারণের জন্য বোঝা সহজ হয় এমনভাবে ইসলামের আইনকানুন সংকলন করা। চরিত্র গঠনে সহায়ক বই লেখা, কিংবা এমন আদর্শ রেখে যাওয়া বা এমন ছাত্র তৈরি করা, যা ব্যক্তির মৃত্যুর পর মানুষের প্রেরণার উৎস হবে।

৩. নেক সন্তান বা সুসন্তান। এমন সন্তান ব্যক্তির মৃত্যুর পর যে তার মুক্তি ও কল্যাণের জন্য দোয়া করে। তাহলে মৃত্যুর পরও ব্যক্তি তা দিয়ে উপকৃত হয়।

শিক্ষা: এ হাদিস মুমিনদের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পেশ করেছে। যেমন—

১. মানুষ মরণশীল। পৃথিবীতে সে চিরদিন থাকবে না। তাকে একদিন এ অস্থায়ী জগত ছেড়ে পরলোকের স্থায়ী জগতে যেতে হবে।

২. মৃত্যুর পর মানুষের কোনো কাজ করার ক্ষমতা থাকবে না। সেখানে তারা শুধু পৃথিবীর কাজের ফল ভোগ করবে।

৩. কাজ করার ক্ষমতা না থাকলেও জীবিতাবস্থায় করা কিছু ভালো কাজের সওয়াব মৃত্যুর পরও মানুষ পেতে থাকবে। মানুষের জন্য মহান আল্লাহর অন্তহীন রহমতের এ এক বিশেষ দিক।

৪. সদকায়ে জারিয়া, কল্যাণধর্মী জ্ঞান ও সুসন্তান মৃত্যুর পরও মানুষের আমলনামায় সওয়াব জমা করার মাধ্যমে পরিণত হবে।

৫. মানুষের সেবা করা এবং মানুষের উপকারে আসে এমন যেকোনো কাজ করা হচ্ছে সর্বোত্তম ইবাদত। মানুষের মৃত্যুর পরও এ ইবাদতের প্রতিদান অব্যাহত থাকে। সুতরাং মানুষের কর্তব্য হলো— মহান আল্লাহর বান্দাদের সেবা ও কল্যাণের কাজে আত্মনিয়োগ করা।

জেনে রাখো

দশটি আমলের সওয়াব মৃত্যুর পরও মানুষের আমলনামায় যুক্ত হতে থাকে। চারটির উল্লেখ সহিহ মুসলিম শরিফে রয়েছে। বাকিগুলো হাদিসের অন্যান্য গ্রন্থ হতে সংগৃহীত। আমলগুলো হলো— ১. উপকারী ইলম, ২. নেক সন্তান যে তার জন্য দোয়া করতে থাকে; ৩. ইসলামি রাষ্ট্রের সীমান্তরক্ষী; যে এ দায়িত্ব পালনকালে ইন্তিকাল করেছে; ৪. উত্তরাধিকারীদের মাঝে যে কুরআন মাজিদ রেখে গেছে। হাদিস, ফিকাহসহ অন্যান্য ধর্মীয় কিতাবও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। ৫. মসজিদ নির্মাণ করা; ৬. মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা; ৭. মুসাফিরখানা নির্মাণ করা; ৮. পানির কূপ বা খাল খনন করা; ৯. খেজুরবৃক্ষ রোপণ করা; ১০. রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কোনো সুন্নত জারি করে যাওয়া।

নেক সন্তানের গুণাবলি/দায়িত্ব:

- পিতামাতার আদেশ মান্য করা।
- পিতামাতার কাজে সহযোগিতা করা।
- তাদের সম্মান ও সম্পদ হেফাজত করা।
- তাদের সালাম দেওয়া।
- তারা যা বলেন তা মনোযোগ সহকারে শোনা।
- তাদের অনুমতি নিয়ে বাইরে যাওয়া।
- পাপ কাজ বর্জন করা।
- পিতামাতার মৃত্যুর পর তাদের অসিয়ত পূর্ণ করা।
- তাদের বন্ধু ও আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মানুষ মরে যাওয়ার পর কয় রকমের কাজের আমলের সাথে তার সম্পর্ক থাকে?

২. صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ (সদাকাতুন জারিয়াহ) শব্দের অর্থ কী?

৩. ব্যক্তি ভালো কাজ করলে আল্লাহ তাআলা তাকে কী দিয়ে পুরস্কৃত করেন?

৪. ইসলামি বই রচনা, ইসলামি সাহিত্য ও কবিতা ইত্যাদি লেখা কোন ধরনের সদকা? *[সকল বোর্ড ২০২১]*

উত্তরের জন্য দেখো ১৮৩ পৃষ্ঠা।

খ. একক কাজ

মানুষ মরে গেলেও যে তিনটি আমলের সওয়াবের ধারা অব্যাহত থাকে, শিক্ষার্থীরা সে সম্পর্কে আলোচনা পেশ করবে।

পাঠ ৩৯ ২৪ নম্বর হাদিসের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা
Translation, Explanation and Learning of Hadith No. 24

[জ্ঞানার্জন সম্পর্কিত হাদিস]

অনুবাদ	আরবি
হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন— রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণে বের হয়, সে মহান আল্লাহর পথে থাকে যতক্ষণ না সে ফিরে আসে (তিরমিযি ও দারিমি)।	عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ فِيْ طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ حَتّٰى يَرْجِعَ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ)

শব্দার্থ: مَنْ خَرَجَ যে ব্যক্তি বের হয়, فِيْ طَلَبِ الْعِلْمِ জ্ঞান অন্বেষণে, فَهُوَ সে থাকে, فِيْ سَبِيْلِ اللهِ মহান আল্লাহর পথে, حَتّٰى যতক্ষণ না, يَرْجِعَ সে প্রত্যাবর্তন করে।

ব্যাখ্যা: এ হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব ও মর্যাদার ওপর আলোকপাত করেছেন। ইসলামে যত রকম ইবাদত রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হলো— জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ বা মহান আল্লাহর পথে জিহাদ। কেননা ইসলাম প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠা এবং প্রতিষ্ঠিত ইসলামি ব্যবস্থাপনা সংরক্ষণে জিহাদের বিকল্প নেই। এজন্যই যারা জিহাদে অংশ নেন কুরআন-হাদিসে তাদের বিশেষ মর্যাদার কথা বলা হয়েছে। এখানে রাসুলুল্লাহ (সা.) জ্ঞান অন্বেষণের কাজকে জিহাদের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সমান আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন— যখন কোনো মানুষ জ্ঞান অন্বেষণে বের হয়, সে বের হয় মহান আল্লাহর পথে; যতক্ষণ না সে বাসায় ফিরে আসে। বস্তুত জ্ঞান অন্বেষণ হলো— বুদ্ধিবৃত্তিক জিহাদ এবং এটিই প্রকৃত জিহাদ। কেননা দৈহিক শক্তিতে যুদ্ধ করে বিজয়ী হওয়া গেলেও, সে বিজয়কে সংহত করা এবং ইসলামি বিধানানুযায়ী তার দাবি আদায় করতে হলে জ্ঞানই প্রধান অবলম্বন। জ্ঞানের পথ তাই মহান আল্লাহরই পথ। অবশ্য এ জ্ঞান মানবকল্যাণধর্মী ও আখিরাতমুখী জ্ঞান। ইসলামে এ জ্ঞানার্জন করা ফরজ। বস্তুত জ্ঞান হলো— নবি-রাসুলদের উত্তরাধিকার।

শিক্ষা: এ হাদিসের শিক্ষা হলো–

১. জ্ঞান অন্বেষণ করা মূলত মহান আল্লাহর পথে বিচরণ করা। জ্ঞানের পথ মহান আল্লাহর পথ।
২. জ্ঞান অন্বেষণ করা মানুষের অবশ্য কর্তব্য। কেননা জ্ঞান ছাড়া মহান আল্লাহর দেওয়া শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ন রাখা অসম্ভব।
৩. জ্ঞান অন্বেষণ করা অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ কাজ। আল্লাহ তাআলা এবং পৃথিবীর মানুষের কাছে মর্যাদা পেতে হলে জ্ঞান অর্জন করতে হবে।
৪. প্রকৃত মুসলিম থাকতে হলে ইসলামি আকিদার মূল বিষয় এবং ফরজ কাজগুলো সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান রাখা ফরজ।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কোন ব্যক্তি মহান আল্লাহর পথে থাকে যতক্ষণ না সে ফিরে আসে?
২. فِيْ طَلَبِ الْعِلْمِ (ফি তলাবিল ইলম) অর্থ কী?
৩. ইসলামে যত রকম ইবাদত রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত কী?
৪. যারা জিহাদে অংশ নেন কুরআন-হাদিসে তাদের কী লাভের কথা বলা হয়েছে?
৫. জ্ঞান কাদের উত্তরাধিকার?

উত্তরের জন্য দেখো ১৮৩ পৃষ্ঠা।

খ. একক কাজ

শিক্ষার্থীরা হাদিসের আলোকে জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব সম্পর্কে শ্রেণিশিক্ষকের কাছে তাদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য উপস্থাপন করবে।

পাঠ ৪০

২৫ নম্বর হাদিসের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা
Translation, Explanation and Learning of Hadith No. 25

[রাসুলের নামে মিথ্যাচারের সতর্কতা সম্পর্কিত হাদিস]

অনুবাদ	আরবি
হযরত সামুরা বিন জুনদুব (রা.) ও হযরত মুগীরা বিন শুবা (রা.) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন— রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার কাছ থেকে কোনো হাদিস বর্ণনা করে আর অনুমিত হয় যে, সে হাদিসটি অবশ্যই মিথ্যা, তাহলে সেই বর্ণনাকারী মিথ্যাবাদীদেরই একজন (সহিহ মুসলিম)।	عَنْ سَمُرَةَ ابْنِ جُنْدُبٍ وَالْمُغِيْرَةِ ابْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ حَدَّثَ عَنِّيْ بِحَدِيْثٍ يُرٰى اَنَّهٗ كَذِبٌ فَهُوَ اَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

শব্দার্থ: مَنْ – যে ব্যক্তি, حَدَّثَ বর্ণনা করে, عَنِّيْ – আমার কাছ থেকে, بِحَدِيْثٍ – কোনো হাদিস, يُرٰى – মনে হয়/অনুমিত হয়, اَنَّهٗ كَذِبٌ – নিশ্চয়ই হাদিসটি মিথ্যা, فَهُوَ – অতঃপর সে, اَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ – মিথ্যাবাদীদের একজন।

ব্যাখ্যা: এ হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর সত্যবাদিতার এবং তাঁর নামে মিথ্যা হাদিস বর্ণনার বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) আমৃত্যু একটি মিথ্যাও বলেননি। তাঁর শৈশবে, কৈশোরে এবং যৌবনে যখন গোটা আরব বর্বরতা আর পাপাচারের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, তখনো তিনি ছিলেন আল-আমিন বা পরম সত্যবাদী। তাঁর বিশ্বস্ততা বা সত্যবাদিতা বিষয়ে সন্দেহ করার মতো একটি লোক গোটা আরবে ছিল না। রাসুল হওয়ার পর তাঁর মধ্যে এ গুণটি সমহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। মুমিন হওয়ার জন্য তাঁর সত্যবাদিতায় বিশ্বাস অনিবার্য। কাজেই কেউ যদি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কোনো কথাকে মিথ্যা মনে করে, সেই বরং চরম মিথ্যাবাদী বলে পরিগণিত হবে।

এমনিভাবে যে ব্যক্তি জেনে শুনে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নামে কোনো কথা চালিয়ে দেয়, অথচ তা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাদিস নয়, সে চরম মিথ্যাবাদী হিসেবে সাব্যস্ত হবে। এ ব্যক্তির জন্য জাহান্নামের কঠোর শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। এ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন— 'যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে আমার নামে মিথ্যা চালিয়ে দেয়, সেতো তার স্থান নির্ধারণ করে নেয় জাহান্নামে।'

শিক্ষা: এ হাদিসের মূল শিক্ষাগুলো হলো—

১. রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেননি এমন কথা তাঁর নামে চালিয়ে দেওয়া হারাম। কোনো মুমিন এ কাজ করতে পারে না।

২. যদি কেউ রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নামে কোনো কথা চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে বা চালিয়ে দেয় তাহলে সে আর মুমিন থাকবে না। তার স্থায়ী আবাস হবে জাহান্নাম।

৩. মহানবি (সা.) ছিলেন সত্যের মূর্তপ্রতীক। তিনি কখনো মিথ্যা বলেননি, তাই তাঁর হাদিস চিরসত্য।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কে মিথ্যাবাদীদেরই একজন?

২. حَدَّثَ (হাদ্দাছা) শব্দের অর্থ কী?

৩. أَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ (আহাদুল কাযিবীন) অর্থ কী?

৪. আমৃত্যু একটি মিথ্যা বলেননি কে?

৫. 'আল-আমিন' শব্দের অর্থ কী?

৬. কার জন্য জাহান্নামের কঠোর শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে?

উত্তরের জন্য দেখো ১৮৩ পৃষ্ঠা।

খ. একক কাজ

রাসুলের (সা.) নামে মিথ্যাচারের পরিণাম লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ মূল্যায়নের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর

পাঠ-১ : ১. আল-হাদিস; ২. আল-হাদিস; ৩. কথা, বাণী বা ঘটনা; ৪. রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কথা, কাজ ও মৌন-সম্মতি; ৫. ব্যাখ্যা গ্রন্থ; ৬. হাদিস।

পাঠ-২ : ১. বর্ণনাকারী; ২. রাবি; ৩. সনদ; ৪. সনদ; ৫. হাদিসের মূল বাণী; ৬. মতন।

পাঠ-৩ : ১. চলার পথ, কর্মের নীতি ও পদ্ধতি; ২. চিহ্ন, নিদর্শন; ৩. সংবাদ; ৪. সুন্নাহ।

পাঠ-৪ : ১. পরোক্ষ বা ওহি গায়ের মাতলু; ২. হাদিস; ৩. পরিপূরক; ৪. কাফির; ৫. রাসূল (সা.)-এর; ৬. হাদিস।

পাঠ-৫ : ১. হাদিস থেকে; ২. ইতিহাস রচনার; ৩. হাদিস সংগ্রহের; ৪. মুহাদ্দিসগণ; ৫. মুহাদ্দিসগণের হাদিস সংগ্রহের পদ্ধতি থেকে; ৬. হাদিসকে।

পাঠ-৬ : ১. মুখস্থকরণ প্রক্রিয়ায়; ২. চারটি; ৩. তিনবার; ৪. সাতজন; ৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা.); ৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.)।

পাঠ-৭ ও ৮ : ১. হযরত আবু বকর (রা.); ২. হযরত আলি (রা.); ৩. উমাইয়া আমলে; ৪. আল মুয়াত্তা; ৫. হযরত উমর ইবনে আবদুল আযিয (রহ.); ৬. তৃতীয়।

পাঠ-৯ ও ১০ : ১. হাদিসের বিশুদ্ধ ছয়খানা গ্রন্থ; ২. মুত্তাফাকুন আলাইহি; ৩. মুহাম্মদ বিন ইসমাইল; ৪. ৭২৭৫টি; ৫. ২০৪ হিজরিতে; ৬. সহিহ মুসলিম।

পাঠ-১১ ও ১২ : ১. হাদিসের; ২. আল্লাহ তাআলা; ৩. হাদিসকে; ৪. রাসসুলুল্লাহ (সা.); ৫. রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে; ৬. হাদিস।

পাঠ-১৩ : ১. কওলি হাদিস; ২. ফি'লি হাদিস; ৩. তিন প্রকার; ৪. মারফু হাদিস; ৫. সংযুক্ত বা অবিচ্ছিন্ন; ৬. ধারাবাহিকতা, একের পর এক অনুগামী হওয়া বা আসা।

পাঠ-১৪ ও ১৫ : ১. আল-আমিন বা সত্যবাদী; ২. নৈতিক জীবন; ৩. আমানতদারির কথা; ৪. দীন বা ধর্ম; ৫. রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর; ৬. নৈতিকতার।

পাঠ-১৬ : ১. পাঁচটি; ২. জাকাতের; ৩. ধন-সম্পদের বা আর্থিক; ৪. শারীরিক ও আর্থিক উভয়।

পাঠ-১৭ : ১. সত্তরটিরও বেশি; ২. লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ; ৩. ইমান বা বিশ্বাস; ৪. একটি বিশেষ শাখা; ৫. ইমানের সর্বনিম্ন শাখা; ৬. ইমানের অপরিহার্য অংশ।

পাঠ-১৮ : ১. অধিক প্রিয়; ২. তার পিতা-মাতার চেয়ে; ৩. তিনটি ভাগে; ৪. রাসুলুল্লাহ (সা.); ৫. হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে; ৬. প্রত্যেক কাজে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর আনুগত্য করা।

পাঠ-১৯ : ১. নিদর্শন বা চিহ্ন; ২. তিনটি; ৩. কাফির-মুশরিকদের; ৪. নিফাক; ৫. মুনাফিক; ৬. মিথ্যা।

পাঠ-২০ : ১. পুণ্যের পথে; ২. পুণ্য; ৩. পাপের পথে; ৪. মিথ্যা বলা তার অভ্যাসে পরিণত হয়; ৫. চরম মিথ্যাবাদী; ৬. উত্তম চরিত্রের।

পাঠ-২১ : ১. হিংসা, ঈর্ষা; ২. দুই ব্যক্তি; ৩. সম্পূর্ণ হারাম।

পাঠ-২২ : ১. একটি দেহসদৃশ; ২. তাদের পারস্পরিক দয়া প্রদর্শনের মধ্যে; ৩. যেন একটি দেহ; ৪. ভ্রাতৃত্বের সুমহান সম্পর্ক; ৫. পরস্পর ভাই ভাই; ৬. গোটা মুসলিম উম্মাহ।

পাঠ-২৩ : ১. তার বন্ধুর; ২. তার বন্ধুর আদর্শ বা ধর্ম; ৩. মানুষের; ৪. বন্ধু নির্বাচন; ৫. ধর্মপ্রাণ, সৎ ও আল্লাহভীরু ব্যক্তিরা; ৬. পাঁচ ব্যক্তির।

পাঠ-২৪ : ১. একজন মুসলিম; ২. যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে নিয়োজিত থাকে; ৩. সে তার প্রতি জুলুম করে না; ৪. তিন রকমের; ৫. এক সর্বজনীন ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে; ৬. ইমানের।

পাঠ-২৫ : ১. যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে; ২. বীর বা শক্তিমান; ৩. ক্রোধান্বিত অবস্থায়; ৪. আত্মশুদ্ধি ও আত্মসংশোধন।

পাঠ-২৬ : ১. সাহায্য; ২. তাকে অত্যাচার থেকে নিবৃত্ত করে; ৩. তুমি সাহায্য করো; ৪. অত্যাচারিত বা নিপীড়িত; ৫. অমার্জনীয় গর্হিত কাজ; ৬. আল্লাহ তাআলা।

পাঠ-২৭ : ১. যার অশ্লীলতা থেকে বেঁচে থাকার জন্য মানুষ তাকে পরিত্যাগ করে; ২. নিকৃষ্ট বা খারাপ; ৩. তার অশ্লীলতার জন্য; ৪. হারাম; ৫. ধ্বংস করে।

পাঠ-২৮ : ১. মুমিন ব্যক্তি; ২. আর না অভিশম্পাতকারী; ৩. এবং না নির্লজ্জ; ৪. সামাজিক মর্যাদা; ৫. একীভূত হবে না।

পাঠ-২৯ : ১. সে রোপণ করে; ২. সদকা বা দান; ৩. বৃক্ষ থেকে; ৪. বৃক্ষ; ৫. বৃক্ষের; ৬. সদকা।

পাঠ-৩০ : ১. শহিদদের সাথে; ২. ব্যবসায়ী বা বণিক; ৩. বিশ্বস্ত বা বিশ্বাসী; ৪. পবিত্র পেশা; ৫. নয় ভাগ; ৬. হারাম।

পাঠ-৩১ : ১. ঋণ; ২. বেঁচে থাকতে বলেছেন; ৩. ঋণ থেকে; ৪. এবং লাঞ্ছনা বা অপমান; ৫. স্বস্তি দেয় না।

পাঠ-৩২ : ১. দাতা; ২. আমাদের অধীনদের থেকে; ৩. উত্তম দান; ৪. যে ব্যক্তি অন্যের কাছে কিছু চাওয়া থেকে নিষ্কৃতি চায়; ৫. যে ব্যক্তি অমুখাপেক্ষী থাকতে চায়; ৬. একটি নিন্দনীয় জীবিকার্জন ব্যবস্থা।

পাঠ-৩৩ : ১. প্রত্যেকের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হওয়া সম্পর্কে; ২. জনগণের; ৩. পরিবারের সদস্যদের বিষয়ে; ৪. স্ত্রী; ৫. মনিবের সম্পদ বিষয়ে; ৬. নিজ নিজ রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে।

পাঠ-৩৪ : ১. মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি; ২. চূড়ান্ত পর্যায়; ৩. জিহাদ।

পাঠ-৩৫ : ১. হালাল উপার্জন অন্বেষণ; ২. উপার্জন করা; ৩. ফরজের পরে; ৪. যাবতীয় বৈধ পন্থাকে; ৫. ব্যক্তির উপার্জনের ধরনের ওপর; ৬. অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফরজ।

পাঠ-৩৬ : ১. মদ; ২. رِجْسٌ বা অপবিত্র বস্তু বলে; ৩. শয়তানের কাজ।

পাঠ-৩৭ : ১. বেহেশতে; ২. দোজখ; ৩. হালাল উপার্জন করা।

পাঠ-৩৮ : ১. তিন রকমের; ২. নিরবচ্ছিন্ন দান বা অবিরত দান; ৩. জান্নাত; ৪. সদকায়ে জারিয়াহ।

পাঠ-৩৯ : ১. যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণে বের হয়; ২. জ্ঞান অন্বেষণে; ৩. জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ বা মহান আল্লাহর পথে জিহাদ; ৪. বিশেষ মর্যাদার কথা; ৫. নবি-রাসুলদের।

পাঠ-৪০ : ১. মিথ্যা হাদিস বর্ণনাকারী; ২. বর্ণনা করে; ৩. মিথ্যাবাদীদের একজন; ৪. রাসুলুল্লাহ (সা.); ৫. পরম সত্যবাদী; ৬. মিথ্যা হাদিস বর্ণনাকারীর জন্য।

৫ এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

রাবি	রাবি শব্দের অর্থ বর্ণনাকারী। যিনি হাদিস বর্ণনা করেন তাকে রাবি বলা হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) যখন কোনো কথা বলতেন উপস্থিত সাহাবিগণ তখন তা মুখস্থ করে রাখতেন। পরে তারা অন্য সাহাবিদের কাছে উক্ত হাদিস বর্ণনা করতেন। এভাবে যিনিই হাদিস বর্ণনা করেছেন তিনিই রাবি।
সনদ	সনদ আরবি বিশেষ্যবাচক শব্দ। এর অর্থ নির্ভর করা, ভরসা করা, বর্ণনাসূত্র ইত্যাদি। উসুলে হাদিসের পরিভাষায়, হাদিসের মূল বক্তব্যে পৌছা পর্যন্ত পথ তথা ধারাবাহিকতাকে সনদ বলে। একে অনেক ক্ষেত্রে ইসনাদও বলা হয়।
মতন	মতন শব্দের অর্থ মূল, দৃঢ়, মজবুত ইত্যাদি। হাদিসের মূল শব্দাবলিকে মতন বলা হয়। অর্থাৎ হাদিসকে বলা হয় মতন।
উসওয়াতুন হাসানা	উসওয়াতুন হাসানা শব্দের অর্থ হলো উত্তম আদর্শ। আদর্শকে আরবিতে উসওয়া বলে। আল্লাহ তাআলা বলেন— অবশ্যই তোমাদের জন্য মহান আল্লাহর রাসুলের জীবনে রয়েছে উত্তম আদর্শ (সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ২১)। হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর দেখানো পথ অনুসরণ করে যাঁরা শ্রেষ্ঠ মানুষ হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন এবং তাঁদের জীবনাদর্শ দ্বারা মানবজাতিকে সঠিক পথে চলতে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করেছেন, তাঁদের জীবনের ভালো দিকগুলোই হলো আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ।
মুনাফিক	মুনাফিক শব্দের অর্থ- কপট বা ভণ্ড। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায়, যারা মৌখিকভাবে ইমানের ঘোষণা দেয় এবং নামাজ, রোজাও পালন করে কিন্তু অন্তরে কুফরি পোষণ করে তাদেরকে মুনাফিক বলে। মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি- ১. মিথ্যা বলা, ২. ওয়াদা ভঙ্গ করা, ৩. আমানতের খিয়ানত করা।
সহিহ	যে হাদিস গ্রন্থে সংকলিত হাদিসের রাবিগণ পূর্ণাঙ্গ ন্যায়নিষ্ঠ, প্রখর স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন, সংকলিত হাদিসসমূহের সনদ মুত্তাসিল বা অবিচ্ছিন্ন এবং হাদিসসমূহ সব ধরনের ত্রুটি ও আপত্তিমুক্ত সে হাদিসগ্রন্থকে সহিহ বলা হয়। যেমন- সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম। এ দুইটিকে একত্রে সহিহাইন বলা হয়।
সুনান	সুনান আরবি শব্দ। সুনান শব্দটি মূলত সুন্নত শব্দের বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ- নিয়ম, পদ্ধতি, রাস্তা, অভ্যাস, তরিকা ইত্যাদি। যে হাদিসগ্রন্থে হাদিসসমূহকে ফিকহের বিষয় অনুসারে সুবিন্যস্তভাবে সাজানো হয়েছে এবং যার মধ্যে তাহারাত, সালাত, সাওম, হজ, জাকাত ইত্যাদি আহকামের হাদিসসমূহ সংগ্রহের প্রতি বিশেষ লক্ষ রাখা হয়েছে তাকে বলা হয় সুনান। যেমন- সুনানে আবু দাউদ, সুনানে ইবনে মাজাহ।
সিহাহ সিত্তাহ	সিহাহ অর্থ বিশুদ্ধ আর সিত্তাহ অর্থ হলো ছয়। সুতরাং সিহাহ সিত্তাহ হলো ছয়টি বিশুদ্ধ গ্রন্থ। হিজরি তৃতীয় শতকে হাদিস সংকলনের স্বর্ণযুগে হাদিস সংকলনের ক্ষেত্রে ছয় জন মুহাদ্দিস এবং তাদের সংকলিত গ্রন্থ সার্বজনীন ও সর্বাঙ্গীন বিশুদ্ধতার স্বীকৃতি লাভ করে। ইলমে হাদিসের পরিভাষায় এ ছয়টি বিশুদ্ধতম হাদিসগ্রন্থকেই সিহাহ সিত্তাহ বলে। এগুলো হলো: সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম, সুনানে নাসাই, সুনানে তিরমিযি, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে ইবনে মাজাহ।

সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

ক. জ্ঞানমূলক

■ **হাদিসের পরিচয়**

প্রশ্ন-১. হাদিস (حَدِيْثٌ) শব্দের অর্থ কী?
[ঢা. বো., চ. বো., ব. বো. '১৭]
উত্তর: হাদিস শব্দের অর্থ কথা, বাণী বা ঘটনা।

প্রশ্ন-২. হাদিস কী? *[দি. বো., সি. বো., ব. বো. '২৫; রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. '১৮]*
উত্তর: রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কথা, কাজ ও মৌনসম্মতিকে হাদিস বলে।

প্রশ্ন-৩. মাশহুর হাদিস কী?
উত্তর: যে হাদিসের রাবির সংখ্যা এক বা একাধিক স্তরে কমপক্ষে তিনজন থাকে তাকে মাশহুর হাদিস বলে।

প্রশ্ন-৪. হাদিসে কুদসি কী?
উত্তর: যে হাদিসের ভাব ও কথা মহান আল্লাহর, কিন্তু রাসুলুল্লাহ (সা.) তা নিজের ভাষায় মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, তা-ই হাদিসে কুদসি।

প্রশ্ন-৫. ফিলি হাদিস কাকে বলে?
উত্তর: যে হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কোনো কাজ বা তৎপরতার বিবরণ স্থান পেয়েছে, তাকে ফিলি হাদিস বলে।

■ **রাবি, সনদ ও মতন**

প্রশ্ন-৬. রাবি (رَاوِىٌّ) শব্দের অর্থ কী?
[ঢা. বো., চ. বো., ব. বো. '১৭]
উত্তর: রাবি অর্থ বর্ণনাকারী।

প্রশ্ন-৭. সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবির নাম কী?
[ঢা. বো., চ. বো., ব. বো. '১৭]
উত্তর: সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবির নাম হযরত আবু হুরায়রা (রা.)।

প্রশ্ন-৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কতটি হাদিস বর্ণনা করেন?
উত্তর: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) ৫৩৭৪টি হাদিস বর্ণনা করেন।

প্রশ্ন-৯. হযরত আয়েশা (রা.) কতটি হাদিস বর্ণনা করেন?
উত্তর: হযরত আয়েশা (রা.) ২২১০টি হাদিস বর্ণনা করেন।

প্রশ্ন-১০. হাদিস বর্ণনার ধারাবাহিকতাকে কী বলে?
উত্তর: হাদিস বর্ণনার ধারাবাহিকতাকে সনদ বলে।

প্রশ্ন-১১. মতন বলতে কী বোঝ?
উত্তর: হাদিসের মূল বক্তব্য বা মূল বিষয়বস্তুর বর্ণনাকে বলা হয় মতন।

■ **আল-কুরআনের সাথে হাদিসের সম্পর্ক ও পার্থক্য**

প্রশ্ন-১২. আল-কুরআনে সুন্নতকে কী বলা হয়েছে?
উত্তর: আল-কুরআনে সুন্নতকে সর্বোত্তম আদর্শ বলা হয়েছে।

প্রশ্ন-১৩. কুরআন বুঝতে হলে কীসের সহায়তা প্রয়োজন?
উত্তর: কুরআন বুঝতে হলে হাদিসের সহায়তা প্রয়োজন।

■ **হাদিস সংরক্ষণ ও সংকলন**

প্রশ্ন-১৪. মুসনাদ কী?
উত্তর: যে গ্রন্থে বর্ণনাকারী সাহাবিদের নামের ক্রমানুসারে হাদিসসমূহ বিন্যস্ত করা হয় তাকে মুসনাদ বলে। যেমন— মুসনাদে আহমদ।

প্রশ্ন-১৫. হাদিস সংকলনের স্বর্ণযুগ বলা হয় কোন শতককে?
উত্তর: হিজরি সনের তৃতীয় শতককে হাদিস সংকলনের স্বর্ণযুগ বলা হয়।

প্রশ্ন-১৬. বিশুদ্ধ হাদিসের গ্রন্থ 'মুয়াত্তা' কে সংকলন করেন?
উত্তর: ইমাম মালিক (রহ.)।

■ **সিহাহ সিত্তাহ ও প্রসিদ্ধ ছয় ইমাম**

প্রশ্ন-১৭. 'সিহাহ সিত্তাহ' কী? *[রা. বো., সি. বো. '১৯]*
উত্তর: সিহাহ সিত্তাহ বলতে ইসলামের ছয়টি বিশুদ্ধ হাদিসগ্রন্থকে বোঝায়। এগুলো হলো— বুখারি, মুসলিম, তিরমিযি, নাসাঈ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ।

প্রশ্ন-১৮. 'সহিহাইন' কাকে বলে?
উত্তর: সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমকে একত্রে সহিহাইন বলে।

প্রশ্ন-১৯. 'সুনানে আরবাআ' কাকে বলে?
উত্তর: হাদিসের চারটি গ্রন্থ তথা তিরমিযি, নাসাঈ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহকে একত্রে 'সুনানে আরবাআ' বলে।

প্রশ্ন-২০. সহিহ বুখারিতে কতটি হাদিস রয়েছে?
উত্তর: সহিহ বুখারিতে ৭২৭৫টি হাদিস রয়েছে।

প্রশ্ন-২১. ইমাম মুসলিম (রহ.) কত হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন?
[ঢা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., ব. বো. '১৯]
উত্তর: ইমাম মুসলিম ২০৪ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন।

■ **নৈতিক জীবন গঠনে হাদিসের ভূমিকা**

প্রশ্ন-২২. ইমানের সর্বোত্তম শাখা কোনটি?
[ঢা. বো., য. বো., কু. বো. '২২]
উত্তর: ইমানের সর্বোত্তম শাখা হলো— 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অর্থাৎ, 'মহান আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই' একথা বলা।

প্রশ্ন-২৩. اِيْمَانٌ (ইমান) শব্দের অর্থ কী?
[রা. বো., দি. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. '২২]
উত্তর: اِيْمَانٌ (ইমান) শব্দের অর্থ হলো— ইমান, বিশ্বাস।

প্রশ্ন-২৪. মুসলিম কাকে বলে?
উত্তর: যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে এবং সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে তাকে মুসলিম বলে।

প্রশ্ন-২৫. 'আল-হায়া' শব্দের অর্থ কী? *[ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো. '২৫]*
উত্তর: 'আল-হায়া' শব্দের অর্থ লজ্জাশীলতা।

প্রশ্ন-২৬. মুমিনের বড় পরিচয় কী?
উত্তর: মুমিনের বড় পরিচয় হলো— লজ্জাশীলতা।

প্রশ্ন-২৭. মুনাফিকের লক্ষণ কয়টি? *[ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো. '২৫]*
উত্তর: মুনাফিকের লক্ষণ তিনটি।

প্রশ্ন-২৮. ওয়াদা ভঙ্গ করা কী?
উত্তর: ওয়াদা ভঙ্গ করা কবিরা গুনাহ। এটি মুনাফিকের অন্যতম লক্ষণ।

প্রশ্ন-২৯. মুমিন ব্যক্তি বন্ধু হিসেবে কাকে গ্রহণ করবে?
উত্তর: মুমিন ব্যক্তি বন্ধু হিসেবে কেবল মুমিনকেই গ্রহণ করবে।

প্রশ্ন-৩০. প্রকৃত শক্তিমান কে?
উত্তর: যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে সেই প্রকৃত শক্তিমান।

প্রশ্ন-৩১. اَلظَّالِمُ (জালিম) কে? *[দি. বো., সি. বো., ব. বো. '২৫]*
উত্তর: যে ব্যক্তি অপর পক্ষকে প্রাপ্য হক ও অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, কাউকে নিপীড়ন করে সে জালিম।

প্রশ্ন-৩২. মানুষের মধ্যে নিকৃষ্টতম ব্যক্তি কে? *[রা. বো., দি. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. '২২]*
উত্তর: মানুষের মধ্যে নিকৃষ্টতম ব্যক্তি হলো সে ব্যক্তি যার অশ্লীলতা থেকে বেঁচে থাকার জন্য মানুষ তাকে পরিত্যাগ করে।

প্রশ্ন-৩৩. আল-হাসাদ (اَلْحَسَدُ) শব্দের অর্থ কী? *[ঢা. বো., ম. বো., কু. বো. '২২; ঢা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., ব. বো. '১৯]*
উত্তর: আল-হাসাদ শব্দের অর্থ হিংসা।

প্রশ্ন-৩৪. ইবাদত কবুলের পূর্বশর্ত কী?
উত্তর: ইবাদত কবুলের পূর্বশর্ত হলো— হালাল উপার্জন।

খ. অনুধাবনমূলক

প্রশ্ন-১. হাদিস বলতে কী বোঝ?
উত্তর: হাদিস বলতে ইসলামি শরিয়তের দ্বিতীয় উৎসকে বোঝায়। হাদিস আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ-কথা, বাণী, সংবাদ, খবর ইত্যাদি। ইসলামের পরিভাষায় হাদিস বলতে বোঝায়, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর যাবতীয় বাণী কর্ম, অনুমোদন ও মৌন সম্মতি এবং তাঁর যাবতীয় অবস্থা ও গুণ। অবশ্য সাহাবিদের উক্তি, কর্ম ও অনুমোদনকে ও ব্যাপক অর্থে হাদিসের সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

প্রশ্ন-২. হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ (রহ.) কেন হাদিস সংকলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন?
উত্তর: হাদিস হারিয়ে যাওয়া ও বিকৃতি হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য উমর বিন আব্দুল আজিজ (রহ.) হাদিস সংকলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।
খোলাফায়ে রাশেদিনের স্বর্ণযুগের অবসান হলে হাদিস সংরক্ষণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। শিয়া সম্প্রদায়, বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিরা নিজেদের স্বার্থ সুরক্ষায় হাদিস জাল করতে শুরু করে। এর প্রেক্ষিতে ৯৯ হিজরিতে উমাইয়া খলিফা হযরত উমর বিন আব্দুল আজিজ (রহ.) হাদিস সংকলনের রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন-৩. ইসলামের পাঁচটি ভিত্তির নাম লেখো। *[রা. বো., দি. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. '২২]*
উত্তর: ইসলাম পাঁচটি ভিত্তি বা স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত।
ইসলামের পাঁচটি ভিত্তি বা স্তম্ভ হলো— কালিমা, সালাত, জাকাত, সাওম ও হজ।

প্রশ্ন-৪. ইমানের সত্তরটি শাখা-প্রশাখা বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
উত্তর: ইমানের সত্তরটি শাখা-প্রশাখা বলতে অসংখ্য শাখার কথা বোঝানো হয়েছে।
হাদিসে উল্লেখ আছে, ইমানের সত্তরটিরও বেশি শাখা রয়েছে। আরবিতে সত্তর সংখ্যার ব্যবহার হয় অনেক বোঝাতে। বাংলায়ও আমরা এমন শব্দ ব্যবহার করি। যেমন— দশে মিলে করি কাজ। এখানে দশ দ্বারা সংখ্যা বোঝায় না বরং অসংখ্য বোঝায়। অনুরূপভাবে হাদিসে আরবি ভাষার ব্যবহার অনুযায়ী সত্তর দ্বারা সংখ্যা নয় বরং অসংখ্য শাখা-প্রশাখার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

প্রশ্ন-৫. اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ - হাদিসাংশের ব্যাখ্যা করো। *[ঢা. বো., চ. বো., ব. বো. '১৭]*
উত্তর: আলোচ্য হাদিসের অর্থ হলো— 'লজ্জাশীলতা ইমানের একটি বিশেষ অঙ্গ'।
উল্লিখিত হাদিসটি সহিহ বুখারি ও মুসলিম শরিফে সংকলিত হয়েছে। এ হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) লজ্জাশীলতার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। একজন মুমিন তার আচার-আচরণ, কথাবার্তা, কাজকর্মে অবশ্যই লজ্জাশীল হবেন। কারণ, লজ্জাশীলতা ইমানের অপরিহার্য একটি দিক। তাই মান-সম্মান রক্ষা ও সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রত্যেক মুমিনের লজ্জাশীল হওয়া প্রয়োজন। আলোচ্য হাদিসে ইমানের সাথে লজ্জার সম্পর্কের দিকটিই ফুটে উঠেছে।

প্রশ্ন-৬. মহানবি (সা.)-কে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতে হবে কেন?
উত্তর: মাতাপিতা, সন্তান, স্ত্রী, পরিজন, আত্মীয়স্বজন এবং পার্থিব কোনো বিষয় বা বস্তুই রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসার চেয়ে বেশি ভালোবাসা পেতে পারে না। কেননা মুমিনের কর্তব্য হলো— রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রেমের ওপর অন্য কাউকে প্রাধান্য না দেওয়া। এছাড়া পার্থিব ও পরকালীন পূর্ণ সাফল্য লাভের জন্য এবং ইমানের পূর্ণতা সাধনের জন্য ব্যক্তির রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি সর্বোচ্চ প্রেমের কোনো বিকল্প নেই। এ কারণে আমাদেরকে মহানবি (সা.)-কে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতে হবে।

প্রশ্ন-৭. "সত্যবাদিতা মানুষকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়"— ব্যাখ্যা করো। *[ঢা. বো., ম. বো., কু. বো. '২২]*

উত্তর: সত্যবাদিতার অনুসরণ মানুষকে কল্যাণ ও জান্নাতের পথে পরিচালিত করে।

সত্য মানুষকে শাশ্বত ন্যায়ের পথে পরিচালিত করে। সে মিথ্যা বলার অভিশাপ থেকে মুক্তি পায়। সত্যবাদিতা মানুষকে উন্নত নৈতিক চরিত্র গঠনে সাহায্য করে। পাপ ও অশালীন কাজ থেকে রক্ষা করে। সত্যবাদী ব্যক্তি কোনোরূপ অন্যায় ও অত্যাচার করতে পারে না। সর্বদা অন্যের কল্যাণ কামনা করে। এজন্য বলা হয়— সত্যবাদিতা মুক্তি দেয়; মিথ্যা ধ্বংস করে। সর্বোপরি সত্যবাদিতা ব্যক্তিকে পরম সাফল্য এনে দেয়। সত্যবাদী পৃথিবীতে মানুষের আস্থা ও ভালোবাসা পায়। পরকালেও তার জান্নাত লাভ সুনিশ্চিত হয়।

প্রশ্ন-৮. "মানুষ তার বন্ধুর ধর্মে প্রভাবিত হয়।" (اَلْمَرْءُ عَلٰى دِيْنِ خَلِيْلِهٖ)— ব্যাখ্যা করো।

[দি. বো., সি. বো., ব. বো. '২৫; ঢা. বো., চ. বো., ব. বো. '১৭]

উত্তর: "মানুষ তার বন্ধুর দীন বা জীবনাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়।"- এটি একখানা হাদিস।

প্রশ্নোল্লিখিত হাদিসে মহানবি (সা.) সৎ বন্ধু নির্বাচনের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। মানুষের সাধারণ স্বভাব হচ্ছে বন্ধুর কর্মপদ্ধতি ও আদর্শের প্রতি আগ্রহী হওয়া। তাই বন্ধু নির্বাচনের ক্ষেত্রে অবশ্যই সতর্ক ও সাবধান হতে হবে। এক্ষেত্রে ধর্মপ্রাণ, সৎ, আল্লাহভীরু ব্যক্তিদের সাথে বন্ধুত্ব করতে রাসুলুল্লাহ (সা.) উৎসাহিত করেছেন।

প্রশ্ন-৯. অশ্লীলতা পরিহার করতে হবে কেন?

উত্তর: নিজেকে একজন সত্যিকারের মুমিন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে অশ্লীলতা পরিহার করতে হবে।

ইসলাম শালীনতার ধর্ম। সুন্দর ও শোভন ইসলামের নীতি। এ জন্যই ইসলামের জীবনদর্শন ও শিক্ষা অত্যন্ত উন্নত আদর্শের ওপর নির্ভরশীল। অশ্লীলতা ও অশোভন আচরণ নৈতিক জীবন ধ্বংস করে, মানুষকে পশুত্বের অসহনীয় জীবন উপহার দেয়। এ কারণে অশ্লীল আচরণ বর্জনের পাশাপাশি অশ্লীল আচরণের সকল অনুসঙ্গ ও সংসর্গ বর্জন করা উচিত।

প্রশ্ন-১০. 'সাদকায়ে জারিয়াহ' বলতে কী বোঝায়?

[রা.বো., কু. বো., চ.বো., ব. বো. '১৮]

উত্তর: সাদকায়ে জারিয়াহ বলতে এমন দান খয়রাতকে বোঝায় যার সওয়াব মৃত্যুর পরও পাওয়া যায়।

সাদকায়ে জারিয়াহ আরবি শব্দ। সাদকা শব্দের অর্থ দান করা এবং জারিয়াহ শব্দের অর্থ প্রবাহমান, সদাস্থায়ী প্রভৃতি। পরিভাষায় সাদকায়ে জারিয়াহ হলো এমন দান যার কার্যকারিতা কখনো শেষ হবে না বরং তা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। অর্থাৎ পৃথিবী যতদিন থাকবে ততদিন পর্যন্ত সাদকাকারী এর সওয়াব পেতেই থাকবে।

প্রশ্ন-১১. সৎ ব্যবসায়ীরা কিয়ামতের দিন শহিদদের সাথে থাকবেন কেন?

উত্তর: সৎ ব্যবসায়ীরা তাদের সততার পুরস্কার হিসেবে কিয়ামতের দিন শহিদদের সাথে থাকবেন।

ব্যবসায়ের পদ্ধতি ও প্রকৃতিই এমন যে, ব্যবসায়ী ইচ্ছা করলেই প্রতারণা করতে পারেন। এ কারণে ব্যবসায়ে বিশ্বস্ত ও সৎ থাকা বেশ কঠিন। এ জন্য সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত মুসলিম ব্যবসায়ীর জন্য পুরস্কারের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। তারা কিয়ামতের কঠিন দিনে শহিদদের সাথে বিপুল আনন্দে আরশের ছায়া লাভ করবেন। ব্যবসায়ীদের এ বিশেষ মর্যাদা দানের মাধ্যমে মূলত তাদেরকে বিশ্বস্ত ও সৎ থাকার উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

প্রশ্ন-১২. "ঋণ হলো রাতের দুশ্চিন্তা ও দিনের লাঞ্ছনা"— ব্যাখ্যা করো। *[রা. বো., দি. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. '২২]*

উত্তর: ঋণের অশুভ পরিণতি সম্পর্কিত হাদিসটি দ্বারা রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে ঋণ গ্রহণে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

ঋণ হলো এমন এক ধরনের দায়বদ্ধতা, যার জন্য নিজের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয় এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতে হয়। একজন ঋণগ্রহীতা সমাজে স্বাধীনভাবে চলতে পারে না। কারণ সবসময় ঋণদাতার উপস্থিতি তার মনে উদ্বেগের সৃষ্টি করে। কখনও কখনও জনসমক্ষে তাকে ঋণের জন্য অপমানিত হতে হয়। এসব লাঞ্ছনা ঋণগ্রহীতাকে স্বস্তিতে থাকতে দেয় না। সে রাতে দুশ্চিন্তার শিকার হয় এবং তার সার্বিক অবস্থার উন্নতি বাধাগ্রস্ত হয়। এরূপ অবস্থা থেকে বাঁচার জন্যই রাসুলুল্লাহ (সা.) ঋণ গ্রহণ থেকে সাবধান থাকার নির্দেশ দিয়ে বলেন, "তোমরা ঋণ থেকে বেঁচে থাকো। কেননা নিশ্চয় ঋণ হলো রাতের দুশ্চিন্তা ও দিনের লাঞ্ছনা" (বায়হাকী)।

প্রশ্ন-১৩. 'জালিম ও মজলুম' বলতে কী বোঝ?

[রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. '১৮]

উত্তর: জালিম ও মজলুম বলতে অত্যাচারী ও অত্যাচারিতকে বোঝায়।

আরবি জালিম শব্দটি 'জুলুম' মূলধাতু থেকে এসেছে। জুলুম অর্থ অত্যাচার, নির্যাতন প্রভৃতি। কাউকে তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা, নিপীড়ন করা প্রভৃতি জুলুমের অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি জুলুম করে তাকে বলা হয় জালিম বা অত্যাচারী। আর যার ওপর জুলুম করা হয় সে হলো মজলুম বা অত্যাচারিত।

প্রশ্ন-১৪. মদ সব অপকর্ম ও অশ্লীলতার মূল।— ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: মদ ও মাদকতা মানব চরিত্রের ধ্বংসের এবং সব অশ্লীল ও অনৈতিক কাজের মূল প্রেরণা।

মদ কেবল নিজে অপবিত্র নয় বরং আরও অসংখ্য অপবিত্র ও নিষিদ্ধ কাজের উৎস। এর ফলে মানুষের বোধ-বিবেচনা ও বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়। কোনো অশালীন ও অন্যায় কাজ করতে তার দ্বিধা হয় না। হত্যা, ব্যভিচার, লুণ্ঠন বা ত্রাস সৃষ্টির মতো ঘটনার নেপথ্যে প্রায়ই মদের ভূমিকা প্রত্যক্ষ থাকে।

প্রশ্ন-১৫. কল্যাণধর্মী শিক্ষা বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা দাও।

উত্তর: কল্যাণধর্মী শিক্ষা বলতে এমন শিক্ষাকে বোঝায় যে শিক্ষার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ উপকৃত হয়। যেমন— সাধারণের উপযোগী করে কুরআন-হাদিসের ব্যাখ্যাগ্রন্থ লেখা। সর্বসাধারণের জন্য বোঝা সহজ হয় এমনভাবে ইসলামের আইনকানুন সংকলন করা। চরিত্র গঠনে সহায়ক বই লেখা কিংবা এমন আদর্শ রেখে যাওয়া বা এমন ছাত্র তৈরি করা যা ব্যক্তির মৃত্যুর পর মানুষের প্রেরণার উৎস হবে। কল্যাণধর্মী শিক্ষা হলে এমন শিক্ষা ও আদর্শ পেশ করা। যে শিক্ষা বা আদর্শের দ্বারা মানুষ যতদিন উপকৃত হবে ততদিন ব্যক্তি সওয়াব পেতে থাকবে।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. হাদিসের মূল বক্তব্যকে কী বলা হয়?
ক. মতন খ. সনদ
গ. রাবি ঘ. বর্ণনা

২. যিনি হাদিস বর্ণনা করেন তাকে কী বলা হয়?
ক. মুহাদ্দিস খ. মুফতি
গ. রাবি ঘ. আলেম

৩. হাদিসের মূল বক্তব্যে পৌঁছার সূত্র কোনটি?
ক. মতন খ. সনদ
গ. কওল ঘ. রিওয়ায়েত

৪. পরোক্ষ ওহি কোনটি?
ক. কুরআন খ. হাদিস
গ. ইজমা ঘ. কিয়াস

৫. কোন বিষয়ে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত মুহাদ্দিসগণ হাদিস গ্রহণ করেননি?
ক. হাদিসের সত্যতা খ. হাদিসের উৎস
গ. কুরআনের বাণী সত্যতা
ঘ. হাদিস সম্পর্কিত কুরআনের আয়াত

৬. হাদিসে কার জীবনচরিত চিত্রিত হয়েছে?
ক. রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর খ. ফেরেশতাদের
গ. আদম (আ.)-এর ঘ. ইবরাহীম (আ.)-এর

৭. কুরআন নাজিলের প্রথম পর্যায়ে কে হাদিস লিখে রাখতে নিষেধ করেছেন?
ক. রাসুলুল্লাহ (সা.) খ. আল্লাহ তাআলা
গ. আবু বকর (রা.) ঘ. আলি (রা.)

৮. কোন খলিফা সর্বপ্রথম হাদিস সংকলনের নির্দেশ দেন?
ক. মারওয়ান ইবনে হাকাম
খ. হিশাম ইবনে আবদুল মালিক
গ. উমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহ.)
ঘ. ওয়ালিদ ইবনে হিশাম

৯. ইমাম বুখারি (রহ.) কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
ক. আজারবাইজান খ. তুর্কমেনিস্তান
গ. আফগানিস্তান ঘ. উজবেকিস্তান

১০. হিজরি তৃতীয় শতাব্দীতে সংকলিত ছয়টি হাদিস গ্রন্থকে একত্রে কী বলে?
ক. সিহাহ সিত্তাহ খ. মুসনাদ
গ. জামিওয়াল সুনান ঘ. কিতাবুস সুনান

১১. শাহিন কুরআন অধ্যয়ন করতে গিয়ে দেখেন সেখানে সালাত কায়েমের কথা আছে কিন্তু এর ওয়াক্ত, আদায়ের নিয়মাবলি ইত্যাদি কিছুই নেই। এগুলো জানার জন্য তাকে কীসের দারস্থ হতে হবে?
ক. ইমামের খ. আলিমের
গ. হাদিসের ঘ. তাফসিরের

১২. উইলিয়ামস দাবি করেন পৃথিবীতে কেউ তার শিক্ষক নন, প্রভু স্বয়ং তাকে শিখিয়েছেন। এমনকি সে ছিল নিরক্ষর কিন্তু সে আসমানি গ্রন্থপ্রাপ্ত। ইসলামে কে এ দাবি করতে পারেন?
ক. হযরত আলি (রা.) খ. হযরত উমর (সা.)
গ. হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ঘ. হযরত উসমান (রা.)

১৩. হাদিসের আলোকে কীভাবে জালিমকে সাহায্য করবে?
ক. প্রহার করে খ. বিরত রেখে
গ. সাহায্য করে ঘ. কটূক্তি করে

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন

১৪. ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত থাকতে হবে—
i. ব্যবসায়িক স্বার্থে
ii. সামাজিক কল্যাণার্থে
iii. পরকালে শহিদদের সাথে থাকতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৫. অপ্রয়োজনে ঋণ করা ঠিক নয়। কারণ এতে—
i. দুশ্চিন্তা বাড়ে
ii. সম্মানহানি হয়
iii. ইমান দুর্বল হয়ে পড়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৬ ও ১৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
এসএসসি পাস করে মুস্তাফিজ এখন কুরআন মাজিদের বাংলা অনুবাদ পড়তে শুরু করেছে। কুরআন মাজিদের অকাট্য বাণীগুলো প্রকৃত অর্থেই তাকে আকৃষ্ট করেছে। মুশকিল হলো কিছু কিছু বাণী বুঝে ওঠা তার পক্ষে বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। এ সমস্যা সমাধানে তার শিক্ষক তাকে ইসলামি শরিয়তের দ্বিতীয় উৎসের জ্ঞান অর্জনের পরামর্শ দিলেন।

১৬. মুস্তাফিজের শিক্ষক কীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন?
ক. হাদিস খ. ইজমা
গ. কিয়াস ঘ. মাযহাব

১৭. মুস্তাফিজ উক্ত বিষয়ের জ্ঞান অর্জনের ফলে জানতে পারবে—
i. কুরআনের ব্যাখ্যা
ii. সঠিক পথের দিশা
iii. কুরআনের সাথে হাদিসের সম্পর্ক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

খ. বোর্ড পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৮. কুরআন বুঝতে হলে কোনটি অধ্যয়ন করতে হয়? *[সকল বোর্ড ২০২৫]*
ক. ফিকহ খ. হাদিস
গ. তাজবিদ ঘ. সাহিত্য

১৯. মতন (مَتْنٌ) অর্থ কী? *[সকল বোর্ড ২০২৩]*
ক. হাদিস লিখনের উপকরণ
খ. হাদিসের মূল বাণী
গ. রাবিগণের বর্ণনা পরম্পরা
ঘ. হাদিস সংকলনের পদ্ধতি

২০. হাদিস বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতাকে বলা হয়— *[সকল বোর্ড ২০১৮]*
ক. রেওয়াত খ. সনদ
গ. মতন ঘ. সুন্নাহ

২১. সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবি কে ছিলেন? *[সকল বোর্ড ২০১৭]*
ক. হযরত আয়েশা (রা.) খ. ইবন আব্বাস (রা.)
গ. আবু হুরায়রা (রা.) ঘ. আনাস (রা.)

২২. ইমাম মালিক (রহ.) রচিত গ্রন্থ কোনটি? *[সকল বোর্ড ২০২২; ২০১৭]*
ক. আর রিসালাহ খ. আল মুয়াত্তা
গ. আল মুসনাদ ঘ. কুতুবে হানাফিয়া

২৩. 'সহিহুল বুখারি' কে সংকলন করেন? *[সকল বোর্ড ২০১৯]*
ক. আবু ইসা মুহাম্মদ বিন ইসা
খ. সুলায়মান বিন আশয়াস
গ. মুহাম্মদ বিন ইসমাইল
ঘ. মুহাম্মদ বিন ইয়াজিদ

২৪. নিচের কোনটি সিহাহ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত? *[সকল বোর্ড ২০১৮]*
ক. মিশকাতুল মাসাবিহ খ. মুসনাদ-ই আহমদ
গ. মুয়াত্তা ইমাম মালিক ঘ. সুনানে ইবনে মাজাহ

২৫. সনদ বিবেচনায় হাদিস কত প্রকার? *[সকল বোর্ড ২০১৮]*
ক. দুই খ. তিন
গ. চার ঘ. পাঁচ

২৬. ইমানের সর্বোৎকৃষ্ট শাখা কোনটি? *[সকল বোর্ড ২০১৮]*
ক. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলা
খ. সালাত আদায় করা
গ. রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়া
ঘ. অন্যায় কাজ করতে লজ্জা পাওয়া

২৭. রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী— "উপরের হাত নিচের হাত হতে উত্তম"— হাদিসে উপরের হাত বলতে কী বোঝানো হয়েছে? *[সকল বোর্ড ২০২৫; ২০২২; ২০১৯]*
ক. দাতা খ. গ্রহীতা
গ. ভিক্ষাবৃত্তি ঘ. আত্মনির্ভরশীলতা

২৮. কলেজ ছাত্র ফাহিম তার বন্ধুকে ছুটিতে কক্সবাজার যাওয়ার কথা বলে পিতার সাথে খুলনা চলে যায়। এজন্য ইসলামের দৃষ্টিতে সে বিবেচিত একজন— *[সকল বোর্ড ২০২৫]*
ক. কাফির খ. মুশরিক
গ. মুনাফিক ঘ. ফাসিক

২৯. হাদিসের আলোকে প্রকৃত বীর কে? *[সকল বোর্ড ২০২১]*
ক. যে রাগের সময় প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে পারে
খ. যে রাগের সময় নিজেকে সংযত রাখতে পারে
গ. যে রাগকে মোটেও ভয় পায় না
ঘ. যে সর্বদা অন্যায়ের প্রতিবাদ করে

৩০. মানব জীবনের মারাত্মক ঘৃণিত কাজ কোনটি? *[সকল বোর্ড ২০২৫]*
ক. অশ্লীলতা খ. চুরি
গ. হিংসা ঘ. ঘৃণা

৩১. সত্যবাদী মুসলিম ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন কার সঙ্গে থাকবেন? *[সকল বোর্ড ২০২৩; ২০২১]*
ক. আলেমদের খ. ইমানদারদের
গ. শহিদদের ঘ. মুত্তাকিদের

৩২. কোনটি ফরজের পর ফরজ? *[সকল বোর্ড ২০২২]*
ক. জিহাদ খ. হালাল উপার্জন
গ. সত্য কথা বলা ঘ. সালাত কায়েম

৩৩. হাদিসে জোর দেওয়া হয়েছে— *[সকল বোর্ড ২০২১]*
i. নৈতিক গুণ অর্জন করার প্রতি
ii. আখলাকে যামিমা চর্চা করার প্রতি
iii. অনৈতিক কার্যকলাপ বর্জন করার প্রতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩৪ ও ৩৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
বেলাল ও হাসান হাদিসের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করছিল। বেলাল বলল, হাদিসও এক ধরনের ওহি। কেননা মহান আল্লাহ বলেন— وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى তখন হাসান বলল, মহান আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার জন্য হাদিসের অনুসরণ অপরিহার্য। *[সকল বোর্ড ২০১৭]*

৩৪. উদ্দীপকে উল্লেখিত 'ওহি' কোন প্রকারের?
ক. মাতলু খ. গায়রে মাতলু
গ. কুদসি ঘ. তাকরিরি

৩৫. উদ্দীপকে হাসানের বক্তব্য যথার্থ, কারণ—
i. হাদিস ছাড়া কুরআন বুঝা সম্ভব নয়
ii. ইহা ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ
iii. এটা ছাড়া মহান আল্লাহর ইবাদত করা অসম্ভব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩৬ ও ৩৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
মুফাস্‌সির আব্দুর রশিদ কুরআনুল কারিমের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার জন্য রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনাদর্শের সাহায্য নেন। কেননা তাঁর জীবনাদর্শ ছাড়া ইসলামি শরিয়তের মাসয়ালা উদ্ভাবন বিষয়ে মুসলিম মনীষীদের গবেষণা সম্ভব নয়। *[সকল বোর্ড ২০২২]*

৩৬. মুফাস্‌সির আব্দুর রশিদ কুরআন কারিমের ব্যাখ্যায় কোন বিষয়টির সাহায্য নেন?
ক. ইজমা খ. কিয়াস
গ. হাদিস ঘ. ফিকহ

৩৭. মুসলিম মনীষীদের গবেষণার ফলে—
i. শরিয়তের বিধান পালন সহজ হয়েছে
ii. মুসলিমদের মাঝে মতপার্থক্য হ্রাস পেয়েছে
iii. ইসলাম ধর্ম মানুষের নিকট সহজবোধ্য হয়েছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i,ii, ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩৮ ও ৩৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
রাহিক সাহেব রাস্তা হতে কলার খোসা সরিয়ে ফেললেন। তার ভাই রাইয়ান নার্সারি হতে গাছের চারা কিনে বাগানে লাগালেন। *[সকল বোর্ড ২০২২]*

৩৮. রাহিক সাহেবের কর্মকাণ্ডে কী প্রকাশ পেয়েছে?
ক. ইজমা খ. ইমান
গ. শোকর ঘ. তাক্‌ওয়া

৩৯. রাইয়ানের কার্যক্রমের ফলে—
i. পরিবেশ রক্ষা পাবে
ii. সদকার সওয়াব পাবে
iii. মুনাফিকি দূর হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i,ii, ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৪০ ও ৪১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
নোমান নিয়মিত সালাত আদায় করে। সে তার বন্ধু ফাহিমকে বলল, আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে কেউ অপমান করলে আমার সহ্য হয় না। তখন ফাহিম বলল, আমাদের ইসলাম শিক্ষা বইয়ে মহানবির জন্য (সা.) ভালোবাসাকে ইমান বলা হয়েছে। নোমান বলল, ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আমাদেরকে এ বিষয়টি মনে রাখতে হবে। *[সকল বোর্ড ২০২৫]*

৪০. তোমাদের পাঠ্যবইয়ের আলোকে ইসলামের তৃতীয় ভিত্তি কোনটি?
ক. নামাজ খ. রোজা
গ. হজ ঘ. জাকাত

৪১. মুমিন হতে হলে কোন ব্যক্তিদের চেয়ে মহানবি (সা.)-কে বেশি ভালোবাসতে হবে?
i. পিতা-মাতা
ii. সন্তান-সন্ততি
iii. সমস্ত মানুষ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উত্তরমালা

১	ক	২	গ	৩	খ	৪	খ	৫	ক	৬	ক	৭	ক	৮	গ	৯	ঘ	১০	ক	১১	গ	১২	গ
১৩	খ	১৪	ঘ	১৫	ক	১৬	ক	১৭	ঘ	১৮	খ	১৯	খ	২০	খ	২১	গ	২২	খ	২৩	গ	২৪	ঘ
২৫	খ	২৬	ক	২৭	ক	২৮	গ	২৯	খ	৩০	ক	৩১	গ	৩২	খ	৩৩	খ	৩৪	খ	৩৫	খ	৩৬	গ
৩৭	ঘ	৩৮	খ	৩৯	ক	৪০	ঘ	৪১	ঘ														

গ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. হাদিস কাকে বলে?
২. বিশুদ্ধতার ভিত্তিতে হাদিস কত প্রকার ও কী কী?
৩. সনদ ও মতনের সংজ্ঞা দাও।
৪. হাদিসের ছয়টি বিশুদ্ধ গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লেখো।
৫. হাদিসের গুরুত্ব সংক্ষেপে আলোচনা করো।
৬. শহিদদের সঙ্গী হতে ব্যবসায়ীদের জন্য ইসলাম কী কী শর্ত পূরণ করতে বলেছে? সংক্ষেপে লেখো।
৭. তাকরিরি হাদিস বলতে কী বোঝ?
৮. হালাল জীবিকা উপার্জনের গুরুত্ব সংক্ষেপে লেখো।
৯. হাদিসের সাথে কুরআনের পার্থক্য সংক্ষেপে লেখো।
১০. হাদিসে বর্ণিত মুনাফিকের আলামত বা লক্ষণগুলো বর্ণনা করো।

ঘ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. জনাব আকবর ও শাহেদ একই এলাকায় বাস করেন। আকবর একজন সৎ ও মেধাবী গবেষক। দশ বছর বয়সের পূর্বেই তিনি আল-কুরআন হিফ্জ করেন। শৈশবেই তাঁর পিতা ইন্তিকাল করেন। মায়ের স্নেহেই তিনি লালিত-পালিত হন। তিনি গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ করার পূর্বে দু'রাকাত নফল নামাজ আদায় করেন। তিনি মায়ের সঙ্গে হজ পালন করেন এবং হিজাযে শিক্ষা লাভ করেন। অপরপক্ষে শাহেদ একজন দুর্নীতিপরায়ণ লোক। তিনি ইসলামি শরিয়তের উৎস হিসেবে আল-কুরআনই যথেষ্ট মনে করেন। একথা শুনে মসজিদের ইমাম সাহেব মহানবি (সা.) এর বিদায় হজের ভাষণে রেখে যাওয়া শরিয়তের বিধানের কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

[ঢা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., ব. বো.'১৯]

ক. ইমাম মুসলিম (র.) কত হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন?

খ. হিজরি তৃতীয় শতককে হাদিস সংকলনের স্বর্ণযুগ বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত জনাব আকবরের জীবনের সাথে কোন বিখ্যাত মনীষীর জীবনের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. মসজিদের ইমাম সাহেব মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর বিদায় হজের ভাষণের যে বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন তা পালনের যৌক্তিকতা উল্লেখ করো।

২.

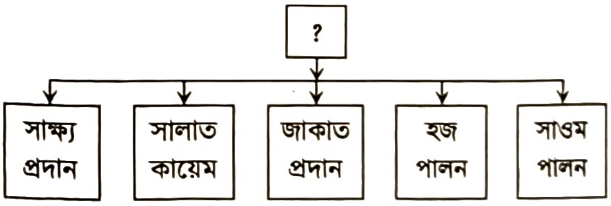

[ঢা. বো., ম. বো., দি. বো., কু. বো. চ. বো., ব. বো. '২৩]

ক. হিংসা (حَسَدٌ) কী?

খ. ইমানের শাখা-প্রশাখা বলতে কী বোঝায়?

গ. প্রদত্ত ছকের শূন্যস্থানের হাদিসটি কোন বিষয়ক? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. প্রদত্ত ছকের হাদিসটি মানবজীবনে কী শিক্ষা বয়ে আনে? বিশ্লেষণ করো।

৩. অধ্যাপক আফজাল হোসেন শ্রেণিকক্ষে ছোট্ট একটি হাদিস নিয়ে আলোচনা করলেন। "লা ইউমিনু আহাদুকুম হাত্তা আকুনা আহাব্বা ইলাইহি মিন ওলিদিহি ওঅলাদিহি অন্নাসি আজমাঈন।" *[ঢা. বো., ম. বো., কু. বো. '২২]*

ক. ইমানের সর্বোত্তম শাখা কোনটি?

খ. "সত্যবাদিতা মানুষকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়"— ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের হাদিসটিতে কোন বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে?

ঘ. হাদিসটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।

৪. জনাব মুহসিন জুমার খুতবা দানকালে বলেন যে, ঈমানের সত্তরটিরও বেশি শাখা-প্রশাখা রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট শাখা হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা এবং সর্বনিম্ন শাখা হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা। আর লজ্জাশীলতা ইমানের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

[ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., দি. বো. '২১]

ক. ইসলাম (إِسْلَامٌ) অর্থ কী?

খ. ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ সম্পর্কে লেখো।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ইমানের সর্বোৎকৃষ্ট শাখাটি ব্যাখ্যা করো।

ঘ. "লজ্জাশীলতা ইমানের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ"— হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

৫. জনাব আরাফাত কে.এস.এম সরকারি কলেজের অধ্যাপক। নতুন জামা পরে কলেজে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ একটি রিক্সা রাস্তায় জমে থাকা কাদা পানি ছিটিয়ে দিলে জামা নষ্ট হলো। তিনি রিক্সাওয়ালাকে মারতে উদ্যত হলেন। এমন সময় একটি হাদিসের কথা মনে করে নিজেকে শান্ত করলেন। তিনি হারতে চান না। বাসায় ফিরে অন্য জামা পরে বের হলেন। মনে খুব শান্তি পেলেন। মাহফুজা খবরে ফিলিস্তিনের মুসলিম ভাইদের কষ্ট দেখে তার সঞ্চিত অর্থ দান করলেন। প্রতিদিন সে নামাজে তাদের মুক্তির জন্য প্রার্থনা করেন। ওদের কথা ভেবে সে খুবই কষ্ট পায়।

[ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো. '২৫]

ক. মুনাফিকের লক্ষণ কয়টি?

খ. জাকাতই ইসলামের সেতুবন্ধন— ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত জনাব আরাফাত সাহেব যে হাদিসের কথা মনে করে নিজেকে শান্ত করলেন তা ব্যাখ্যা করো।

ঘ. মাহফুজার কার্যক্রম হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

৬. সরকার একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে সারা দেশে এক কোটি গাছ লাগানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতে যেমন পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হবে তেমনি বৃক্ষ রোপণকারীরা সওয়াবেরও অংশীদার হবে। কেননা মানুষ বা পশু-পাখি সেখান থেকে ফল খায় বা উপকৃত হয়। হাদিসের ভাষ্যমতে এক শ্রেণির লোক কিয়ামতের দিন শহিদদের সাথে থাকবেন।

[ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., দি. বো. '২১]

ক. মাজলুম (مَظْلُوْمٌ) অর্থ কী?
খ. "সে যেন দেখে কার সাথে বন্ধুত্ব করছে"— বুঝিয়ে লেখো।
গ. উদ্দীপকে সরকারের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিটি কোন ধরনের সওয়াবের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত হাদিসটির আলোকে কারা কিয়ামতের দিন শহিদদের সাথে থাকবেন? তাদের গুণাবলি বিশ্লেষণ করো।

৭. জসিম শান্ত প্রকৃতির ছেলে। একদা কতিপয় দুষ্ট ছেলে তাকে বেত দিয়ে মেরে আহত করে। এ ঘটনা দেখে জনাব কসিম দুষ্ট ছেলেদের অত্যাচার থেকে তাকে রক্ষা করে উভয়ের মাঝে সমঝোতার চেষ্টা করেন। অপরপক্ষে জসিমের বন্ধু আবিরের চরিত্র তাস খেলা, জুয়া খেলা, নারীদের উত্যক্ত করাসহ অশ্লীলতায় ভরপুর। এজন্য অনেকেই তাকে এড়িয়ে চলে। মুফতি এনামুল হক বলেন, 'ইসলামে অশ্লীলতার কোনো সুযোগ নেই। এজন্য তাকে শাস্তি পেতে হবে।'

[রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. '১৮]

ক. 'হাদিস' কী?
খ. 'জালিম ও মজলুম' বলতে কী বোঝ?
গ. জনাব কসিমের কর্মকাণ্ডে কোন হাদিসের শিক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উদ্দীপকে আবিরের চরিত্রটি হাদিসের বিবেচনায় চিহ্নিতপূর্বক মুফতি এনামুলের উক্তিটি মূল্যায়ন করো।

৮. জনাব শফি একজন চাউল ব্যবসায়ী। মাঝে মাঝে তিনি চিকন চাউলের সাথে মোটা চাউল মিশিয়ে সেটা চিকন চাউল হিসেবে বিক্রি করেন। কখনওবা ওজনেও কম দেন। তার বন্ধু রাফি এহেন কর্মকাণ্ড আঁচ করতে পেরে তাদের মধ্যকার বন্ধুত্ব ত্যাগ করেন।

[দি. বো., সি. বো., ব. বো. '২৩]

ক. 'মুনাফিক' কারা?
খ. 'মানুষ তার বন্ধুর ধর্মে প্রভাবিত হয়'— ব্যাখ্যা করো।
গ. শফির ব্যবসা কতটুকু গ্রহণযোগ্য? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. 'বিশ্বস্ত বন্ধু প্রাচীরসম' উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

৯. মসজিদের ইমাম মাওলানা মানসুর মুসল্লিদের উদ্দেশে ইসলামের ভিত্তিসমূহ উল্লেখ করে বক্তব্য দিচ্ছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন— "হারাম সম্পদে তৈরি মাংস (শরীর) বেহেশতে প্রবেশ করবে না এবং হারাম সম্পদে তৈরি প্রতি টুকরো মাংসের জন্য দোযখই যথোপযুক্ত আবাস।"

[রা. বো., দি. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. '২২]

ক. اَلْاِيْمَانُ (ইমান) শব্দের অর্থ কী?
খ. ইসলামের পাঁচটি ভিত্তির নাম লেখো।
গ. হালাল খাদ্য গ্রহণের গুরুত্ব বর্ণনা করো।
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত হাদিসের বাস্তব শিক্ষা মূল্যায়ন করো।

ঙ. সমন্বিত অধ্যায়ের সৃজনশীল প্রশ্ন

১০. মহানবি (সা.) বলেছেন "আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যতদিন তোমরা সে দুটিকে আঁকড়ে ধরে থাকবে ততদিন পথভ্রষ্ট হবে না।" *[ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., দি. বো. '২১]*

◄১ম ও ২য় অধ্যায়ের সমন্বয়ে

ক. হাদিস (حَدِيْثٌ) কাকে বলে?
খ. "তিনি ওহী ব্যতীত কোনো কথাই বলেন না"— ব্যাখ্যা করো।
গ. 'দুটি জিনিস' এর দ্বিতীয়টির গুরুত্ব বর্ণনা করো।
ঘ. উদ্দীপকে উদ্দিষ্ট প্রথম বিষয়টির পরিচয় দাও এবং মানব জীবনে এর গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো।

১১. ইসমাইল হোসেন নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করেন। তিনি তার পরিবারে সবাইকে কুরআন তিলাওয়াতের জন্য উৎসাহিত করেন। তাছাড়া তিনি নিয়মিত হাদিসশাস্ত্র পাঠ করেন। পরিবারের সবাইকে তিনি সহিহ হাদিস পাঠ করে শোনান। ফলে তার ছেলেমেয়েরা নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে।

◄১ম ও ২য় অধ্যায়ের সমন্বয়ে

ক. 'হাদিস' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ কী?
খ. উপার্জন হালাল না হলে ইবাদত কবুল হয় না কেন? ব্যাখ্যা করো।
গ. কুরআন তিলাওয়াতের ওপর ইসমাইল হোসেনের গুরুত্ব দেওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উদ্দীপকটিতে নৈতিক চরিত্র গঠনে হাদিসের গুরুত্বের প্রতিফলন ঘটেছে— মন্তব্যটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করো।

১২. প্রফেসর ড. নাছির উদ্দীন স্যার শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বললেন, ইসলামের মূল উৎস হলো 'আল-কুরআন'। এ গ্রন্থের জ্ঞান অর্জন করে বাস্তবজীবনে প্রতিফলন ঘটাতে পারলে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি পাওয়া যায়। তিনি আরও বলেন— রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন— "যে ব্যক্তি তার কোনো মুসলমান ভাইয়ের প্রয়োজনে এগিয়ে আসে, মহান আল্লাহ তার প্রয়োজনে এগিয়ে আসেন।"

[রা. বো., সি. বো., য. বো. '২৩]

ক. 'ইসলাম' শব্দের অর্থ কী?
খ. "সাওম পালনকারীর জন্য দুটি আনন্দ।"— ব্যাখ্যা করো।
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ইহকালে শান্তি ও পরকালে মুক্তির উপায় কী? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উদ্দীপকে প্রফেসর ড. নাছির উদ্দীন স্যার যে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন তার সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষণ করো।

৩

আল-ইজমা

Al-Ijma

প্রধান প্রধান শব্দ

- ইজমা
- আযিমত
- রুখসাত
- আহলে ইজমা
- মুজতাহিদ
- মারাতিব
- মুতাজিলা

পৃথিবীর সাথে সাথে মানবজীবনের চাহিদা এবং সমস্যাও পরিবর্তনশীল। ইসলামও একটি শাশ্বত ও গতিশীল জীবনবিধান। ইজমা ইসলামি জীবনবিধানের গতিশীলতার চরিত্র বহন করে। আল-কুরআন ও আল-হাদিসের পরেই ইজমার স্থান। এজন্য ইসলামি আইন-বিজ্ঞানের চারটি মৌল উৎসের মধ্যে তৃতীয় উৎস হিসেবে ইজমাকে গণ্য করা হয়। কুরআন-হাদিস দ্বারা যখন কোনো সমস্যার সমাধান করা যায় না, ঠিক তখনই ইজমার উপর নির্ভর করতে হয়। কুরআন ও হাদিস দিয়ে প্রমাণিত যে, মহানবি (সা.)-এর ইন্তেকালের পর কিয়ামত পর্যন্ত নতুন করে মহান আল্লাহর কোনো বাণী পৃথিবীতে আর নাজিল হবে না। সুতরাং নতুনভাবে উদ্ভূত কিছু গৌণ সমস্যার সমাধান কুরআন ও হাদিসে সরাসরি নাও পাওয়া যেতে পারে। সেক্ষেত্রে সমাধান দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহর ইজমার সুযোগ রেখেছেন। যেসব গৌণ বিষয়ের সমাধান সরাসরি কুরআন ও হাদিসে পাওয়া যায় না, প্রখ্যাত আলেম ও গবেষকগণ সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে আলোচনা, সমালোচনা ও পর্যালোচনার পরে সেসব সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে যে ঐকমত্য পোষণ করেন তা-ই হলো ইজমা। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মতকে ইজমা করার ক্ষমতা ও সম্মান প্রদান করেছেন। মহানবি (সা.) সাহাবিদেরকে ইজমা করার পদ্ধতি শিখিয়েছেন। কুরআন ও হাদিসের বহুসংখ্যক বাণীর মাধ্যমে ইজমার বৈধতা ও স্বীকৃতি প্রমাণিত। ইসলামি সমাজের পারস্পরিক অভিন্নতা ও ঐকমত্যের বহিঃপ্রকাশ হলো ইজমা।

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে যা যা শিখব

- আল-ইজমা-এর পরিচয়, প্রকারভেদ, উৎপত্তি, ইজমার পদ্ধতি, রুকন, ইজমাকারীদের যোগ্যতা, ইজমার শর্ত ও হুকুম
- আল-ইজমা-এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা এবং বাস্তব জীবনে তা প্রয়োগ

পাঠ পরিকল্পনা	
পাঠ ১	ইজমার উৎপত্তির ইতিহাস
পাঠ ২	ইজমার পরিচয়
পাঠ ৩	ইজমার প্রকারভেদ
পাঠ ৪ ও ৫	ইজমার পদ্ধতি ও রুকন
পাঠ ৬	ইজমার আহল বা ইজমাকারীদের যোগ্যতা
পাঠ ৭	ইজমার শর্তসমূহ
পাঠ ৮ ও ৯	ইজমার স্তর ও হুকুম
পাঠ ১০	ইজমার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

পাঠ ১

ইজমার উৎপত্তির ইতিহাস
History of the Origin of Ijma

ইসলামি শরিয়তের দুটি প্রধান উৎস হলো কুরআন ও হাদিস। এছাড়াও মানবমুক্তির এ মহান আদর্শের বিধি-বিধান আরো দুটি উৎস থেকে উৎসারিত হয়। এর একটি ইজমা অপরটি কিয়াস। অবশ্য ইজমা ও কিয়াস কোনো নতুন মূলনীতি প্রবর্তন করে না। বরং কুরআন ও হাদিসে আল্লাহ তাআলা ও রাসুলুল্লাহ (সা.) যেসব মূলনীতি পেশ করেছেন তার আলোকে বিভিন্ন নতুন নতুন সমস্যার সমাধান ইজমা ও কিয়াসের মাধ্যমে পাওয়া যায়। মূলত শরিয়তের কোনো সিদ্ধান্তের ব্যাপারে মুজতাহিদগণের ঐক্যমত্য পোষণকে ইজমা বলা হয়। ইজমার সমাধানগুলো সর্বসম্মত। অন্যদিকে কিয়াসে কেবল সংশ্লিষ্ট গবেষকের নিজস্ব অভিমত প্রাধান্য পায়। তবে উভয় ক্ষেত্রেই কোনো গবেষক কুরআন ও হাদিসের নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করেন না।

ইসলামি শরিয়ার উৎস হিসেবে ইজমা নবোদ্ভাবিত কোনো বিষয় নয়। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তেকালের পরে এ পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়নি। এমনকি নিজের খেয়ালখুশিমতো রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজেও এ পদ্ধতি প্রবর্তন করেননি। ইজমার প্রবর্তক স্বয়ং আল্লাহ তাআলা। তাঁর মূলনীতি ও নির্দেশনার ভিত্তিতেই রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর যুগেই ইজমা উৎপত্তি লাভ করে। তবে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সময়কালে ইজমা ব্যাবহারিক দিক দিয়ে তেমন গুরুত্বপূর্ণ হতে পারেনি। কেননা এসময় কুরআন নাজিল হতো এবং যেকোনো সমস্যা সমাধানের জন্য রাসুলুল্লাহ (সা.) বর্তমান ছিলেন। কুরআনের বাণী এবং তাঁর নির্দেশ নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়ার মানসিকতা সাহাবিদের ছিল। তবে তা সত্ত্বেও রাসুলুল্লাহ (সা.) বিভিন্ন ইস্যুতে সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করতেন এবং তাঁদের মতামতের আলোকে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিতেন। যেমন— রাসুলুল্লাহ (সা.) আজানের প্রচলনে হযরত উমর (রা.)-এর পরামর্শ, খন্দকের যুদ্ধে পরিখা খননের জন্য হযরত সালমান ফারসি (রা.) এর পরামর্শ গ্রহণ করেন। আরো অনেক ক্ষেত্রে তিনি সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করেন। আর এভাবেই তিনি ইজমার বৈধতা, পদ্ধতি ও আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কেননা তাঁর প্রতি মহান আল্লাহর নির্দেশ ছিল— وَشَاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ **অর্থ:** কাজে-কর্মে তাদের সাথে তুমি পরামর্শ করো (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৫৯)।

সুতরাং আল্লাহ তাআলার নির্দেশ অনুযায়ী পরামর্শ করে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নেওয়া মুমিনদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য। ইজমার বিধান তাদের মধ্যে এ বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা কুরআনের অন্যত্র বলেন— وَأَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ **অর্থ:** আর তারা বিভিন্ন বিষয়ে পরস্পর পরামর্শ করে (সূরা আশ-শুরা, আয়াত: ৩৮)।

ইজমার প্রয়োগ শুরু হয় খুলাফায়ে রাশিদিনের যুগে। মহানবি (সা.)-এর ইন্তেকালের পর অসংখ্য জাতীয় ইস্যুতে মুমিনগণ সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়ে ইজমার বাস্তব দৃষ্টান্ত পেশ করেন। ইজমার চাক্ষুস উদাহরণ হচ্ছে— হযরত আবু বকর (রা.)-এর খলিফা নির্বাচিত হওয়া, তাঁর শাসনামলে কুরআন সংকলিত হওয়া, হযরত উমর (রা.)-এর শাসনামলে তারাবিহ সালাত জামায়াতে পড়ার বিধান প্রবর্তন বা হযরত উসমান (রা.)-এর সময়কালে অশুদ্ধ কুরআনের পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে ফেলা প্রভৃতি বিষয়ের সিদ্ধান্ত সাহাবিদের ইজমার ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়।

পরবর্তীকালে রাসুলুল্লাহ (সা.) ও খুলাফায়ে রাশিদিনের সময়কালীন দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে প্রয়োজনীয় বিষয়ে অসংখ্য ইজমা সংঘটিত হয়। এ ক্ষেত্রে মুজতাহিদগণ (কুরআন ও সুন্নাহ থেকে মাসয়ালা উদ্ভাবনকারী গবেষক দল) মুখ্য ভূমিকা পালন করেন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ইজমা কী? *[সকল বোর্ড ২০২৩; রা. বো., দি. বো., কু. বো., সি. বো. ২০১৭]*
২. ইসলামি শরিয়তের প্রধান দুটি উৎসের নাম লেখো।
৩. ইজমা ও কিয়াস কী প্রবর্তন করে না?
৪. ইজমার সমাধানগুলোর ধরন কী রূপ?
৫. ইজমার প্রবর্তক কে?
৬. ইজমার প্রয়োগ শুরু হয় কোন যুগে?

উত্তরের জন্য দেখো ২০৫ পৃষ্ঠা।

খ. একক কাজ

শিক্ষার্থীরা ইজমার উৎপত্তি সম্পর্কে ১০টি বাক্য লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ২ ইজমার পরিচয়
Introduction to Ijma

ইজমার আভিধানিক অর্থ

اِجْمَاعٌ (ইজমা) শব্দটি মাসদার বা ক্রিয়ামূল। এটি جَمْعٌ (জামউন) শব্দমূল থেকে নির্গত। এর অর্থ— ঐক্যবন্ধ হওয়া, ঐকমত্য পোষণ করা বা একমত হওয়া। শব্দতত্ত্ববিদ ও মুজতাহিদগণ এর বিভিন্ন আভিধানিক অর্থ উল্লেখ করেছেন। যেমন—

১. নূরুল আনওয়ার গ্রন্থকার বলেন— ইজমা অর্থ হলো اِتِّفَاقٌ (ইত্তিফাক) বা একমত হওয়া।

২. আল্লামা ফখরুল ইসলাম বায়দাভির মতে, ইজমা অর্থ اَلْعَزْمُ (আল আযমু) বা দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেওয়া।

৩. 'আল-কামুসুল ফিকহ' গ্রন্থে আছে, এর অর্থ اَلْاِحْكَامُ (ইহকাম) বা মজবুত করা।

৪. ইবনে মানযুর লিখেছেন, ইজমা অর্থ কোনো বিষয়ের ওপর একমত হওয়া।

৫. Dictionary of Islam-এ ইজমার অর্থ করা হয়েছে, Collecting বা Collection, Assembling বা Gathering, together তথা সংগ্রহ, সংযোজন, সম্পাদনা প্রভৃতি।

ইজমার পারিভাষিক সংজ্ঞা

শরিয়তের পরিভাষায়, ধর্মীয় বা পার্থিব যেকোনো বিষয়ে মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর যুগপরবর্তী যেকোনো সময়ে যোগ্যতাসম্পন্ন মুসলিম মুজতাহিদদের কুরআন-সুন্নাহ সমর্থিত এবং সর্বসম্মত ঐকমত্যের নাম হলো ইজমা।

১. ইসলামি বিশ্বকোষে আছে, 'মহান আল্লাহর আরোপিত কোনো হুকুম সম্পর্কে উম্মতের সর্বসম্মত ঐকমত্য হলো ইজমা' (৫ম খন্ড, পৃ- ৩৬৩)।

২. ফিকহশাস্ত্রের প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞ ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন— هُوَ اِتِّفَاقُ رَاْيِ الْمُجْتَهِدِيْنَ مِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ عَصْرٍ مَّا عَلٰى حُكْمٍ شَرْعِيٍّ. অর্থ: শরিয়তের কোনো হুকুম বা বিধানের ব্যাপারে একই যুগের উম্মতে মুহাম্মাদির মুজতাহিদগণের একমত হওয়াকে ইজমা বলে।

৩. মুসলিম বিশ্বের অন্যতম শিক্ষাবিদ ও দার্শনিক ইমাম গাজ্জালি (রহ.)-এর মতে— ধর্মীয় প্রশ্নসমূহে হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর উম্মতের ঐকমত্য হলো ইজমা।

৪. আল্লামা ফখরুল ইসলাম বায়দাভি বলেন— ইজমা হলো উম্মতের কোনো এক যুগের সব মুজতাহিদের যেকোনো বিষয়ের ওপর একমত হওয়া।

৫. নূরুল আনওয়ার গ্রন্থকার আল্লামা মোল্লাজিউন বলেন— هُوَ اِتِّفَاقُ مُجْتَهِدِيْنَ صَالِحِيْنَ مِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ عَصْرٍ وَاحِدٍ عَلٰى اَمْرٍ قَوْلِيٍّ اَوْ فِعْلِيٍّ. অর্থ: হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর উম্মতের মধ্যে সৎকর্মপরায়ণ মুজতাহিদগণের কথায় কিংবা কাজে কোনো বিষয়ে একই যুগে ঐকমত্য পোষণ করাকে ইজমা বলে।

ওপরের পারিভাষিক সংজ্ঞাগুলোর আলোকে আমরা বলতে পারি যে, শরিয়তের কোনো বিষয়ে একই যুগের মুজতাহিদদের একমত হওয়াকে ইজমা বলা হয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. اِجْمَاعٌ (ইজমা) শব্দটি কোন শব্দমূল থেকে নির্গত?
২. 'ইজমা অর্থ কোনো বিষয়ের ওপর একমত হওয়া'।— এটি কার অভিমত?
৩. মহান আল্লাহর আরোপিত কোনো হুকুম সম্পর্কে উম্মতের সর্বসম্মত ঐকমত্যকে কী বলে?
৪. "ধর্মীয় প্রশ্নসমূহে হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর উম্মতের ঐকমত্য হলো ইজমা।"— এটি কার অভিমত?

উত্তরের জন্য দেখো ২০৫ পৃষ্ঠা।

পাঠ ৩ ইজমার প্রকারভেদ
Types of Ijma

ইজমা সংঘটনের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং ইজমার প্রকৃতি বিবেচনায় ইজমাকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন— ইজমার আহল (অধিকারী) বিবেচনায় ইজমা প্রধানত দু'প্রকার।

১. **إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ (ইজমাউস সাহাবি) বা সাহাবিদের ইজমা:** রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায় বা তাঁর ইন্তেকালের পরে কোনো বিষয়ে সব সাহাবি (রা.)-এর একমত হওয়ার ফলে যে ইজমা সম্পন্ন হয় তাকে সাহাবিদের ইজমা বলা হয়। অবশ্য সাহাবিদের কেউ কেউ যদি ঐকমত্য পোষণ করেন আর অবশিষ্টরা যদি মৌনতা অবলম্বন করেন তাহলেও ইজমা সম্পন্ন হবে। এ ইজমাও 'ইজমাউস সাহাবি'-এর আওতাভুক্ত হবে।

২. **إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ (ইজমাউল উম্মাহ) বা উম্মাহর ইজমা:** সাহাবি (রা.)-এর যুগ শেষ হওয়ার পর পরবর্তী যেকোনো যুগের মুসলিম মুজতাহিদগণ যদি কোনো বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন তাহলে তাকে 'ইজমাউল উম্মাহ' বলা হয়। বর্তমান যুগের ইজমাও এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

আবার, ইজমার প্রকৃতি বিবেচনায় উল্লিখিত দু'ধরনের ইজমার প্রতিটিকে আবার তিনভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—

ক. **اَلْإِجْمَاعُ الْقَوْلِيُّ (আল-ইজমাউল কাওলি) বা বিবৃতিমূলক ইজমা:** যে ইজমায় সমকালীন সব সাহাবি (রা.) বা মুজতাহিদ সুস্পষ্ট বক্তব্যের মাধ্যমে তাঁদের একমত হওয়ার ঘোষণা দেন তাকে 'আল-ইজমাউল কাওলি' বা বিবৃতিমূলক ইজমা বলা হয়। যেমন— মুজতাহিদগণ বলবেন, أَجْمَعْنَا عَلَى هٰذَا বা আমরা এর ওপর একমত হলাম। এ ইজমার উদাহরণ হলো— হযরত আবু বকর (রা.)-এর খলিফা নির্বাচিত হওয়া।

খ. **اَلْإِجْمَاعُ الْفِعْلِيُّ (আল-ইজমাউল ফি'লি) বা কর্মমূলক ইজমা:** যে ইজমায় সমকালীন সব মুজতাহিদ একযোগে কোনো কাজ শুরু করার মাধ্যমে তাঁদের ঐকমত্য প্রকাশ করেন তাকে 'আল-ইজমাউল ফি'লি' বা কর্মমূলক ইজমা বলে। এ ইজমার উদাহরণ হলো— জমি বর্গা দেওয়া, যৌথ ব্যবসা বা শেয়ার ব্যবসায় সম্পর্কিত মাসয়ালা।

গ. **اَلْإِجْمَاعُ التَّقْرِيرِيُّ (আল-ইজমাউত তাকরিরি) বা মৌন সম্মতিমূলক ইজমা:** যে ইজমায় সমকালীন একদল মুজতাহিদ তাঁদের কথা বা কাজের মাধ্যমে নিজেদের একমত হওয়ার ঘোষণা দেন আর অবশিষ্টরা সে বিষয়ে কোনো বক্তব্য পেশের ক্ষেত্রে মৌনতা অবলম্বন করেন তাকে 'আল-ইজমাউত তাকরিরি' বা মৌন সম্মতিমূলক ইজমা বলে। এ জাতীয় ইজমার অপর নাম 'ইজমায়ে সুকুতি'। এ ইজমার উদাহরণ হলো— হযরত আবু বকর (রা.) কর্তৃক জাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আহল বিবেচনায় ইজমা প্রধানত কয় প্রকার?
২. হযরত আবু বকর (রা.)-এর খলিফা নির্বাচিত হওয়া কোন ধরনের ইজমার উদাহরণ?
৩. ইজমা সংগঠনে সাহাবিদের কেউ কেউ যদি ঐকমত্য পোষণ করেন আর অবশিষ্টরা যদি মৌনতা অবলম্বন করেন তাহলে কী ঘটবে?
৪. বর্তমান যুগের ইজমা কোন শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত?
৫. প্রকৃতি বিবেচনায় ইজমাকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?
৬. 'আল ইজমাউত তাকরিরি' বা মৌন সম্মতিমূলক ইজমার অপর নাম কী?

উত্তরের জন্য দেখো ২০৫ পৃষ্ঠা।

খ. একক কাজ

শিক্ষার্থীরা ইজমার প্রকারভেদগুলো খাতায় লিখে শ্রেণিশিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৪ ও ৫ ইজমার পদ্ধতি ও রুকন
Ways and Rukons of Ijma

ইজমার পদ্ধতি

ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী তিনটি পদ্ধতিতে ইজমা হতে পারে। যথা—
১. কথনমূলক; ২. কর্মমূলক; ৩. নীরবতামূলক।

১. **কথনমূলক:** একই যুগের সৎকর্মপরায়ণ মুত্তাকি, কুরআন-সুন্নাহর পূর্ণাঙ্গ অনুসারী সব মুজতাহিদ কোনো নতুন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বলবেন, أَجْمَعْنَا عَلَى هٰذَا অর্থাৎ আমরা এ বিষয়ের ওপর একমত হলাম। অথবা কতিপয় মুজতাহিদ প্রস্তাব উপস্থাপন করে তা পর্যালোচনার জন্য অন্য মুজতাহিদগণকে সময় দেবেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মুজতাহিদগণ তাদের সমর্থন ব্যক্ত করবেন। এ পদ্ধতিকে 'কথনমূলক' বা কাওলি পদ্ধতির ইজমা বলা হয়।

২. **কর্মমূলক:** একই যুগের সব ন্যায়পরায়ণ, মুত্তাকি ও কুরআন-সুন্নাহর পূর্ণাঙ্গ অনুসারী মুজতাহিদ কোনো কাজ একযোগে করা শুরু করবেন। অর্থাৎ সব মুজতাহিদ তাদের কর্মের মাধ্যমে ঐকমত্য প্রকাশ করবেন। এ জাতীয় ইজমাকে 'কর্মমূলক' বা ফি'লি পদ্ধতির ইজমা বলা হয়। যৌথ কারবার বা শেয়ার বিজনেসের ব্যাপারে এ পদ্ধতিতে ইজমা হয়েছে।

৩. **নীরবতামূলক:** সৎকর্মশীল, মুত্তাকি ও কুরআন-সুন্নাহর পূর্ণাঙ্গ অনুসারী মুজতাহিদগণের মধ্যে কতিপয় মুজতাহিদ কোনো বিষয়ে কথা বা কাজের মাধ্যমে ইজমা করার পর বাকি মুজতাহিদগণের মতামতের জন্য নির্ধারিত সময় দেবেন। উক্ত সময়ের মধ্যে যদি মুজতাহিদগণ কোনো ধরনের প্রতিবাদ না করে বরং নীরবতা অবলম্বন করেন তাহলে ধরে নিতে হবে যে, বিষয়টির ওপর বাকি মুজতাহিদগণেরও ইজমা হয়েছে। এ জাতীয় পদ্ধতিকে 'নীরবতামূলক' বা সুকুতি পদ্ধতির ইজমা বলা হয়। আর যদি কোনো মুজতাহিদ বিরোধিতা বা প্রতিবাদ করেন তাহলে ইজমা সাব্যস্ত হবে না।

হাম্বলি ও হানাফি মাযহাবের অধিকাংশ ফিকহবিদ উল্লিখিত ইজমাকে নীরবতামূলক إِجْمَاعٌ سُكُوْتِيٌّ বলে অভিহিত করেছেন। মালিকি ও শাফেয়ি মাযহাবের কিছু আলেম, কালামশাস্ত্রের অধিকাংশ এবং হানাফি মাযহাবের কোনো কোনো ফিকহবিদ এ পদ্ধতিকে ইজমাহ হিসেবে স্বীকৃতি দেননি। তাদের মতে এটা শরিয়তের দলিলও সাব্যস্ত হতে পারবে না। উল্লেখ্য ইমাম আবু হানিফা এবং জমহুর ফিকহবিদগণ এ পদ্ধতির ইজমাকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন।

ইজমার রুকন

رُكْنٌ (রুকন) হলো এমন উপাদান যার মাধ্যমে কোনো বস্তু বা বিষয় অস্তিত্ব লাভ করে। ইজমার অস্তিত্ব লাভের জন্যও এরকম দুটি উপাদান রয়েছে। এগুলো হচ্ছে ইজমার রুকন। এর একটি হলো اَلْعَزِيْمَةُ (আযিমত) এবং অপরটি اَلرُّخْصَةُ (রুখসাত)।

ক. **আযিমত:** আযিমত হলো- প্রবল ইচ্ছা, দৃঢ় সংকল্প বা অনমনীয় প্রত্যয়। সব মুজতাহিদের একযোগে এমন কাজ শুরু করা বা এমন কথা বলাকে আযিমত বলে, যা তাদের একমত হওয়ার বিষয়টি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে। যেমন— তারা কোনো বিষয়ে বললেন, 'أَجْمَعْنَا عَلَى هٰذَا' বা আমরা এর ওপর একমত হলাম। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়— হযরত আবু বকর (রা.)-এর খলিফা হিসেবে নির্বাচনের সময়ে সাহাবিরা এ জাতীয় বক্তব্য পেশ করেছিলেন। আবার হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে সবাই জামায়াতে তারাবিহের সালাত বিশ রাকাত আদায়ের মাধ্যমে একযোগে কাজের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

খ. **রুখসাত:** আভিধানিক অর্থ অবকাশ, ঐচ্ছিক বা হালকা। ইসলামি পরিভাষায় রুখসাত হলো, কোনো বিষয়ে কথায় বা কাজে মুজতাহিদদের একটি অংশের একমত হওয়া এবং অবশিষ্টরা সে বিষয়ে মৌনতা অবলম্বন করবেন। এমনকি এ বিষয়ে মতামত প্রকাশের নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত তারা কোনো আপত্তি উত্থাপন করবেন না বা এর বিরুদ্ধে কোনো কাজ করবেন না। অর্থাৎ— বিষয়টি জানার পরে নেতিবাচক কোনো বক্তব্য না দিয়ে বরং চুপ থাকবেন। রুখসাতকে إِجْمَاعٌ سُكُوْتِيٌّ বা মৌনতামূলক ইজমাও বলা হয়।

আযিমতের গ্রহণযোগ্যতা সর্বসম্মত হলেও ইমাম শাফেয়ি (রহ.) রুখসাতকে অগ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেন। কেননা তিনি মনে করেন, চুপ থাকাটা কখনো কখনো ভয়ের জন্যও হতে পারে। কিন্তু হানাফি মাযহাব[১] অনুসারীরা রুখসাতকেও গ্রহণযোগ্য মনে করেন। কেননা, কোনো মুজতাহিদই কেবল ভয়ের জন্য সত্য প্রকাশ থেকে বিরত থাকতে পারেন না। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'সত্য প্রকাশে মৌনতা অবলম্বনকারী ব্যক্তি বোবা শয়তান' (মিশকাত)। সৎকর্মপরায়ণ মুসলিম মুজতাহিদরা তাই ভয়ের জন্য সত্য গোপন রাখবেন না। বরং সম্মতির নিদর্শন হিসেবেই তারা চুপ থাকবেন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী কয়টি পদ্ধতিতে ইজমা হতে পারে?
২. মুজতাহিদগণ যদি বলেন— "আমরা এ বিষয়ের ওপর একমত হলাম" তাহলে কোন ধরনের ইজমা হবে? *[সকল বোর্ড ২০২৫]*
৩. সব মুজতাহিদ তাদের কর্মের মাধ্যমে যে ঐকমত্য প্রকাশ করেন তাকে কোন পদ্ধতির ইজমা বলা হয়?
৪. আযিমত (عَزِيْمَةٌ) কী? *[দি. বো., সি. বো., র. বো. ২০২৫; ঢা. বো., ম. বো., কু. বো., ২০২২; ঢা. বো., দি. বো., সি. বো., য. বো. ২০১৮]*
৫. ইজমার ক্ষেত্রে আযিমত ও রুখসাত কী? *[সকল বোর্ড ২০১৭]*
৬. রুখসাতকে আর কী নামে অভিহিত করা হয়?

উত্তরের জন্য দেখো ২০৫ পৃষ্ঠা।

খ. দলীয় কাজ

শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা দু'টি দলে বিভক্ত হবে। প্রথম দল ইজমা করার পদ্ধতি এবং দ্বিতীয় দল ইজমার রুকন নিয়ে আলোচনা করবে।

গ. বাড়ির কাজ

আজ রজব মাসের শেষ জুমাবার। খতিব সাহেব তার খুতবায় বললেন— এখনও কিছু মুসলমান রমজানে তারাবির সালাত আট রাকাত পড়ে। যারা এ নামাজ বিশ রাকাত পড়ে তাদের পক্ষ থেকে জানতে চাইলে জবাবে আট রাকাত ওয়ালারা বলে, 'মহানবি (সা.) এ নামাজ আট রাকাত পড়েছিলেন।' অথচ তাদের জানা উচিত যে, হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে তারাবির সালাত জামায়াতের সাথে বিশ রাকাত সাহাবিদের একযোগে ঐকমত্য ঘোষণার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিষয়টি এরূপ নয় যে, কিছু সাহাবি ঐকমত্যের ঘোষণা দিয়েছিলেন, আবার কিছু সাহাবি মৌনতা অবলম্বন করেছিলেন।

১. সাহাবিদের একযোগে ঐকমত্য ঘোষণার বক্তব্য দ্বারা ইমাম সাহেব ইজমার কোন রুকনটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন? ব্যাখ্যা করো।
২. ইমাম সাহেবের শেষ বক্তব্যটি 'ইজমায়ে রুখসাত' কে ইঙ্গিত করে কি? মতের পক্ষে যুক্তি দাও।

---

[১] হানাফি মাযহাব- সুন্নি সম্প্রদায়ের মধ্যে সবচেয়ে বড় মাযহাব। এই মতাবলম্বী মানুষেরা ইমাম আবু হানিফার অনুগামী। মূলত আবু হানিফার দুই শিষ্য; আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ আস-সায়বানির অধীনে এই মতবাদ ছড়িয়ে পড়ে।

পাঠ ৬ ইজমার আহল বা ইজমাকারীদের যোগ্যতা
Ahl Al-Ijma or Qualifications of the Performer of Ijma

أَهْلُ الْإِجْمَاعِ বা ইজমার আহল বলতে সেসব লোকদের বোঝায় যাদের ইজমা করার জন্য যোগ্যতা রয়েছে। ইজমাকারীদের ইজমা করার জন্য দুই ধরনের যোগ্যতা বা গুণাবলি থাকতে হবে। যথা– ১. জ্ঞানগত ও ২. চারিত্রিক যোগ্যতা। জ্ঞানের দিক থেকে ইজমাকারীকে কুরআন মাজিদের গভীর জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে, শুধু অনুবাদ ও ব্যাখ্যার যোগ্যতা হলেই হবে না। সুন্নতের প্রায়োগিক জ্ঞান অর্জন করে কাজে পরিণত করার যোগ্যতা প্রয়োজন। এছাড়া রাসুলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবাদের জীবন-চরিত, তাদের ইজমা ও কিয়াসের জ্ঞান অর্জন করা ইজমাকারীর জন্য আবশ্যক। সংশ্লিষ্ট শাখার জ্ঞানহীন ব্যক্তিবর্গের জন্য ইজমা জায়েজ নয়।

আবার চারিত্রিক দিক থেকে ইজমাকারীকে উন্নত চরিত্রের পরিচায়ক, শরিয়তের সব নির্দেশ পালন ও নিষেধ থেকে বিরত থাকতে হবে। শরিয়ত বিরোধী বিভিন্ন কর্মকাণ্ড, অশ্লীলতা, বিদআত থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতে হবে। কেউ যদি ফাসেকিতে লিপ্ত হয় তাহলে তার ইজমা গ্রহণযোগ্য হবে না।

এছাড়াও কোন শ্রেণির লোকদের যোগ্যতা ইজমা করার জন্য যথেষ্ট বা কারা ইজমার আহল সে বিষয়ে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। যথা—

১. হাম্বলি মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম আহমদ ও শায়খ মুহীউদ্দীন আরাবি বলেন— ইজমার আহল হলেন সাহাবিগণ। কেননা, ইসলামের মূলশক্তি তাঁরাই। তাঁদের প্রশংসায় কুরআন মাজিদে এরশাদ হয়েছে— আল্লাহ তাআলা তাঁদের ওপর সন্তুষ্ট, আর তাঁরা সন্তুষ্ট মহান আল্লাহর ওপর (সূরা আল-বাইয়্যিনাহ, আয়াত: ৮)।
২. মালেকি মাযহাব প্রণেতা ইমাম মালিক (রহ.) বলেন— ইজমার আহল হলেন মদিনাবাসীগণ। কেননা রাসুলুল্লাহ (সা.) মদিনাকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন। আর এর অধিবাসীরা তাঁকে ও তাঁর সাহাবিদের আশ্রয় দিয়েছেন।
৩. শিয়া সম্প্রদায়ের মতে, ইজমার আহল হলেন শুধু রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পরিবারের সদস্যরা। কেননা এক হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁদেরকে হেদায়েতের উৎস বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

সব যুগে সাধারণভাবে ইজমার আহল কারা সে প্রসঙ্গে 'আল-মানার' গ্রন্থে লেখা হয়েছে, প্রবৃত্তি বা নিজস্ব খেয়ালখুশির অনুসরণ করেন না এবং পাপাচারে লিপ্ত হন না এমন সৎকর্মপরায়ণ পুণ্যবান মুজতাহিদগণই ইজমার আহল। অবশ্য এসব শর্ত ইজতিহাদি ইজমার ব্যাপার কিন্তু যে ইজমা ইজতিহাদি নয় সে ইজমার আহল সকল মুসলিম।

'ইজাযুল কুরআন' গ্রন্থের লেখক ইমাম আবু বকর বাকিল্লানি অবশ্য এ মতের বিরোধিতা করেছেন। তিনি বলেছেন, সবরকমের ইজমার আহল হবেন সাধারণ মুসলিমগণ। এজন্য মুজতাহিদ হওয়ার শর্তারোপ করা ঠিক হবে না।

অধিকাংশ ইমাম ও উলামা বাকিল্লানির এ অভিমত প্রত্যাখ্যান করেছেন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ইজমাকারীদের ইজমা করার জন্য কয় ধরনের যোগ্যতা বা গুণাবলি থাকতে হবে?
২. 'ইজমার আহল সাহাবিগণ'।— এ অভিমত কাদের?
৩. কার মতে, 'ইজমার আহল হলেন মদিনাবাসীগণ'?
৪. কোন সম্প্রদায়ের মতে, 'ইজমার আহল হলেন শুধু রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পরিবারের সদস্যরা?
৫. ইজমার আহল কারা? *[রা. বো., দি. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০২২]*

উত্তরের জন্য দেখো ২০৫ পৃষ্ঠা।

খ. একক কাজ

শিক্ষার্থীরা ইজমাকারীদের যোগ্যতা সম্পর্কে ১০টি বাক্য লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ৭ ইজমার শর্তসমূহ
Conditions of Ijma

ইজমা সংঘটিত হলে তা ইসলামি শরিয়ার বিধান হিসেবে বিবেচিত হবে। এর ওপর আমল করা প্রতিটি মুমিনের জন্য আবশ্যক। আর তাই যেকোনোভাবে ইজমা সম্পন্ন করা যায় না। এজন্য গ্রহণযোগ্য ও যথাযথ ইজমা সংঘটনের জন্য কতগুলো শর্তপূরণ করতে হয়। এক্ষেত্রে অবশ্য ইমামদের মতবিরোধ রয়েছে। যেমন—

১. **সবার ঐকমত্য:** আল্লামা হাফিযুদ্দীন নাসাফী বলেন— ইজমার শর্ত হলো প্রত্যেকের একমত হওয়া। এ ক্ষেত্রে যেকোনো একজনের মতবিরোধ ইজমা সংঘটনের জন্য ঠিক ততটাই প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে, যতটা করে অধিকাংশের মতবিরোধ। কাজেই একজনও যদি বিরোধিতা করে তাহলে ইজমা সংঘটিত হবে না। কেননা রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِيْ عَلٰى ضَلَالَةٍ **অর্থ:** আমার উম্মত বিভ্রান্তির ওপর একমত হবে না (ইবনে মাযাহ)। এখানে উম্মত বলতে সবাইকে বোঝানো হয়েছে।

২. **ইজতিহাদি বিষয় হওয়া:** ইজমা সংঘটিত হওয়ার অন্যতম শর্ত হলো, যে বিষয়ে ইজমা করা হবে সে বিষয়টি ইজতিহাদি হতে হবে। তাতে গবেষণা করার সুযোগ থাকতে হবে। অর্থাৎ যে বিষয়ে ইজমা হবে সেটি হবে গবেষণালব্ধ বিষয়। কেননা, ইজতিহাদ ছাড়াই যে বিষয় প্রমাণিত সত্য সে বিষয়ে ইজমার প্রয়োজন নেই। যেমন- কুরআনের সত্যতা, সালাতের রাকাত সংখ্যা প্রভৃতি।

৩. **কুরআন-সুন্নাহসম্মত বিষয় হওয়া:** কুরআন মাজিদ ও সুন্নাহর মূলনীতির বিরুদ্ধে যায় এমন কোনো বিষয়ে ইজমা সংঘটিত হবে না। ইজমা সংঘটনের বিষয়টিকে অবশ্যই কুরআন-সুন্নাহসম্মত হতে হবে।

৪. **মুজতাহিদ হওয়া:** যারা ইজমা করবেন তাদের সবার মুজতাহিদ হওয়া ইজমা সংঘটনের শর্ত। কেননা, ইজতিহাদি বিষয়ে মুজতাহিদ ছাড়া সাধারণ মুসলিমের মতামত নিতান্তই মূল্যহীন এবং অপ্রয়োজনীয়।

৫. **মুজতাহিদদের যুগ শেষ হওয়া:** ইমাম শাফেয়ি (রহ.) বলেন— ইজমার শর্ত হলো যেসব মুজতাহিদ ইজমা করেছেন তাদের মৃত্যু হওয়া এবং মৃত্যু পর্যন্ত তাদের সে মতের ওপর বহাল থাকা।
হানাফি মাযহাব ও অন্যান্য মাযহাবের প্রধান ইমামগণ অবশ্য এ শর্তের বিরোধিতা করেছেন।

৬. **পূর্ববর্তীদের মতবিরোধ না থাকা:** যে বিষয়ে ইজমা হবে সেটি মতবিরোধপূর্ণ হবে না। পূর্ববর্তী যুগের মুজতাহিদগণ মতবিরোধ করেননি, কেবল এমন বিষয়ে ইজমা সংঘটিত হবে। অধিকাংশ উলামা ইজমা সংঘটনের জন্য এটিকে শর্ত মনে করেননি। তাই এটি ইজমার শর্ত হিসেবে বিবেচিত হবে না।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ইজতিহাদ শব্দের অর্থ কী? *[ঢা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., ব. বো. ২০১৯]*
২. ইজমা সংঘটিত হলে তা ইসলামি শরিয়ার কী হিসেবে বিবেচিত হবে?
৩. ইজমার ওপর আমল করা প্রতিটি মুমিনের জন্য কী?
৪. গ্রহণযোগ্য ও যথাযথ ইজমা সংঘটনের জন্য কী করতে হয়?
৫. আল্লামা হাফিযুদ্দীন নাসাফীর মতে, ইজমার অন্যতম শর্ত কী?
৬. ইজতিহাদ ছাড়াই যে বিষয় প্রমাণিত সত্য সে বিষয়ে কী প্রয়োজন নেই?

উত্তরের জন্য দেখো ২০৫ পৃষ্ঠা।

পাঠ ৮ ও ৯

ইজমার স্তর ও হুকুম
Stages and Rules of Ijma

ইজমার স্তর

ইজমা সম্পন্ন হওয়ার সময়কাল এবং ইজমা সংঘটনের প্রকৃতি বিবেচনায় ইজমাকে চারটি স্বতন্ত্র স্তরে বিন্যস্ত করা হয়। এগুলোকে مَرَاتِبُ الْإِجْمَاعِ (মারাতিবুল ইজমা) বা ইজমার স্তর বলে। এগুলো হলো—

১. **সব সাহাবি (রা.)-এর ইজমা:** সমসাময়িক সব সাহাবি (রা.) কোনো বিষয়ে তাঁদের বক্তব্য বা কাজের মাধ্যমে একমত হওয়া প্রমাণ করলে ইজমা সম্পন্ন হবে। খলিফা হিসেবে হযরত আবু বকর (রা.)-এর নির্বাচন বা কুরআন সংকলন এ স্তরের ইজমা। ইজমার চারটি স্তরের মধ্যে এ স্তরের ইজমাই সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন।

২. **সাহাবিদের নীরবতামূলক ইজমা:** সমসাময়িক সাহাবিদের মধ্যে কেউ কেউ কোনো বিষয়ে তাঁদের বক্তব্য বা কাজের মাধ্যমে যদি একমত হন আর অন্যরা সে বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করেন তাহলে ইজমা সংঘটিত হবে। এটি দ্বিতীয় স্তরের ইজমা।

৩. **সাহাবিদের মতবিরোধহীন বিষয়ে পরবর্তী যুগের ইজমা:** তৃতীয় স্তরের ইজমা হলো সে ইজমা, যা সাহাবিদের যুগ শেষ হয়ে যাওয়ার পরের কোনো যুগে সংঘটিত হয় এবং এ ইজমা সংঘটিত হয় এমন বিষয়ে যে বিষয়ে সাহাবিদের মধ্যে কোনো মতবিরোধ ছিল না। এমনও হতে পারে যে, বিষয়টি হয়তো সাহাবিদের যুগে অস্তিত্বহীন ছিল। এটি তৃতীয় স্তরের ইজমা।

৪. **সাহাবিদের মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে পরবর্তী যুগের ইজমা:** যে বিষয়ে সাহাবিদের মধ্যে একাধিক মতামত ছিল তাঁদের সে মতামতের যেকোনো একটির ওপর পরবর্তী যুগের মুজতাহিদরা একমত হলেও ইজমা সংঘটিত হবে। এটি ইজমার সর্বশেষ বা চতুর্থ স্তর।

ইজমার হুকুম

সাধারণভাবে ইজমার মাধ্যমে সাব্যস্ত বিধানের ওপর আমল করা ওয়াজিব। ইমামগণ এ বিষয়ে মোটামুটিভাবে মতৈক্যে পৌঁছেছেন। অবশ্য এটা ঠিক যে, ঢালাওভাবে ইজমার কোনো সাধারণ হুকুম সাব্যস্ত করা কঠিন। কেননা, ইজমা হয়েছে বিভিন্ন যুগে এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়ায়। সব যুগের এবং সব লোকের ইজমার মর্যাদা ও হুকুম এক রকম হবে না। যুগ ও ব্যক্তিভেদে ইজমার হুকুমেও পার্থক্য হবে। যেমন—

১. সব সাহাবি (রা.)-এর ইজমার হুকুম: সব শ্রেণির ইজমার মধ্যে এটিই সর্বাধিক শক্তিশালী। এ শ্রেণির ইজমার পদ্ধতি হলো, সব সাহাবি (রা.) কোনো একটি বিষয়ে বলেছেন, أَجْمَعْنَا عَلَى هٰذَا **অর্থ:** এ বিষয়ে আমরা একমত হলাম। যেমন: হযরত আবু বকর (রা.)-এর খলিফা নির্বাচন প্রশ্নে সব সাহাবি (রা.) এর ইজমা হয়েছিল।

এ শ্রেণির ইজমার হুকুম হলো— তা কুরআনের আয়াত এবং সর্বাধিক বিশুদ্ধতম মুতাওয়াতির হাদিসের পর্যায়ভুক্ত। অর্থাৎ এ ধরনের ইজমা অকাট্য দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে। এর দ্বারা নিশ্চয়তামূলক জ্ঞান লাভ হবে এবং এ শ্রেণির ইজমা অস্বীকারকারীকে কাফির বলা যাবে। এ ব্যাপারে সব ইমাম একমত। কারণ সব সাহাবি (রা.) একত্রিত হলে তাতে সন্দেহ পোষণ করার কোনো সুযোগ নেই। কেননা কুরআন মাজিদে সাহাবিদের ব্যাপারে বলা হয়েছে— رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ
অর্থ: মহান আল্লাহ তাঁদের ওপর সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও মহান আল্লাহর ওপর সন্তুষ্ট (সূরা আল-বায়্যিনাহ, আয়াত: ৮)।

আরো বলা হয়েছে— اٰمِنُوْا كَمَا اٰمَنَ النَّاسُ **অর্থ:** তোমরা তদ্রূপ ইমান আনো যেরূপ লোকেরা ইমান এনেছে (সূরা আল-বাকারা, আয়াত, আয়াত: ১৩)। এ আয়াতে 'লোকেরা' বলতে সাহাবিদের বোঝানো হয়েছে।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন— 'নাজাতপ্রাপ্ত হবে তারা যারা আমার এবং সাহাবাদের মত ও পথে থাকবে' (তিরমিযি)।

তিনি আরো বলেন— أَصْحَابِيْ كَالنُّجُوْمِ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ . **অর্থ:** আমার সাহাবিগণ (রা.) হলেন তারকারাজির সদৃশ। অতএব, তোমরা তাদের যে কাউকে অনুসরণ করে হেদায়েত পাবে (মিশকাত)।

সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, সাহাবিরা ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আর এজন্য তাঁদের ইজমা সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য।

২. সাহাবিদের নীরবতামূলক ইজমার হুকুম: এ জাতীয় ইজমার পদ্ধতি হলো– কতিপয় সাহাবি উক্তি করেছেন বা কাজ শুরু করেছেন। বাকিরা নীরবতা অবলম্বন করেছেন। এ জাতীয় ইজমার মাধ্যমে আত্মতৃপ্তিমূলক জ্ঞান অর্জিত হবে। এর অস্বীকারকারীদের কাফির বলা যাবে না।

এ জাতীয় ইজমার গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে হানাফি ও শাফেয়িদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। হানাফিগণের মতে, এ জাতীয় ইজমা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য।

হানাফিদের দলিল: এ জাতীয় ইজমার একটি উদাহরণ হলো– রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাতের পর হযরত আবু বকর (রা.)-এর খিলাফতকালে কতিপয় লোক জাকাত দিতে অস্বীকার করে। আবু বকর (রা.) তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন। তখন কতিপয় সাহাবি মৌখিকভাবে তাতে সমর্থন জানান। আবার কতিপয় সাহাবি চুপ থাকেন।

অতএব, প্রমাণিত হলো এ জাতীয় ইজমা গ্রহণযোগ্য। শাফেয়িগণের মতে, এ জাতীয় ইজমা গ্রহণযোগ্য নয়।

শাফেয়িদের দলিল: নীরবতা পরিবেশগত কারণেও হতে পারে। এর উদাহরণ হচ্ছে– আওল-এর মাসয়ালায় হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) হযরত উমর (রা.)-এর মতের সাথে একমত ছিলেন না। কিন্তু নানা দিক বিবেচনা করে তিনি এ বিষয়ে নীরব ছিলেন।

৩. সাহাবিদের মতবিরোধহীন বিষয়ে পরবর্তী যুগের ইজমার হুকুম: এ জাতীয় ইজমার হুকুমের ব্যাপারে ইমামগণের মতামত হচ্ছে–

- ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম শাফেয়ি (রহ.) বলেন— এ জাতীয় ইজমা সাহাবিদের (রা.) নীরবতামূলক ইজমার মতো। অর্থাৎ এ ইজমা মাশরুহ হাদিসের সমপর্যায়ের এবং আত্মতৃপ্তিমূলক জ্ঞানদাতা। এর অস্বীকারকারীকে কাফির বলা যাবে না, তবে গোমরাহ বলা যায়।
- ইসলামি আইনজ্ঞ ইমাম জাসসাল (রহ.) বলেন— হাদিসে মুতাওয়াতির অস্বীকারকারীকে যেমন কাফির বলা যাবে, তেমনি এ জাতীয় ইজমা অস্বীকারকারীকেও কাফির বলা যাবে।
- ইমাম আবু হানিফার অনুসারী ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ আস-সায়বানি (রহ.)-এর মতে, কুরআন ও হাদিস ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এ জাতীয় ইজমা পরিবর্তন করা বৈধ।

৪. সাহাবিদের (রা.) মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে পরবর্তী যুগের ইজমা: এ ইজমাও গ্রহণযোগ্য হবে। তবে তা অনিশ্চয়তামূলক জ্ঞান দেবে। এ জাতীয় ইজমা 'খবরে ওয়াহিদ' বা সর্বোচ্চ তিনজন ও সর্বনিম্ন একজন রাবির বর্ণিত হাদিসও এর ওপর প্রাধান্য পাবে। খবরে ওয়াহিদ পাওয়া না গেলে এর ওপরই আমল করতে হবে। এ জাতীয় ইজমা অস্বীকারকারীরা কাফির হবে না। এ ধরনের ইজমার উদাহরণ হিসেবে দাস-দাসী ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত মাসয়ালার কথা বলা যায়। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.) দাস-দাসী ক্রয়-বিক্রয়কে অবৈধ বলেছেন, কিন্তু চতুর্থ খলিফা হযরত আলি (রা.) এ মতের সাথে দ্বিমত পোষণ করে দাস-দাসী ক্রয়-বিক্রয়কে বৈধ বলেছেন। পরবর্তী যুগের মুজতাহিদগণ উভয়ের মত পর্যালোচনা করে দাস-দাসী ক্রয়-বিক্রয়কে অবৈধ হিসেবে ঐকমত্যে পৌছেছেন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ইজমা সম্পন্ন হওয়ার সময়কাল এবং ইজমা সংঘটনের প্রকৃতি বিবেচনায় ইজমাকে কয়টি স্বতন্ত্র স্তরে বিন্যস্ত করা হয়?
২. ইজমার চারটি স্তরের মধ্যে কোন ইজমা সর্বাধিক মর্যাদা সম্পন্ন?
৩. সাহাবিদের (রা.) মতবিরোধহীন বিষয়ে পরবর্তী যুগের ইজমা কোন স্তরের?
৪. সাধারণভাবে ইজমার মাধ্যমে সাব্যস্ত বিধানের ওপর আমল করার বিধান কী?
৫. যুগ ও ব্যক্তিভেদে ইজমার হুকুমে কী ঘটে?

উত্তরের জন্য দেখো ২০৫ পৃষ্ঠা।

খ. একক কাজ

শিক্ষার্থীরা ইজমার স্তর সম্পর্কে লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ১০

ইজমার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা
Importance and Necessity of Ijma

ইসলামি শরিয়তে ইজমা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও গতিশীল একটি আইনি উৎস। মুসলিম জীবনদর্শন ও ব্যবস্থাপনায় এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বিভিন্নভাবে বিষয়টি প্রতীয়মান হয়। যেমন—

১. **ইসলামি আইনের তৃতীয় উৎস:** আইনের উৎস হিসেবে শরিয়তে ইজমা তৃতীয় পর্যায়ের দলিল। কুরআন মাজিদ ও সুন্নাহর পরই এর স্থান। আল্লাহ তাআলা এবং রাসুলুল্লাহ (সা.) ইজমার এ অবস্থান, গ্রহণযোগ্যতা, নির্ভরতা ও মর্যাদা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কালামে হাকিমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔

অর্থ: আর যে ব্যক্তি তার কাছে হেদায়েত প্রকাশিত হওয়ার পর রাসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনদের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে সেদিকেই প্রত্যাবর্তন করাব, যেদিকে সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১১৫)।

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে—

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ـ

অর্থ: আর এমনিভাবে আমি তোমাদের করেছি মধ্যমপন্থি জাতি, যেন তোমরা মানুষের ওপর সাক্ষী হতে পার এবং রাসুল হন তোমাদের ওপর সাক্ষী (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৪৩)। وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوا۔

অর্থ: তোমরা মহান আল্লাহর রজ্জুকে (পথ বা দীনকে) সম্মিলিতভাবে আঁকড়ে ধর এবং বিচ্ছিন্ন হয়ো না (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১০৩)। وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔

অর্থ: আর তাদের মতো হয়ো না, যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং নিদর্শনসমূহ আসার পরও বিরোধিতা করতে শুরু করেছে। তাদের জন্য রয়েছে ভয়ঙ্কর শাস্তি (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১০৫)।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, مَا رَاٰهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنٌ

অর্থ: মুসলিমগণ যা ভালো ও সঙ্গত মনে করে, আল্লাহ তাআলার কাছেও তা ভালো এবং সঙ্গত (কিতাবুস সুন্নাহ)। তিনি আরও বলেন— لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِيْ عَلٰى ضَلَالَةٍ

অর্থ: বিভ্রান্তি বা ভুল বিষয়ের ওপর আমার উম্মত একমত হবে না (আহকামুল কুরআন)। অন্যত্র রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, يَدُ اللّٰهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ فَمَنْ شَذَّ شُذَّ فِي النَّارِ

অর্থ: জামায়াত বা দলবদ্ধতার ওপর রয়েছে মহান আল্লাহর রহমতের হাত। কাজেই যে ব্যক্তি দলছুট হয়, দলের বিরোধিতা করে, সে তার ঠিকানা জাহান্নামে নির্দিষ্ট করে নেয় (সুনানে তিরমিযি)।

কুরআন মাজিদ ও হাদিস শরিফের উল্লিখিত ঘোষণাসমূহে মুমিনদের মিলিত মতামতের বিশেষ গুরুত্বের কথা বিবৃত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আয়াতে মুমিনদের জন্য ইজমা করা বা একমত হওয়াকে ফরজ করে দিয়েছেন। আর রাসুলুল্লাহ (সা.) নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, প্রকৃত মুমিনদের ইজমা কখনোই ভুল বিষয়ে হবে না। তাছাড়া কুরআন মাজিদ এবং তাঁর ভাষ্যে মুমিনদের বিরোধিতা করাকে জাহান্নামে নিক্ষেপের কারণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যা থেকে ইজমার গ্রহণযোগ্যতা ও অনিবার্যতা প্রতীয়মান হয়।

২. **নতুন আইন উদ্ভাবন:** মানবজীবন গতিশীল। সেজন্য প্রতিনিয়ত নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়। কুরআন ও হাদিসে নবোদ্ভাবিত এসব সমস্যার সরাসরি সমাধান পাওয়া যায় না বরং কুরআন-হাদিসে রয়েছে মূলনীতি। এখানে যে পরিমাণ সমস্যার সমাধান পেশ করা হয়েছে তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অনেকগুণ বেশি সমস্যার কোনো সরাসরি সমাধান দেওয়া হয়নি। এসব নতুন নতুন সামঞ্জস্যপূর্ণ সমস্যা সমাধান করার ক্ষেত্রে মুমিনদের ইজমা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

৩. **জাতীয় ঐক্য সংরক্ষণ:** মুমিনদের আল্লাহ তাআলা ঐক্যবদ্ধ থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। জাতীয় ঐক্য ক্ষুণ্ন করে বা মুমিনদের মধ্যে বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে– এমন সব কাজকে তিনি হারাম ঘোষণা করেছেন। যেকোনো ইস্যুতে মুমিনদের ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ তাদের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট করে। এক্ষেত্রে ইজমা বা সম্মিলিত সিদ্ধান্ত তাদের ঐক্য ধরে রাখতে অনন্যসাধারণ ভূমিকা রাখতে পারে।

৪. **বিভ্রান্তি থেকে সুরক্ষা:** আপামর মুমিন জনতাকে বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করে ইজমা। সাধারণ মুমিনদের অধিকাংশের জন্য নিজেদের মতানুসারে চলা প্রায়শ সম্ভব হয়ে ওঠে না। জ্ঞানগত সীমাবদ্ধতার জন্য এ কাজ তাদেরকে বিভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতায় নিপতিত হওয়ার আশঙ্কা জাগিয়ে তোলে। ইজমা তাদেরকে এক্ষেত্রে পুরোপুরি সুরক্ষা দান করে। কেননা এতে যোগ্যতম সব মুজতাহিদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত প্রতিফলিত হয়। আর রাসুলুল্লাহ (সা.) তো বলেই দিয়েছেন, 'আমার উম্মত বিভ্রান্তির ওপর একমত হবে না।'

৫. **ইসলামের পূর্ণতার প্রমাণ:** ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। আল্লাহ তাআলা এর পূর্ণতার ঘোষণা দিয়ে বলেছেন,

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا (ط)

অর্থ: আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের ওপর আমার নিয়ামতের পূর্ণতা দিলাম এবং ইসলামকেই তোমাদের দীন হিসেবে মনোনীত করলাম (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত: ৩)। ইজমা ছাড়া ইসলামের এ পূর্ণতার দাবি মিথ্যে হতে বাধ্য। কেননা তাহলে নতুন নতুন সমস্যা সমাধানের সর্বসম্মত কোনো পদ্ধতি থাকবে না। ফলে মুমিনরা বিভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতায় নিপতিত হবে।

বস্তুত অবস্থানগত দিক থেকে তৃতীয় পর্যায়ের দলিল হলেও প্রয়োগগত বাস্তব দিক বিবেচনা করলে ইজমাকেই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উৎস মনে হয়। কেননা কুরআন ও হাদিসের যথাযথ বাস্তবায়ন ইজমার ওপরই বহুলাংশে নির্ভর করে। 'Encyclopedia of Islam' গ্রন্থে এ জন্যই বলা হয়েছে, 'Ijma-the third and in practice, the most important of the basis of Islamic religious law, according to the classic theory.'

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ইসলামি শরিয়তের ইজমা কেমন আইনি উৎস?
২. ইসলামি শরিয়তে আইনের উৎস হিসেবে ইজমা কোন পর্যায়ের দলিল?
৩. রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর উম্মত কোন বিষয়ের ওপর একমত হবে না?
৪. কুরআন ও হাদিসে নবোদ্ভাবিত সমস্যার কী পাওয়া যায় না?
৫. মুমিনদের ঐক্যবদ্ধ থাকার নির্দেশ দিয়েছেন কে?
৬. কোন বিষয় আপামর মুমিন জনতাকে বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করে?

উত্তরের জন্য দেখো ২০৫ পৃষ্ঠা।

খ. একক কাজ

শিক্ষার্থীরা ইজমার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কুরআন হাদিসের উদ্ধৃতিসহ একটি সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ মূল্যায়নের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর

পাঠ-১: ১. শরিয়তের কোনো সিদ্ধান্তের ব্যাপারে মুজতাহিদগণের ঐকমত্য পোষণ; ২. আল-কুরআন ও আল-হাদিস; ৩. কোনো নতুন মূলনীতি; ৪. সর্বসম্মত; ৫. স্বয়ং মহান আল্লাহ; ৬. খুলাফায়ে রাশেদিনের যুগে।

পাঠ-২: ১. جَمْعٌ (জামউন) শব্দমূল থেকে নির্গত; ২. ইবনে মানযুর-এর; ৩. ইজমা; ৪. ইমাম গাজ্জালি (রহ.)-এর।

পাঠ-৩: ১. দুই প্রকার; ২. আল-ইজমাউল কাওলি; ৩. ইজমা সম্পন্ন হবে; ৪. ইজমাউল উম্মাহ শ্রেণির; ৫. তিন ভাগে; ৬. ইজমায়ে সুকুতি।

পাঠ-৪ ও ৫: ১. তিনটি; ২. কথনমূলক; ৩. ইজমাউল ফি'লি বা কর্মমূলক ইজমা; ৪. কোনো বক্তব্যমূলক বিষয়ে সব মুজতাহিদের এমন কাজ বা কথা বলা, যাতে তাদের সবার একমত হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হয়; ৫. রুকন; ৬. ইজমাউস সুকুতি বা মৌনতামূলক ইজমা।

পাঠ-৬: ১. দুই ধরনের; ২. ইমাম আহমদ ও শায়খ মুহীউদ্দিন আরাবির; ৩. ইমাম মালিক (রহ.)-এর; ৪. শিয়া সম্প্রদায়; সৎকর্মপরায়ণ পূণ্যবান মুজতাহিদগণ।

পাঠ-৭: ১. গবেষণা; ২. বিধান; ৩. আবশ্যক; ৪. কতগুলো শর্ত পূরণ; ৫. প্রত্যেকের একমত হওয়া; ৬. ইজমা।

পাঠ-৮ ও ৯: ১. চারটি; ২. সব সাহাবি (রা.)-এর ইজমা; ৩. তৃতীয় স্তরের; ৪. ওয়াজিব; ৫. পার্থক্য।

পাঠ-১০: ১. অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও গতিশীল; ২. তৃতীয় পর্যায়ের; ৩. বিভ্রান্তি বা ভুল বিষয়ের উপর; ৪. সরাসরি সমাধান; ৫. আল্লাহ তাআলা; ৬. ইজমা।

এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

ইজমা	ইজমা অর্থ ঐক্যবদ্ধ হওয়া, ঐক্যমত্য পোষণ করা বা একমত হওয়া। শরিয়তের পরিভাষায় ধর্মীয় বা পার্থিব যেকোনো বিষয়ে মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর যুগপরবর্তী যেকোনো সময়ে যোগ্যতাসম্পন্ন মুসলিম মুজতাহিদদের কুরআন সুন্নাহ সমর্থিত এবং সর্বসম্মত ঐক্যমত্যের নাম হলো ইজমা।
আযিমত	আযিমত হলো- প্রবল ইচ্ছা, দৃঢ় সংকল্প বা অনমনীয় প্রত্যয়। সব মুজতাহিদের একযোগে এমন কাজ শুরু করা বা এমন কথা বলাকে আযিমত বলে, যা তাদের একমত হওয়ার বিষয়টি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে। যেমন- তারা কোনো বিষয়ে বললেন, আমরা এর ওপর একমত হলাম।
রুখসাত	রুখসাত এর আভিধানিক অর্থ অবকাশ, ঐচ্ছিক বা হালকা। রুখসাত হলো কোনো বিষয়ে কথায় বা কাজে মুজতাহিদদের একটি অংশের একমত হওয়া। অবশিষ্টরা মতামত প্রকাশের নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত তারা কোনো আপত্তি উত্থাপন করবেন না বা এর বিরুদ্ধে কোনো কাজ করবেন না। এ অবস্থাকে মৌনতামূলক ইজমাও বলা হয়।
আহলে ইজমা	ইজমা সম্পাদনের যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের ইজমার আহল বলা হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তেকালের পর সাহাবিরা ছিলেন ইজমার আহল। কেননা রাসুলের (সা.) পর তারাই ছিলেন ইসলামি শরিয়ত সম্পর্কে অভিজ্ঞ, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পছন্দনীয় এবং সমাজে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি। সাহাবিদের যুগের পরে অভিজ্ঞ আলিমগণ ইজমা প্রদান করতে পারবেন। আর এই ধরনের ব্যক্তি বা মানুষদের আহলে ইজমা বা ইজমার আহল বলা হয়।
মুজতাহিদ	মুজতাহিদ শব্দের অর্থ গবেষক। ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে উলামাদের গবেষণাকে ইজতিহাদ বলে। আর ইজতিহাদে সক্ষম ব্যক্তিকে মুজতাহিদ বলা হয়। একজন মুজতাহিদের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য: ১. আল-কুরআনের পূর্ণ জ্ঞান থাকা। ২. সনদ-মতনসহ রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাদিসগুলো জানা।

	৩. আরবি ভাষা সম্পর্কে দক্ষ ও অভিজ্ঞ হওয়া। ৪. অত্যধিক স্মরণশক্তিসম্পন্ন হওয়া। ৫. ইজতিহাদ ও মাসআলা চয়নের প্রক্রিয়াসমূহের উপর পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখা।
মারাতিব	সময়কাল এবং ইজমা সংঘটনের প্রকৃতি বিবেচনায় ইজমার স্বতন্ত্র স্তরবিন্যাসই মারাতিবুল ইজমা। মারাতিবুল ইজমাকে চারটি স্বতন্ত্র স্তরে বিন্যস্ত করা হয়েছে। যেমন- ১. সব সাহাবি (রা.)-এর ইজমা, ২. নীরবতামূলক ইজমা, ৩. সাহাবিদের মতবিরোধহীন বিষয়ে পরবর্তী যুগের ইজমা, ৪. সাহাবিদের মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে পরবর্তী যুগের ইজমা।
মুতাজিলা	হিজরি ২য় শতকের শুরুতে ইসলামি আকিদার ক্ষেত্রে যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানকে কেন্দ্র করে আবির্ভাব হওয়া একটি দলের নাম মুতাজিলা। এরা ওয়াসিল ইবনে আতার অনুসারী। মুতাজিলা নামটি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের দেওয়া। মুতাজিলা শব্দটি এসেছে আরবি 'ইতিজাল' শব্দ থেকে। এর অর্থ পৃথক হওয়া। তারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত থেকে পৃথক যা বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে তাদের মুতাজিলা বলা হয়।

সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

ক. জ্ঞানমূলক

■ **ইজমার পরিচয়**

প্রশ্ন-১. اَلْإِجْمَاعُ (ইজমা) কী? *[রা. বো., দি. বো., কু. বো,. সি. বো. '১৭]*

উত্তর: প্রখ্যাত আলিম ও গবেষকগণের সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে পর্যালোচনার পর শরিয়তের কোনো সিদ্ধান্তের ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করাই ইজমা।

প্রশ্ন-২. ইজমার বৈধতা কীসের দ্বারা স্বীকৃত?

উত্তর: কুরআন ও হাদিস দ্বারা ইজমার বৈধতা স্বীকৃত।

প্রশ্ন-৩. ইজমার উপকারিতা কী?

উত্তর: কুরআন-হাদিসের আলোকে বিভিন্ন নতুন নতুন সমস্যার সমাধান পাওয়া যায়।

প্রশ্ন-৪. ইজমার প্রয়োগ শুরু হয় কখন থেকে?

উত্তর: ইজমার প্রয়োগ শুরু হয় খুলাফায়ে রাশিদিনের যুগ থেকে।

■ **ইজমার প্রকারভেদ**

প্রশ্ন-৫. আহল বিবেচনায় ইজমা কয় প্রকার?

উত্তর: ইজমার আহল (অধিকারী) বিবেচনায় ইজমা দু'প্রকার।

প্রশ্ন-৬. ইজমার আহল অর্থ কী?

উত্তর: ইজমার আহল অর্থ ইজমাকারীদের যোগ্যতা।

প্রশ্ন-৭. ইজমার আহল কারা?

[রা. বো., দি. বো., চ. বো. সি. বো., য. বো., ব. বো. '২২]

উত্তর: প্রবৃত্তি বা নিজস্ব খেয়াল খুশির অনুসরণ করেন না এবং পাপাচারে লিপ্ত হন না, এমন সৎকর্মপরায়ণ, পুণ্যবান মুজতাহিদগণই ইজমার আহল।

প্রশ্ন-৮. ইজমাউল ফিলি কী?

উত্তর: মুজতাহিদগণের একযোগে কাজ শুরু করার মাধ্যমে ঐকমত্য প্রকাশ করাই হলো— ইজমাউল ফিলি।

■ **ইজমার পদ্ধতি ও রুকন**

প্রশ্ন-৯. ইজমার রুকন কী?

উত্তর: যা দ্বারা ইজমা অস্তিত্ব লাভ করে, তা-ই ইজমার রুকন।

প্রশ্ন-১০. ইজমার রুকন কয়টি?

উত্তর: ইজমার রুকন ২টি।

প্রশ্ন-১১. আযিমত (عَزِيْمَةٌ) কী? *[দি. বো., সি. বো., ব. বো. '২৫; ঢা. বো., ম. বো., কু. বো. '২২; ঢা. বো., দি. বো., সি. বো., য. বো. '১৮]*

উত্তর: আযিমত হলো সব মুজতাহিদের কোনো বক্তব্যমূলক বিষয়ে এমন শব্দ ব্যবহার করা, যাতে তাদের সবার একমত হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হয়।

প্রশ্ন-১২. রুখসাতকে কোন ইজমা বলা হয়?

উত্তর: রুখসাতকে মৌনতামূলক ইজমা বলা হয়।

প্রশ্ন-১৩. তারাবিহ সালাত জামায়াতে পড়ার বিধান প্রবর্তিত হয় কখন থেকে?

উত্তর: হযরত উমর (রা.)-এর শাসনকাল থেকে তারাবিহ সালাত জামায়াতে পড়া চালু হয়।

প্রশ্ন-১৪. 'মারাতিবুল ইজমা' কী?

উত্তর: সময়কাল এবং ইজমা সংঘটনের প্রকৃতি বিবেচনায় ইজমার স্বতন্ত্র স্তরবিন্যাসই 'মারাতিবুল ইজমা'।

প্রশ্ন-১৫. ইজমাকারীকে কী হতে হবে?

উত্তর: ইজমাকারীকে অবশ্যই মুজতাহিদ হতে হবে।

প্রশ্ন-১৬. ইজতিহাদ শব্দের অর্থ কী? *[ঢা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., ব. বো. '১৯]*

উত্তর: ইজতিহাদ শব্দের অর্থ- গবেষণা।

■ ইজমার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

প্রশ্ন-১৭. হাদিস অনুযায়ী বোবা শয়তান কে?

উত্তর: হাদিস অনুযায়ী সত্য প্রকাশে মৌনতা অবলম্বনকারী হলো বোবা শয়তান।

প্রশ্ন-১৮. কাদেরকে মধ্যমপন্থি হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে?

উত্তর: উম্মতে মুহাম্মাদিকে মধ্যমপন্থি জাতি হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন-১৯. সংঘটিত ইজমাটি কী বলে বিবেচিত হবে?

উত্তর: সংঘটিত ইজমাটি ইসলামি শরিয়ার বিধান হিসেবে বিবেচিত হবে। আর এর উপর আমল করা ওয়াজিব।

খ. অনুধাবনমূলক

প্রশ্ন-১. শরিয়তের দলিল হিসেবে ইজমার অবস্থান ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: ইসলামি শরিয়তের তৃতীয় উৎস ইজমা।

শরিয়তের কোনো বিষয়ে একই যুগের মুসলিম উম্মতের পুণ্যবান মুজতাহিদদের ঐকমত্য পোষণ করাকে ইজমা বলা হয়। কুরআন-সুন্নাহ দিয়ে সমর্থিত হলে ইজমা দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। দলিল হিসেবে ইজমা গ্রহণ করার ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে— 'আর তাঁদের কাজকর্ম সম্পাদিত হয় পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে।' সুতরাং ইজমা শরিয়তের দলিল।

প্রশ্ন-২. ইজমার উৎপত্তি হয়েছে কীভাবে?

উত্তর: রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সময় হতেই ইজমার ব্যবহার বা প্রচলন লক্ষ করা যায়।

রাসুলুল্লাহ (সা.) স্বয়ং বিভিন্ন বিষয়ে সাহাবিগণের পরামর্শ নিতেন। অতঃপর তাঁদের মতামতের আলোকে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। এভাবেই রাসুলুল্লাহ (সা.) ইজমার বৈধতা, দৃষ্টান্ত ও আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে সাহাবিগণের যুগে-এর পূর্ণাঙ্গ প্রচলন ঘটে।

প্রশ্ন-৩. রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর উম্মতকে ইজমা করার অধিকার দেওয়া হয়েছে কেন?

উত্তর: বিভ্রান্তি এড়িয়ে সঠিক পথে থাকার জন্য রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর উম্মতকে ইজমা করার অধিকার দেওয়া হয়েছে।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন– 'আমার উম্মত বিভ্রান্তির ওপর একমত হবে না।' পৃথিবী পরিবর্তনশীল। এই পৃথিবীতে নতুন নতুন সমস্যা সৃষ্টি হয়। এ সমস্যা নিয়ে যাতে কোনো বিভ্রান্তি না হয়, তাই জ্ঞানসমৃদ্ধ আলেম ও উম্মাহকে ইজমা করার অধিকার দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন-৪. "আমার উম্মত কোনো ভুলের ওপর একতাবদ্ধ হতে পারে না।"— ব্যাখ্যা করো। *[দি. বো., সি. বো., ব. বো. '২৫; রা. বো., দি. বো., চ. বো. সি. বো., য. বো., ব. বো. '২২]*

উত্তর: রাসুলুল্লাহ (সা.) ইজমার গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে বলেছেন, "আমার উম্মত বিভ্রান্তি বা ভুলের ওপর একমত হবে না।" (আহকামুল কুরআন) ইজমা ইসলামি শরিয়তের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও গতিশীল একটি আইনি উৎস। মুসলমানদের জীবনে এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কুরআন ও সুন্নাহর পরই ইজমার স্থান। এটি নবোদ্ভাবিত কোনো বিষয় নয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজের বা তাঁর ইন্তেকালের পরে এ পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়নি; বরং এর প্রবর্তক স্বয়ং আল্লাহ তাআলা। তাঁর মূলনীতি ও নির্দেশনার ভিত্তিতেই রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর যুগেই ইজমা উৎপত্তি লাভ করে। আল্লাহ তাআলা ও রাসুলুল্লাহ (সা.) ইজমার অবস্থান, গ্রহণযোগ্যতা, নির্ভরতা ও মর্যাদা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এ কারণে রাসুলুল্লাহ (সা.) উপরিউক্ত হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

প্রশ্ন-৫. রুখসাতকে ইজমায়ে সুকুতি বলে আখ্যায়িত করা যায় কি? বুঝিয়ে লেখো। *[ঢা. বো., চ. বো., ব. বো. '১৭]*

অথবা, **মৌনতামূলক ইজমা বা ইজমায়ে সুকুতি বলতে কী বোঝ?** *[ঢা. বো., ম. বো., কু. বো. '২২]*

উত্তর: রুখসাত বলতে কোনো বিষয়ে কথায় বা কাজে মুজতাহিদদের একটি অংশের একমত হওয়াকে বোঝায়।

রুখসাত-এর আভিধানিক অর্থ অবকাশ, ঐচ্ছিক বা হালকা। এটি ইজমার একটি রুকন। এর মাধ্যমে কোনো বিষয়ে মুজতাহিদদের একটি অংশ একমত হন এবং বাকিরা সে বিষয়ে মৌনতা অবলম্বন করেন। এমনকি এ বিষয়ে মতামত প্রকাশের নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত তারা কোনো আপত্তি উত্থাপন করেন না। বরং বিষয়টি জানার পর নেতিবাচক বক্তব্য না দিয়ে চুপ থাকেন। একে ইজমায়ে সুকুতি বা মৌনতামূলক ইজমাও বলা হয়।

প্রশ্ন-৬. 'আহলুল ইজমা' বলতে কী বোঝায়? *[রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. '১৮]*

উত্তর: ইজমা সম্পাদনে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের 'আহলুল ইজমা' বলা হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তেকালের পর সাহাবিরা ছিলেন ইজমার আহল। কেননা রাসুলের পর তারাই ছিলেন ইসলামি শরিয়ত সম্পর্কে অভিজ্ঞ, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পছন্দনীয় এবং সমাজে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি। সাহাবিদের যুগের পরে অভিজ্ঞ আলিমগণ ইজমা প্রদান করতে পারবেন। এভাবে শরিয়ত সম্পর্কে অভিজ্ঞ এবং সর্বজন গ্রহণযোগ্য মানুষ, যারা ইজমা প্রদান করলে তা শরিয়তের বিধানে পরিণত হবে সে ধরনের ব্যক্তি বা মানুষদের আহলুল ইজমা বা ইজমার আহল বলা হয়।

প্রশ্ন-৭. ইজমার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: ইজমা হওয়ার জন্য সব মুজতাহিদের প্রত্যক্ষ বা মৌন সমর্থন থাকা আবশ্যক।

যে মুজতাহিদ একান্তভাবে কুরআন ও হাদিসের সঠিক অনুসরণ নিশ্চিত করার জন্য গবেষণা করেন এমন মুজতাহিদ নতুন কোনো সমস্যার সমাধান উদ্ভাবনের জন্য যথাযথ পদ্ধতিতে ইজতিহাদ করবে এবং কুরআন-সুন্নাহের মূলনীতি সমর্থিত সিদ্ধান্ত উদ্ভাবন করবেন। এরপর অন্যান্য মুজতাহিদ এবং আলিমগণের কাছে উদ্ভাবিত সিদ্ধান্তটি পর্যালোচনার জন্য পেশ করবেন। তাহলে নতুন উদ্ভাবিত সিদ্ধান্তের ওপর ইজমা হয়েছে বলে ধরা হবে।

প্রশ্ন-৮. 'কুরআন-সুন্নাহ পরিপন্থি ইজমা গ্রহণযোগ্য নয়'— ব্যাখ্যা করো। *[ঢা. বো., দি. বো., সি. বো., য. বো. '১৮]*

উত্তর: ইজমা হলো- কুরআন ও সুন্নাহ হতে উদ্ভূত আইন।

ইজমা বৈধ হওয়ার শর্ত হলো— ইজমা কুরআন-সুন্নাহর নসের বিরোধী হবে না। ইজমার সিদ্ধান্ত কোনোক্রমেই সাহাবাদের অভিমত বা সিদ্ধান্তের পরিপন্থি হতে পারবে না। ইজমার বিধানের মূলভিত্তি অবশ্যই শরিয়তের দলিলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ইজমার মাধ্যমে কী ধরনের সমস্যা সমাধান করা হবে?
ক. ইসলামের মুখ্য সমস্যা
খ. ইসলামের গৌণ সমস্যা
গ. হাদিসে নির্দেশিত সমস্যা
ঘ. কুরআন নির্দেশিত সমস্যা

২. ইসলামি শরিয়তে ইজমার উৎপত্তি হয়েছে কেন?
ক. কুরআনের ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য
খ. হাদিসের ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য
গ. মতানৈক্য দূর করার জন্য
ঘ. কুরআনের নির্দেশনা মেনে নেওয়ার জন্য

৩. আহ্‌ল বিবেচনায় ইজমা কয় প্রকার?
ক. ২ খ. ৩
গ. ৪ ঘ. ৫

৪. 'আযিমত' শব্দের অর্থ কী?
ক. প্রবল ইচ্ছা খ. আবশ্যিক
গ. মজবুত ঘ. একমত হওয়া

৫. ইজমাকারীকে কোনটি থেকে বিরত থাকতে হবে?
ক. কুরআনের অনুসরণ
খ. হাদিসের অনুসরণ
গ. খেয়াল খুশির অনুসরণ
ঘ. গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্তের অনুসরণ

৬. 'মহান আল্লাহ তাদের ওপর সন্তুষ্ট। আর তারাও সন্তুষ্ট মহান আল্লাহর ওপর।'— কাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে?
ক. সাহাবি খ. তাবিয়ি
গ. তাবে তাবিয়ি ঘ. ফকিহ

৭. হযরত আবু বকর (রা.)-এর খলিফা নির্বাচিত হওয়ার ওপর সাহাবিদের ঐকমত্যের ঘোষণা কোন প্রকারের ইজমা?
ক. কর্মমূলক
খ. বিবৃতিমূলক
গ. নীরবতামূলক
ঘ. সমর্থনমূলক

৮. শামীম নিয়মিত তার জমি-জমাগুলো বর্গা দেয় এবং চুক্তি অনুসারে ফসল পায়। কারণ সে জানে ইজমার মাধ্যমে এটি বৈধ হয়েছে। সে কোন ইজমার ভিত্তিতে জমি বর্গা দেয়?
ক. কর্মমূলক খ. বিবৃতিমূলক
গ. নীরবতামূলক ঘ. মৌনতামূলক

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন

৯. ইজমা ব্যাবহারিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে—
i. রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে
ii. সাহাবিদের যুগে
iii. বর্তমান যুগে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১০. ইজমার মাধ্যমে সমাজে প্রবর্তিত হয়—
i. নতুন মূলনীতি
ii. নতুন সমস্যার সমাধান
iii. আলিমগণের ঐকমত্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১১ ও ১২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
সালামনগর গ্রামবাসী ইজমাভিত্তিক সমস্যা সমাধানের জন্য কিছু আলিমদের সমন্বয়ে একটি সংঘ গড়ে তোলেন। একদিন একটি ইজমাভিত্তিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে গ্রামের সব আলিম একমত ও দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হলো।

১১. সালামনগর গ্রামের আলিমগণের কর্মকাণ্ডের সাথে শরিয়তের কোন সিদ্ধান্তের সাদৃশ্য রয়েছে?
ক. রাসুলের মদিনার সনদ প্রণয়ন সিদ্ধান্তের
খ. হুদায়বিয়ার সন্ধির সিদ্ধান্তের
গ. জামায়াতের সাথে তারাবিহের নামাজের সিদ্ধান্তের
ঘ. জাকাত প্রণয়ন বিষয়ক সিদ্ধান্তের

১২. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনাটি থেকে গ্রামবাসী লাভ করবে—
i. ইজমার ভিত্তিতে শান্তি প্রতিষ্ঠার শিক্ষা
ii. সাহাবিদের সমাজব্যবস্থার শিক্ষা
iii. বর্তমান আলিমদের একক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার শিক্ষা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

খ. বোর্ড পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৩. ইজমা (اَلْإِجْمَاعُ) শব্দের অর্থ কী? *[সকল বোর্ড ২০২৫]*
ক. ঐকমত্য পোষণ করা খ. সংকল্প করা
গ. অনুমতি দেওয়া ঘ. সম্মত হওয়া

১৪. ইজমার মাধ্যমে— *[সকল বোর্ড ২০১৮]*
ক. আইনের কারণ ও হুকুম নির্ধারণ করা যায়
খ. সাদৃশ্যপূর্ণ বিধানের সাথে তুলনা করা যায়
গ. আগত দিনের সমস্যা সমাধান করা যায়
ঘ. মানুষের মাঝে ঐক্য সৃষ্টি করা যায়

১৫. ইজমা-এর রুকন কয়টি? *[সকল বোর্ড ২০২৫; ২০২৩]*
ক. ২টি খ. ৩টি
গ. ৪টি ঘ. ৫টি

১৬. "আমরা সবাই এর উপর একমত"। এটি কোন পর্যায়ের ইজমা? *[সকল বোর্ড ২০২৫]*
ক. আযিমত খ. রুখসাত
গ. ফে'লি ঘ. তাকরিরি

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
এ বছর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় স্যাটেলাইট ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে রমজানের চাঁদ দেখা যায়। সবাই পরের দিন সাওম পালন শুরু করে। *[সকল বোর্ড ২০২২]*

১৭. দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে চাঁদ দেখে সাওম পালনে সবার ঐকমত্যের ফলে—
i. ইসলামের পূর্ণতা পেয়েছে
ii. বিভ্রান্তি থেকে সুরক্ষিত iii. জাতীয় ঐক্য সংরক্ষিত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii, ও iii

১৮. মাইকে নামাজ পড়ার বৈধতা শরিয়তের কোন উৎসের ভিত্তিতে গ্রহণীয় হয়েছে? *[সকল বোর্ড ২০২২]*
ক. কুরআন খ. হাদিস
গ. ইজমা ঘ. কিয়াস

উত্তরমালা

১	খ	২	গ	৩	ক	৪	ক	৫	গ	৬	ক	৭	খ	৮	ক	৯	গ	১০	গ	১১	গ	১২	ক
১৩	ক	১৪	গ	১৫	ক	১৬	ক	১৭	ঘ	১৮	গ												

গ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ইজমা কাকে বলে?
২. ইজমা কয় প্রকার ও কী কী?
৩. ইজমার উৎপত্তি ব্যাখ্যা করো।
৪. আযিমত ও রুখসাত বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো।
৫. ইজমার রুকনগুলো ব্যাখ্যা করো।
৬. ইজমাকারীদের যোগ্যতা সংক্ষেপে লেখো।
৭. ইজমার শর্তাবলি সংক্ষেপে লেখো।
৮. ইজমার স্তর কয়টি ও কী কী? ব্যাখ্যা করো।
৯. ইজমার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করো।

ঘ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. প্রদত্ত ছকের আলোকে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

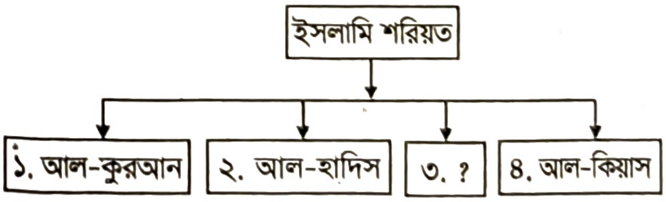

[দি. বো., সি. বো., ব. বো. '২৫; রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. '১৮]

ক. 'আযিমত' কী?
খ. فَاعْتَبِرُوْا يٰۤاُولِي الْاَبْصَارِ আয়াতের মর্মার্থ লেখো।
গ. উদ্দীপকে ৩ নম্বর উৎসটি '?' তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করো।
ঘ. 'উদ্দীপকের ১ নম্বর উৎসটি হাদিস ছাড়া বোঝা অসম্ভব।'— বিশ্লেষণ করো।

২. ইমাম সাহেব বয়ান করলেন, ইসলামি শরিয়তের চারটি উৎস। কোনো বিষয়ের সমস্যার সমাধানে প্রথমে আল-কুরআন, তারপর হাদিসে রাসুল। তাতে পাওয়া না গেলে তৃতীয় উৎসে খুঁজবেন। "কুরআন ও হাদিসের পরেই এর স্থান।" *[ঢা. বো., য. বো., কু. বো. '২২]*

ক. 'আল-হাসাদ' শব্দের অর্থ কী?
খ. মৌনতামূলক ইজমা বা ইজমায়ে সুকুতি বলতে কী বোঝ?
গ. উদ্দীপকে ইমাম সাহেব কোন উৎসের কথা বলেছেন? সেটির উৎপত্তি বর্ণনা করো।
ঘ. "কুরআন ও হাদিসের পরেই এর স্থান।"— উক্তিটির তাৎপর্য আলোচনা করো।

৩. একটি মুসলিম দেশ আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ইসলামি শরিয়াহ অনুযায়ী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করতে চায়। তারা ভাবল কীভাবে সুদমুক্ত লেনদেন ব্যবস্থা চালু করা যায়? এ নিয়ে দেশের কতিপয় ইসলামি স্কলার একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন 'মুদারাবা' ও 'মুশারাকা' নামে দুটি পদ্ধতিতে বিনিয়োগ ব্যবস্থা চালু করা যায়। তাদের এই সিদ্ধান্তকে দেশের বাকি আলেমগণ পত্রিকায় ঘোষণা দিয়ে সমর্থন জানালো।

[ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো. '২৫]

ক. 'হজ' শব্দের অর্থ কী?
খ. 'রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন'— ব্যাখ্যা করো।
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত ইসলামি স্কলারদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি ইসলামি শরিয়তের কোন উৎসের সাথে সাদৃশ্য রাখে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. দেশের অন্যান্য আলেমগণের ঐকমত্যের পদ্ধতিটি কীভাবে এই সিদ্ধান্তকে ইসলামি শরিয়তের একটি আইনে পরিণত করেছে? বিশ্লেষণ করো।

৪.

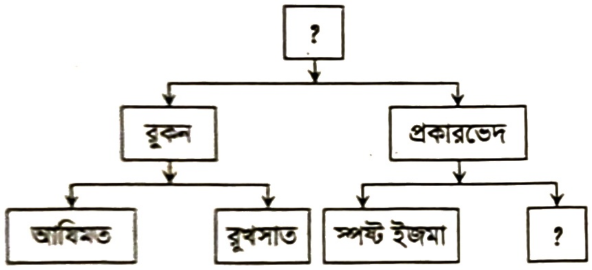

[ঢা. বো., ম. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো. '২৩]

ক. الْفِقْهُ (আল ফিকহ) বলতে কী বোঝায়?
খ. ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ফিকহশাস্ত্রের পথিকৃৎ— ব্যাখ্যা করো।
গ. প্রথম চিত্রের শূন্যস্থানে কোন বিষয়টি প্রতিস্থাপিত হবে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. শেষ চিত্রের শূন্যস্থানে প্রতিস্থাপিত বিষয়টি চিহ্নিত করে এর গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে আলেমদের মতামত ব্যক্ত করো।

৫. মাওলানা নাজমুল হোসাইন এক মিলাদ মাহফিলে বলেন— 'কবিরা গুনাহ জাহান্নামে যাওয়ার কারণ। এমনকি, যারা প্রকাশ্যে কবিরা গুনাহ করে, তারা ইসলামি আদালতে সাক্ষ্যদানের যোগ্যতাও হারায়। এ ব্যাপারে আলেমগণ ঐকমত্য পোষণ করেন। যেমন— হযরত আবু বকর (রা.)-এর খলিফা নির্বাচনে সকল সাহাবিগণ একমত হন।' তখন জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, 'এ ধরনের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য না হওয়ার বিষয়ে কুরআন ও হাদিসে কোনো সুস্পষ্ট বক্তব্য নেই। কুরআন ও হাদিসের বাইরে কোনো আমল করা, মুসলমানদের জন্য আবশ্যক নয়।' *[রা. বো., সি. বো., য. বো. '২৩]*

ক. 'ইজতিহাদ' শব্দের অর্থ কী?
খ. "দুনিয়া আখিরাতের শস্যক্ষেত্র"— ব্যাখ্যা করো।
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত খলিফা নির্বাচন কোন ধরনের ইজমা? তা ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত জনৈক ব্যক্তির বক্তব্য তুমি কি সমর্থন কর? তোমার মতামতের সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করো।

৬. শান্তিনগর গ্রামের যুবকেরা একটি সামাজিক সংঘ প্রতিষ্ঠা করে। সংঘ পরিচালনার জন্য তারা একটি সংবিধানও রচনা করে। কিছুদিন পর তাদের সংঘ পরিচালনায় এমন একটি সমস্যার উদ্ভব হয় যার সমাধানের পদ্ধতি সম্পর্কে তাদের সংবিধানে কোনো নির্দেশনা নেই। নতুন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সভাপতি কার্যকরী পরিষদের সভায় সমস্যাটি সমাধানে যথার্থ পরামর্শ দিতে সক্ষম এমন সদস্যকে আহ্বান করেন। অধিকাংশের পরামর্শ মতে একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে কিছু সংখ্যক সদস্য এব্যাপারে কোনো প্রকার মতামত ব্যক্ত করেনি। এভাবে সমস্যাটির সমাধান সম্পন্ন হয়।

[রা. বো., সি. বো. '১৯]

ক. ইজমার রুকনগুলি কী কী?
খ. 'সাহাবাদের ইজমা অপরিবর্তনীয়'— ব্যাখ্যা কর।
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংঘের সমস্যা সমাধানের পদ্ধতিটি শরিয়তের কোন উৎসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকে কিছু সংখ্যক সদস্য কোনো প্রকার মতামত না দেয়া সত্ত্বেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ সঠিক হয়েছে কিনা? তোমার মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও।

৭. খলিল জুমাবার (শুক্রবার) জুমআর সালাত আদায় করতে মসজিদে যায়। মসজিদের ইমাম সাহেবের বয়ান থেকে সে জানতে পারে যে, রমজান মাসে জামায়াতে তারাবির সালাত আদায় করার বিধান আগে ছিল না। মহানবি (সা.)-এর মৃত্যুর পর হযরত উমর (রা.)-এর যুগে ইজমার মাধ্যমে জামায়াতে তারাবির সালাত আদায়ের সিদ্ধান্ত হয়। এক্ষেত্রে সব সাহাবি (রা.) ঐকমত্যের মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন।

ক. রুকন কী?
খ. জাতীয় ঐক্য সংরক্ষণে ইজমা গুরুত্বপূর্ণ কেন?
গ. ইজমার আহল বিবেচনায় উদ্দীপকে উল্লেখিত ইজমা কোন প্রকারের? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. ইজমার স্তর বিবেচনায় উদ্দীপকে উল্লেখিত ইজমার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো।

ঙ. সমন্বিত অধ্যায়ের সৃজনশীল প্রশ্ন

৮. আব্দুল্লাহ ঢাকার স্বনামধন্য একটি মাদ্রাসা থেকে কামিল পাশ করেন। বর্তমানে তিনি কাপড়ের ব্যবসা করেন। ব্যবসার ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত সৎ। সম্প্রতি তিনি মোবাইল ফোন ব্যবহার করার শরিয়তসম্মত হুকুম কুরআন ও হাদিসে অনুসন্ধান করেন। তিনি এ সংক্রান্ত কোনো বিধান খুঁজে না পেয়ে বিশিষ্ট আলেমগণের ঐকমত্যের ভিত্তিতে এর সমাধানের আহ্বান জানান। *◄ ২য় ও ৩য় অধ্যায়ের সমন্বয়ে*

ক. রুখসাত অর্থ কী?
খ. কারা ইজমা করতে পারবে? বুঝিয়ে লেখো।
গ. আব্দুল্লাহ যে বিধানের আলোকে মোবাইল সংক্রান্ত সমস্যাটির সমাধানের আহ্বান জানিয়েছেন তার গুরুত্ব বর্ণনা করো।
ঘ. আব্দুল্লাহ ব্যবসার ক্ষেত্রে কোন পথ অবলম্বন করেন?

৪

আল-কিয়াস

Al-Qiyas

প্রধান প্রধান শব্দ

- কিয়াস
- আছল
- ফরয়া
- ইল্লত
- হুকুম
- জলি
- খফি

মহান আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে মানুষ অধিকতর বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণী। ইসলামে মানুষকে বুদ্ধিমত্তা খাটিয়ে জীবন পরিচালনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের প্রয়োজনেরও পরিবর্তন ঘটে। দেখা দেয় নতুন নতুন সমস্যা। মহানবি (সা.) ও সাহাবিদের যুগে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে, কুরআন ও হাদিসে তার কল্যাণকর সমাধান দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীকালে যুগ বিবর্তনে আবার অন্যরকম সমস্যা দেখা দিয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, কুরআন ও হাদিসে এসব নতুন সমস্যার সমাধান নেই। কিন্তু এটা ভুল ধারণা। একটু ভালোভাবে খেয়াল করলে দেখা যায় যে, কুরআন ও হাদিসে যেসব সমস্যার সমাধান দেওয়া হয়েছে, পরবর্তীতে উদ্ভূত সমস্যার সাথে বিভিন্নভাবে তার মিল রয়েছে। কিয়াসের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি ও উৎপত্তি হয় মহানবি (স)-এর যুগে। হাদিসে বর্ণিত আছে— নবিজি (সা.) হযরত মুআজ বিন জাবাল (রা.)-কে ইয়েমেনের প্রধান বিচারক নিয়োগ করার প্রাক্কালে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কোনো বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ যদি কুরআন ও হাদিসে না পাও, তখন তুমি কী করবে?' হযরত মুআজ (রা.) উত্তরে বলেছিলেন, 'আমি আমার বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সমাধান করবো।' তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) মুআজ (রা.)-এর প্রশংসা করেছিলেন। বুদ্ধিমত্তা খাটিয়ে কুরআন ও হাদিসে দেওয়া সমাধানের আলোকে নতুন সমস্যার সমাধান করতে বলা হয়েছে। এ পদ্ধতিকেই বলা হয় 'কিয়াস'। অর্থাৎ কুরআন ও হাদিসে যে সমাধান দেওয়া হয়েছে তা হলো সূত্র। একই সূত্র বিভিন্ন স্থানে প্রয়োগ করা যায়। সুতরাং কুরআন-হাদিসের সমাধান নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করার নাম কিয়াস।

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে যা যা শিখব

- আল-কিয়াস এর পরিচয়, রুকন, প্রকারভেদ, শর্ত ও হুকুম
- আল-কিয়াস এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা এবং বাস্তব জীবনে তা প্রয়োগ

পাঠ পরিকল্পনা	
পাঠ ১	কিয়াসের উৎপত্তির ইতিহাস
পাঠ ২	কিয়াসের পরিচয়
পাঠ ৩	কিয়াসের রুকন
পাঠ ৪	কিয়াসের প্রকারভেদ
পাঠ ৫	কিয়াসের শর্তসমূহ
পাঠ ৬ ও ৭	কিয়াসের মূলনীতি ও হুকুম
পাঠ ৮	কিয়াসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা
পাঠ ৯ ও ১০	কিয়াস ইসলামি আইনের উৎস কি না

পাঠ ১ কিয়াসের উৎপত্তির ইতিহাস
Introduction to Ijma

ইসলামি শরিয়তের চতুর্থ উৎস হলো— কিয়াস। মর্যাদাগত দিক থেকে এর অবস্থান ইজমার পরে, কিন্তু প্রয়োগগত বিবেচনায় কিয়াস ইজমার আগে। কেননা সাধারণভাবে কিয়াসলব্ধ বিষয়েই ইজমা সম্পন্ন হয়। গতিশীল ইসলামি আইনের মূল গতিশীলতা হলো কিয়াস। এর মাধ্যমে গবেষকদের গবেষণা কাজে আত্মনিয়োগ করার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। উন্মুক্ত রাখা হয়েছে মুক্তবুদ্ধি চর্চা ও স্বাধীন মত প্রকাশের পথ। ইসলামি আইনের আধুনিকায়ন, প্রগতি এবং এর সর্বকালীন ও সর্বজনীন চরিত্রটি অক্ষুণ্ন রাখার জন্য কিয়াসের কোনো বিকল্প নেই।

ইসলামি আইনের উৎস হিসেবে কিয়াস কোনো নতুন সংযোজন নয়। এটি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তেকাল বা সাহাবিদের যুগ শেষ হওয়ার পর নবোদ্ভাবিত কোনো বিষয় নয়। বরং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর যুগেই কুরআন-হাদিসের পাশাপাশি আইনের উৎস হিসেবে কিয়াসের যাত্রা শুরু হয়। আল্লাহ তাআলা তাঁর সুস্পষ্ট নির্দেশের মাধ্যমে কিয়াসের সূচনা করেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) ও মুসলিম জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য আল্লাহ তাআলা ইহুদিদের শাস্তি দিয়েছিলেন। এ শাস্তি শুধু তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল না। পরবর্তীকালে যে বা যারাই এ কাজে লিপ্ত হবে তাদের জন্যও ঐ একই শাস্তি কার্যকর হবে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদে সে কথা না বলে ঘোষণা দিয়েছেন—

فَاعْتَبِرُوْا يَاُولِى الْاَبْصَارِ **অর্থ:** অতএব, হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিরা, তোমরা শিক্ষাগ্রহণ করো (সূরা আল-হাশর, আয়াত: ২)।

মহান আল্লাহর এ নির্দেশে মুসলিমদের মধ্যে কিয়াসের ধারা শুরু হয়। তারা এক বিধানের সাথে তুলনা করে, এক বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে নতুন বিষয়ে বিধান প্রণয়ন শুরু করেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজেও কিয়াস করতেন। তাঁর সাহাবিদেরও তিনি এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ দিয়েছেন। যেমন—প্রধান বিচারক হিসেবে ইয়েমেনে প্রেরণের আগে রাসুলুল্লাহ (সা.) মুয়াজ বিন জাবাল (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, লোকদের মধ্যে কীভাবে ফয়সালা করবে? উত্তরে তিনি বলেন— প্রথমে মহান আল্লাহর কিতাবের মাধ্যমে। সেখানে না পেলে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহ অনুসারে। সেখানেও যদি না পাই তাহলে আমি কুরআন-সুন্নাহর আলোকে আমার নিজস্ব গবেষণার মাধ্যমে ফয়সালা করব। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর এ জবাবে সন্তুষ্ট হলেন। এজন্য তিনি মহান আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

এভাবেই আইন প্রণয়নের উৎস হিসেবে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর যুগেই কিয়াসের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটে। খুলাফায়ে রাশিদিনের[১] শাসনামলে অসংখ্য সমস্যা সমাধানে কিয়াস প্রয়োগ হতে থাকে। সাহাবিদের যুগ শেষে মুজতাহিদ ইমামগণ কিয়াসের পদ্ধতি ও নীতিমালা গ্রন্থাবদ্ধ করেন। ফলে এক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচার ও অনিয়মের অবসান হয়ে কিয়াস ইসলামি আইনের অন্যতম উৎস হিসেবে আধুনিকতা ও প্রগতির প্রতীক হয়ে ওঠে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কিয়াসের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি ও উৎপত্তি হয় কোন যুগে?
২. মহানবি (সা.) কাকে ইয়েমেনের প্রধান বিচারক নিয়োগ করেন?
৩. ইসলামি শরিয়তের চতুর্থ উৎস কী?
৪. প্রয়োগগত বিবেচনায় কিয়াসের অবস্থান কার আগে?

উত্তরের জন্য দেখো ২২২ পৃষ্ঠা।

খ. একক কাজ

শিক্ষার্থীরা কিয়াসের উৎপত্তির ইতিহাস সম্পর্কে ১০টি বাক্য লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

---

[১] খুলাফায়ে রাশিদিন এর শাব্দিক অর্থ ন্যায়পরায়ণ খলিফা। হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর সহচরদের মধ্যে চারজনকে খুলাফায়ে রাশিদিন বলা হয়। তারা মুহাম্মাদ (সা.)-এর মৃত্যুর পর ইসলামের নেতৃত্ব দেন। এই চারজন খলিফা হলেন: হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত উসমান (রা.) ও হযরত আলি (রা.)।

পাঠ ২

কিয়াসের পরিচয়
Introduction to Qiyas

আভিধানিক অর্থ:

কিয়াস (اَلْقِيَاسُ) শব্দটি একটি মাসদার বা ক্রিয়ামূল। শব্দটি قَيْسٌ (কায়সুন) বা قَوْسٌ (কাওসুন) শব্দমূল থেকে নির্গত। এর অর্থ: পরিমাপ, অনুমান বা তুলনা করা।

১. ইবনে মানযুর বলেন— কিয়াসের শাব্দিক অর্থ হলো— رَدُّ الشَّيْئِ إِلَى نَظِيْرِهِ অর্থ: বস্তুকে তার সমতুল্য বস্তুর দিকে ফেরানো।

২. আল-মানার গ্রন্থকার আল্লামা আবুল বারাকাত আন-নাসাফি (রহ.) বলেন— কিয়াস অর্থ اَلتَّقْدِيْرُ বা পরিমাপ করা।

৩. ড. আব্দুল করিম জায়দান বলেন— কাঠামোগত বা অর্থগত দিক দিয়ে বস্তুর পারস্পরিক তুলনা করাই কিয়াস।

৪. ইসলামি বিশ্বকোষে কিয়াসের অর্থ লেখা হয়েছে, অনুমান করা, মুক্ত করা, শুরু করা।

৫. কারো কারো মতে, দৃষ্টান্ত বা উপমা পেশ করা, অনুধাবন করা প্রভৃতি অর্থও কিয়াসের অন্তর্ভুক্ত। ইংরেজি 'Analogy' কিয়াসের সমার্থক। যার অর্থ, 'Similarity in certain respects between different objects.'

পারিভাষিক সংজ্ঞা:

মূল আইন যে যুক্তি বা ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত সে যুক্তির আলোকে উদ্ভূত নতুন নতুন সমস্যা সমাধানে মহান আল্লাহর নির্দেশিত পদ্ধতিই কিয়াস। ইসলামি চিন্তাবিদগণ কিয়াসের বিভিন্ন পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। যথা-

১. 'আল-মানার' গ্রন্থকার আবুল বারাকাত আন্ নাসাফি বলেন— 'হুকুম এবং হুকুম প্রবর্তনের কারণ ও ভিত্তির মধ্যে শাখা বিধানকে মূল বিধানের সাথে তুলনা করার নাম কিয়াস'।

২. 'তানকিহ' গ্রন্থকার বলেন— 'কিয়াস হলো মূল বিধান থেকে শাখা বিধানের মধ্যে হুকুম স্থানান্তর করা'।

৩. ইমাম মালিক (রহ.) বলেন— মূল আইন থেকে ইল্লত বা আইন প্রবর্তনের কারণ ও যুক্তির মাধ্যমে যুক্তিভিত্তিক নতুন সিদ্ধান্তকে কিয়াস বলে।

৪. ইমাম শাফেয়ি (রহ.) বলেন— একটি পরিচিত বিষয়ের সাথে অন্য একটি পরিচিত বিষয়ের ইল্লতের মাধ্যমে সমন্বয়সাধন করাকে কিয়াস বলে।

৫. ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, কিয়াস হলো আইনের বিস্তৃতি। মূল আইন যখন সমস্যা মোকাবিলায় যথেষ্ট না হয় বা মূল আইনের ভাষা যখন তার উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়, তখন ইল্লতের মাধ্যমে নতুন বিধি আহরণ করতে হয়। এতে আইনের যে বিস্তৃতি ঘটে তাকে কিয়াস বলে।

ওপরে প্রদত্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বলা যায়, কিয়াস হলো ইসলামি আইন প্রবর্তনের একটি পদ্ধতি। মানুষের গতিশীল জীবনে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব ঘটে। এ সমস্যাগুলোর কোনো কোনোটার সরাসরি সমাধান কুরআন-সুন্নাহতে পাওয়া যায় না। মূলত কুরআন-সুন্নাহতে পাওয়া যায় মূলনীতি এবং সাদৃশ্যপূর্ণ কোনো বিধান। সে মূলনীতি বা বিধানের কারণ ও ধরন বিবেচনা করে নতুন উদ্ভূত সমস্যার ইসলামি সমাধান উদ্ভাবনের পদ্ধতিই হচ্ছে কিয়াস। কিয়াস ইসলামি শরিয়তের চতুর্থ উৎস।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কিয়াস কী? *[সকল বোর্ড ২০১৭]*
২. 'কিয়াস' শব্দের অর্থ কী?
৩. ইসলামি বিশ্বকোষে কিয়াসের কী অর্থ লেখা হয়েছে?

উত্তরের জন্য দেখো ২২২ পৃষ্ঠা।

পাঠ ৩ কিয়াসের রুকন
Rukons/Pillars of Qiyas

কিয়াস যে উপাদানগুলোর ভিত্তিতে অস্তিত্ব লাভ করে সেগুলোকে কিয়াসের রুকন বা ভিত্তি বলে। কিয়াসের রুকন চারটি– ১. আছল; ২. ফরয়া; ৩. ইল্লত; ৪. হুকুম। এ চারটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

১. **আছল (اَلْاَصْلُ):** আছল অর্থ মূল। যার ওপর অনুমান করে কিয়াস করা হয় তাকে আছল বা মূল বলা হয়। এর অপর নাম মুকাইয়্যাস আলাইহি (مُقَيَّسٌ عَلَيْهِ)। আছল হলো মূল বিধান; যে বিধানটির সাথে তুলনা করে নতুন বিষয়ের বিধান নির্ণয় করা হয়। আছল কুরআন, হাদিস বা ইজমা দ্বারা নির্মিত হয়। যেমন: মদ কুরআন ও হাদিস দিয়ে হারাম সাব্যস্ত হয়েছে। মদ পান করা হারাম, এটি হলো আছল।

২. **ফরয়া (اَلْفَرْعُ):** ফরয়া অর্থ শাখা। মূলের ওপর অনুমান করে নতুন যে সমস্যাটির সমাধান খোঁজা হয় তাকে ফরয়া বলে। এর অপর নাম মুকাইয়্যাস (مُقَيَّسٌ)। ফরয়া-এর বিধান কুরআন, হাদিস ও ইজমার মধ্যে পাওয়া যায় না। কিয়াসের জন্য ফরয়াকে আছলের সাথে তুলনা করা হয়। যেমন গাঁজা, হেরোইন, কোকেন প্রভৃতি নেশা দ্রব্য সম্পর্কে কুরআন, হাদিস ও ইজমায় বিধান উল্লেখ নেই। এক্ষেত্রে মদের সাথে তুলনা করে এগুলোর বিধান খোঁজা হয়। সুতরাং 'গাঁজা, হেরোইন ও কোকেন' হচ্ছে ফরয়া।

৩. **ইল্লত (اَلْعِلَّةُ):** ইল্লত অর্থ কার্যকারণ, যুক্তি। কিয়াসের ক্ষেত্রে ইল্লত এমন একটি গুণগত দিক, যা আছল ও ফরয়ার মধ্যে সমানভাবে বিদ্যমান এবং সে কারণেই আছলের বিধান ফরয়ার মধ্যে বাস্তবায়িত হয়। মুজতাহিদগণ এ হুকুমটিকে শাখার ওপরে আরোপিত করেন। কেননা এর মধ্যে মূলের যে গুণ থাকা দরকার ঠিক সে গুণটিই বিদ্যমান। আর ইল্লতের গুণটিকে প্রকাশ্য ও সুসংবদ্ধ হতে হবে, যাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এর কারণেই হুকুম আরোপিত হয়েছে। যেমন– মদ, হেরোইন ও গাঁজার মধ্যে নেশা সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। সুতরাং 'নেশা সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য' হচ্ছে ইল্লত।

৪. **হুকুম (اَلْحُكْمُ):** হুকুম অর্থ বিধান। আছল ও ফরয়ার মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য/দোষ/গুণ বিদ্যমান থাকার কারণে মুজতাহিদগণ ফরয়ার ব্যাপারে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন তাকে বলা হয় হুকুম। যেমন– আছল হচ্ছে 'মদ পান করা হারাম'। গাঁজা, হেরোইন ও কোকেনের মধ্যে একই বৈশিষ্ট্য/দোষ বিদ্যমান। ফলে মুজতাহিদগণ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, গাঁজা, হেরোইন ও কোকেন সেবন হারাম। সুতরাং 'হারাম' হচ্ছে হুকুম।

আছল, ফরয়া, ইল্লত ও হুকুম-এর উদাহরণ

কুরআন মাজিদে মদ সম্পর্কে বলা হয়েছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ.

অর্থ: হে ইমানদারগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তি ও ভাগ্যনির্ধারক তীর শয়তানের অপবিত্র কাজ। সুতরাং তোমরা এগুলো থেকে বিরত থাক (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত: ৯০)।

হাদিসে বলা হয়েছে– كُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ **অর্থ:** যাবতীয় মদ হারাম।

এখানে, কুরআন ও হাদিসের স্পষ্ট বাণীর মাধ্যমে নির্ণীত হলো যে, 'মদ পান করা হারাম'।

অন্যদিকে, কুরআন ও হাদিসে গাঁজা, হেরোইন ও কোকেনের বিধান উল্লেখ নেই। কারণ রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায় এগুলো ছিল না বিধায় কুরআন ও হাদিসে এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়নি। পরবর্তীতে এগুলো তৈরি হয়েছে এবং মানুষেরা তা গ্রহণ করে নেশাগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে এগুলো সম্পর্কে বিধান জানা জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এক্ষেত্রে কিয়াসের মাধ্যমে বিধান বের করা হয়েছে। মদের সাথে তুলনা করে বা কিয়াস করে বিধান দেওয়া হয়েছে যে, 'গাঁজা, হেরোইন ও কোকেন হারাম'। কারণ মদ এবং গাঁজা, হেরোইন ও কোকেনের মধ্যে একই বৈশিষ্ট্য/দোষ বিদ্যমান। সুতরাং এ উদাহরণে 'মদ পান করা হারাম' হচ্ছে আছল। 'গাঁজা, হেরোইন ও কোকেন' হচ্ছে ফরয়া। 'নেশা সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য/দোষ' হচ্ছে ইল্লত। আর গাঁজা, হেরোইন ও কোকেনের বিধান 'হারাম' হচ্ছে হুকুম।

মাসয়ালা নির্ণয়ের পদ্ধতির নাম: কিয়াস

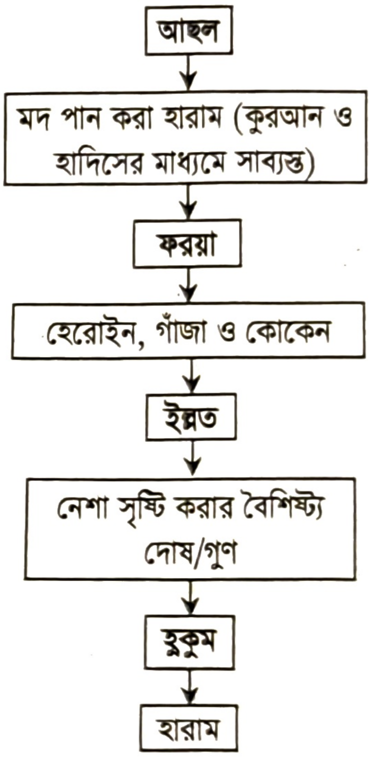

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কিয়াস যে উপাদানগুলোর ভিত্তিতে অস্তিত্ব লাভ করে সেগুলোকে কী বলে?
২. কিয়াসের রুকন কয়টি?
৩. যার ওপর কিয়াস করা হয় তাকে কী বলে? *[সকল বোর্ড ২০১৭]*
৪. আছল কী দ্বারা নির্মিত হয়?
৫. যে জিনিসকে কিয়াস করা হয়, তাকে কী বলে? *[সকল বোর্ড ২০১৭]*
৬. اَلْعِلَّةُ (ইল্লত) শব্দের অর্থ কী?

উত্তরের জন্য দেখো ২২২ পৃষ্ঠা।

খ. একক কাজ

শিক্ষার্থীরা কিয়াসের মাধ্যমে মাসয়ালা নির্ণয়ের পদ্ধতির ছকটি অংকন করে শ্রেণিশিক্ষককে দেখাবে।

গ. দলীয় কাজ

দুটি দলে বিভক্ত হবে। এরপর কিয়াসের চারটি রুকনের মধ্যে যেকোনো একটি করে রুকন নিয়ে শ্রেণিতে আলোচনা করবে। শিক্ষক বর্ণনায় উত্তম দলকে পুরস্কৃত করবেন।

পাঠ ৪ কিয়াসের প্রকারভেদ
Types of Qiyas

কিয়াস প্রধানত দুই প্রকার। যথা—

১. আল-কিয়াসুল জলি (اَلْقِيَاسُ الْجَلِيُّ)

২. আল-কিয়াসুল খফি (اَلْقِيَاسُ الْخَفِيُّ)

১. আল-কিয়াসুল জলি (اَلْقِيَاسُ الْجَلِيُّ): আল-কিয়াসুল জলি (اَلْقِيَاسُ الْجَلِيُّ) অর্থ: প্রকাশ্য কিয়াস।

ইসলামি পরিভাষায়, যে কিয়াস সর্ববাদী ও সর্বসম্মত পদ্ধতি অনুযায়ী সম্পন্ন হয় এবং আছল, ফরয়া ও ইল্লত সবার কাছে বোধগম্য হয় তাকে আল-কিয়াসুল জলি (اَلْقِيَاسُ الْجَلِيُّ) বলা হয়।

হানাফিদের মতে, যে কিয়াসের ইল্লত বা কার্যকারণ সুস্পষ্ট এবং সবার কাছে তা বোধগম্য তাকে আল-কিয়াসুল জলি বলে। যেমন— মদ পান করা হারাম। এর ওপর কিয়াস করে বিধান দেওয়া হয়েছে যে, গাঁজা, হেরোইন ও কোকেন গ্রহণ করা হারাম। অনুরূপভাবে বিড়াল যে পানিতে মুখ লাগিয়েছে তা পবিত্র। এর ওপর কিয়াস করে বিধান দেওয়া হয়েছে যে, খরগোশ যে পানিতে মুখ লাগিয়েছে তাও পবিত্র।

২. আল-কিয়াসুল খফি (اَلْقِيَاسُ الْخَفِيُّ): আল-কিয়াসুল খফি (اَلْقِيَاسُ الْخَفِيُّ) অর্থ: অপ্রকাশ্য কিয়াস। ইসলামি পরিভাষায়, যদি অবস্থা এমন হয় যে, প্রকাশ্য কিয়াস একটি বিষয়কে সমর্থন বা প্রত্যাশা করে কিন্তু হাদিসে তার বিপরীত নির্দেশনা রয়েছে। অথবা এমন হয় যে, প্রকাশ্য কিয়াস একটি বিষয় প্রত্যাশা করে কিন্তু জনসাধারণের কল্যাণে প্রকাশ্য কিয়াসের প্রত্যাশার বিপরীত বিধান দেওয়া হয়, তবে তাকে আল-কিয়াসুল খফি (اَلْقِيَاسُ الْخَفِيُّ) বলা হয়।

এ জাতীয় কিয়াসের অপর নাম ইসতিহসান (اِسْتِحْسَانٌ)। যেমন— বাই সালাম (بَيْعُ سَلَمٍ) জায়েজ হওয়া। বাই সালাম হলো এমন ক্রয়-বিক্রয় যাতে মূল্য আগে পরিশোধ করা হয় এবং পণ্য পরে হস্তান্তর করা হয়। প্রকাশ্য কিয়াস অনুযায়ী বাই সালাম নাজায়েজ হওয়ার কথা। কারণ পণ্য হাজির না থাকার কারণে এ জাতীয় ক্রয়-বিক্রয় নাজায়েজ হওয়া উচিত। হাদিসে বলা হয়েছে—

مَنْ اَسْلَمَ مِنْكُمْ فَلْيُسْلِمْ فِىْ مَكِيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ اِلٰى اَجَلٍ مَعْلُوْمٍ.

অর্থ: তোমাদের কেউ সালাম পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় করতে চাইলে সে যেন নির্দিষ্ট পরিমাণে, নির্দিষ্ট ওজনে এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তা করে।

কিয়াসে খফির আরেকটি উদাহরণ হলো— শক্ত পাত্র নাপাক হলে তা ধুয়ে পাক (পবিত্র) করা। কিয়াসে জলির দাবি হলো, যেহেতু মাটি বা সিলভারের তৈরি শক্ত পাত্র নিংড়ানো যায় না, ভাঁজ করা যায় না সেহেতু তা পাক (পবিত্র) করা বৈধ হবে না। বাস্তবতার দাবি হলো, এভাবে ব্যবহার্য পাত্র যদি নাপাক থেকে যায় তাহলে মানুষেরা ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হবে। তাই কিয়াসে খফি অনুযায়ী কয়েকবার ধুয়ে শক্ত পাত্র ব্যবহারের বিধান দেওয়া হয়েছে।

আবার শাখার কার্যকারণের ধরনের ভিত্তিতে কিয়াস তিন প্রকার। যথা—

১. অধিক শক্তিশালী কিয়াস (اَلْقِيَاسُ الْاَوْلٰى)

২. সমজাতীয় কিয়াস (اَلْقِيَاسُ الْمُسَاوِىْ)

৩. নিম্নবর্তী কিয়াস (اَلْقِيَاسُ الْاَدْنٰى)

১. অধিক শক্তিশালী কিয়াস:

শাখার কার্যকারণ মূলের কার্যকারণের চেয়ে যদি অধিক শক্তিশালী হয়, তবে উক্ত বিধান প্রয়োগের জন্য শাখা অধিকতর অনুকূল বিবেচিত হয়। এ জন্য এটাকে অধিক শক্তিশালী কিয়াস বলা হয়। যেমন— আল্লাহ তাআলা বলেন—

فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ **অর্থ:** তাদের সাথে উহ্ শব্দটিও বলো না (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত: ২৩)।

আয়াতটি দ্বারা পিতামাতার সাথে অসন্তোষ প্রকাশ নিষেধ করা হয়েছে। আর এর কার্যকারণ তাদের কষ্ট প্রদান। এ আয়াতের ওপর কিয়াস করে তাদের প্রহার করাও নিষিদ্ধ। অতএব দেখা যায়, এখানে প্রহার নিষিদ্ধতার কার্যকারণ মূলের চেয়ে বেশি শক্তিশালী।

২. সমজাতীয় কিয়াস:

সমজাতীয় কিয়াস-এর অর্থ মূল ও শাখার কার্যকারণ একজাতীয় হওয়া। যেমন— অন্যায়ভাবে ইয়াতিমের সম্পদ ভক্ষণের প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে আল্লাহ তাআলা বলেন—

اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ۭ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا۔

অর্থ: যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতিমের অর্থ-সম্পদ ভক্ষণ করে, তারা মূলত নিজেদের পেটে আগুনই ভর্তি করেছে এবং অচিরেই তারা অগ্নিতে দগ্ধ হবে (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১০)।

এর বিধানের কার্যকারণ ইয়াতিমের সম্পদ নষ্ট করা। এজন্য ইয়াতিমের সম্পদ আগুনে পুড়িয়ে ফেলারও একই বিধান। কারণ এর মাধ্যমে ইয়াতিমের সম্পদ নষ্ট করার একই কার্যকারণ পাওয়া যায়।

৩. নিম্নবর্তী কিয়াস:

যদি اَصْلٌ বা মূলের কার্যকারণের তুলনায় اَلْفَرْعُ বা শাখার কার্যকারণ দুর্বল হয়, তবে তাকে নিম্নবর্তী কিয়াস বলে।

যেমন— গমের সাথে আপেলের তুলনা। উভয় কার্যকারণ খাদ্য। অতএব আপেল ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধের সময় কম-বেশি করলে তা সুদ হিসেবে বিবেচ্য হবে। যেভাবে গমের মধ্যে হয়ে থাকে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কিয়াস কত প্রকার ও কী কী? *[ঢা. বো., য. বো., দি. বো., সি. বো. ২০১৮]*
২. কিয়াসে জলি অর্থ কী? *[ঢা. বো., সি. বো. ২০১৯]*
৩. যে কিয়াসের ইল্লত বা কার্যকারণ সুস্পষ্ট এবং সবার কাছে তা বোধগম্য তাকে কী বলে?
৪. কিয়াসে খফি অর্থ কী?
৫. কিয়াসে খফির অপর নাম কী?
৬. প্রকাশ্য কিয়াস (কিয়াসে জলি) অনুযায়ী 'বাই সালাম' কী হওয়ার কথা?

উত্তরের জন্য দেখো ২২২ পৃষ্ঠা।

খ. দলীয় কাজ

শিক্ষার্থীরা দুইটি দলে বিভক্ত হবে। একদল কিয়াসে জলি; অন্যদল কিয়াসে খফি উদাহরণসহ আলোচনা করবে। শিক্ষক বিচারকের ভূমিকা পালন করবে।

পাঠ ৫ কিয়াসের শর্তসমূহ
Conditions of Qiyas

কিয়াস সম্পাদনের জন্য ইমামগণ কতগুলো শর্তারোপ করেছেন। এ শর্তগুলো পূরণ না হলে কিয়াস গ্রহণযোগ্য হবে না। কিয়াস ইসলামি আইনের উৎস বিবেচিত হবে যদি এসব শর্ত পূরণ করে কিয়াস সম্পন্ন করা হয়। শর্তগুলো হলো—

১. **আছল নির্দিষ্ট না হওয়া:** আছল বা মূল বিধান যার ওপর কিয়াস করা হবে, সেটি কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা জাতির জন্য নির্দিষ্ট হতে পারবে না। যেমন— শরিয়তের কোনো ঘটনা প্রমাণের জন্য ন্যূনতম দুজন পুরুষের সাক্ষ্য প্রয়োজন। কিন্তু একটি বিশেষ কারণে রাসুলুল্লাহ (সা.) হযরত খুযায়মা (রা.)-এর একক সাক্ষ্যকেই দুজনের স্থলাভিষিক্ত করে দিয়েছেন। সুতরাং এ বিষয়টির ওপর কিয়াস করা যাবে না। কেননা এটি হযরত খুযায়মা (রা.)-এর জন্য নির্দিষ্ট।

২. **আছল কিয়াসবিরোধী না হওয়া:** যে বিষয়ের ওপর কিয়াস করা হবে, সে মূল বিধানটি নিজেই কিয়াসবিরোধী হবে না। কেননা আছল নিজে কিয়াসবিরোধী হলে তার ওপর কিয়াস করা যায় না। যেমন— রোজা অবস্থায় পানাহার করলে রোজা ভেঙে যায়। কিন্তু ভুলক্রমে পানাহার করলে রোজা ভাঙবে না। এটা কিয়াসসম্মত নয়। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বিশেষ নির্দেশে এ বিধান প্রবর্তিত হয়েছে। সেজন্য এর ওপর কিয়াস করা যাবে না।

৩. **আছল ও ফরয়া সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া:** যে আছলের ওপর কিয়াস করা হবে এবং যে ফরয়াকে কিয়াস করা হবে সেই আছল ও ফরয়ার মধ্যে পুরোপুরি মিল থাকতে হবে। আছল ও ফরয়া পুরোপুরি সাদৃশ্যপূর্ণ না হলে কিয়াস বৈধ হবে না।

৪. **ফরয়ার জন্য স্বতন্ত্র নস না থাকা:** যে ফরয়াটির কিয়াস হবে তার জন্য আলাদা কোনো নস বা দলিল থাকতে পারবে না। কেননা ফরয়ার যদি আলাদা দলিল থাকে তাহলে তার কিয়াস করার প্রয়োজন পড়ে না।

৫. **আছল ও ফরয়ার অভিন্ন ইল্লত থাকা:** যে কারণ ও যুক্তির ভিত্তিতে আছল বা মূলবিধান প্রবর্তিত হয়েছে বলে অনুমান করা হয়, ফরয়ার মধ্যে সেই একই কারণ ও যুক্তি বিদ্যমান থাকা কিয়াস সম্পন্ন হওয়ার অনিবার্য শর্ত। ইল্লত অভিন্ন না হলে কিয়াস করা যাবে না।

৬. **আছলের হুকুম স্থানান্তর করা:** ইমাম ফখরুদ্দিন (রহ.) বলেন— কিয়াসের একটি বিশেষ শর্ত হলো আছলের হুকুমটি ফরয়ার ওপর প্রয়োগ করতে হবে। কেননা হুকুম স্থানান্তর ছাড়া কিয়াস করা অর্থহীন হয়ে পড়বে।

৭. **আছলের হুকুমে রদবদল না হওয়া:** আছলের হুকুম ফরয়ার ওপর প্রয়োগের পর ঐ হুকুমটি অপরিবর্তিত থাকতে হবে। আছলের হুকুম রদবদলের সম্ভাবনা থাকলে কিয়াস হবে না। যেমন— তায়াম্মুমের ওপর কিয়াস করে ইমাম শাফেয়ি (রহ.) ওযুতে নিয়তকে শর্ত সাব্যস্ত করেছেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন— ওযুতে নিয়ত শর্ত হিসেবে সাব্যস্ত করা ঠিক নয়।

৮. **আছলটি অন্য কোনো আছলের ফরয়া না হওয়া:** ইমাম ফখরুল ইসলাম (রহ.) বলেন— যে বিষয়ের ওপর কিয়াস করা হবে সেটি কোনো আছলের ফরয়া হতে পারবে না। কেননা একটি ফরয়ার ওপর অন্য ফরয়ার কিয়াস করা বৈধ হবে না।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কিয়াস সম্পাদনের জন্য ইমামগণ কী আরোপ করেছেন?
২. রাসুলুল্লাহ (সা.) কোন সাহাবির (রা.) একক সাক্ষ্যকেই দুজনের স্থলাভিষিক্ত করে দিয়েছিলেন?
৩. আছল ও ফরয়া পুরোপুরি সাদৃশ্যপূর্ণ না হলে কিয়াস কী হবে না?
৪. ফরয়ার যদি আলাদা দলিল থাকে তাহলে তার কী করার প্রয়োজন পড়ে না?
৫. ইল্লত অভিন্ন না হলে কী করা যাবে না?

উত্তরের জন্য দেখো ২২২ পৃষ্ঠা।

খ. একক কাজ

শিক্ষার্থীরা কিয়াসের শর্তে বর্ণিত উদাহরণগুলোকে নির্দিষ্ট শর্তের সাথে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ৬ ও ৭ কিয়াসের মূলনীতি ও হুকুম
Main Features and Rules of Qiyas

কিয়াস করার ক্ষেত্রে ইমামগণ সাধারণত চারটি মূলনীতি অবলম্বন করেন। যেমন—

১. কিয়াস কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমাবিরোধী হবে না।
২. কিয়াসের মাধ্যমে কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা নির্ধারিত মূলনীতিবিরোধী আইন প্রণয়ন করা যাবে না।
৩. কিয়াসের পদ্ধতি ও আইন মানুষের জ্ঞানের পরিসীমার মধ্যে থাকতে হবে।
৪. যেসব বিষয়ে কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার নির্ধারিত সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে সেসব বিষয়ে কিয়াস করা যাবে না।

কিয়াসের হুকুমের ব্যাপারে বিজ্ঞজনদের বক্তব্য নিম্নরূপ:

১. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বক্তব্য হচ্ছে– تَعْدِيَةُ حُكْمِ النَّصِّ إِلَى مَا لَا نَصَّ فِيْهِ . অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদিসের নির্দেশনা পাওয়া না যাবে, সেক্ষেত্রে হুকুম হলো, সে বিষয়ে কুরআন ও হাদিসের যে নির্দেশনা আছে তার সাথে তুলনা করে আমল করা। অর্থাৎ কিয়াস অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব।

২. ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন— إِنَّ الْقِيَاسَ يُفِيْدُ غَلَبَةَ الظَّنِّ وَيُوْجِبُ الْعَمَلَ بِهِ. **অর্থ:** নিশ্চয়ই কিয়াস প্রবল ধারণাপ্রসূত জ্ঞান দান করে এবং এর ওপর আমল করা ওয়াজিব।

তবে কিয়াসের বিপরীতে খবরে ওয়াহিদ পাওয়া গেলে কিয়াসের ওপর আমল করা যাবে না। কিয়াস অস্বীকারকারীকে কাফির বলা যাবে না।

৩. আহলে জাওয়াহির, শিয়া[২], রাফেজি[৩] ও খারিজি[৪] সম্প্রদায়ের মতে, শরিয়তে কিয়াসের কোনো অস্তিত্ব নেই।

তারা তাদের মতের পক্ষে দলিল হিসেবে বলে থাকেন–

মহান আল্লাহ বলেছেন, আমি আপনার ওপর কিতাব নাজিল করেছি, যাতে সব বিষয়ের বিশদ বর্ণনা রয়েছে (সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৮৯)।

যেহেতু কুরআনে সব বিষয়ের সমাধান রয়েছে, সেহেতু কিয়াসের প্রয়োজনীয়তা নেই।

তাদের এ দলিলের জবাবে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত বলে, কিয়াস কুরআনের মর্ম উদঘাটন করে এবং কুরআনের বিধানের বিস্তৃতি ঘটায়। সুতরাং কিয়াস উল্লিখিত আয়াতের পরিপন্থি নয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কিয়াস করার ক্ষেত্রে ইমামগণ সাধারণত কয়টি মূলনীতি অবলম্বন করেন?
২. কিয়াস কী বিরোধী হবে না?
৩. কিয়াসের পদ্ধতি ও আইন কার বা কীসের পরিসীমার মধ্যে থাকতে হবে?
৪. যেসব বিষয়ে কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার নির্ধারিত সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে সেসব বিষয়ে কী করা যাবে না?
৫. কিয়াসের দ্বারা কোন জ্ঞান অর্জিত হবে না?
৬. কোন কোন সম্প্রদায়ের মতে, শরিয়তে কিয়াসের কোনো অস্তিত্ব নেই?

উত্তরের জন্য দেখো ২২২ পৃষ্ঠা।

খ. একক কাজ

কিয়াস করার ক্ষেত্রে ইমামগণ সাধারণত যে চারটি মূলনীতি অবলম্বন করেন শিক্ষার্থীরা তা লিখে শ্রেণিশিক্ষককে দেখাবে।

---

[২] শিয়া: হযরত আলি (রা.)-এর সমর্থক দলকে সাধারণত শিয়া বলা হয়। এটি একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়।

[৩] সুন্নি, ওহাবি ও আহলে হাদিসরা শিয়াদের রাফেজি বলে থাকে।

[৪] 'খারিজি' শব্দটির অর্থ 'দলত্যাগ'। সিফফিনের যুদ্ধে হযরত আলি (রা.)-এর দল পরিত্যাগ করে বারো হাজার মুসলমান বের হয়ে এক নতুন দল গঠন করে, তাদেরকেই সাধারণত খারিজি নামে অভিহিত করা হয়।

পাঠ ৮ কিয়াসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা
Importance and Necessity of Qiyas

ইসলামি শরিয়তে আইনের চতুর্থ উৎস হিসেবে কিয়াস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়। নানা দিক থেকে এ গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

১. **মহান আল্লাহর নির্দেশ:** কুরআন মাজিদে মুসলিম জাতিকে আল্লাহ তাআলা কিয়াস করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, فَاعْتَبِرُوْا يَاۤ اُولِى الْاَبْصَارِ **অর্থ:** অতএব, হে দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন মানুষেরা ! তোমরা চিন্তা-গবেষণা করো (সূরা আল-হাশর, আয়াত: ২)। সেজন্য ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কিয়াস করা জরুরি। মহান আল্লাহর নির্দেশিত বিষয় হিসেবে একে উপেক্ষা করা যায় না।

২. **রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পছন্দনীয় পদ্ধতি:** সহিহ হাদিসে এসেছে রাসুলুল্লাহ (সা.) হযরত মুয়াজ বিন জাবাল (রা.)-কে বিচারক করে ইয়েমেনে প্রেরণ করার আগে তাকে জিজ্ঞেস করেন, কীভাবে তুমি বিচার-ফয়সালা করবে? তিনি বলেন— মহান আল্লাহর কিতাবের মাধ্যমে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, যদি মহান আল্লাহর কিতাবে না পাও? মুয়াজ (রা.) বলেন— মহান আল্লাহর রাসুল (সা.)-এর সুন্নাহের ভিত্তিতে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন— যদি সেখানেও না পাও? মুয়াজ (রা.) বলেন— তাহলে আমি আমার ব্যক্তিগত গবেষণার আলোকে বিচার ফয়সালা করব। তাঁর এ জবাবে রাসুলুল্লাহ (সা.) অত্যন্ত খুশি হন। তিনি ইরশাদ করেন, সব প্রশংসা মহান আল্লাহর যিনি তাঁর রাসুলের প্রতিনিধিকে এমন কথার তৌফিক দিলেন যাতে তাঁর রাসুল (সা.) সন্তুষ্ট হলেন (তিরমিযি, আবু দাউদ)। এই বর্ণনা প্রমাণ করে যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) কিয়াস পদ্ধতিতে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান দানের বিষয়টি অত্যন্ত পছন্দ করতেন। বস্তুত এর বাস্তব প্রয়োজন ও বিপুল গুরুত্ব রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর এ পছন্দ থেকেও অনুমিত হয়।

৩. **কিয়াসের সর্বজনগ্রাহ্যতা:** কিয়াস মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.)-এর নির্দেশিত ও নির্বাচিত বিষয় হওয়ায় রাসুলুল্লাহ (সা.) ও তাঁর পরবর্তী যুগের সব মুজতাহিদ একে আইনি উৎস হিসেবে গ্রহণ করে নিয়ে এর গুরুত্বে বিশেষ মাত্রা যুক্ত করেছেন।

৪. **সমস্যা সমাধানের মাধ্যম:** মানবজীবন অত্যন্ত গতিশীল এবং পরিবর্তনমুখী। প্রতিনিয়ত এখানে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব ঘটে। এসব সমস্যার প্রত্যক্ষ ও সরাসরি সমাধান কুরআন-হাদিসে না থাকা খুবই স্বাভাবিক। সাহাবিদের জীবনধারায়ও এসবের অনুপস্থিতি অসম্ভব নয়। এসব সমস্যার ইসলামি শরিয়তভিত্তিক সমাধান উদ্ভাবনের জন্য কিয়াস বিশেষ জরুরি। কেননা কিয়াস উদ্ভূত এসব সমস্যা সমাধানের ওপরেই মুসলিম উম্মাহ ইজমা সম্পাদন করবে।

৫. **ইসলামের পূর্ণতার প্রমাণ:** সর্বোপরি কিয়াস ছাড়া ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ একটি জীবনব্যবস্থা হিসেবে প্রমাণ করা সম্ভব হয় না। কেননা কিয়াস ছাড়া ইসলাম একটি গতিহীন ও সংকীর্ণ জীবনাদর্শে পরিণত হয়, যার পক্ষে সব দেশের ও সব কালের দাবি মেটানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। কিয়াসই ইসলামকে সর্বকালীন ও সর্বজনীন জীবনাদর্শে পরিণত করে। সব যুগের মানুষের যেকোনো রকমের সমস্যার কুরআন-হাদিসসম্মত সমাধান দেওয়া কেবল কিয়াসের মাধ্যমেই সম্ভব হয়ে ওঠে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কার জবাবে রাসুলুল্লাহ (সা.) অত্যন্ত খুশি হন?
২. নবোদ্ভাবিত সমস্যার শরিয়তভিত্তিক সমাধানের জন্য কী বিশেষ জরুরি?
৩. কিয়াস ইসলামকে কীরূপ জীবনাদর্শে পরিণত করে?

উত্তরের জন্য দেখো ২২২ পৃষ্ঠা।

খ. একক কাজ

শিক্ষার্থীরা কিয়াসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ১০টি বাক্য খাতায় লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৯ ও ১০ কিয়াস ইসলামি আইনের উৎস কি না
Is Qiyas a Source of Islamic Law or Not

কুরআন মাজিদে কিয়াসের স্বীকৃতি রয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজে কিয়াস করার জন্য সাহাবিদের বিশেষ উৎসাহ দিয়েছেন। তাঁর ইন্তেকালের পর সাহাবিগণ কিয়াসের স্বাধীন প্রয়োগের মাধ্যমে একে ইসলামি আইনের চতুর্থ উৎস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তা সত্ত্বেও আহলে জাওয়াহির, শিয়া ও খারিজি সম্প্রদায় কিয়াসকে শরিয়তের উৎস হিসেবে মেনে নেননি। তারা বলেছেন, কিয়াস ইসলামি আইনের উৎস নয়। কেননা আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদে সবকিছুর বর্ণনা সন্নিবেশিত করেছেন। মহান আল্লাহ বলেছেন— مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ. **অর্থ:** এ কিতাবে আমি কোনো কিছু লিপিবদ্ধ করা বাকি রাখিনি (সূরা আল-আনআম, আয়াত: ৩৮)। وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. **অর্থ:** আর আমি আপনার ওপর কিতাব নাজিল করেছি; তা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, সুপথের নির্দেশনা, রহমত এবং মুসলিমদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ (সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৮৯)।

সুতরাং কুরআন মাজিদে সবকিছুর বিবরণ থাকার পর কিয়াসের কোনো প্রয়োজন পড়ে না। কিয়াস বরং মানুষের বিভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতার কারণ হয়ে ওঠে। যেমন— রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, বনি ইসরাইল এক যুগ পর্যন্ত সঠিক পথের ওপর ছিল। এরপর তাদের মধ্যে দাসীদের সন্তানদের আধিক্য হলো। তারা বিগত বিষয়ের ওপর আগত বিষয়াবলিকে কিয়াস করতে শুরু করল। ফলে তারা নিজেরা গোমরাহ হলো এবং অন্যদেরও গোমরাহ করল। তাছাড়া কিয়াসের মূলভিত্তি হলো অনুমান। সেজন্য কিয়াসকে ইসলামি আইনের উৎস বলা যায় না।

সত্যপন্থি মুজতাহিদগণ আহলে জাওয়াহির, শিয়া ও খারিজিদের মতের প্রতিবাদ করেছেন। তাঁরা কিয়াসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে একে ইসলামি আইনের উৎস প্রমাণের প্রয়াস পেয়েছেন। পাশাপাশি তাঁদের আপত্তির জবাবও দিয়েছেন। তারা বলেছেন, কুরআনে সবকিছুর বর্ণনা আছে ঠিকই কিন্তু তা সংক্ষিপ্ত। কিয়াস একে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে। আর বনি ইসরাইলরা কিয়াস করে ধ্বংস হয়েছিল তাদের অন্যায় কিয়াসের কারণে। অন্যদিকে মুসলিম উম্মাহর কিয়াস হয় কুরআন-হাদিসের মূলনীতি অনুসারে। সেজন্য তারা ধ্বংস হবে না বরং সুপথ পাবে।

অবশ্য একথা ঠিক যে, কিয়াস অনুমাননির্ভর। কিন্তু এ অনুমানও স্বেচ্ছাচারী বা কুরআন-সুন্নাহবিরোধী নয় বলে তা কিয়াসি বিধানের ওয়াজিব হওয়া নিষিদ্ধ করে না। মূলত এজন্যই কিয়াসের বিধান অস্বীকারকারীকে কাফির বলা যায় না। এর মাধ্যমে অকাট্য জ্ঞানও অর্জিত হয় না। তাছাড়া এর ওপর খবরে ওয়াহিদ প্রাধান্য পায়।

বস্তুত ইসলামের আধুনিকতা ও প্রগতির প্রমাণ হলো কিয়াস। কুরআন-হাদিসেও এর স্বীকৃতি রয়েছে। বাস্তব জীবনে সাহাবিগণ একে ব্যবহারও করেছেন। সর্বোপরি ব্যাবহারিক দিক বিবেচনায় কিয়াসের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতাও অসীম। সেজন্য কিয়াসকে ইসলামি আইনের চতুর্থ উৎস মেনে নিতে কারো আপত্তি থাকা উচিত নয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কিয়াসের বিষয়ে কুরআন মাজিদে কী রয়েছে?
২. রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজে কিয়াস করার জন্য কাদের উৎসাহ দিয়েছেন?
৩. কিয়াসের মূলভিত্তি কী?
৪. কারা আহলে জাওয়াহির, শিয়া ও খারিজিদের মতের প্রতিবাদ করেছেন?

উত্তরের জন্য দেখো ২২২ পৃষ্ঠা।

খ. একক কাজ

শিক্ষার্থীরা 'শরিয়তের উৎস কিয়াস' এর পক্ষে ২টি প্রমাণ পেশ করবে।

পাঠ মূল্যায়নের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর

পাঠ-১: ১. মহানবি (সা.)-এর যুগে; ২. হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল-(রা.)-কে; ৩. কিয়াস; ৪. ইজমার।

পাঠ-২: ১. নতুন পরিস্থিতিতে কুরআন-হাদিসের আলোকে সমস্যার সমাধান; ২. পরিমাপ, অনুমান বা তুলনা করা; ৩. অনুমান করা, মুক্ত করা, শুরু করা।

পাঠ-৩: ১. রুকন বা ভিত্তি; ২. চারটি; ৩. আছল বা মূল; ৪. কুরআন, হাদিস ও ইজমা দ্বারা; ৫. ফরয়া বা শাখা; ৬. কার্যকরণ, যুক্তি।

পাঠ-৪: ১. দুই প্রকার- (রহ.) কিয়াসে জলি ও (ii) কিয়াসে খফি; ২. প্রকাশ্য কিয়াস; ৩. কিয়াসে জলি; ৪. অপ্রকাশ্য কিয়াস; ৫. ইসতিহসান; ৬. নাজায়েজ।

পাঠ-৫: ১. কতগুলো শর্ত; ২. হযরত খুযায়মা (রা.)-এর; ৩. বৈধ; ৪. কিয়াস; ৫. কিয়াস।

পাঠ-৬ ও ৭: ১. চারটি; ২. কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা; ৩. মানুষের জ্ঞানের; ৪. কিয়াস; ৫. ওয়াজিব; ৬. আহলে জাওয়াহির, শিয়া, রাফিজি ও খারিজি।

পাঠ-৮: ১. হযরত মুয়াজ বিন জাবাল (রা.)-এর; ২. কিয়াস; ৩. সর্বকালীন ও সর্বজনীন।

পাঠ-৯ ও ১০: ১. স্বীকৃতি; ২. সাহাবিদের; ৩. অনুমান; ৪. সত্যপন্থি মুজতাহিদগণ।

৫ এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

কিয়াস	কিয়াস শব্দের শাব্দিক অর্থ অনুমান করা বা তুলনা করা। মূল আইন যে যুক্তি বা ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সে যুক্তির আলোকে উদ্ভূত নতুন নতুন সমস্যা সমাধানে মহান আল্লাহর নির্দেশিত পদ্ধতিই কিয়াস। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন— কিয়াস হলো আইনের বিস্তৃতি। মূল আইন যখন সমস্যা মোকাবেলায় যথেষ্ট না হয় তখন মূল আইন থেকে ইল্লতের মাধ্যমে নতুন বিধি আহরণ করতে হয়। এতে আইনের যে বিস্তৃতি ঘটে, তাকেই কিয়াস বলে।
আছল	আছল অর্থ মূল। যার ওপর অনুমান করে কিয়াস করা হয় তাকে আছল বা মূল বলা হয়। আছল হলো মূল বিধান। যে বিধানটির সাথে তুলনা করে নতুন বিষয়ের বিধান নির্ণয় করা হয়। যেমন- মদ পান করা হারাম, এটি হলো আছল।
ফরয়া	ফরয়া অর্থ শাখা। মূলের ওপর অনুমান করে নতুন যে সমস্যাটির সমাধান খোঁজা হয় তাকে ফরয়া বলে। ফরয়া এর বিধান কুরআন, হাদিস ও ইজমার মধ্যে পাওয়া যায় না। কিয়াসের জন্য ফরয়াকে আছলের সাথে তুলনা করা হয়। যেমন: গাঁজা, হেরোইন, কোকেন প্রভৃতি নেশা দ্রব্য সম্পর্কে কুরআন, হাদিস ও ইজমায় বিধান উল্লেখ নেই। এক্ষেত্রে মদের সাথে তুলনা করে এগুলোর বিধান খোঁজা হয়। সুতরাং গাঁজা, হেরোইন ও কোকেন হচ্ছে ফরয়া।
ইল্লত	ইল্লত অর্থ কার্যকারণ, যুক্তি। কিয়াসের ক্ষেত্রে ইল্লত এমন একটি গুণগত দিক যা আছল বা ফরয়ার মধ্যে সমানভাবে বিদ্যমান এবং সে কারণেই আছলের বিধান ফরয়ার মধ্যে বাস্তবায়িত হয়। মুজতাহিদগণ এ হুকুমটিকে শাখার ওপরে আরোপিত করেন। কেননা এর মধ্যে মূলের যে গুণ থাকা দরকার ঠিক সে গুণটিই বিদ্যমান। আর ইল্লতের গুণটিকে প্রকাশ্য ও সুসংবদ্ধ হতে হবে, যাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এর কারণেই হুকুম আরোপিত হয়েছে। যেমন- মদ, হেরোইন ও গাঁজার মধ্যে নেশা সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। সুতরাং নেশা সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ইল্লত।

হুকুম	হুকুম অর্থ বিধান। আছল ও ফরয়ার মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য/দোষ/গুণ বিদ্যমান থাকার কারণে মুজতাহিদগণ ফরয়ার ব্যাপারে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন তাকে বলা হয় হুকুম। যেমন: আছল হচ্ছে মদ পান করা হারাম। গাঁজা, হেরোইন ও কোকেনের মধ্যে একই বৈশিষ্ট্য/দোষ বিদ্যমান। ফলে মুজতাহিদগণ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, গাঁজা, হেরোইন ও কোকেন সেবন হারাম। সুতরাং হারাম হওয়া হচ্ছে হুকুম।
জলি	কিয়াসুল জলি অর্থ প্রকাশ্য কিয়াস। যে কিয়াস সর্ববাদী ও সর্বসম্মত পদ্ধতি অনুযায়ী সম্পন্ন হয় এবং আছল, ফরয়া ও ইল্লত সবার কাছে বোধগম্য হয় তাকে কিয়াসুল জলি বলা হয়।
খফি	খফি কিয়াস বলতে অপ্রকাশ্য কিয়াসকে বোঝায়। যদি অবস্থা এমন হয় যে, প্রকাশ্য কিয়াস একটি বিষয়কে সমর্থন বা প্রত্যাশা করে কিন্তু হাদিসে তার বিপরীত নির্দেশনা রয়েছে অথবা এমন হয় যে, প্রকাশ্য কিয়াস একটি বিষয় প্রত্যক্ষ করে কিন্তু জনসাধারণের হিতার্থে প্রকাশ্য কিয়াসের প্রত্যাশায় বিপরীত বিধান দেওয়া হয়, তাকে খফি কিয়াস বলে।

সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

ক. জ্ঞানমূলক

■ কিয়াসের পরিচয়

প্রশ্ন-১. কিয়াস (اَلْقِيَاسُ) শব্দের অর্থ কী?
উত্তর: কিয়াস শব্দের অর্থ অনুমান করা বা তুলনা করা।

প্রশ্ন-২. ইসলামি আইনের চতুর্থ উৎস কোনটি?
উত্তর: ইসলামি আইনের চতুর্থ উৎস কিয়াস।

প্রশ্ন-৩. কিয়াস কী? *[সকল বোর্ড ২০১৭]*
উত্তর: নিজস্ব বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে কুরআন-হাদিসের আলোকে নতুন সমস্যার সমাধানই কিয়াস।

প্রশ্ন-৪. কিয়াস দ্বারা কোন জ্ঞান অর্জিত হয়?
উত্তর: কিয়াস দ্বারা অনুমানভিত্তিক জ্ঞান অর্জিত হয়।

■ কিয়াসের প্রকারভেদ

প্রশ্ন-৫. কিয়াস কত প্রকার ও কী কী?
[ঢা বো., দি. বো., সি. বো., য. বো. '১৮]
উত্তর: কিয়াস ২ প্রকার। যথা— ১. কিয়াসে জলি ও ২. কিয়াসে খফি।

প্রশ্ন-৬. কিয়াসে জলি অর্থ কী? *[ঢা বো., সি. বো. '১৯]*
উত্তর: কিয়াসে জলি অর্থ প্রকাশ্য কিয়াস।

প্রশ্ন-৭. 'কিয়াসে জলি' কী?
উত্তর: যে কিয়াসের ইল্লত বা কার্যকারণ সুস্পষ্ট এবং সবার কাছে তা বোধগম্য তাকে 'কিয়াসে জলি' বলে।

প্রশ্ন-৮. কিয়াসে খফি কী?
উত্তর: যদি প্রকাশ্য কিয়াস একটি বিষয়কে প্রত্যাশা করে কিন্তু জনসাধারণের কল্যাণে প্রকাশ্য কিয়াসের প্রত্যাশার বিপরীত বিধান দেওয়া হয়, তবে তাকে কিয়াসে খফি বা অপ্রকাশ্য কিয়াস বলে।

প্রশ্ন-৯. কিয়াসের হুকুম কী?
উত্তর: কিয়াসের ওপর আমল করা ওয়াজিব।

■ কিয়াসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

প্রশ্ন-১০. কিয়াস অস্বীকার করলে কী হবে?
উত্তর: কিয়াস অস্বীকার করলে ফাসিক হবে।

প্রশ্ন-১১. 'নস' কী?
উত্তর: কোনো বিষয়ে শরিয়তের সুস্পষ্ট দলিল হলো নস।

প্রশ্ন-১২. মুসলিম উম্মাহর কিয়াস কীসের ওপর ভিত্তি করে করা হবে?
উত্তর: মুসলিম উম্মাহর কিয়াস কুরআন ও সুন্নাহর ওপর ভিত্তি করে করা হবে।

প্রশ্ন-১৩. মহানবি (সা.) কাকে ইয়েমেনের বিচারক নিযুক্ত করেন?
উত্তর: মহানবি (সা.) মুয়াজ বিন জাবাল (রা.)-কে ইয়েমেনের বিচারক নিযুক্ত করেন।

প্রশ্ন-১৪. কিয়াসের বিধান কখন আইনে পরিণত হয়?
উত্তর: কিয়াসের মাধ্যমে উদ্ভাবিত বিধান কুরআন-সুন্নাহবিরোধী না হলে তা আইনে পরিণত হয়।

প্রশ্ন-১৫. বাই সালাম কী?
উত্তর: বাই সালাম হলো এমন ক্রয়-বিক্রয় যাতে মূল্য আগে পরিশোধ করা হয় এবং পণ্য পরে হস্তান্তর করা হয়।

■ কিয়াসের রুকন

প্রশ্ন-১৬. কিয়াসের রুকন কয়টি?
উত্তর: কিয়াসের রুকন চারটি।

প্রশ্ন-১৭. আছল কী?
উত্তর: নতুন উদ্ভাবিত সমস্যাটিকে যে বিধানের সাথে তুলনা করা হয় সেটিই হলো আছল।

প্রশ্ন-১৮. গাঁজা হারাম ঘোষিত হয়েছে কীসের ওপর কিয়াস করে?
উত্তর: মদের ওপর কিয়াস করে।

খ. অনুধাবনমূলক

প্রশ্ন-১. কিয়াসের শর্ত 'আছল নির্দিষ্ট না হওয়া'– বিষয়টি ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: আছল বা মূল বিধান যার ওপর কিয়াস করা হবে, সেটি কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা জাতির জন্য নির্দিষ্ট হতে পারবে না। যেমন– শরিয়তের কোনো ঘটনা প্রমাণের জন্য ন্যূনতম দুজন পুরুষের সাক্ষ্য প্রয়োজন। কিন্তু একটি বিশেষ কারণে রাসুলুল্লাহ (সা.) হযরত খোযায়মা (রা.)-এর একক সাক্ষ্যকেই দুজনের স্থলাভিষিক্ত করে দিয়েছেন। এ বিষয়টির ওপর কিয়াস করা যাবে না। কেননা এটি হযরত খোযায়মা (রা.)-এর জন্য নির্দিষ্ট।

প্রশ্ন-২. কিয়াসের রুকন কী? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: যার ওপর কোনো কিয়াসের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত তাই কিয়াসের রুকন।

কিয়াসের কতগুলো রুকন রয়েছে। যেগুলো ছাড়া কিয়াস সংঘটিত হবে না। এগুলো হলো– ক. আল আছল; যার ওপর অনুমান করা হয়, খ. আল-ফরয়া; যে নতুন সমস্যাটির সমাধান খোঁজা হয়, গ. আল-ইল্লত; কার্যকারণ, এবং ঘ. আল-হুকুম; বিধান।

প্রশ্ন-৩. কিয়াসের হুকুম কী?

[রা বো., দি. বো., কু. বো., সি. বো., য. বো. '১৭]

উত্তর: কিয়াসের হুকুম হচ্ছে কিয়াস দিয়ে অকাট্য জ্ঞান অর্জিত হয় না; বরং ধারণাপ্রসূত জ্ঞান অর্জিত হয়।

কিয়াস দ্বারা অনিশ্চয়তামূলক জ্ঞান লাভ করা যায় না। তাই এর দ্বারা শরিয়তের অকাট্য দলিল সাব্যস্ত হবে না। তবে কিয়াসের ওপর আমল করা ওয়াজিব হবে যদি তা কুরআন, হাদিস ও ইজমার সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। কিয়াস অস্বীকার করলে কাফির হবে না; বরং ফাসিক হবে।

প্রশ্ন-৪. ইসলামি আইনের উৎস হিসেবে কিয়াসের অবস্থান ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: কিয়াস ইসলামি আইনের চতুর্থ উৎস।

কুরআন-মাজিদে কিয়াসের স্বীকৃতি রয়েছে। ইসলামি আইনের উৎস হিসেবে কিয়াস কোনো নতুন সংযোজন নয়। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে কিয়াসের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটে। তিনি নিজে কিয়াস করার জন্য সাহাবিদের বিশেষ উৎসাহ দিয়েছেন। তাঁর ইন্তেকালের পর সাহাবিগণ কিয়াসের স্বাধীন প্রয়োগের মাধ্যমে একে ইসলামি আইনের চতুর্থ উৎস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন– فَاعْتَبِرُوْا يَا أُوْلِى الْأَبْصَارِ অর্থ: হে চক্ষুষ্মাণগণ, তোমরা শিক্ষাগ্রহণ কর (সূরা আল-হাশর, আয়াত: ২)।

প্রশ্ন-৫. কিয়াস কীভাবে শরিয়তের উৎস হিসেবে অনুমোদিত?

উত্তর: নবোদ্ভাবিত সমস্যার সমাধানের জন্য কুরআন-হাদিসের মাধ্যমে কিয়াস শরিয়তের উৎস হিসেবে অনুমোদিত হয়।

মানবজীবন ও সমাজ সতত পরিবর্তনশীল। পরিবর্তনের ধারায় জগতে নতুন নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্মেষ ঘটে। যুগের পরিবর্তন ও পরিবেশের আলোকে নতুন নতুন সমস্যারও সৃষ্টি হয়। এগুলোর সমাধান হয়তো কুরআন-হাদিসে সরাসরি বর্ণিত হয়নি। তখন কুরআন-হাদিসের সাথে তুলনা করে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান করতে হয়। আর এ তুলনা করাই হলো কিয়াস। কুরআন হাদিসের আলোকে সমাধান করার ফলে কিয়াসকে শরিয়তের উৎস হিসেবে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন-৬. কিয়াস ছাড়া ইসলামকে সম্পূর্ণ জীবনব্যবস্থা বলা যায় না কেন? *[রা বো., দি. বো., কু. বো., সি. বো., য. বো. '১৭]*

উত্তর: কিয়াস ইসলামি শরিয়তের চতুর্থ উৎস হিসেবে কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা স্বীকৃত বলে এটি ছাড়া ইসলামকে সম্পূর্ণ জীবনব্যবস্থা বলা যায় না।

কিয়াস ব্যতীত ইসলাম একটি গতিহীন ও সংকীর্ণ জীবনাদর্শে পরিণত হয়। ফলে সব দেশের ও সব কালের দাবি মেটানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। কিয়াসই ইসলামকে সর্বকালীন ও সর্বজনীন জীবনাদর্শে পরিণত করে। এ কারণেই কিয়াসকে ইসলামি শরিয়তের উৎস হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং এটি ইসলামকে পূর্ণতা দান করেছে।

প্রশ্ন-৭. 'হে বিচক্ষণ জ্ঞানীগণ, তোমরা গভীর চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো।'– এ আয়াতে কী বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: আলোচ্য আয়াতটি কিয়াসের প্রতি ইঙ্গিত করেছে।

মূলত ইসলামি শরিয়তের আইনের উৎস হিসেবে কিয়াস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়। এ কারণে মহান আল্লাহই আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে মুসলিম জাতিকে চিন্তা ও গবেষণার মাধ্যমে প্রয়োজন হলে কিয়াস করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কিয়াস করা জরুরি।

? অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কিয়াস শব্দের অর্থ কী?
ক. অনুমান করা খ. একমত হওয়া
গ. প্রতিষ্ঠা করা ঘ. নতুন বাণী

২. কিয়াসকে আইনের বিস্তৃতি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন কে?
ক. ইমাম মালিক (রহ.)
খ. ইমাম শায়েফি (রহ.)
গ. ইমাম আবু হানিফা (রহ.)
ঘ. আবুল বারাকাত আন-নাসাফি (রহ.)

৩. কিয়াস যে উপাদানগুলোর ভিত্তিতে উৎপত্তি লাভ করে তাকে কী বলে?
ক. কিয়াসের হুকুম
খ. কিয়াসের রুকন
গ. কিয়াসের শর্ত
ঘ. প্রকারভেদ

৪. কোন যুগে কিয়াসের উৎপত্তি ঘটে?
ক. রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে
খ. রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে
গ. সাহাবিদের যুগে
ঘ. বর্তমান যুগে

৫. কিয়াস মেনে চলা প্রত্যেক মুমিনের জন্য কী হিসেবে বিবেচিত হবে?
ক. ফরজ খ. ওয়াজিব
গ. সুন্নাত ঘ. নফল

৬. اَلْفَرْعُ (আল-ফারউ) শব্দের অর্থ কী?
ক. মূল বিধান
খ. শাখা বিধান
গ. সম বিধান
ঘ. নব বিধান

৭. কিয়াসের ইল্লত বলতে কী বোঝায়?
ক. কিয়াসের মূল
খ. কিয়াসের শাখা
গ. কিয়াসের কার্যকারণ
ঘ. কিয়াসের বিধান

৮. عِلْمٌ قَطْعِيٌّ বলতে কী বোঝায়?
ক. অকাট্য জ্ঞান খ. ধারণা প্রসূত জ্ঞান
গ. কুরআনের জ্ঞান ঘ. হাদিসের জ্ঞান

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন

৯. কিয়াসকে শরিয়তের উৎস হিসেবে অস্বীকারকারী সম্প্রদায় হচ্ছে—
i. আহলে জাওয়াহির
ii. শিয়া সম্প্রদায়
iii. খারিজি সম্প্রদায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১০. মহান আল্লাহ মদ, গাঁজা, হেরোইন, কোকেন ইত্যাদি হারাম করেছেন—
i. মাদকতার জন্য
ii. নেশার জন্য
iii. অভ্যাসের জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১১ ও ১২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
রাজেন্দ্রপুর গ্রামের অধিকাংশ মানুষ নিরক্ষর। তারা কোনো সমস্যা দেখা দিলে মাওলানা নুরুদ্দীনের শরণাপন্ন হয়। মাওলানা নুরুদ্দীন ইসলামি শরিয়ত সম্পর্কে অধিক জ্ঞানের অধিকারী এবং মুজতাহিদ। তিনি অনেক ক্ষেত্রে গবেষণার মাধ্যমে নতুন উদ্ভূত সমস্যার সমাধান দেন।

১১. অনুচ্ছেদের মাওলানা নুরুদ্দীনের গবেষণার সাথে কীসের সাদৃশ্য রয়েছে?
ক. উরফের
খ. ইজমার
গ. কিয়াসের
ঘ. ক্ষমতা প্রয়োগের

১২. উক্ত গবেষণা গ্রামবাসীর জন্য হতে পারে—
i. শরিয়তের বিধান
ii. শরিয়তের নতুন মূলনীতি
iii. অবশ্য পালনীয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

খ. বোর্ড পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৩. পূর্ব সিদ্ধান্তকে দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করে মিমাংসা করাই হচ্ছে— *[সকল বোর্ড ২০১৭]*

ক. ইজমা খ. কিয়াস
গ. আজিমত ঘ. রুখসত

১৪. যে জিনিসকে কিয়াস করা হয়, তাকে কী বলে? *[সকল বোর্ড ২০১৭]*

ক. আছল
খ. হুকুম
গ. ফরয়া
ঘ. ইল্লত

১৫. যার ওপর কিয়াস করা হয়, তাকে কি বলে? *[সকল বোর্ড ২০১৭]*

ক. আছল খ. ফরয়া
গ. ইল্লত ঘ. হুকুম

১৬. কিয়াস হলো— *[সকল বোর্ড ২০১৬]*

i. একটির সাথে আরেকটির সাদৃশ্য নির্ধারণ করা
ii. একটির সাথে আরেকটির তুলনা করা
iii. ঐকমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৭ ও ১৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

জনাব রাশিদের মনে প্রশ্ন জাগে যে, আজকের যুগে প্রচলিত অনেক বিষয় রাসুলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবাদের যুগে বিদ্যমান ছিল না। গবেষকগণ এর কিছু বৈধ আবার কিছু অবৈধ বলে মত দিয়ে থাকেন। যে বিষয়ে কুরআন ও হাদিসে স্পষ্ট কিছু বলা নেই তা বৈধ বা অবৈধ হয় কী করে? রাশিদের বন্ধু রফিক বলেন— প্রচলিত বিষয়াদিতে কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত অনুরূপ বিষয়ের বৈধ বা অবৈধ হওয়ার কারণ বিদ্যমান থাকলে তাকে বৈধ বা অবৈধ বলা যাবে। যেমন— পবিত্র কুরআনে মদকে হারাম বলা হয়েছে। মদ হারাম হওয়ার কারণ নেশা। অতএব নেশা সৃষ্টিকারী বস্তু যে নামেই হউক তা হারাম হবে। *[সকল বোর্ড ২০১৮]*

১৭. রফিকের বক্তব্যে যে বিদ্যমান কারণের উল্লেখ আছে তাকে কিয়াসের পরিভাষায় কী বলা হয়?

ক. আসল খ. ইল্লত
গ. ফরয়া ঘ. হুকমুল আসল

১৮. উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়টির মাধ্যমে—

i. নতুন উদ্ভূত সমস্যার সমাধান করা যায়
ii. মানুষের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়
iii. মানুষের বিচার বুদ্ধি ও চিন্তার প্রয়োগ করা যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উত্তরমালা

১	ক	২	গ	৩	খ	৪	ক	৫	খ	৬	খ	৭	গ	৮	ক	৯	ঘ	১০	ক	১১	গ	১২	খ
১৩	খ	১৪	গ	১৫	ক	১৬	ক	১৭	খ	১৮	খ												

গ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. সংক্ষেপে কিয়াসের পরিচয় দাও।
২. কিয়াসের রুকন কয়টি ও কী কী? ব্যাখ্যা করো।
৩. কিয়াসের প্রকারভেদ উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করো।
৪. কিয়াসের শর্তগুলো লেখো।
৫. কিয়াসের মূলনীতি ব্যাখ্যা করো।

ঘ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. জনাব মুনাফ ও ইকরাম দু জন একই গ্রামের বাসিন্দা। দু জনই কৃষিকাজ করেন। ইকরাম নিজের জমি চাষ করার সময় অন্যের জমির সীমানা ঠিক রাখেন না। অপরদিকে মুনাফ জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল-কুরআন ও সুন্নাহের অনুশাসন মেনে চলেন। তিনি নিজের জমি চাষ করেন। বর্তমানে জমি লিজ পদ্ধতি চালু হয়েছে। এ পদ্ধতি বৈধ কি-না তা জানার জন্য একজন বিজ্ঞ আলেমের কাছে গেলে, তিনি আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন— "হে বিচক্ষণ জ্ঞানীগণ! তোমরা গভীর চিন্তা-ভাবনা ও প্রজ্ঞা অবলম্বন কর।" *[ঢা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., ব. বো. '১৬]*

ক. কিয়াসের রুকন কয়টি?
খ. طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ - এ হাদিসটি অর্থ লেখো।
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত আল-কুরআনের আয়াতটি ইসলামি শরীয়তের কোন উৎসের প্রতি ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. ইকরামের উপার্জন কেমন? সমাজজীবনে এর ক্ষতিকর প্রভাব মূল্যায়ন করো।

২. মির্জাপুর নগরের শামিম খারাপ লোকের পাল্লায় পড়ে হেরোইন ও ইয়াবায় আসক্ত হয়ে পড়লে তার বন্ধু শাহীন তাকে এসব ছেড়ে দিতে বলে। তখন শামিম বলল— মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.) কোথাও ইয়াবা ও হেরোইন নিষেধের কথা বলেননি। এ বিষয় ইমামদের মতৈক্যও হয়নি। তাই এর বাইরে কোনো বিষয়ে আমল করা আবশ্যক নয়। একথা শুনে স্থানীয় আলিম জনাব আবরার বলেন— 'হেরোইন ও ইয়াবা মাদকদ্রব্য। তাই এসব হারাম।'

[ঢা. বো., দি. বো., সি. বো., য. বো. '১৮]

ক. কিয়াস কত প্রকার ও কী কী?

খ. 'কিয়াসে জলি অধিকতর গ্রহণযোগ্য'—ব্যাখ্যা করো।

গ. শামিম ইসলামি শরিয়তের কোন উৎস অস্বীকার করেছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. 'প্রত্যেক নেশা জাতীয় দ্রব্য হারাম।'— উক্তিটির আলোকে জনাব আবরারের বক্তব্যের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো।

৩. সালমান মসজিদের ইমাম সাহেবকে বললেন, পবিত্র কুরআন ও হাদিসে সুস্পষ্টভাবে মদ পান হারাম করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমান যুগের কোকেন, হেরোইন, গাঁজা, ফেনসিডিল ইত্যাদিকেও ইসলামে হারাম করা হয়েছে। অথচ পবিত্র কুরআন, হাদিস এবং ইজমার কোথাও এ বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। উত্তরে ইমাম সাহেব বললেন, এগুলোও এমন এক নীতির মাধ্যমে হারাম করা হয়েছে যা ছিল রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে অত্যন্ত পছন্দনীয়। আর উক্ত নীতি বাস্তবায়িত হবে কুরআন ও হাদিসের ভিত্তিতেই।

ক. কিয়াসের মূলনীতি কয়টি?

খ. فَاعْتَبِرُوْا يَا أُولِى الْأَبْصَارِ আয়াতটি কোন বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছে? ব্যাখ্যা দাও।

গ. রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে অত্যন্ত পছন্দনীয় নীতি বলতে ইমাম সাহেব কোন নীতির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উক্ত নীতি কীসের ভিত্তিতে বাস্তবায়িত হবে? বিশ্লেষণ করো।

৪. মিজান একজন পরহেজগার যুবক। আদনান তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। দুজন একসাথে চলতে গিয়ে আদনান লটারি বিক্রয়রত গাড়ি থেকে ১০ টাকা মূল্যের দুটি টিকিট ক্রয় করে একটি নিজে এবং অপরটি মিজানকে দিল। লটারি ড্র হলে মিজান একটি মোটর সাইকেল পুরস্কার পেল। আদনান মিজানকে ৫০,০০০ টাকা দিয়ে মোটর সাইকেলটি নিজেই নিয়ে নিল। মিজানের লটারিতে মোটর সাইকেল পাওয়ার খবর জানাজানি হলে মিজানের মক্তব শিক্ষক তাকে ডেকে লটারিকে নিষিদ্ধ কাজ বলে আখ্যায়িত করেন এবং নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করেন—

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

অতঃপর মিজান টাকাগুলো আদনানের নিকট ফেরত দিল এবং তাকেও মোটর সাইকেলটি ফেরত বা দান করে দিতে বলল। তখন আদনান বলল, "তুমি অতিরিক্ত ধার্মিকতা দেখাচ্ছ"। *[ঢা. বো., চ. বো., ব. বো. '১৭]*

ক. কিয়াস কী?

খ. কোনো বিষয়ে কুরআন ও হাদিসের স্পষ্ট বিধান না থাকলে সমাধানের উপায় কী?

গ. মিজানের শিক্ষক লটারিকে কেন নিষিদ্ধ বলে আখ্যায়িত করলেন? বুঝিয়ে লেখো।

ঘ. 'অতিরিক্ত ধার্মিকতা'- বিষয়টি তোমার দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করো।

৫. ইয়াবার বৈধতা নিয়ে তিন বন্ধু S, T ও U এর মধ্যে আলোচনা চলছিল। S বলল কুরআন ও হাদিসে ইয়াবা নিয়ে কোনো আলোচনা নেই। ইয়াবা নিষিদ্ধ হলে অবশ্যই তা কুরআন অথবা হাদিসে থাকত। যেহেতু আলোচনা নেই তাই ইয়াবা বৈধ। T বলল ইয়াবা অবৈধ। কারণ মদের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য আছে, ইয়াবার মধ্যেও তা আছে। U বলল, T এর কথাই সঠিক। কেননা মহান আল্লাহ বলেন—

فَاعْتَبِرُوْا يَا أُولِى الْأَبْصَارِ

[রা. বো., দি. বো., কু. বো., সি. বো., য. বো. '১৭]

ক. اَلْإِجْمَاعُ কী?

খ. قِيَاسٌ ছাড়া ইসলামকে সম্পূর্ণ জীবনব্যবস্থা বলা যায় না কেন?

গ. ইয়াবা অবৈধ হওয়া সম্পর্কে T এর বক্তব্য ব্যাখ্যা করো।

ঘ. فَاعْتَبِرُوْا يَا أُولِى الْأَبْصَارِ এর যথার্থতা মূল্যায়ন করো।

৬. জনাব বসীর ও জনাব নাজিম দুজন ইসলামি চিন্তাবিদ। তারা ইসলামি শরিয়তের চতুর্থ উৎস নিয়ে আলোচনা করছিলেন। জনাব বসীর বললেন, এটি ইসলামি আইনশাস্ত্রের এক গতিশীল ধারা। জনাব নাজিম বললেন, শুধু তাই না এটি গ্রহণ ও প্রয়োগ নিঃসন্দেহে ইসলামি জীবনব্যবস্থার জন্য কল্যাণকর। কেননা এর মাধ্যমে আধুনিক জীবনব্যবস্থার নিত্যনতুন সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়।

ক. ইজমা শব্দের অর্থ কী?

খ. ইজমার আহল্ সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করো।

গ. জনাব বসীরের উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।

ঘ. জনাব নাজিমের উক্তির সাথে তুমি কি একমত? তোমার মতের সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করো।

৭. খিদিরপুর ইউপি চেয়ারম্যান হলেন জামিল আহমেদ। তিনি তার মেম্বার রমজান আলীকে একটি সামাজিক সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব প্রদান করে বললেন, সবকিছুই সরকারি বিধান অনুযায়ী করবে। চেয়ারম্যান সাহেব তার মেম্বারকে জিজ্ঞাসা করলেন, যদি এমন কোনো নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যার সমাধান সরকারি আইনে নেই তখন তুমি কী করবে? তখন রমজান আলী উত্তরে বললেন সেক্ষেত্রে উপস্থিত গণ্যমান্যদের সাথে পরামর্শ করে নিজের চিন্তাভাবনা অনুযায়ী এবং সরকারি আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আইন ঘোষণা করে সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করব। চেয়ারম্যান সাহেব সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, "মহান আল্লাহ তোমার অন্তর চক্ষু খুলে দিন"।

ক. কিয়াসে জলি কী?

খ. ইল্লত ও হুকুম বলতে কী বোঝ?

গ. রমজান আলীর চিন্তা ধারা বাস্তবজীবনে শরিয়ত সম্মত কি না? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকে আলোচ্য বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা কুরআন ও হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

ঙ. সমন্বিত অধ্যায়ের সৃজনশীল প্রশ্ন

৮. জনাব নাজিম কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণ করেন এবং তিনি মনে করেন পবিত্র কুরআন ও হাদিসের বাইরে অন্য কোন উৎস খোঁজা বিদআত কিংবা হারাম। অপরদিকে রফিক সাহেব মনে করেন কুরআন ও হাদিস ব্যতীত শরিয়তের আর দুটি উৎস রয়েছে, যেগুলোর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং সেগুলোর ওপর আমল করা ওয়াজিব।

◀ ৩য় ও ৪র্থ অধ্যায়ের সমন্বয়ে

ক. ইজমা অর্থ কী?

খ. বড় জিহাদ বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত শরিয়তের তৃতীয় উৎসের গুরুত্ব বর্ণনা করো।

ঘ. উদ্দীপকের বর্ণনামতে চতুর্থ উৎসের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করো।

৯. বাংলাদেশে রোহিঙ্গা প্রবেশের পর তাদের আশ্রয়কেন্দ্রে একটি ঘটনা ঘটে। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে তাদের নিজেদের মাঝে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এ সমস্যার সমাধানে তারা একজন ইসলামি চিন্তাবিদ মাওলানা হালিমের শরণাপন্ন হলে তিনি একটি রায় প্রদান করেন; কিন্তু তাতেও দ্বন্দ্ব নিরসন না হয়ে বরং বিষয়টি জটিল আকার ধারণ করায় দেশবরেণ্য আলমেগণ মিলে স্বার্থক সিদ্ধান্ত দিলে দ্বন্দ্ব নিরসন হয়।

[রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. '১৮] ***◀ ৩য় ও ৪র্থ অধ্যায়ের সমন্বয়ে***

ক. اَلْبَقَرَةُ (আল-বাকারা) শব্দের অর্থ কী?

খ. মক্কি সূরা বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকে ইসলামি চিন্তাবিদ মাওলানা হালিমের রায় প্রদান ইসলামি আইনের কোন উৎসের ইঙ্গিতবাহী? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. আলেমগণের সিদ্ধান্ত প্রদান আল-কুরআন ও হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

৫

ফিকহশাস্ত্র

Al-Fiqh

প্রধান প্রধান শব্দ

- ফিকহ
- মাযহাব
- হানাফি মাযহাব
- মালিকি মাযহাব
- শাফিঈ মাযহাব
- হাম্বলি মাযহাব

কুরআন ও হাদিস ইসলামি বিধিবিধানের প্রধান দুটি উৎস। কুরআনের আয়াতের সংখ্যা নির্দিষ্ট হলেও এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অত্যন্ত ব্যাপক। আবার সব আয়াত এক ধরনের নয়। কোনোটি আম (সাধারণ অর্থজ্ঞাপক) আবার কোনোটি খাস (বিশেষ অর্থজ্ঞাপক)। কুরআন মাজিদে বিভিন্ন বিধিবিধান অধ্যায় আকারে দেওয়া হয়নি, বরং বিক্ষিপ্তভাবে দেওয়া হয়েছে। হাদিসের সংখ্যা যেমন অগণিত তেমনি এর রয়েছে অনেক ধরনের পরিভাষা ও বিধানগত ভিন্নতা। কুরআন ও হাদিস থেকে মাসয়ালা (বিধিবিধান) খুঁজে বের করা সাধারণ মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য ব্যাপার। আবার বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদিসের মধ্যে দ্বান্দ্বিক নির্দেশনা রয়েছে। যার সমাধান খুঁজে বের করা উঁচু স্তরের আলিম ও গবেষক ছাড়া সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং সাধারণ মুসলমানের পক্ষে সঠিকভাবে ইসলামের বিধিবিধান পালন করা কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। এ কষ্টসাধ্য বিষয়গুলোকে সহজ করার জন্য অতি উঁচু স্তরের আলিম ও গবেষক কুরআন ও হাদিসের সব নির্দেশনা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে সহজে পালন উপযোগী একটি শাস্ত্র সংকলন করেন। এ শাস্ত্রের নাম ফিকহশাস্ত্র। কুরআন ও হাদিসের বহু স্থানে ফিকহশাস্ত্রের প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে যে, এ শাস্ত্র মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর। যেহেতু এ শাস্ত্রের মাধ্যমে ইসলামের যাবতীয় হুকুম-আহকাম প্রণয়ন করার পাশাপাশি বিভিন্ন অন্যায়-অপরাধের শাস্তি বিধানের সীমা ও প্রয়োগ পদ্ধতি প্রণীত হয়েছে, তাই একে ইসলামি আইনশাস্ত্র বা Islamic Law হিসেবেও অভিহিত করা হয়।

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে যা যা শিখব

- ফিকহশাস্ত্রের পরিচয়, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, সংকলনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা
- মাযহাবের পরিচয় ও চার ইমামের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং তাদের মতো ন্যায়নিষ্ঠ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ জীবন গঠন

পাঠ পরিকল্পনা	
পাঠ ১	ফিকহশাস্ত্রের পরিচয়
পাঠ ২	ফিকহশাস্ত্রের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু
পাঠ ৩ ও ৪	ফিকহশাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ
পাঠ ৫ ও ৬	ফিকহশাস্ত্রের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা
পাঠ ৭	মাযহাবের সংজ্ঞা এবং বিভিন্ন মাযহাব উৎপত্তির কারণ
পাঠ ৮	হানাফি মাযহাব
পাঠ ৯	মালিকি মাযহাব
পাঠ ১০	শাফিঈ মাযহাব
পাঠ ১১	হাম্বলি মাযহাব
পাঠ ১২	চার ইমামের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি: ইমাম আবু হানিফা (রহ.)
পাঠ ১৩	ইমাম মালিক (রহ.)
পাঠ ১৪	ইমাম শাফেয়ি (রহ.)
পাঠ ১৫	ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)

পাঠ ১ ফিকহশাস্ত্রের পরিচয়
Introduction to Fiqh

ইসলামি বিধিবিধান ও মূলনীতির প্রধান উৎস কুরআন মাজিদ ও হাদিস কিন্তু এ উৎস দুটিতে ইসলামি আইন-কানুন ধারাবাহিকভাবে বিন্যস্ত করা হয়নি। বরং কুরআন-হাদিসের বিস্তৃত অজ্ঞানে বিক্ষিপ্ত আকারে এ বিধিবিধান গ্রন্থিত ছিল। সাধারণ মানুষ ও অনারব মুসলিমরা ইসলামি বিধিবিধানের পূর্ণ অনুশীলনের ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্ত হয়েছিলেন। তাদের পক্ষে সরাসরি কুরআন-হাদিস থেকে বিধান আহরণ প্রায় অসম্ভব হয়ে দেখা দিয়েছিল। তাদের জন্য বিন্যস্ত ইসলামি আইন সংকলন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। এমনি প্রয়োজন ও গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতেই মুসলিম মনীষীদের নিষ্ঠা ও আন্তরিক গবেষণায় স্বতন্ত্ররূপে ইসলামি আইনবিজ্ঞান যাত্রা শুরু করে। এটিই ফিকহশাস্ত্র (Islamic Jurisprudence) হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

ফিকহশাস্ত্রের সংজ্ঞা

সাধারণ অর্থে (اَلْفِقْهُ) ফিকহ হলো জ্ঞান-বুদ্ধির স্বাধীন প্রয়োগ। শব্দটির প্রচলিত ব্যবহার মাসদার বা ক্রিয়ামূল হিসেবে। অভিধানে শব্দটি হৃদয়ঙ্গম করা, অনুধাবন করা, বুঝতে পারা, সূক্ষ্মদর্শিতা, অবগত হওয়া, উন্মুক্ত করা, জানা প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

আল্লামা **রশিদ রিজা** বলেন— কুরআন মাজিদে বিশবার ফিকহ শব্দটি উল্লেখ হয়েছে। এর মধ্যে উনিশ স্থানে এটি ব্যবহৃত হয়েছে গভীর জ্ঞান ও সূক্ষ্ম ইলম অর্থে। **আল-কাওছার** অভিধানে ফিকহ অর্থ লেখা হয়েছে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা, ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কিত সূক্ষ্ম জ্ঞান প্রভৃতি।

পরিভাষায়, কুরআন-সুন্নাহ থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আহরিত শরিয়তের বিধান বা কানুনবিজ্ঞানের নাম ফিকহ।

১. ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন— مَعْرِفَةُ النَّفْسِ مَالَهَا وَمَا عَلَيْهَا অর্থ: ব্যক্তির সত্তা ও আত্মার জন্য যা কল্যাণকর ও অকল্যাণকর সে সম্পর্কে জ্ঞানলাভই ফিকহ।

২. তাফসিরে জালালাইনের দুইজন লেখকের একজন **আল্লামা জালালুদ্দিন আস-সুয়ুতি (রহ.)** বলেন— اَلْفِقْهُ مَعْقُوْلٌ مِنَ الْمَنْقُوْلِ অর্থ: কুরআন-সুন্নাহ থেকে বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা উদঘাটিত জ্ঞানকে ফিকহ বলে।

৩. ফাতহুল কাদির গ্রন্থের লেখক **শায়খ ইবনে হুমাম** (রহ.) বলেন— هُوَ التَّصْدِيْقُ بِالْاَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْقَطْعِيَّةِ অর্থ: ফিকহ বলতে বোঝায় শরিয়তের অকাট্য বিধানসমূহের সত্যায়ন ও অনুশীলন।

৪. জমহুর উলামাদের মতে, ফিকহ হলো শরিয়তের ব্যাবহারিক বিধিবিধান; যেমন— (বিস্তারিত প্রমাণাদি ও মাসাইল উদ্ভাবনের যোগ্যতাসহ) হালাল-হারাম প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ।

মোটকথা, স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহ তাআলা মানুষের পার্থিব ও অপার্থিব জীবনে সার্বিক সফলতা অর্জনে সহায়ক যে জীবনবিধান অবতীর্ণ করেছেন, ব্যাবহারিক জীবনে তা প্রতিপালনের লক্ষ্যে যে শাস্ত্রে তার বিধি-নিষেধসমূহ যথাযথ পদ্ধতিতে সংকলিত হয়েছে তাকে ফিকহশাস্ত্র বলা যায়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ইসলামি বিধিবিধান ও মূলনীতির প্রধান উৎস দুটির নাম লেখো।
২. ইসলামি আইন বিজ্ঞানকে কী বলে?
৩. اَلْفِقْهُ (ফিকহ) শব্দের অর্থ কী? *[সকল বোর্ড ২০২০, ২০২২, ২০১৯]*
৪. কুরআন মাজিদে কতবার 'ফিকহ' শব্দটির উল্লেখ হয়েছে?

উত্তরের জন্য দেখো ২৫০ পৃষ্ঠা।

পাঠ ২

ফিকহশাস্ত্রের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু
Aims, Objectives and Subject Matters of Fiqh

ফিকহশাস্ত্র হলো ইসলামি আইনের বিন্যস্ত গ্রন্থবন্ধ রূপ। সেজন্য ইসলামি আইনের চারটি মূল উৎসই ফিকহশাস্ত্রের উৎস। এগুলো হলো— আল-কুরআন, আল-হাদিস, ইজমা ও কিয়াস।

এর মধ্যে কুরআন হলো প্রত্যক্ষ ওহি এবং সরাসরি মহান আল্লাহর কালাম। আল্লাহ তাআলা হলেন এ ইসলামি আইনের প্রবক্তা। সেজন্য ফিকহের প্রথম ও প্রধান উৎস কুরআন মাজিদ। আল-হাদিস হলো পরোক্ষ ওহি এবং কুরআন মাজিদের ব্যাখ্যা। এটি মহানবি (সা.)-এর জীবনদর্শন ও বাণী। সেজন্য ফিকহের দ্বিতীয় প্রধান উৎস আল-হাদিস। এর তৃতীয় উৎস ইজমা। যেকোনো যুগের মুসলিম মুজতাহিদদের কুরআন-সুন্নাহ সমর্থিত যেকোনো বিষয়ে ঐকমত্যের নাম ইজমা। মুসলিম উম্মাহর প্রত্যেক সদস্যের মতামত প্রকাশ পায় বলে ইজমার স্থান ফিকহের উৎস হিসেবে কুরআন-সুন্নাহর পরেই। ফিকহের চতুর্থ প্রধান উৎস হলো কিয়াস। মুজতাহিদ এককভাবে যেকোনো নতুন সমস্যা সমাধানের জন্য কুরআন, হাদিস ও ইজমার ওপর গবেষণা করে যে সমাধান উদ্ভাবন করেন তা ইসলামি আইনে পরিণত হয়। একক উদ্ভাবনের এ পদ্ধতির নাম কিয়াস।

ফিকহশাস্ত্রের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এখানে ফিকহশাস্ত্রের মূল লক্ষ্য হলো- মানুষকে মহান আল্লাহর নির্ধারিত হুকুম-আহকাম পালনের সঠিক রীতি পদ্ধতি নির্দেশ করা এবং এর মাধ্যমে তাকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের যোগ্য করে তোলা। ইসলামের সব হুকুম-আহকামের মূল উৎস কুরআন ও হাদিস। কিন্তু সর্বসাধারণের পক্ষে সরাসরি কুরআন-হাদিস থেকে বিধান জেনে নিয়ে তা পালন করা সম্ভব নয়। কেননা কুরআন ও হাদিসে ধারাবাহিকভাবে বিধান পেশ করা হয়নি। একই বিষয়ের আইন একাধিক স্থানে বর্ণনার কারণে সাধারণ মানুষের জন্য ইসলামি আইনের অনুশীলন ও বাস্তবায়ন অসম্ভব ছিল। এ সমস্যা দূর করে সাধারণ মানুষের জন্য ইসলামের অনুশীলন সহজসাধ্য করার লক্ষ্যে ফিকহশাস্ত্র কাজ করে। সেজন্য বলা যায়, মহান আল্লাহর আইন সহজসাধ্যভাবে পালন করে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি অর্জনই ফিকহশাস্ত্রের অন্যতম উদ্দেশ্য।

ফিকহশাস্ত্রের বিষয়বস্তু বা আলোচ্য বিষয়

ফিকহশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় মূলত ৬টি।

১. **ইবাদত:** ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব ইবাদতের মধ্যকার কার্যাবলির নীতিমালা।
২. **মুআমালাত:** মুসলমানদের পারস্পরিক আচার-আচরণ, লেনদেন, ক্রয়-বিক্রয়, ধার-কর্জ, ব্যাংকিং সিস্টেম ইত্যাদি।
৩. **মুখাসামাত :** ইসলামি আইন অনুযায়ী বিচার ফয়সালার যাবতীয় নীতিমালা বা মাসাইল।
৪. **মুনাকিহাত:** বিবাহ, তালাক, ইদ্দত, বংশবৃদ্ধি, মিরাস, ওসিয়ত ইত্যাদি বিষয়ক মাসাইল।
৫. **উকুবাত:** হত্যা, চুরি, ডাকাতি, যিনা-ব্যভিচার, অপবাদ, কিসাস, দিয়ত ইত্যাদির মাসাইল।
৬. **হুকুমাত ও খিলাফত:** ইসলামি রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিমালা, যুদ্ধ, সন্ধি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ক মাসাইল।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ফিকহশাস্ত্রের উৎস কী?
২. আল-কুরআন কীরূপ ওহি?
৩. আল-হাদিস কীরূপ ওহি?
৪. ফিকহশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় মূলত কয়টি?
৫. মুসলমানদের পারস্পরিক আচার-আচরণ, লেনদেন, ক্রয়-বিক্রয়, ধার-কর্জ, ব্যাংকিং সিস্টেম কী নামে অভিহিত?

উত্তরের জন্য দেখো ২৫০ পৃষ্ঠা।

পাঠ ৩ ও ৪ ফিকহশাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ
Origin and Development of Fiqh

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাতের পর একদিকে ইসলাম দিক দিগন্তে ব্যাপকভাবে প্রসারিত হতে থাকে। অন্যদিকে মানুষের অসীম সমস্যার সমাধান قَطْعِىْ বা স্পষ্টভাবে সরাসরি কুরআন ও হাদিসে পাওয়া যেত না বলে সৃষ্টি হতে থাকে বিশৃঙ্খলা ও সামাজিক ন্যায়-নীতি বিঘ্নিত হওয়ার মারাত্মক আশঙ্কা। তৈরি হয় মতবিরোধ। প্রয়োজন হয় বাধ্যতামূলক গ্রন্থাবদ্ধ আইনমালা। এমনই পরিপ্রেক্ষিতে একদল নিবেদিত প্রাণ মুজতাহিদদের কঠোর সাধনায় ফিকহশাস্ত্রের উৎপত্তি হয়। পরবর্তীতে কয়েকটি পর্যায়ে এ শাস্ত্রের বিকাশ ঘটে।

ফিকহশাস্ত্রের উৎপত্তি

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায় ফিকহ: রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায় 'ফিকহ' নামক কোনো আলাদা বিষয় ছিল না। ছিল না ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব ইত্যাদি পরিভাষাগুলো। তবে কুরআন ও হাদিসে এসব শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। কুরআন মাজিদে ফিকহ সংশ্লিষ্ট কয়েকটি শব্দ রয়েছে। যেমন— কুরআন মাজিদের সূরা আত-তাওবার ১১২ নম্বর আয়াতে لِيَتَفَقَّهُوْا শব্দটি রয়েছে। এর অর্থ: 'যেন তারা ফিকহ অর্জন করতে পারে বা গভীর জ্ঞান লাভ করতে পারে।' কুরআন মাজিদের আরো কয়েক স্থানে এরূপ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

হাদিসেও 'ফকিহ' এবং তৎসংশ্লিষ্ট শব্দগুলোর ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন: ইরশাদ হয়েছে—

فَقِيْهٌ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ۔

অর্থ: একজন ফকিহ এক হাজার আবেদের চেয়েও শয়তানের ওপর অধিক শক্তিশালী (বুখারি)।

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সময়ে ফিকহ নামক জ্ঞানের আলাদা শাখা না থাকার কারণ হলো– তখন কোনো সমস্যার উদ্ভব হলে কুরআনের আয়াত নাজিল হতো। অথবা রাসুলুল্লাহ (সা.) হাদিস অনুযায়ী উদ্ভূত সমস্যার সমাধান দিতেন।

তবে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায়ও সাহাবিগণ কুরআন ও হাদিসের অনুসরণের ক্ষেত্রে নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী বিশ্লেষণপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। সিদ্ধান্ত গ্রহণের এ জাতীয় পদক্ষেপ ফিকহের অন্তর্ভুক্ত। যেমন: আহযাবের যুদ্ধে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন—

لَا يُصَلِّيَنَّ اَحَدٌ اَلْعَصْرَ اِلَّا فِىْ بَنِىْ قُرَيْظَةَ۔

অর্থ: বনু কুরায়জা মহল্লায় না পৌঁছে তোমাদের কেউ যেন আসরের সালাত আদায় না করে।

উপস্থিত সব সাহাবি (রা.) মহানবি (সা.)-এর নির্দেশ শুনেছেন। তাঁদের মধ্যে কতিপয় সাহাবি বনু কুরায়জা মহল্লায় পৌঁছে আসরের সালাত আদায় করেন। আর কতিপয় সাহাবি পথিমধ্যে আসরের সালাত আদায় করেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) উভয় দলের সাহাবিদের আমলের কথা শুনেছেন। তিনি কোনো দলের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেননি। একদল সাহাবি হাদিসের শাব্দিক অর্থ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। অন্য দল সাহাবি বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতিই ফিকহ।

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায় যেসব সাহাবি (রা.) ফিকহে বুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন তন্মধ্যে বিখ্যাত কয়েকজন হচ্ছেন: হযরত উমর (রা.), হযরত আয়েশা (রা.), হযরত উসমান (রা.), হযরত আলি (রা.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.), হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা.), হযরত যায়িদ ইবনে সাবিত (রা.), হযরত আবু মুসা আশআরি (রা.) প্রমুখ।

খুলাফায়ে রাশেদিনের আমলে ফিকহ: রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তেকালের পর থেকে হযরত আলি (রা.)-এর খিলাফতের শেষ পর্যন্ত সময়কে খুলাফায়ে রাশেদিনের আমল বলা হয়।

খুলাফায়ে রাশেদিনের আমলে ইসলামি সাম্রাজ্য ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। তখন বিভিন্ন অঞ্চল, দেশ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে ইসলাম বিস্তৃতি লাভ করে। বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতায় ইসলামের প্রভাব বিস্তার লাভ করে। ফলে ইসলামের বিধিবিধান পালন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা দেখা দেয়। সেসব সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব অর্পিত হয় জ্ঞানী-গুণী সাহাবিদের ওপর। তাঁরা জটিল সমস্যাবলির সমাধানের ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদিসের ওপর ব্যাপক গবেষণা করেন। মাসয়ালা নির্ণয়ে তাঁদের তুলনামূলক আলোচনা, পর্যালোচনা, ঐকমত্যের সিদ্ধান্ত ও ইজতিহাদ ফিকহের অন্তর্গত। এ সময়ের বিজ্ঞ সাহাবিদেরকে 'ফকিহ' সাহাবি হিসাবে গণ্য করা হয়। তখনকার ফকিহ সাহাবিদেরকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। যেমন—

ক. মুকসিরুন ফকিহ সাহাবি; খ. মুতাওয়াস্‌সিতুন ফকিহ সাহাবি; গ. মুকিল্লুন ফকিহ সাহাবি।

ক. মুকসিরুন ফকিহ সাহাবি:

সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যারা অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন এবং ইলমুল ফিকহের বহুসংখ্যক মাসয়ালার ফতোয়া প্রদান করেছেন বা বিধান নির্ণয় করেছেন তাদেরকে মুকসিরুন ফকিহ সাহাবি বলা হয়। যেমন—

১. হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.), ২. হযরত আলি ইবনে আবু তালেব (রা.), ৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.), ৪. হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.), ৫. হযরত উম্মুল মুমিনিন আয়েশা (রা.), ৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখ।

খ. মুতাওয়াস্‌সিতুন ফকিহ সাহাবি:

যারা মুকসিরুনদের সমপর্যায়ে পৌছাতে না পারলেও তাদের ফতোয়ার সংখ্যা একেবারেই কম ছিল না, তারা হলেন মুতাওয়াস্‌সিতুন ফকিহ সাহাবি। যেমন—

১. হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.), ২. হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা.), ৩. হযরত সালমান ফারসি (রা.), ৪. হযরত আবু মুসা আল-আশয়ারি (রা.), ৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা.), ৬. হযরত উম্মে সালমা (রা.) প্রমুখ।

গ. মুকিল্লুন ফকিহ সাহাবি:

যারা স্বল্পসংখ্যক ফতোয়া প্রদান করেছেন এবং মুতাওয়াস্‌সিতুনদের সমপর্যায়ে পৌছতে পারেননি, তাদেরকে মুকিল্লুন ফকিহ সাহাবি বলা হয়। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাহাবির নাম হলো—

১. হযরত আবু দারদা (রা.), ২. হযরত হাসান ইবনে আলি (রা.), ৩. হযরত হোসাইন ইবনে আলি (রা.), ৪. হযরত উবাই ইবনে কাব (রা.), ৫. হযরত আবু আইয়ুব আল-আনসারি (রা.), ৬. হযরত আবু জর আল-গিফারি (রা.), ৭. হযরত উম্মুল মুমিনিন হাফসা (রা.), ৮. হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা.), ৯. হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.) প্রমুখ।

খুলাফায়ে রাশেদিন পরবর্তী সাহাবিগণ (রা.)-এর আমলে ফিকহ: হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর শাসনামল থেকে হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত সময়কে ফিকহের তৃতীয় যুগ ধরা হয়। এ সময় মুসলমানদের মধ্যে নানা ধরনের মতবিরোধ ও কোন্দল দেখা দেয়। বিশেষ করে উমাইয়া শাসনামলের মাঝামাঝি সময়ে মুসলমানদের মধ্যকার আলিমগণ

দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েন। এক দল কেবল হাদিসের ওপর আমল করতেন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও ইজমা-কিয়াসের ধার ধারতেন না। তাদেরকে বলা হতো আহলুল হাদিস (أَهْلُ الْحَدِيْثِ)। অন্য দলটি কুরআন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াসের আলোকে সমস্যার সমাধান করতেন। তাদেরকে বলা হতো আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত (أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ)।

তাবেয়িদের যুগে ফিকহ: তাবেয়িগণের মধ্যে যাঁরা উঁচু স্তরের বিজ্ঞ আলিম ছিলেন তাঁরা সাহাবিগণের কাছে শরিয়তের ইলম অর্জন করেন এবং তাঁদের থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে কুরআন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াসের আলোকে মাসয়ালা মাসাইল নির্ণয়ে আত্মনিয়োগ করেন। তাবেয়িদের যুগের প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত ফিকহ একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রের মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়নি। হিজরি দ্বিতীয় শতকের গোড়ার দিকে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) (৮০-১৫০ হি.) সর্বপ্রথম ফিকহকে একটি শাস্ত্রে রূপদান করেন। তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টা, সাধনা ও অনুপ্রেরণায় তাঁর সমসাময়িক মুসলিম মনীষীগণ মাসয়ালা-মাসাইলকে গ্রন্থাবদ্ধ করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ফলে ফিকহশাস্ত্র (عِلْمُ الْفِقْهِ) নামক একটি জ্ঞানের স্বতন্ত্র ধারা উৎপত্তি লাভ করে।

ফিকহশাস্ত্রের ক্রমবিকাশ

স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর ফিকহশাস্ত্রের ক্রমবিকাশের গৌরবময় ধারা সূচিত হয়। সর্বমোট তিনটি পর্যায়ে ইসলামি শরিয়ার গ্রন্থাবদ্ধ এ ধারার পূর্ণ বিকাশ সাধিত হয়। যেমন—

প্রথম পর্যায় (১২১-৩০০ হিজরি)

হিজরি দ্বিতীয় শতকের তৃতীয় দশক থেকে তৃতীয় শতাব্দীর শেষ সময়কাল পর্যন্ত ফিকহশাস্ত্রের ক্রমবিকাশের প্রথম পর্যায়। একে ইজতিহাদের যুগও বলা হয়। কেননা এ সময় ইজতিহাদ বা গবেষণা প্রক্রিয়ায় ফিকহশাস্ত্র বিকশিত হয়। এ সময় ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সমকালীন মুজতাহিদ ফকিহদের মধ্য থেকে সেরাদের নিয়ে একটি 'গবেষণা পরিষদ' গঠন করেন। এ পরিষদ ইসলামি শরিয়তের প্রতিটি বিধান ও মূলনীতি নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা পরিচালনা করে। ব্যাপক আলোচনা, যুক্তিতর্ক ও পক্ষে-বিপক্ষে বক্তব্যের পর এক একটি বিধান লিখিত হতে থাকে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর এ গবেষণা পরিষদ ফিকহশাস্ত্রের ক্রমবিকাশে বিপুল গতি সঞ্চার করে। তাঁদের পথ অনুসরণ করে ইমাম মালিক (৯৩-১৭৯ হি), ইমাম শাফেয়ি (১৫০-২০৪ হি) এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১ হি) ফিকহ উদ্ভাবনের কাজ সম্পন্ন করেন।

এ পর্যায়েই ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর 'হানাফি মাযহাব' ইমাম মালিক (রহ.)-এর 'মালিকি মাযহাব', ইমাম শাফেয়ি (রহ.)-এর 'শাফিঈ মাযহব' এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর 'হাম্বলি মাযহাব' মুসলিম উম্মাহর সব পর্যায়ের মানুষের কাছে অনুসরণীয় যথার্থ ফিকহ পদ্ধতি হিসেবে পরিচিতি ও জনপ্রিয়তা পায়। সর্বসাধারণের শরিয়তের বিধান অনুশীলনের কাজ এ চারটি মাযহাবের যেকোনো একটির অনুসরণে চলতে থাকে।

তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এ পর্যায়েই ফিকহশাস্ত্রের গবেষণা ও উদ্ভাবনের নীতিনির্ধারক শাস্ত্র 'উসুল আল-ফিকহ' আত্মপ্রকাশ করে। ফলে মুজতাহিদদের গবেষণায় নিয়মতান্ত্রিকতা ও ইসলামি ধারা অক্ষুণ্ন রাখা সহজ হয়।

দ্বিতীয় পর্যায় (৩০১-৬৩৭/৬৩৮ হিজরি)

হিজরি চতুর্থ শতাব্দীর গোড়া থেকে সপ্তম শতাব্দীতে আব্বাসি খিলাফতের পতনের পূর্ব পর্যন্ত ফিকহশাস্ত্র ক্রমবিকাশের দ্বিতীয় পর্যায়। এ পর্যায়টিকে বলা হতো 'মাসয়ালা উদ্ভাবনের যুগ'। কেননা এ পর্যায়ে মাসয়ালা উদ্ভাবন প্রক্রিয়ায় ফিকহশাস্ত্রের দ্বিতীয় পর্যায়ের বিকাশ সাধিত হয়। অবশ্য এ পর্যায়ে ইমাম আবু হানিফা, মালিক, শাফেয়ি ও আহমদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর পরে নতুন কোনো মাযহাব গড়ে তোলার মতো ইমাম আবির্ভূত হননি। বরং তাদের বাইরে অন্য যেসব ছোটখাটো মাযহাব ছিল তা বিলুপ্ত হতে থাকে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ফিকহশাস্ত্র মাসয়ালা উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে পূর্ণতা পায়। এ যুগে তাকলিদ বা পূর্ববর্তী ইমামদের অনুসরণের ধারা শুরু হয়। মাসয়ালা উদ্ভাবন ও পূর্ণতার এ পর্যায়ে এমনকি ফিকহশাস্ত্রের ওপর উল্লেখযোগ্য কোনো মৌলিক গ্রন্থ রচিত হয়নি। এ যুগে পূর্ববর্তী যুগের ইমামদের প্রদত্ত মাসয়ালা এবং তার পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তিতর্ক নিয়েই নতুন গ্রন্থ রচিত হয়। মুজতাহিদগণ মৌলিক গবেষণার চেয়ে মাসয়ালা উদ্ভাবনের কাজেই বেশি সম্পৃক্ত থাকেন। অবশ্য এ পর্যায়ে মৌলিক গবেষণার জন্য তেমন বেশি কাজও অবশিষ্ট ছিল না। প্রথম পর্যায়ের ফকিহদের হাতে তা প্রায় পূর্ণতা লাভ করেছিল।

তৃতীয় পর্যায় (৬৩৮/৬৩৯ হিজরি)

আব্বাসি খিলাফতের পতন থেকে আজ পর্যন্ত ফিকহশাস্ত্রের ক্রমবিকাশের তৃতীয় পর্যায় অতিবাহিত হচ্ছে। এটাকে পরিপূর্ণভাবে তাকলিদ বা অনুসরণের যুগ বলা যায়। কেননা এ সময় মুজতাহিদগণ ও মুসলিম উম্মাহ পূর্ববর্তীদের পরিপূর্ণ অনুসরণ ছাড়া ফিকহশাস্ত্রের গতিপথ বদলে দেওয়ার বা উল্লেখ করার মতো তেমন কোনো কাজ করেননি। সর্বশেষ এ যুগে নতুন কোনো ইজতিহাদ হয়নি, বরং পূর্ববর্তী মুজতাহিদদের ফতোয়ার পূর্ণ অনুসরণ করা হয়। সম্ভাবনার ক্ষেত্রে তাঁদের মতামতই মূলনীতি হিসেবে প্রাধান্য পেয়েছে। নিরবচ্ছিন্ন অনুসরণের জন্য এ যুগ তাকলিদ বা অনুসরণের যুগ নামে খ্যাত।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, ফিকহশাস্ত্র কুরআন- সুন্নাহ থেকে উদ্ভূত হলেও প্রথমে তা ছিল বিক্ষিপ্ত অবস্থায়। হিজরি দ্বিতীয় শতকে এসে তাকে বিন্যস্ত করা হয় এবং তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যেই তার গ্রন্থনা স্বকীয় মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতা পায়। সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত এর বিকাশের ধারা অব্যাহত থাকে আর পরবর্তী যুগে সর্বাঙ্গীণ অনুসরণের আলোকে ফিকহশাস্ত্র পূর্ণ স্থিতি লাভ করে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কোন সময়ে 'ফিকহ' নামক কোনো আলাদা বিষয় ছিল না?

২. সূরা আত-তাওবার কত নম্বর আয়াতে لِيَتَفَقَّهُوا শব্দটি রয়েছে?

৩. মহানবি (সা.) একদল সাহাবি (রা.)-কে কোন মহল্লায় না পৌছে সালাত আদায়ে নিষেধ করেছিলেন?

৪. রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তেকালের পর থেকে হযরত আলি (রা.)-এর খিলাফতের শেষ পর্যন্ত সময়কে কী আমল বলা হয়?

৫. হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) কোন শ্রেণির ফকিহ সাহাবি?

৬. হিজরি কত শতাব্দীতে ফিকহশাস্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ হয়? */সকল বোর্ড ২০১৭/*

উত্তরের জন্য দেখো ২৫০ পৃষ্ঠা।

খ. একক কাজ

শিক্ষার্থীরা ফিকহশাস্ত্রের উৎপত্তি সম্পর্কে ১০টি বাক্যের একটি অনুচ্ছেদ লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ৫ ও ৬ ফিকহশাস্ত্রের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা
Importance and Necessity of Fiqh

ফিকহশাস্ত্রের উৎপত্তির ইতিহাসেই এ শাস্ত্রের বিপুল গুরুত্ব ও অসীম প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মহানবি (সা.)-এর ইন্তেকালের পর ইসলাম দিক-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে। নানা বর্ণের নানা ভাষার অসংখ্য মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়। বহু অনারব জাতির সংমিশ্রণে ইসলামে নিত্যনতুন সমস্যা জন্ম নিতে শুরু করে। কিন্তু ক্রমবর্ধিষ্ণু এ সমস্যার সরাসরি সমাধান কুরআন-হাদিসে ছিল না। সেজন্য সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে। সামাজিক সুবিচার ও ন্যায়নীতি বিঘ্নিত হওয়ার মারাত্মক আশঙ্কা দেখা দেয়। তৈরি হয় মতদ্বৈততা। প্রয়োজন হয় বাধ্যতামূলক বিস্তৃত গ্রন্থাবন্ধ আইনমালার। এ প্রয়োজন পূরণের ওপর নির্ভর করে ইসলামের সংহতি, ঐক্য এমনকি অস্তিত্ব। এমনি পরিপ্রেক্ষিতে একদল নিবেদিতপ্রাণ মুজতাহিদদের নিরন্তর সাধনায় ফিকহশাস্ত্র উৎপত্তি লাভ করে। ফলে মুসলিম ঐক্য রক্ষা পায়। অন্তহীন সমস্যার পাওয়া যায় যৌক্তিক ও বুদ্ধিভিত্তিক সমাধান। যা থেকে প্রতীয়মান হয় মুসলিম উম্মাহর জীবনধারায় ফিকহ এক বাস্তব প্রয়োজন। একে বাদ দিয়ে সুন্দর ও স্বাভাবিক মুসলিম জীবনের কথা চিন্তা করা যায় না। যাঁরা ইজমা, কিয়াস ও ইজতিহাদকে অপ্রয়োজনীয় মনে করে ফিকহ ব্যবস্থাকে অস্বীকার করার প্রয়াস চালায়, মূলত তারা মুখে মুখে অস্বীকারের বুলি আওড়ালেও বাস্তব জীবনে ফিকহে অবগাহন করেন। যুগ-যুগান্তরে ফকিহদের গবেষণা প্রসূত জ্ঞানের ফল যে ফিকহ-সেটা তারা ভোগ করেন অবলিলায়। ইসলামি শরিয়ত বা জীবন-বিধানের সব পর্যায়ে ফিকহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় একটি শাস্ত্র। যেমন–

১. **দীনের স্তম্ভ:** ফিকহশাস্ত্র ইসলামি শরিয়তের ব্যাবহারিক দিকের প্রধান ভিত্তি। সর্বসাধারণের জন্য দীনকে সহজবোধ্য করার এ এক অসাধারণ পদ্ধতি। এর মাধ্যমে সব দেশ ও কালের মুসলিমগণ অত্যন্ত সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যে দীনের অনুশীলন করতে পারেন। ফিকহের মাহাত্ম্য, গুরুত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে হাদিসে অসংখ্য বর্ণনা রয়েছে। ইমাম বায়হাকি (রহ.) ও দারে কুতনি বর্ণনা করেছেন–

لِكُلِّ شَيْءٍ عِمَادٌ وَعِمَادُ هٰذَا الدِّيْنِ اَلْفِقْهُ ـ

অর্থ: প্রত্যেক বস্তুরই খুঁটি রয়েছে। আর এ দীন ইসলামের খুঁটি হলো ফিকহ।

২. **কল্যাণলাভ:** ফিকহ ব্যক্তির পৃথিবীর জীবন শৃঙ্খলা ও শান্তিপূর্ণ করতে পারে। ইসলামি হুকুম-আহকাম অনুশীলনের মাধ্যমে সে মহান আল্লাহর প্রিয়পাত্রে পরিণত হয়। সেজন্য পার্থিব জীবনে ইসলামি জীবনযাপন করে পরকালীন মুক্তি এবং পার্থিব শান্তিলাভের জন্য ফিকহের জ্ঞানার্জন অত্যাবশ্যক। এর মাধ্যমে ব্যক্তি দু'জগতেই প্রভূত কল্যাণলাভ করতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَن يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا ـ

অর্থ: আর যাকে হিকমত বা ফিকহের জ্ঞানদান করা হয়েছে তাকে দেওয়া হয়েছে অশেষ কল্যাণ। নবি (সা.) বলেন— مَن يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ

অর্থ: আল্লাহ তাআলা যে ব্যক্তির কল্যাণ সাধনের ইচ্ছা করেন, তিনি তাকে দীন সম্পর্কে সূক্ষ্ম জ্ঞানদান করেন (বুখারি ও মুসলিম)।

৩. **শ্রেষ্ঠতম ইবাদত:** ফিকহশাস্ত্রের বিপুল গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কারণে এর চর্চা, অনুশীলনও শ্রেষ্ঠতম ইবাদতের শামিল। অন্য যেকোনো ইবাদত সম্পাদনের জন্য ফিকহচর্চা ও সাধনার গুরুত্ব বেশি। কেননা এর চর্চা সুন্দরভাবে ইবাদত সম্পন্ন করার পদ্ধতি বলে দেয়। এর সহায়তায় ব্যক্তির ইবাদত যথাযথ ও নিষ্ঠাপূর্ণ হয়। এজন্য রাসুলুল্লাহ (সা.) ফিকহচর্চার গুরুত্ব তুলে ধরে ইরশাদ করেছেন,

مَجْلِسُ فِقْهٍ خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ سِتِّيْنَ سَنَةً ـ

অর্থ: ফিকহচর্চার মজলিস ষাট বছরের ইবাদত থেকে উত্তম।

৪. **শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক:** ফিকহ ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বের প্রতীক। এর চর্চা, সাধনা, গবেষণা ও জ্ঞানার্জন তাকে শ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত করে। কেননা এর ফলে সে শরিয়তের সব বিধান সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে। সে জেনে যায় এসব বিধান প্রবর্তনের নেপথ্যে উদ্দেশ্য ও কারণ। শরিয়তের সবরকমের নির্দেশ ও বিধানাবলির অবস্থানগত মর্যাদা সম্পর্কেও সে সম্যক ধারণা লাভ করে। ফলে তাঁকে সহজেই বিপথগামী করা যায় না বরং সে মানুষের হেদায়েতের কারণে পরিণত হয়। এজন্যই মহানবি (সা.) বলেন—

فَقِيْهٌ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ.

অর্থ: একজন ফিকহশাস্ত্রবিদ এক হাজার আবিদের চেয়েও শয়তানের ওপর অধিক শক্তিশালী (বুখারি)। উল্লেখ্য, আবিদ হলেন এমন ব্যক্তি যার ফিকহের তেমন জ্ঞান নেই, কিন্তু অত্যন্ত ইবাদতগুজার।

৫. **সবশ্রেণির বিধান বর্ণনা:** কুরআন-হাদিসে কেবল মৌলিক ইবাদতের নির্দেশ এসেছে। মৌলিক ইবাদতের পাশাপাশি সহায়ক অন্যান্য ইবাদত ও হুকুম-আহকামের বর্ণনা এখান থেকে সরাসরি সংগ্রহ করা বেশ দুঃসাধ্য ব্যাপার। অথচ ব্যক্তির জীবনের সবক্ষেত্রে ও পর্যায়ে ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব, মুবাহ, হালাল, হারাম, মাকরুহ প্রভৃতি বিধান অনুশীলনের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট নির্দেশ থাকা জরুরি ছিল। ফিকহ এ প্রয়োজন পূরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে। সহায়ক ইবাদত ও হুকুম-আহকাম অনুশীলনের বাধা অপসারণ করতে ফিকহ সবশ্রেণির বিধানের বিস্তারিত বিবরণ উপস্থাপন করেছে।

৬. **শরয়ি বিধানের ব্যাখ্যা, বিন্যাস ও সহজ উপস্থাপনা:** কুরআন নাজিল সমাপ্তি ও রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তেকালের পর সর্বসাধারণের উপযোগী করে শরয়ি বিধান পরিবেশনের জন্য মূলনীতি ও বিধানাবলির চুলচেরা বিশ্লেষণ অনিবার্য হয়ে পড়ে। তাছাড়া কুরআন-হাদিসের অবিন্যস্ত ও বিক্ষিপ্ত বর্ণনা ইসলামি আইনের বিন্যাস ও সহজ উপস্থাপনার উপযোগিতা সৃষ্টি করে। ফিকহশাস্ত্র শরয়ি বিধানের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দেয়। বিধানগুলোর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুসারে এগুলোকে বিন্যস্ত করে সব দেশের সাধারণ মানুষের উপযোগী করে। সর্বোপরি এ শাস্ত্রবিধান বর্ণনার ক্ষেত্রে সহজ উপস্থাপনার রীতি গ্রহণ করে আপামর মুসলিম জনগোষ্ঠীর ধর্মানুশীলনকে সহজসাধ্য করেছে।

৭. **আমলের সহজীকরণ :** কুরআন ও হাদিসে যেসব মাসয়ালা-মাসায়িলের সরাসরি হুকুম-আহকাম বর্ণিত নেই, সেসব মাসয়ালার সমাধান পেতে মুজতাহিদগণ গবেষণায় লিপ্ত হন। তাদের গবেষণালব্ধ সমাধানের সুফল ভোগ করে সাধারণ মানুষ। এতে শরিয়তের বিধানাবলি মেনে চলা সহজতর হয়েছে।

৮. **ইসলামি শরিয়তের সংরক্ষণ:** রাসুলুল্লাহ (সা.) ও খুলাফায়ে রাশিদার স্বর্ণযুগের পর ইসলামে নিষিদ্ধ রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা শুরু হয়। এ ব্যবস্থায় পাপাচারী শাসকরা নিজেদের অন্যায়কে বৈধ করার জন্য ব্যাপক জাল হাদিস তৈরি করে। পাপাচারীরা ইচ্ছেমতো শরিয়তের বিধান প্রবর্তন ও পরিবর্তনের ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে। এ অব্যবস্থা ও অনৈতিকতা দূর করে ফিকহশাস্ত্র। এ শাস্ত্রে ব্যাপক গবেষণা শেষে ইসলামি শরিয়তের সম্ভাব্য সব বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে যে কারো পক্ষে এক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারিতা চালানোর সুযোগ তিরোহিত হয়।

৯. **ইসলামি আইনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ:** বিশ্বের মানবরচিত অন্যান্য মতবাদের ওপর ফিকহ ইসলামি আইনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনের সব রকমের সমস্যার এটি একটি পূর্ণাঙ্গ বিধান। অথচ অন্য কোনো আইনই পূর্ণাঙ্গ নয়। অবশ্য অপূর্ণাঙ্গ হলেও মানবরচিত আইন ধারাবাহিকতাসম্পন্ন এবং বিন্যস্ত। এর বিপরীতে ইসলামি আইনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য প্রয়োজন ছিল গ্রন্থাবদ্ধ, বিন্যস্ত, ধারাবাহিক ও অধ্যায়ভিত্তিক সমাধানের আইনগ্রন্থ। ফিকহশাস্ত্র এ প্রয়োজন পূরণ করেছে। পাশাপাশি বিন্যস্ত উপস্থাপনার মাধ্যমে সব আইনের ওপর এর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে।

১০. **যুগের চাহিদা পূরণ:** ইসলামি শরিয়তে কুরআন-হাদিসের পরেই ফিকহশাস্ত্রের স্থান। কেননা কুরআন-হাদিসে পেশকৃত বিধানাবলিই সুবিন্যস্ত ধারাবাহিকতায় সর্বসাধারণের উপযোগী করে এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া গতিশীল মানবজীবনে প্রতিনিয়ত উদ্ভূত সমস্যাবলির মোকাবিলা করার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত ফিকহশাস্ত্র এক অনিবার্য প্রয়োজন হয়েই থাকবে। কেননা নতুন জন্ম নেওয়া সব সমস্যা সমাধানের বাস্তবভিত্তিক সমাধানের ব্যবস্থাপনা হলো ফিকহ।

১১. **মহান আল্লাহ নির্দেশিত বিষয়:** ফিকহের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা নিহিত রয়েছে আল্লাহ তাআলার ঘোষণায়। এতে মহান আল্লাহ সব সময়ের জন্য একটি বিশেষ দলকে ফিকহচর্চা ও গবেষণায় নিয়োজিত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ -

অর্থ: এরপর তাদের প্রত্যেক দলের একটি করে উপদল কেন বের হলো না, যাতে তারা দীনের জ্ঞানলাভ করে এবং তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়কে সতর্ক করে (সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ১২২)।

বস্তুত ইসলামি শরিয়তের পূর্ণতা, সর্বজনীনতা, সর্বকালোপযোগিতা এবং সর্বাধিক যৌক্তিক মানবিকতার বাস্তব নিদর্শন হলো ফিকহশাস্ত্র। সুতরাং কোনোভাবেই একে উপেক্ষা করা যায় না। এর প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ইসলামি শরিয়তের ব্যবহারিক দিকের প্রধান ভিত্তি কী?

২. দীন ইসলামের খুঁটি কী?

৩. আল্লাহ তাআলা যে ব্যক্তির কল্যাণ সাধনের ইচ্ছা করেন, তাকে কী দান করেন?

৪. ফিকহ চর্চার মজলিস কত বছরের ইবাদত থেকে উত্তম?

৫. একজন ফিকহশাস্ত্রবিদ কত জন আবিদের চেয়েও শয়তানের ওপর অধিক শক্তিশালী?

উত্তরের জন্য দেখো ২৫০ পৃষ্ঠা।

খ. একক কাজ

শিক্ষার্থীরা ফিকহশাস্ত্রের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার ওপর দশ বাক্যের একটি অনুচ্ছেদ লিখে শ্রেণিশিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৭

মাযহাবের সংজ্ঞা এবং বিভিন্ন মাযহাব উৎপত্তির কারণ
Definition of Mazhab and the Reason for the Origin of Different Mazhabs

ইসলাম তার অনুসারীদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি অনিবার্য করে। আল্লাহ তাআলা বলেন— 'তোমরা ঐক্যবন্ধভাবে মহান আল্লাহর দীনকে ধারণ করো এবং বিচ্ছিন্ন হয়ো না।' সেজন্য তার অনুসারীদের মধ্যে কোনো বিভেদ ও পার্থক্য স্বীকার করা হয় না। তাই বলে ইসলামে সংকীর্ণতাও নেই, নেই গোঁড়ামি। চিন্তাশীল মানুষের জন্য মুক্তবুদ্ধিচর্চার সবরকম সুযোগ রয়েছে এখানে। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তেকালের পর ইসলাম বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। মুসলিমদের নতুন নতুন সমস্যা সমাধানের জন্য গবেষণার প্রয়োজন পড়ে। ইসলামের উদার গবেষণা নীতিতে মুসলিম মনীষীগণ গবেষণায় নিয়োজিত হন। ফলে গড়ে ওঠে বিভিন্ন মতবাদ ও চিন্তাগোষ্ঠী। আল্লাহ তাআলা ও রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশনায় গড়ে ওঠা এসব মতবাদই 'মাযহাব' নামে পরিচিত।

মাযহাবের সংজ্ঞা

مَذْهَبٌ (মাযহাব)— শব্দটি একবচন। এর বহুবচন مَذَاهِبُ (মাযাহিবু)। এর অর্থ: চলার পথ, ধর্মমত, বিশ্বাস। এর আরবি প্রতিশব্দ হলো اَلطَّرِيْقُ (তরিক) বা রাস্তা, অনুসৃত পথ।

সাধারণভাবে বলা যায়, ইসলামি শরিয়তের বিভিন্ন আইন-কানুন, আমল, লেনদেন, পারস্পরিক মেলামেশা ও ইবাদত সম্পর্কিত মৌলিক আকিদাগত বিষয় অভিন্ন রেখে এগুলোর ব্যাবহারিক দিক ও শাখা-প্রশাখাতে যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন মুজতাহিদদের বিভিন্ন মতামত প্রকাশের পরিপ্রেক্ষিতে যেসব ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ গড়ে উঠেছে তাকে মাযহাব বলে। অন্যভাবে বলা যায়— মুজতাহিদদের উদ্ভাবিত মূলনীতির আলোকে বের হওয়া মাসয়ালার নাম মাযহাব।

বিভিন্ন মাযহাব উৎপত্তির কারণ

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে মুসলিমদের মধ্যে মতবিরোধের সুযোগ ছিল না। খুলাফায়ে রাশিদার স্বর্ণযুগেও কোনো মাযহাব জন্ম নেয়নি। কিন্তু এর পরবর্তী সময় নানা ঘটনা, কারণ ও পরিপ্রেক্ষিত ইসলামে বিভিন্ন মাযহাবের জন্ম দেয়। যেমন-

১. **ইসলামের প্রসার ও বিশ্বজনীন প্রেরণা:** রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তেকালের অল্পকালের মধ্যেই ইসলাম দূর-দূরান্তে বিস্তৃত হয়। বিভিন্ন ধর্ম, গোত্র, অঞ্চল, বর্ণ ও সম্প্রদায়ের মানুষ এ ধর্ম গ্রহণ করে। বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় একই সময় এমন সব লোকের মধ্যে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে, চিন্তা ও দর্শনের ক্ষেত্রে যাদের বিভেদের অন্ত ছিল না।
এসব স্থানের লোকদের দীর্ঘদিন আচরিত ধর্ম ও সংস্কৃতির ভিন্নতার কারণে ধর্ম অনুশীলনের ক্ষেত্রেও ভিন্নতা দেখা দেয়। এক্ষেত্রে বিজিত জাতিসমূহের শিক্ষা-সংস্কৃতি, সভ্যতা ও ঐতিহ্যের যতটুকু সম্ভব তা গ্রহণ করে মুসলিম জাতি ইসলামের বিশ্বজনীন ভাবমূর্তি গড়ে তোলার প্রয়াস পায়। জাতিগত পর্যায়ে বিভিন্ন মতপার্থক্য সমর্থন এবং অপর সংস্কৃতির সাথে মুসলিম সংস্কৃতির এ সমন্বয় প্রচেষ্টা ইসলামে বিভিন্ন মাযহাব তৈরির পথ সুগম করে।

২. **আইন ব্যাখ্যাদাতার সংখ্যাধিক্য:** রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে আইন প্রণয়ন ও ব্যাখ্যার একমাত্র অধিকার ছিল তাঁর নিজের। কোনো নতুন সমস্যার উদ্ভব হলে কিংবা সাহাবিদের মনে নতুন কোনো জিজ্ঞাসা জন্ম নিলে তাঁরা সাথে সাথে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছ থেকে তার সমাধান জেনে নিতেন। ফলে এ সময় মুসলমানদের মধ্যে কোনো মতবাদগত ভিন্নতা তৈরি হতে পারেনি। সাহাবিদের যুগে আইন ব্যাখ্যাকারী হিসেবে সব সাহাবি (রা.)-ই ভূমিকা পালন করেন। তাবেয়ি ও তাদের পরবর্তী যুগে এ সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পায়। আইন ব্যাখ্যাকারী এসব ব্যক্তিদের ভিন্নতা ও বিপুল সংখ্যাধিক্যের কারণে তাদের পারস্পরিক ব্যাখ্যায় পার্থক্য তৈরি হতে থাকে। আর এর পথ ধরেই জন্ম নেয় বিভিন্ন মাযহাব।

৩. **কুরআন-হাদিসে বিভিন্নার্থক শব্দের ব্যবহার:** কুরআন মাজিদ ও হাদিসে একাধিক অর্থবোধক এবং ব্যাপক ভাবসম্পন্ন অসংখ্য শব্দের উপস্থিতি রয়েছে। এসব শব্দ একই সাথে বিভিন্ন রকমের তাৎপর্য বহন করে। মুজতাহিদগণ দীনি মাসয়ালা উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে এ জাতীয় শব্দের বিভিন্ন অর্থ থেকে একটিমাত্র অর্থকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এর যেকোনো একটি অর্থকে প্রাধান্য দেওয়া নিয়েই মুজতাহিদদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ফলে সৃষ্টি হয়েছে নানারকম মতবাদ। আর এর পথ ধরেই জন্ম নিয়েছে ভিন্ন ভিন্ন মাযহাব।

৪. **হুকুমের ধরন নিয়ে মতবিরোধ:** আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুল (সা.) বিভিন্ন প্রসঙ্গে মুসলিম উম্মাহর জন্য প্রয়োজনীয় হুকুম-আহকাম দিয়েছেন। এগুলোর মধ্যে কিছু হুকুম খাস বা নির্দিষ্ট। এগুলো কেবল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জন্য নির্দিষ্ট। অন্যরা এর আওতাবহির্ভূত। আবার কিছু হুকুম আছে আম বা সর্বজনীন। সাধারণভাবে সবাই এ হুকুম পালনে বাধ্য। কুরআন-হাদিসের হুকুম-আহকামের মধ্যে কোনটি আম আর কোনটি খাস তা নিয়ে মতবিরোধের কারণেও শরয়ি বিধান উদ্ভাবনে মুজতাহিদদের মধ্যে মতবিরোধ হয়। যার ফলে মাযহাব উৎপত্তি লাভ করে।

৫. **অর্থ গ্রহণের দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য:** কুরআন-হাদিসের অর্থ গ্রহণে মুজতাহিদগণ কেউ কেউ আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করেন এবং সে হিসেবে মাসয়ালা উদ্ভাবন করেন। কেউ কেউ পারিভাষিক অর্থ গ্রহণ করেন এবং সে হিসেবেই মাসয়ালা উদ্ভাবন করেন। অর্থগ্রহণের দৃষ্টিভঙ্গিগত এ পার্থক্যের জন্য ইমামদের উদ্ভাবিত মাসয়ালায় পার্থক্য গড়ে ওঠে। এর ফলে মাযহাব উৎপত্তি লাভ করে।

৬. **মাসয়ালা রচনার নীতিগত তারতম্য:** ইমামদের গবেষণা পদ্ধতি ও মাসয়ালা উদ্ভাবন প্রক্রিয়া একরকম ছিল না। তাদের কেউ হাদিসের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন বেশি, কেউ গুরুত্ব দিয়েছেন ইজমা বা কিয়াসে। দলিল হিসেবে হাদিস গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন নীতি গ্রহণ করেছিলেন। মাসয়ালা রচনায় গৃহীত তাদের পৃথক নীতি এবং তাদের জ্ঞান ও দক্ষতাগত এ তারতম্যের জন্যও ইসলামে বিভিন্ন মাযহাব জন্মলাভ করে।

বিভিন্ন রকম মাযহাব

ইসলামে যেসব মাযহাবের উদ্ভব ঘটে তার মধ্যে কিছু রাজনৈতিক, কিছু ধর্মতাত্ত্বিক এবং কিছু দার্শনিক। ধর্মীয় রাজনৈতিক মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত হলো শিয়া, খারিজি ও সুন্নি মাযহাব। ধর্মতাত্ত্বিক মাযহাবের মধ্যে রয়েছে জাবরিয়া, কাদরিয়া, মুরজিয়া ও সিফাতিয়া মাযহাব আর দার্শনিক মাযহাব হিসেবে মুতাযিলা, আশারিয়া, সুফি ও ফালাসিফা মাযহাব প্রসিদ্ধি পেয়েছে।

ফিকহশাস্ত্রের মাযহাব

ফিকহশাস্ত্রের চারটি মাযহাব প্রসিদ্ধি পেয়েছে। এগুলো ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মাযহাব 'সুন্নি' মাযহাবের আওতাভুক্ত। পৃথিবীর সব সুন্নি মুসলিমই এ মাযহাবগুলোর কোনো না কোনো একটির অনুসরণ করেন। কেননা মুসলিম উম্মাহ এ মাযহাব চারটির সত্যতার ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছেছে। তারা এ সিদ্ধান্তেও একমত হয়েছেন যে, যেকোনো মুসলিমকেই এককভাবে কেবল যেকোনো একটি মাযহাবের অনুসরণ করতে হবে। একজন মুসলিম একাধিক মাযহাবের অনুসরণ করতে পারবেন না। মাযহাব চতুষ্টয় হলো— (ক) হানাফি মাযহাব (খ) শাফিঈ মাযহাব (গ) মালিকি মাযহাব ও (ঘ) হাম্বলি মাযহাব।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ইসলাম তার অনুসারীদের মধ্যে কী অনিবার্য করে?
২. مَذْهَبٌ (মাযহাব) শব্দের অর্থ কী?
৩. মুজতাহিদদের উদ্ভাবিত মূলনীতির আলোকে বের হওয়া মাসয়ালাকে কী বলে?
৪. রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে আইনপ্রণয়ন ও ব্যাখ্যায় একমাত্র অধিকার ছিল কার?
৫. সাহাবিদের যুগে আইনব্যাখ্যাকারী হিসেবে কারা ভূমিকা পালন করেন?
৬. ইসলামে ধর্মীয়-রাজনৈতিক মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত কারা?

উত্তরের জন্য দেখো ২৫০ পৃষ্ঠা।

খ. একক কাজ

শিক্ষার্থীরা মাযহাবের উৎপত্তির কারণ সম্পর্কে ১০টি বাক্য লিখে শ্রেণিশিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৮

হানাফি মাযহাব
Hanafi Mazhab

হানাফি মাযহাবের প্রবর্তক ও প্রতিষ্ঠাতা ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) (৮০ - ১৫০ হি.)। আইনতত্ত্বের সূত্র ও নীতি প্রণয়নে তিনি ব্যক্তিগত বিচার-বুদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করতেন বলে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাযহাবকে 'আহলুর রায়' বলে অভিহিত করা হয়। ইসলামি আইনতত্ত্বের প্রবর্তক তিনি। ইসলামি আইন বিন্যস্ত ও বিধিবন্ধ করার মূল কৃতিত্ব তাঁর। এর পূর্বে আইনের সহায়ক উৎস হিসেবে কিয়াসের প্রবর্তন থাকলেও পরিপূর্ণ মর্যাদায় তিনিই একে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বাস্তব চাহিদাভিত্তিক আইন প্রণয়নের জন্য 'ইসতিহসান' নীতি প্রবর্তন করেন।

'হানাফি মাযহাব' প্রবর্তনের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তাঁর শ্রেষ্ঠ চল্লিশ জন শিক্ষার্থী নিয়ে একটি 'ফিকহ সম্পাদনা পরিষদ' গঠন করেছিলেন। সুদীর্ঘ ২২ বছরের সাধনা শেষে ১৪৪ হিজরিতে এ পরিষদ তাদের কাজ শেষ করে। হানাফি মাযহাবের বেশির ভাগ মাসয়ালা সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত গ্রন্থে স্থান পায় । গ্রন্থটি 'কুতুবে আবু হানিফা' নামে খ্যাতিলাভ করে। এ গ্রন্থে ৮৩ হাজার মাসয়ালা সন্নিবেশিত হয় যার মধ্যে ৪৫ হাজার বাস্তব জীবন সম্বন্ধে।

হানাফি মাযহাবকে আরো প্রণালিবন্ধ ও সংহত করেন ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর শ্রেষ্ঠ দুই শিক্ষার্থী ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)। স্বাধীন মতামত প্রয়োগের জন্য আব্বাসি খলিফারা হানাফি মাযহাবকে বিশেষ সম্মানের চোখে দেখতেন। বর্তমানে বিশ্বের তিন-চতুর্থাংশ মুসলিম হানাফি মাযহাবের অনুসারী।

হানাফি মাযহাবের বৈশিষ্ট্য

ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) প্রবর্তিত ফিকহ কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়ার কারণে তা মুসলিম বিশ্বে সর্বাধিক প্রসিদ্ধি ও প্রসার লাভ করেছে। যেমন—

১. হানাফি ফিকহের মাসয়ালাসমূহ তত্ত্ব, তথ্য হিকমত ও কল্যাণকামিতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন— اَلدِّيْنُ اَلنَّصِيْحَةُ **অর্থ:** কল্যাণকামিতাই হচ্ছে দীন ও বা ধর্ম। ইসলামে এমন কোনো বিধান নেই, যা মানুষের কল্যাণে প্রবর্তিত হয়নি। অর্থাৎ প্রতিটি বিধিবিধানের ক্ষেত্রে মানবজাতির কল্যাণ নিহিত রয়েছে। যেমন— সালাত তথা নামাজের বিধান দেওয়া হয়েছে, মানবজাতিকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য। মহান আল্লাহ বলেন— إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ **অর্থ:** নিশ্চয়ই নামাজ মানুষকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে (সূরা আল-আনকাবুত, আয়াত: ৪৫)। এভাবে জাকাত, সাওম, হজ মানুষকে সামাজিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব পালনের শিক্ষা দেবে।

২. অন্যান্য মাযহাবের তুলনায় হানাফি ফিকহ একান্তই সহজ ও অনায়াস সাধ্য। যেমন— ইসলামের বিধান হচ্ছে চুরি করলে হাত কাটা যাবে। তবে হানাফি ফিকহ এক্ষেত্রে বেশকিছু অবকাশ রেখেছে। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক চুরি, কুরআন মাজিদ চুরি, কাফন চুরি এবং পিতার সম্পদ পুত্র চুরি করলে এ মাযহাব অনুযায়ী হাত কাটা যাবে না। কিন্তু অন্যান্য মাযহাবে হাত কাটা যাবে। এমনিভাবে চোর যদি শিশু হয় বা এক স্বর্ণমুদ্রার কম অর্থ চুরি করা হয় অথবা কয়েকজনে মিলে এক স্বর্ণমুদ্রা চুরি করে হানাফি ফিকহে তাদেরও হাত না কাটার বিধান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য মাযহাব এক্ষেত্রেও কোনো ছাড় দেয়নি।

৩. হানাফি ফিকহে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) মানুষের পার্থিব প্রয়োজনাদি তথা লেনদেন ও আচরণের ক্ষেত্রে গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও তত্ত্ব উপলব্ধির সাথে কাজ করেছেন। যেমন— শাফিঈ মাযহাবে প্রাপ্তবয়স্ক কন্যা তার নিজের বিয়ের হকদার নয়, বরং এ অধিকার অভিভাবকদের। কিন্তু হানাফি মাযহাবে বিয়ের ক্ষেত্রে পূর্ণ অধিকার প্রাপ্তবয়স্কা কন্যার নিজের। কেননা ইসলাম নর-নারীকে সমান মর্যাদা দিয়েছে।

৪. হানাফি ফিকহ ইসলামি রাষ্ট্রের জিম্মি বা জিযিয়া কর দানকারী অমুসলিম নাগরিকদের একান্ত উদারতার সাথে স্বাধীনভাবে নিজেদের অধিকার ভোগের সুযোগ দিয়েছে। যেমন— জিম্মির রক্ত মুসলিমদের রক্তের মতো নিরাপদ। তারা স্বাধীন ব্যবসা করতে পারবে। তাদের ব্যক্তিগত আচরণ নিজস্ব ধর্মীয় বিধানের আলোকেই পরিচালিত হওয়ার সুযোগ থাকবে। কিন্তু অন্যান্য মাযহাবে ব্যক্তিগত আচরণের কিছু কিছু বিষয় নিয়ন্ত্রণের অভিমত রয়েছে।

৫. যেসব আহকাম নস বা কুরআন-হাদিসের মাধ্যমে সাব্যস্ত এবং যে ক্ষেত্রে ইমামদের মতবিরোধ রয়েছে, সেক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সাধারণত এমন দিক গ্রহণ করেছেন, যেটি অধিকতর শক্তিশালী ও প্রামাণ্য। যেমন— শাফিঈ মাযহাবে ওজুর ফরজ ছয়টি। মালিকি ও হাম্বলি মাযহাবেও এ সংখ্যা ছয় কিংবা ছয়ের বেশি। কিন্তু হানাফি ফিকহে অজুর ফরজ চারটি। কেননা কুরআন মাজিদে চারটি ফরজের কথাই স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে।

৬. হানাফি মাযহাবে কুরআন-হাদিসের বিধানসমূহকে অত্যন্ত দৃঢ় ও যুক্তিগ্রাহ্য দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

৭. ইসলামি তাহযীব-তামাদ্দুন, শিক্ষা-সংস্কৃতির জন্য যা কিছু অত্যাবশ্যকীয় অন্যান্য ফিকহের তুলনায় তা হানাফি ফিকহের মধ্যেই বেশি পরিমাণে বিদ্যমান।

৮. হানাফি মাযহাবে আইনের উৎস হিসেবে কিয়াসের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

৯. অধিকতর মানবিক বিধান প্রবর্তনের জন্য এ মাযহাবে 'ইসতিহসান' নীতি প্রবর্তিত হয়েছে।

১০. এ মাযহাবের মাসয়ালাগুলোর মধ্যে যেগুলো নস দিয়ে প্রমাণিত সেগুলো পুরোপুরি নসভিত্তিক আর যেগুলো নসের মূলনীতিতে নতুনভাবে উদ্ভাবিত সেগুলো অধিকতর যুক্তিভিত্তিক।

হানাফি মাযহাবের অনুসৃত কিতাবসমূহ

হানাফি ফিকহ যেসব গ্রন্থের অনুসরণ করে বা যে গ্রন্থগুলোকে হানাফি ফিকহের ভিত্তি বলা যায় অথবা যে গ্রন্থগুলোতে হানাফি ফিকহের বিভিন্ন বিষয় পেশ করা হয়েছে তার সংখ্যা বিপুল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো ফিকহ আল-আকবর, কুতুবে আবু হানিফা, জামিউস সগির, জামিউল কবির, মাবসুত, কুদুরি, হিদায়া, কিতাবুল খারাজ, কিতাবুস সুনান, কানযুদ দাকাইক, শামি, শরহে মায়ানিয়াল আছার প্রভৃতি।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. হানাফি মাযহাবের প্রবর্তক ও প্রতিষ্ঠাতা কে?
২. ইমাম আজম আবু হানিফা (রহ.) প্রতিষ্ঠিত হানাফি মাযহাবকে আর কী বলে অভিহিত করা হয়?
৩. ইসলামি আইনতত্ত্বের প্রবর্তক কে?
৪. কোন ইমাম ৪০ জনের সম্পাদনা পরিষদ গঠন করেন? *[সকল বোর্ড ২০১৭]*
৫. 'ইমাম আজম' কার উপাধি?
৬. ইমাম আজম আবু হানিফার (রহ.) দুজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থীর নাম লেখো।

উত্তরের জন্য দেখো ২৫০ পৃষ্ঠা।

খ. একক কাজ

শিক্ষার্থীরা হানাফি মাযহাবের ৫টি বৈশিষ্ট্য বাড়ি থেকে লিখে এনে শিক্ষককে দেখাবে।

গ. দলীয় কাজ

শিক্ষার্থীরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে একদল হানাফি মাযহাবের পরিচয় এবং অপর দল হানাফি মাযহাবের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করবে।

পাঠ ৯ মালিকি মাযহাব
Maliki Mazhab

মদিনায় ইমাম মালিক বিন আনাস (রহ.) (৯৩-১৭৯ হি.) প্রতিষ্ঠা করেন মালিকি মাযহাব। তিনি তাঁর সমকালে সর্বশ্রেষ্ঠ হাদিস বিশেষজ্ঞ ছিলেন। এ কারণে তিনি ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধির চেয়ে হাদিসের ওপর বেশি নির্ভর করতেন। 'মুসলাহাত' বা জনকল্যাণ নীতির প্রবক্তা ছিলেন ইমাম মালিক (রহ.)। কুরআন, হাদিস, ইজমা, কিয়াস ছাড়াও তিনি 'ইসতিসলাহ'-কে মুসলিম আইনের পঞ্চম উৎস বলে গণ্য করতেন। ইমাম মালিক (রহ.) দীর্ঘ ৫০ বছর শিক্ষা ও ফতোয়া দানের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। ফরজ হজ আদায়ের উদ্দেশ্যে তিনি একবারই মদিনার বাইরে মক্কায় গিয়েছিলেন। এরপর তিনি মদিনা থেকে আর বাহির না হলেও বিশ্বের বিভিন্ন এলাকা থেকে শিক্ষার্থীরা তাঁর কাছে হাদিস শিখতে আসেন এবং তারাই মালিকি মাযহাবকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেন।

মালিকি মাযহাবের বৈশিষ্ট্য

ইমাম মালিক (রহ.) প্রবর্তিত মালিকি মাযহাব মদিনাবাসীদের বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কঠোরতা এ মাযহাবের জনপ্রিয় না হওয়ার কারণ হয়ে উঠেছে। এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো—

১. মালিকি মাযহাবে সব যুক্তিতর্কের ওপর কুরআন ও হাদিসের দলিলকে প্রাধান্য দিতেন।

২. যদিও বাহ্যত মনে হয় মালিকি মাযহাবে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে হাদিসের ওপর কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। মালিকি ফিকহ রচনায় স্বাভাবিকভাবেই সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে কুরআন মাজিদ।

৩. মালিকি ফিকহর মূলভিত্তি হলো মদিনাবাসীর আমল। কেননা মদিনা হচ্ছে ইসলামের লালনক্ষেত্র। মদিনার অধিবাসীরা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে ছিলেন। এসব কারণে এ মাযহাবে তাঁদের আমল বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে।

৪. মদিনার অধিবাসী হিসেবে ইমাম মালিক (রহ.) সম্ভবত এর প্রতি একটু বেশিই গুরুত্ব দিয়েছিলেন। মাসয়ালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে তিনি মদিনাবাসীর অভ্যাস ও মদিনায় প্রচলিত প্রথাকেও বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

৫. মালিকি ফিকহে কিয়াসের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর পরে অন্য কোনো ইমাম কিয়াসের এমন ব্যবহার আর করেননি। তবে অবস্থা ও প্রয়োগগত ক্ষেত্রে মালিকি ফিকহে কিয়াস ব্যবহারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে।

৬. এ মাযহাবে 'ইসতিসলাহ'[1]কে মুসলিম আইনের পঞ্চম উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

৭. মালিকি ফিকহে মুসলাহাত বা জনকল্যাণ নীতির ভিত্তিতে মাসয়ালা উদ্ভাবন করা হয়েছে।

৮. এ মাযহাবে অমুসলিমদেরকে পূর্ণ স্বাধীনতা ও অধিকার দেওয়া হয়নি।

মালিকি মাযহাবের অনুসৃত কিতাব

মালিকি ফিকহ যেসব গ্রন্থের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে ফিকহি মালিকি, মুয়াত্তা, আস-সুন্নাহ, আল-ওয়াদিয়াহ, কিতাবুল মানাসিক, কিতাবুল মাজালিসাত, রিসালাতুল ফিল আকাদিয়া, আল-মুদাওয়ানাতুল কুবরা প্রভৃতি।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মালিকি মাযহাব প্রতিষ্ঠা করেন কে?
২. কোন ইমাম ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধির চেয়ে হাদিসের ওপর বেশি নির্ভর করতেন?
৩. ফিকহশাস্ত্রে 'মুসলাহাত' বা জনকল্যাণ নীতির প্রবক্তা কে ছিলেন?

উত্তরের জন্য দেখো ২৫০ পৃষ্ঠা।

[1] ইসতিসলাহ শব্দের অর্থ: জনকল্যাণ। জনগণের কল্যাণে যে আইন প্রণীত হয় তাকে ইসতিসলাহ বলে।

পাঠ ১০ শাফিঈ মাযহাব
Shafie Mazhab

শাফিঈ মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম শাফেয়ি (রহ.) (১৫০-২০৪ হিজরি)। তিনি দুটি পর্যায়ে তাঁর মাযহাব প্রবর্তনের কাজ সম্পন্ন করেন। ১৯৫ হিজরিতে জ্ঞানসাধনায় খ্যাতি ও বিজ্ঞতার শীর্ষে আরোহণের পর তিনি হানাফি ও মালিকি মাযহাবের সমন্বয়ে ইরাকে একটি মাযহাব গড়ে তোলেন। এটি তাঁর মাযহাবে কাদিম বা পুরনো মাযহাব। এরপর ১৯৮ হিজরিতে ইমাম শাফেয়ি মিসর গমন করেন। মিসরের জীবনযাত্রা, লোকদের জীবনদর্শন ও চিন্তাধারার আলোকে তিনি তাঁর মাযহাবে বেশকিছু পরিবর্তন নিয়ে আসেন। ফলে গড়ে ওঠে তাঁর মাযহাবে জাদিদ বা নতুন মাযহাব।

ইমাম শাফেয়ি (রহ.) প্রতিষ্ঠিত মাযহাবের আইনকানুন খুব রক্ষণশীল ছিল না আবার খুব যুক্তিভিত্তিকও না। এ মাযহাব মধ্যমপন্থি। এখানে ইজমা ও কিয়াস অত্যন্ত উদারভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। শাফিঈ মাযহাবে কুরআন ও হাদিসের বিভিন্ন বিধানে সবসময় সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে।

শাফিঈ মাযহাবের বৈশিষ্ট্য

ইমাম শাফেয়ি (রহ.) একটি মধ্যমপন্থি মাযহাব প্রবর্তন করেছেন। তাঁর মাযহাবে বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে সমন্বয়সাধনের প্রবল প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। এ মাযহাবের বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে—

১. শাফিঈ মাযহাবে আল-কুরআনের সুস্পষ্ট ভাষ্যকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করে তা বাহ্যিকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে।
২. এ মাযহাবে হাদিসকে দ্বিতীয় পর্যায়ের দলিল হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। কিন্তু মাসয়ালা নির্ধারণের ক্ষেত্রে হাদিসকে কুরআনের সমকক্ষ বিবেচনা করা হতো।
৩. এ ফিকহে হাদিসকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে কোনোরূপ শর্তারোপ করা হয়নি। অর্থাৎ হাদিসের ওপর তার রাবি আমল করেছে কি করেনি, কিংবা হাদিস মাশহুর কি না তা বিবেচনা করা হয়নি।
৪. শাফিঈ মাযহাবে কুরআনের মতো হাদিসকেও আমল ফরজকারী সাব্যস্ত করেছে। যেমন— অজুর ক্ষেত্রে শাফিঈ মাযহাবে ছয়টি ফরজের কথা বলা হয়েছে।
৫. এ মাযহাবে তাবেয়িদের যুগ পরবর্তী ইজমাকে বৈধ বিবেচনা করা হয়নি।
৬. মদিনার হাদিসকে তিনি নিঃশর্তে গ্রহণ করতেন।
৭. কিয়াসের নীতি তিনি খুব কমই গ্রহণ করতেন।
৮. হুকুম প্রদানের ক্ষেত্রে তিনি অনেকটা কঠিন নীতি অনুসরণ করতেন।

শাফিঈ মাযহাবের অনুসৃত কিতাব

শাফিঈ মাযহাবে যেসব কিতাব লিপিবদ্ধ হয় এবং পরে যেসব কিতাব অনুসরণে তা পরিচালিত হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো— হাবি, উসুলিয়াহ, আর-রিসালাহ, কিতাবুল-উম্ম, আল-মুখতাছার, ইবনুল-ফিরকাহ, নিহায়াতুল-মাতলাব, মিনহাজুত-তালিবীন, কিতাবু ইখতিলাফ আল হাদিস প্রভৃতি।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ইমাম শাফেয়ি (রহ.) তাঁর মাযহাবে কাদিম বা পুরনো মাযহাব কোথায় গড়ে তোলেন?
২. ইমাম শাফেয়ি (রহ.) কত হিজরিতে ফিকহি মাযহাব প্রতিষ্ঠা করেন? *[সকল বোর্ড ২০২৫]*
৩. কোন ফিকহে হাদিসকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে কোনোরূপ শর্তারোপ করা হয়নি?
৪. অজুর ক্ষেত্রে শাফিয়ি মাযহাবে কয়টি ফরজের কথা বলা হয়েছে?
৫. কোন মাযহাবে তাবেয়িদের যুগপরবর্তী ইজমাকে বৈধ বিবেচনা করা হয়নি?

উত্তরের জন্য দেখো ২৫০ পৃষ্ঠা।

পাঠ ১১ হাম্বলি মাযহাব Hamboli Mazhab

চতুর্থ ও শেষ স্বীকৃত ফিকহি মাযহাব 'হাম্বলি মাযহাবের' প্রতিষ্ঠাতা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) (১৬৪-২৪১ হিজরি)। হাদিসের সর্বাত্মক ও সঠিক অনুসরণই ছিল তাঁর প্রবর্তিত আইনের মূলকথা। তিনি আইন তত্ত্বের চেয়ে হাদিসেই ছিলেন বেশি দক্ষ। মাসয়ালা উদ্ভাবনে তিনি ইজমা ও কিয়াসকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন না। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) মুতাযিলাদের যুক্তিবাদী মতবাদের বিরুদ্ধে তাঁর মতবাদ গড়ে তোলেন। তিনি তাদের সাথে প্রকাশ্যে বিতর্কে লিপ্ত হন। এসব বিতর্ক সভায় লক্ষ লোকের সমাগম হতো। সমবেত লোকদের মাধ্যমে হাম্বলি মাযহাব দ্রুত প্রসারিত হয়। হিজরি চতুর্থ শতকের মধ্যে এ মাযহাব ইরাকের বাইরে প্রচারিত হয়। সপ্তম শতাব্দীতে তা মিসরে দারুণ সমাদৃত হয়। কিন্তু শীঘ্রই এর গ্রহণযোগ্যতা কমতে থাকে। কেননা ইমাম আহমদ (রহ.) ছিলেন রক্ষণশীল চিন্তাবিদ। অতিরিক্ত রক্ষণশীলতার জন্যই তাঁর অনুসারীদের সংখ্যা খুব একটা বৃদ্ধি পায়নি।

হাম্বলি মাযহাবের বৈশিষ্ট্য

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) প্রবর্তিত মাযহাবের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো—

১. এখানে কুরআন মাজিদ ও হাদিসের বাহ্যিকরূপের প্রতিফলন হয়েছে।
২. এ ফিকহের মূলনীতি কুরআন মাজিদ ও সহিহ হাদিসের ওপর নির্ভরশীল।
৩. এ মাযহাবে 'মারফু ও মাওকুফ' এ দু'রকম হাদিসকেই কেবল আমলযোগ্য ও দলিল হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।
৪. হাম্বলি মাযহাবে যথাসম্ভব কিয়াস বর্জন করা হয়েছে।
৫. হাম্বলি মাযহাবে মদিনাবাসীর আমলকে দলিল মনে করা হয়নি। তাছাড়া বুদ্ধিবৃত্তি ও যুক্তিকে এখানে গৌণ করে দেখা হয়েছে।
৬. এ মাযহাব ছিল খুবই সহজ ও সরল।

হাম্বলি মাযহাবের অনুসৃত কিতাব

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) প্রবর্তিত এ হাম্বলি মাযহাবে মুসনাদে আহমদ, কিতাবু-তাআতির রাসুল, দলিলুত তালিব, কিতাবুস সালাত, মাসায়িলুস সালিহ, মুকনিউ, নায়লুল মাআরিব প্রভৃতি কিতাবের অনুসরণ করা হয়েছে।

বস্তুত ইসলামে যেসব ফিকহ মাযহাব গড়ে উঠেছে মৌলিক আকিদাগত বিষয়ে এগুলোর কোনো বিভেদ নেই। আল্লাহ তাআলা যেসব ফরজ বিধান দিয়েছেন সে বিষয়েও ইমামদের কোনো মতপার্থক্য নেই। কেবল এসব বিধান আদায় পদ্ধতি নিয়ে ইমামগণ মতবিরোধ করেছেন। এ মতবিরোধ ইসলামি আদর্শ ও চেতনা পরিপন্থি নয়। কেননা এতে গবেষণা ও উদ্ভাবনের ধারা অব্যাহত থাকে। ইসলামি আদর্শ ও চেতনাবিরোধী মতবিরোধ হলো এমন বিভেদ যা মুসলিমদের জাতীয় ঐক্য সংহতি বিনষ্ট করে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ইসলামে চতুর্থ ও শেষ স্বীকৃত ফিকহি মাযহাব কোনটি?
২. মুতাযিলাদের যুক্তিবাদী মতবাদের বিরুদ্ধে কোন ইমাম মতবাদ গড়ে তোলেন?
৩. অতিরিক্ত রক্ষণশীলতার জন্য কোন ইমামের অনুসারী সংখ্যা খুব একটা বৃদ্ধি পায়নি?
৪. কোন ফিকহে কুরআন মাজিদ ও হাদিসের বাহ্যিকরূপের প্রতিফলন হয়েছে?
৫. কোন মাযহাবের 'মারফু' ও 'মাওকুফ' এ দুরকম হাদিসকেই কেবল আমলযোগ্য দলিল হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে?
৬. 'মুসনাদে আহমদ' হাদিস গ্রন্থের সংকলক কে?

উত্তরের জন্য দেখো ২৫০ পৃষ্ঠা।

খ. একক কাজ

শিক্ষার্থীরা হাম্বলি মাযহাবের ৫টি বৈশিষ্ট্য লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ১২ চার ইমামের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি: ইমাম আবু হানিফা (রহ.)
Short Introduction to Four Imam: Imam Abu Hanifa (R)

হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইসলামের বিশ্বব্যাপী বিস্তার প্রায় সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। ভারতের সিন্ধু থেকে সুদূর ইউরোপের স্পেন, এশিয়া মাইনর এবং উত্তর-আফ্রিকা পর্যন্ত এলাকায় ইসলাম ছিল ক্ষমতাসীন শক্তি। বহুজাতি, দেশ আর তাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, জীবনাচার, সভ্যতা প্রভৃতি ইসলামে মতভেদ ও মতানৈক্যের এক অনাকাঙ্ক্ষিত পরিপ্রেক্ষিত রচনা করেছিল। আইনের সুনির্দিষ্ট কোনো নীতিমালা ছিল না। ইসলামের এ অবস্থায় নিষ্ঠাবান বিজ্ঞ মুসলিম মুজতাহিদগণ ইসলামি আইনের প্রকৃত রূপ সংরক্ষণের জন্য সর্বসাধারণের মধ্যে এর সহজ উপস্থাপনার উদ্দেশ্যে ফিকহ সংকলন ও সম্পাদনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাদের মধ্যে স্বতন্ত্র মাযহাব প্রতিষ্ঠা ও ফিকহ সম্পাদনায় নেতৃত্ব দিয়ে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন চারজন বিশ্ববিখ্যাত মুজতাহিদ। এরা হলেন– ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.), ইমাম মালিক (রহ.), ইমাম শাফেয়ি (রহ.) ও ইমাম আহমদ (রহ.)। এখানে বিশ্ববরেণ্য এ ইমাম চতুষ্টয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপিত হলো।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) Imam Abu Hanifa (R)

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর নাম নুমান বিন সাবিত। আবু হানিফা তাঁর কুনিয়াত বা উপনাম। তিনি এ নামেই পরিচিত। তাঁর উপাধি ইমাম আযম। হিজরি ৮০ সালে তিনি কুফা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং এখানেই লালিত-পালিত হন। শৈশবে তিনি পিতৃহারা হন। ইমাম জাফর সাদিকের তত্ত্বাবধানে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। খুব কম বয়সে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) অসাধারণ মেধা ও তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তিতে তাফসির, হাদিস, বালাগাত ও অন্যান্য শাস্ত্রে প্রাথমিক জ্ঞানলাভ করেন। এ সময়ে তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর খাদিম বিশিষ্ট সাহাবি হযরত আনাস বিন মালিক (রহ.)-এর খিদমতে হাজির হন।

১০০ হিজরিতে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) হাম্মাদ বিন সুলায়মানের শিক্ষালয়ে ভর্তি হন। ১১০ হিজরি পর্যন্ত এখানে গভীর নিষ্ঠার সাথে জ্ঞানার্জন অব্যাহত রাখেন। এরপর কুফার মুহাদ্দিসদের কাছে হাদিস অধ্যয়ন সম্পন্ন করেন। কিন্তু তিনি বেশি আগ্রহবোধ করেন ইসলামি আইনে।

পড়াশুনা শেষ করে পৈত্রিক কাপড়ের ব্যবসায় দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। গ্রামে, শহরে বিভিন্ন জায়গায় নিজের ব্যবসায়কে বিস্তৃত করেন। সমকালে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ধন-সম্পত্তিতে অগ্রগণ্য ছিলেন। ১২০ হিজরিতে ইমাম হাম্মাদ (রহ.) ইন্তেকাল করলে ব্যবসায়ের পাশাপাশি তিনি ওস্তাদের শিক্ষালয়ের দায়িত্ব নেন। ১৫০ হিজরিতে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ইমাম আযম এ শিক্ষালয়ের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এসময় অসংখ্য শিক্ষার্থী তাঁর কাছে ফিকহ শেখেন। এদের মধ্যে ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম যুফার প্রমুখ মনীষীগণ অন্যতম।

ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর পূর্বে ফিকহ ইসলামি কোনো স্বতন্ত্র শাস্ত্র ছিল না। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) প্রথম ফিকহকে বিন্যস্ত স্বতন্ত্র শাস্ত্রের মর্যাদা দেন। ফিকহ সম্পাদনার কাজ সুসম্পন্ন করার জন্য তিনি ১৩২ হিজরিতে একটি কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। নিজের শ্রেষ্ঠতম ৪০ জন ফকিহ শিক্ষার্থীকে নিয়ে একটি 'সম্পাদনা পরিষদ' এবং সর্বশ্রেষ্ঠ দশজনকে নিয়ে 'পর্যালোচনা পরিষদ' গঠন করে তিনি ফিকহ সংকলনের বিধিবদ্ধ ধারার সূচনা করেন। ইমাম আযম (রহ.)-এর নিবিড় তত্ত্বাবধান, প্রত্যক্ষ মতামতদান ও বিশ্লেষণ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিরলস প্রচেষ্টায় দীর্ঘ বাইশ বছরে ফিকহশাস্ত্রের প্রথম পূর্ণাঙ্গ সংকলন সমাপ্ত হয়। প্রাথমিকভাবে এতে ৮৩ হাজার মাসয়ালা স্থান পায়। এগুলোর নাম রাখা হয় 'কুতুবে হানাফিয়া'। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি এ সংকলনকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেন। শেষ পর্যন্ত এতে ৫ লাখ মাসয়ালা সংকলিত হয়।

আব্বাসীয় খলিফা আল-মানসুর আবু হানিফাকে রাজ্যের প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগের প্রস্তাব দেন কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। অতঃপর আল-মানসুর তাকে কারাবন্দি করে রাখেন। ১৫০ হিজরিতে বন্দি অবস্থায় তাঁর ওপর বিষ প্রয়োগ করা হয়। সিজদারত অবস্থায় শহিদ হন মহান এ জ্ঞানসাধক। ইতিহাসখ্যাত এ মনীষীকে বাগদাদে দাফন করা হয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. হিজরি কত শতাব্দীতে ইসলামের বিশ্বব্যাপী বিস্তার প্রায় সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল?
২. ইমাম আজম আবু হানিফা (রহ.)-এর পূর্ণনাম কী?
৩. ইমাম আবু হানিফা জন্মগ্রহণ করেন কোথায়? *[সকল বোর্ড ২০১৮]*
৪. কার তত্ত্বাবধানে ইমাম আজম আবু হানিফা (রহ.)-এর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়?

উত্তরের জন্য দেখো ২৫০ পৃষ্ঠা।

পাঠ ১৩ ইমাম মালিক (রহ.) Imam Malik (R)

ইমাম মালিক (রহ.)-এর নাম মালিক বিন আনাস (রহ.)। তাঁর কুনিয়াত বা উপনাম আবু আব্দুল্লাহ। তবে তিনি মূল নামেই বিশ্ববিখ্যাত হন। আমৃত্যু মদিনায় অবস্থানের জন্য তাঁর উপাধি ছিল 'ইমামু দারুল হিজরাত'। অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও তাঁর জীবনী লেখকদের মতে, ইমাম মালিক (রহ.) ৯৩ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শৈশব কাটে মদিনায় নিজ পরিবারে। কৈশোরে তিনি প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আবদুর রহমান বিন হরমুয, ইমাম যহুরী, নাফে ইবন যাকওয়ান, ইয়াহইয়া বিন সাঈদ প্রমুখের কাছে হাদিস শিক্ষালাভ করেন। যৌবনের প্রারম্ভে মক্কায় রবিয়াতুর রায়ের কাছে ইমাম মালিক ফিকহ অধ্যয়ন করেন। এক্ষেত্রে খুব কম সময়েই তিনি বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করেন। যার জন্য তিনি প্রথম যৌবনেই ফতোয়া দান ও রিওয়াতের অনুমতি লাভ করেন।

হাদিস ও ফিকহশাস্ত্রে অগাধ জ্ঞানার্জন করে ইমাম মালিক (রহ.) মদিনার মসজিদে নববিতে বসেই শিক্ষাদান শুরু করেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে দারস ও ফতোয়া দিতেন। মিশর, আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে লোকজন তার কাছে হাদিস ও ফিকহের জ্ঞান লাভের জন্য আগমন করত। আব্দুল্লাহ বিন মুবারক, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম শাফেয়ি প্রমুখ বরেণ্য ব্যক্তিগণ তাঁর কাছে ফিকহ ও হাদিসের শিক্ষা গ্রহণ করেন। মদিনাবাসী হওয়ার সুবাদে গোড়া থেকেই তিনি হাদিস সংগ্রহ শুরু করেন। এরপর সংগৃহীত বিপুল হাদিস থেকে যাচাই-বাছাই করে মাত্র ১৭২০ খানা হাদিসের সমন্বয়ে ইমাম মালিক (রহ.) মুসলিম আইনের হাদিসভিত্তিক সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'মুয়াত্তা' সংকলন করেন। এছাড়াও কিতাবুল মাজালিসাত, কিতাবুল মানাসিক, কিতাবুস সুনান তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। 'ফিকহি মালিকি' তাঁর উদ্ভাবিত মাসয়ালাসমূহের বিশেষ সংকলন।

ফিকহশাস্ত্রের অগাধ জ্ঞানী এ মহান ব্যক্তিকে ফিকহ মাসয়ালা জিজ্ঞেস করার সাথে সাথে তার উত্তর দিয়ে দিতেন। কিন্তু হাদিসে নববির প্রতি এত বেশি শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল যেকোনো হাদিস জিজ্ঞেস করলে প্রথমে গোসল করে উত্তম পোশাক পরিধান করে গায়ে আতর ব্যবহার করতেন। অতঃপর উঁচু আসনে সমাসীন হয়ে হাদিস বর্ণনা করতেন। ফাতিমিদের সমর্থন করায় আব্বাসি খলিফা আল-মানসুর তাঁকে কারারুদ্ধ করে ও নির্যাতনের আদেশ দেয়। কিন্তু ইমাম মালিক (রহ.) তাঁর নীতিতে অটল থাকেন। মানসুরের শাসনামলে তাঁর কারাজীবন ও নির্যাতন অব্যাহত থাকে। পরবর্তীতে খলিফা হারুন-অর-রশীদ তাঁকে মুক্তি দেন এবং যথাযথ মর্যাদা প্রদান করেন।

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি ইমাম মালিক (রহ.) সীমাহীন ভালোবাসা পোষণ করতেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) হিজায (মক্কা-মদিনা)- এর বাইরে যাননি বলে তিনিও কোনোদিন এর বাইরে যাননি। কেবল রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বিশেষ মর্যাদা দেওয়ার জন্যই তিনি মদিনাবাসীকে তাঁর মাসয়ালা উদ্ভাবন প্রক্রিয়ায় বিশেষ স্থান দিয়েছেন। ১৭৯ হিজরিতে ইমাম মালিক (রহ.) ইন্তেকাল করেন। ইমাম মালিক (রহ.) এর মৃত্যুর পূর্বরাতে ইমাম শাফেয়ির (রহ.) ফুফু স্বপ্নে সে অঞ্চলের সর্বশ্রেষ্ঠ ও জ্ঞানী মনীষীটির মৃত্যুর সংবাদ পান। সকালবেলা ইমাম শাফেয়ি (রহ.) তাঁকে ইমাম মালিক (রহ.)-এর মৃত্যুর সংবাদ দেন। মদিনার জান্নাতুল বাকিতে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ইমাম মালিক (রহ.)-এর উপাধি কী ছিল?
২. ইমাম মালিক (রহ.) কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? *[সকল বোর্ড ২০১৯]*
৩. যৌবনের প্রারম্ভে ইমাম মালিক (রহ.) কার কাছে ফিকহ অধ্যয়ন করেন?
৪. মুসলিম আইনের হাদিসভিত্তিক সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'মুয়াত্তা' কে সংকলন করেন?
৫. ফাতিমিদের সমর্থন করায় খলিফা আল-মনসুর কাকে কারারুদ্ধ করেন?
৬. কোন খলিফা ইমাম মালিক (রহ.)-কে মুক্তি ও যথাযথ সম্মান প্রদান করেন?

উত্তরের জন্য দেখো ২৫০ পৃষ্ঠা।

খ. একক কাজ

ইমাম মালিক (রহ.) সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা একটি সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ লিখে তা শিক্ষকের কাছে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ১৪ ইমাম শাফেয়ি (রহ.)
Imam Shafi'i (R)

ইমাম শাফেয়ি (রহ.)-এর নাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইদ্রিস আশ-শাফেয়ি (রহ.)। তাঁর উপাধি হলো 'নাসিরুল হাদিস' তথা হাদিসের সাহায্যকারী বা সহায়ক। তবে তিনি বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন ইমাম শাফেয়ি (রহ.) নামে। পিতা-মাতা উভয় দিক থেকে তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে সম্পৃক্ত। ১৫০ হিজরিতে আধুনিক ফিলিস্তিনের গাজা অঞ্চলে তাঁর জন্ম হয়। মাত্র দুবছর বয়সে ইমাম শাফেয়ি পিতাকে হারান। মায়ের স্নেহাশ্রয়ে তাঁর শৈশব কাটে। তাঁর উৎসাহে ইমাম শাফেয়ি শিক্ষাগ্রহণ শুরু করেন। তিনি ছোটবেলা থেকেই শিক্ষানুরাগী ছিলেন। মাত্র ৭ বছর বয়সে পবিত্র কুরআন এবং ১০ বছর বয়সে ইমাম মালিক (রহ.)-এর 'মুয়াত্তা' মুখস্থ করেন। শিক্ষার জন্য তিনি সর্বপ্রথম মদিনা সফর করেন। সেখানে তিনি ইমাম মালিককে 'মুয়াত্তা' মুখস্ত শুনান। ইমাম শাফেয়ির ছোট বয়সে এই প্রজ্ঞা ও প্রতিভা দেখে তিনি অভিভূত হন। এরপর ইমাম মালেকের কাছ থেকে হাদিস ছাড়াও আরো অনেক কিছু শিক্ষা লাভ করেন। এরপর তিনি মক্কা গমন করেন। এখানে মুসলিম বিন খালিদ জানজি (রহ.)-এর কাছে ফিকহ অধ্যয়ন করেন এবং পাঁচ বছরেই ফতোয়া দানের অনুমতি পেয়ে যান। এছাড়া আরো ৮১ জন মুহাদ্দিসের কাছে ইমাম শাফেয়ি (রহ.) হাদিস অধ্যয়ন করেন। তিনি ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর কাছে হানাফি ফিকহ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞানলাভ করেন।

অধ্যয়ন শেষে ইমাম শাফেয়ি (রহ.) অধ্যাপনা শুরু করেন। জ্ঞান গভীরতা ও বিজ্ঞতার জন্য খুব সহসাই শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও ফকিহ হিসেবে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। আব্বাসি খলিফা হারুন-অর-রশীদ তাঁর সুনাম ও বিজ্ঞতার জন্য তাঁকে নাজরান প্রদেশের প্রশাসক নিয়োগ করেন। ফাতিমীয়দের প্রতি পক্ষপাতিত্বের মিথ্যে অভিযোগে ইমাম শাফেয়ি (রহ.) পদচ্যুত হন। অবশ্য খুব শীঘ্রই এ অভিযোগ মিথ্যা প্রতিপন্ন হলে খলিফা তাকে স্বপদে বহালের ঘোষণা দেন। কিন্তু ইমাম শাফেয়ি (রহ.) সবিনয়ে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে অধ্যাপনায় ফিরে যান।

১৯৫ হিজরিতে ইরাকে ইমাম শাফিয়ি (রহ.) তাঁর স্বতন্ত্র মাযহাব প্রবর্তনের ঘোষণা দেন। ১৯৮ হিজরিতে মিসরে গমনের পর তিনি তার মাযহাবে কিছু পরিবর্তন আনেন। নিজ মাযহাবের প্রচারণার জন্য ইমাম শাফেয়ি (রহ.) বেশকিছু গ্রন্থ রচনা করেন। রিসালাহ, উসুলিয়া, কিতাবুল উম্ম, রিসালাত ফি আদিল্লাতিল আহকাম, কিতাবু ইখতিলাফ আল-হাদিস তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তিনি উসুল আল-ফিকহ বা ফিকহ গবেষণার মূলনীতি প্রণয়ন করেন। এজন্য তাঁকে এ শাস্ত্রের জনক বলা হয়।

২০৪ হিজরিতে ইমাম শাফিয়ি (রহ.) মিসরে ইন্তেকাল করেন। এখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।

ইমাম শাফেয়ি (রহ.)-এর শিক্ষকবৃন্দ: ইমাম শাফেয়ি (রহ.) স্বীয় যুগে বিভিন্ন দেশে অগণিত আলেমের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করেন। তন্মধ্যে কয়েকজন হলো— ১. ইমাম সুফইয়ান বিন উয়ায়না (রহ.) (মক্কি), ২. ইমাম ইসমাইল বিন আব্দুল্লাহ (রহ.) (মক্কি), ৩. ইমাম মুসলিম বিন খালিদ (রহ.) (মক্কি), ৪. ইমাম মালিক বিন আনাস (রহ.) (মাদানি), ৫. ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসমাইল (রহ.) (মাদানি), ৬. ইমাম হিশাম বিন ইউসুফ (রহ.) (ইয়ামেনি), ৭. ইমাম ওয়াকী বিন আল-জাররাহ (রহ.) (কুফি)। এছাড়াও আরো অসংখ্য বিদ্বান ইমাম শাফেয়ির শিক্ষক ছিলেন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. 'নাসিরুল হাদিস' কোন ইমামের উপাধি ছিল?
২. ফিকহের কোন ইমাম পিতা-মাতা উভয় দিক থেকে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে সম্পৃক্ত?
৩. ইমাম শাফেয়ি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
৪. কোন ইমাম মাত্র ৭ বছর বয়সে পবিত্র কুরআন এবং ১০ বছর বয়সে 'মুয়াত্তা' মুখস্থ করেন?
৫. খলিফা হারুন-অর-রশীদ ইমাম শাফেয়ি (রহ.)-কে কোন প্রদেশের প্রশাসক নিয়োগ করেন?
৬. 'কিতাবুল উম্ম' গ্রন্থ কে সংকলন করেন? */সকল বোর্ড ২০২২/*

উত্তরের জন্য দেখো ২৫০ পৃষ্ঠা।

খ. একক কাজ

শিক্ষার্থীরা ইমাম শাফেয়ি (রহ.) সম্পর্কে ১০টি বাক্য লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ১৫ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)
Imam Ahmad Ibn Hambal (R)

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর নাম আবু আব্দুল্লাহ আহমদ বিন হাম্বল আল-মারুফি। ১৬৪ হিজরিতে ইরাকের রাজধানী বাগদাদে তাঁর জন্ম হয়। শৈশবেই তিনি পিতৃহারা হন। পারিবারিক ঐতিহ্য অনুযায়ী এ সময়ে তিনি কুরআন হাদিস ও আরবি ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা নেন। তিনি ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর কাছে ফিকহ অধ্যয়ন করেন। একাধিক্রমে পনের বছর বয়স পর্যন্ত বাগদাদের বিখ্যাত ফকিহদের কাছে ফিকহ অধ্যয়ন অব্যাহত রাখেন। ১৭৯ হিজরিতে তাঁর হাদিসের উচ্চশিক্ষা গ্রহণ শুরু হয়। হুশাইম বিন বশির, উমাইর বিন আব্দুল্লাহ, আব্দুর রহমান বিন মাহদি, আবু বকর বিন আয়াশ প্রমুখ মুহাদ্দিসদের কাছে তিনি হাদিস শেখেন। হাদিস সংগ্রহ ও অধ্যয়নের জন্য তিনি হেজাজ, সুদূর ইয়ামেনসহ গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশসমূহ সফর করেন। ১৯৫ হিজরিতে মক্কায় ইমাম শাফেয়ি (রহ.)-এর কাছে ফিকহ অধ্যয়ন করেন।

শিক্ষা সমাপ্তির পর ইমাম আহমদ (রহ.) অধ্যাপনা শুরু করেন। এ সময়ে তিনি মুহাদ্দিস হিসেবে খ্যাতিলাভ করেন। তাঁর সমকালীন আব্বাসি খলিফা আল-মামুন 'মুতাযিলা' সম্প্রদায়কে পৃষ্ঠপোষকতা দিলে ইমাম আহমদ এর প্রতিবাদ করেন। তিনি বক্তৃতা ও বিতর্কের মাধ্যমে মুসলিমদের প্রকৃত ইমানি চেতনা জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। ফলে খলিফা তাঁকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেন। মুতাসিম বিল্লাহ খলিফা হয়ে ইমামের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালায় কিন্তু তিনি মুতাযিলাদের সাথে কোনো আপোস করেননি। ২৩২ হিজরিতে মুতাওয়াক্কিল খলিফা হয়ে মুতাযিলাদের প্রতিরোধের ঘোষণা দেন। এর প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তিনি ইমাম আহমদকে মুক্তি দেন। ইমাম আবারো অধ্যাপনায় নিয়োজিত হন।

সবশেষে ২৪১ হিজরিতে ইমাম আহমদ পরলোকগমন করেন। ষাট হাজার মহিলাসহ তার জানাজায় ১০ লক্ষাধিক লোক সমবেত হয়। বাগদাদেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের রচনাবলি: আন্দোলন ও সংগ্রামের মধ্যে থেকেও ইমাম আহমদ বেশকিছু গ্রন্থ রচনা করেন, যা প্রসিদ্ধ চারজন ইমামের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। এ ইমামের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলি নিম্নে উল্লেখ করা হলো— ১. হাদিস গ্রন্থ 'মুসনাদে আহমদ' (চল্লিশ হাজার হাদিসের সংকলন); ২. কিতাবুল মানাসিক; ৩. ফাজায়িলুস সাহাবাহ; ৪. আল ই'লাল ওয়া মারিফাতিল রিজাল; ৫. কিতাবুস সালাত; ৬. আর-রাদ্দ আলাল জাহমিয়্যাহ; ৭. রিসালাতু ইমাম আহমদ; ৮. আহকামুন্নিসা; ৯. কিতাবুস সুন্নাহ ইত্যাদি।

ইমাম আহমদ (রহ.) সম্পর্কে আলিম সমাজের প্রশংসা:

১. ইমাম আলি ইবনুল মাদানি (রহ.) বলেন— 'আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুল (সা.)-এর পর দু'জন ব্যক্তির মাধ্যমেই ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, একজন হলেন হযরত আবু বকর (রা.); যার মাধ্যমে মুরতাদ ও ভণ্ড নবিদের দমন করেছেন, আর অপরজন আহমদ ইবনে হাম্বল, যার মাধ্যমে কুরআনের মানহানির সময় কুরআনকে সমুন্নত করেছেন।'

২. ইমাম আব্দুল ওয়াহহাব আল-ওয়ারবাক (রহ.) বলেন— 'ইমাম আহমদ এমন একজন ব্যক্তি যাকে ৬০,০০০ (ষাট হাজার) প্রশ্ন করা হলো, তিনি সব প্রশ্নের জবাবে 'হাদ্দাছানা ওয়া আখবারানা' অর্থাৎ শুধু হাদিস হতে জবাব দিয়েছেন। অন্যকিছু বলেননি।

৩. ইমাম শাফেয়ি (রহ.) বলেন— 'আমি বাগদাদ থেকে বের হয়ে ইমাম আহমদের চেয়ে অধিক তাকওয়াবান, ফকিহ ও জ্ঞানী আর কাউকে পাইনি।'

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
২. ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) প্রথমে কার কাছে ফিকহ অধ্যয়ন করেন?
৩. হাদিস সংগ্রহ ও অধ্যয়নের জন্য ইমাম আহমদ বিন.হাম্বল (রহ.) কোন প্রদেশসমূহ সফর করেন?
৪. কোন আব্বাসি খলিফা 'মুতাযিলা' সম্প্রদায়কে পৃষ্ঠপোষকতা দেন?
৫. কোন আব্বাসি খলিফা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালায়?
৬. ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর জানাজায় কত লোক সমবেত হয়?

উত্তরের জন্য নিচে দেখো।

খ. একক কাজ

শিক্ষার্থীরা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল সম্পর্কে বাড়ি থেকে একটি সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ লিখে এনে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ মূল্যায়নের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর

পাঠ-১: ১. কুরআন মাজিদ ও হাদিস; ২. ইলমুল ফিকহ বা ফিকহ শাস্ত্র; ৩. হৃদয়ঙ্গম করা, অনুধাবন করা, সূক্ষ্মদর্শিতা ইত্যাদি; ৪. বিশবার।

পাঠ-২: ১. শরিয়তের (ইসলামি আইন) চারটি মূল উৎস; ২. প্রত্যক্ষ ওহি; ৩. পরোক্ষ ওহি; ৪. ছয়টি; ৫. মুআমালাত।

পাঠ-৩ ও ৪: ১. রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায়; ২. ১১২ নম্বর আয়াতে; ৩. বনু কুরাইজার মহল্লায়; ৪. খুলাফায়ে রাশেদিনের আমল; ৫. মুকসিরুন; ৬. দ্বিতীয় শতাব্দীতে।

পাঠ-৫ ও ৬: ১. ফিকহশাস্ত্র; ২. ফিকহ; ৩. দীন সম্পর্কে সূক্ষ্ম জ্ঞান; ৪. ষাট বছরের; ৫. এক হাজার।

পাঠ-৭: ১. ঐক্য ও সংহতি; ২. চলার পথ, ধর্মমত, বিশ্বাস; ৩. মাযহাব; ৪. রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিজের; ৫. সাহাবিগণ; ৬. শিয়া, খারিজি ও সুন্নি মাযহাব।

পাঠ-৮: ১. ইমাম আজম আবু হানিফা (রহ.); ২. আহলুর রায়; ৩. ইমাম আজম আবু হানিফা (রহ.); ৪. আবু হানিফা (রা.); ৫. ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর; ৬. ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)।

পাঠ-৯: ১. ইমাম মালিক বিন আনাস (রহ.); ২. ইমাম মালিক (রহ.); ৩. ইমাম মালিক (রহ.)।

পাঠ-১০: ১. ইরাকে; ২. ১৯৫ হিজরিতে; ৩. শাফিঈ মাযহাবের; ৪. ছয়টি; ৫. শাফিঈ মাযহাবে।

পাঠ-১১: ১. হাম্বলি মাযহাব; ২. ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.); ৩. ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.); ৪. ফিকহে হাম্বলিতে; ৫. হাম্বলি মাযহাবে; ৬. ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.)।

পাঠ-১২: ১. দ্বিতীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকে; ২. নুমান বিন সাবিত; ৩. ইরাকের কুফা নগরিতে; ৪. ইমাম জাফর আস সাদিক (রহ.)-এর।

পাঠ-১৩: ১. ইমামুল দারুল হিজরত; ২. মদিনায়; ৩. হযরত রবিয়াতুর রায়ে (রহ.) এর কাছে; ৪. ইমাম মালিক (রহ.); ৫. ইমাম মালিক (রহ.)-কে; ৬. খলিফা হারুন-অর-রশীদ।

পাঠ-১৪: ১. ইমাম শাফেয়ি (রহ.)-এর; ২. ইমাম শাফেয়ি (রহ.); ৩. ফিলিস্তিনের গাজা অঞ্চলে; ৪. ইমাম শাফেয়ি (রহ.); ৫. নাজরান; ৬. ইমাম শাফেয়ি (রহ.)।

পাঠ-১৫: ১. ইরাকের রাজধানী বাগদাদে; ২. ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর কাছে; ৩. হেজাজ, ইয়েমেনসহ গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশসমূহ; ৪. খলিফা আল-মামুন; ৫. খলিফা মুতাসিম বিল্লাহ; ৬. ষাট হাজার মহিলাসহ ১০ লক্ষাধিক লোক।

৫ এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

ফিকহ	ফিকহ শব্দের অর্থ বুদ্ধিমত্তা, অনুধাবন, প্রজ্ঞা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায়, বিশুদ্ধ দলিল প্রমাণাদি সহকারে মানুষের কর্মসংক্রান্ত ব্যাপারে শরিয়তের হুকুম আহকাম সম্পর্কিত গভীর জ্ঞানকে ফিকহ বলে। ফিকহশাস্ত্র মানুষকে মহান আল্লাহর নির্ধারিত হুকুম-আহকাম পালনের সঠিক রীতি-পদ্ধতি নির্দেশ করে। ফিকহশাস্ত্র ব্যতীত দীন সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত হওয়া অসম্ভব। খাঁটি মুসলিম হওয়ার জন্য ফিকহশাস্ত্রের সব মাসয়ালা জানা প্রয়োজন।
মাযহাব	মাযহাব শব্দের অর্থ চলার পথ, ধর্মমত, বিশ্বাস। ইসলামি আইনকানুন, আমল, মুয়ামালাত ও ইবাদত সম্পর্কিত মৌলিক বিষয়সমূহ ব্যতীত সেগুলোর শাখা-প্রশাখাতে মুসলিম পণ্ডিতদের বিভিন্ন চিন্তাশীল ও দার্শনিক মতবাদই হলো মাযহাব। ইসলামের উদার গবেষণা নীতিতে মুসলিম মনীষীগণ গবেষণায় নিয়োজিত হন। এর ফলে যেসব মতবাদ গড়ে ওঠে তাকেই মাযহাব বলা হয়।
হানাফি মাযহাব	ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) যে মাযহাব প্রবর্তন ও প্রতিষ্ঠা করেন সেটি হানাফি মাযহাব। হানাফি ফিকহ সহজ উপস্থাপনা, সাবলীলতা, জীবনমুখিতা প্রভৃতি অনবদ্য গুণাবলির জন্য ব্যাপকভাবে সমাদৃত। হানাফি মাযহাব সর্ববৃহৎ মাযহাব। বর্তমান বিশ্বে মুসলিম জনশক্তির শতকরা ৭৫ ভাগ এ মাযহাবের অনুসারী।
মালিকি মাযহাব	ইমাম মালিক বিন আনাস যে মাযহাব প্রতিষ্ঠা করেন তাই মালিকি মাযহাব। মালিকি মাযহাব মদিনাবাসীদের বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। এ মাযহাবের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো: ১. মালিকি মাযহাবে সব যুক্তিতর্কের ওপর কুরআন ও হাদিসের দলিলকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ২. মালিকি ফিকহর মূলভিত্তি হলো মদিনাবাসীদের আমল। ৩. মালিকি ফিকহে কিয়াসের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। ৪. এ মাযহাবে ইসতিসলাহ অর্থাৎ জনগণের কল্যাণকে মুসলিম আইনের পঞ্চম উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। ৫. এ মাযহাবে অমুসলিমদেরকে পূর্ণ স্বাধীনতা ও অধিকার দেওয়া হয়নি।
শাফিঈ মাযহাব	ইমাম শাফেয়ি (রহ.) যে মাযহাব প্রতিষ্ঠা করেন সেটি শাফিঈ মাযহাব। তিনি ১৯৫ হিজরিতে হানাফি ও মালিকি মাযহাবের সমন্বয়ে একটি মাযহাব গড়ে তোলেন। পরবর্তীতে তিনি বেশকিছু পরিবর্তন করে মিসরে শাফিঈ মাযহাব প্রতিষ্ঠা করেন। এ মাযহাবের আইন-কানুন খুব রক্ষণশীল ছিল না আবার খুব যুক্তিভিত্তিকও না। এ মাযহাব মধ্যমপন্থি। এখানে ইজমা ও কিয়াস অত্যন্ত উদারভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। শাফিঈ মাযহাবে কুরআন ও হাদিসের বিভিন্ন বিধানে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে।
হাম্বলি মাযহাব	ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) যে মাযহাব প্রতিষ্ঠা করেন তাই হাম্বলি মাযহাব। চতুর্থ ও শেষ স্বীকৃত ফিকহি মাযহাব হলো হাম্বলি মাযহাব। হাদিসের সর্বাত্মক ও সঠিক অনুসরণই হলো এ মাযহাবের মূলকথা। এ মতবাদে ইজমা ও কিয়াসকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়নি। মুতাজিলাদের যুক্তিবাদী মতবাদের বিরুদ্ধে বিতর্কের মাধ্যমে এ মতবাদ দ্রুত প্রসারিত হয়। তবে অতিরিক্ত রক্ষণশীলতার কারণে এ মতবাদের অনুসারীদের সংখ্যা খুব কম।

সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

ক. জ্ঞানমূলক

■ ফিকহশাস্ত্রের পরিচয়

প্রশ্ন-১. ফিকহ বলতে কী বোঝ?
উত্তর: ফিকহ বলতে বিশুদ্ধ দলিল-প্রমাণাদি সহকারে মানুষের কর্মসংক্রান্ত ব্যাপারে শরিয়তের হুকুম-আহকাম সম্পর্কিত গভীর জ্ঞানকে বুঝি।

প্রশ্ন-২. ফিকহশাস্ত্রের মূল উৎস কী?
উত্তর: ফিকাহশাস্ত্রের মূল উৎস হলো— কুরআন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াস।

■ ফিকহশাস্ত্রের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু

প্রশ্ন-৩. ফিকহশাস্ত্রের মূল লক্ষ্য কী?
উত্তর: ফিকাহশাস্ত্রের মূল লক্ষ্য হলো— মানুষকে মহান আল্লাহর নির্ধারিত হুকুম পালনের সঠিক পদ্ধতি নির্দেশ করা।

প্রশ্ন-৪. ইলমে ফিকহ-এর বিষয়বস্তু কী?
উত্তর: ইলমে ফিকহ এর বিষয়বস্তু হলো শরিয়তের বিধিবিধানসম্মত বান্দার কার্যাবলি।

প্রশ্ন-৫. ফিকহ সংকলনের যুগ বলতে কী বোঝায়?
[দি. বো., সি. বো., ব. বো. '২৫]
উত্তর: ফিকহ সংকলনের যুগ বলতে হিজরি ১২১ শতক হতে হিজরি ৬৩৯ শতক পর্যন্ত সর্বমোট তিনটি পর্যায়ে ইসলামি শরিয়ার গ্রন্থাবদ্ধ ধারার সংকলনের সময়কালকে বোঝায়।

■ ফিকহশাস্ত্রের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

প্রশ্ন-৬. ইসলামি শরিয়তের ব্যাবহারিক দিকের প্রধান ভিত্তি কী?
উত্তর: ইসলামি শরিয়তের ব্যাবহারিক দিকের প্রধান ভিত্তি হলো ফিকহশাস্ত্র।

প্রশ্ন-৭. ফিকহশাস্ত্রের জনক কে?
উত্তর: ফিকহশাস্ত্রের জনক হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহ.)।

প্রশ্ন-৮. আল্লাহ তাআলা তার বান্দার জন্য কোনটিকে কল্যাণকর হিসেবে উল্লেখ করেছেন?
উত্তর: হিকমত বা ফিকহের জ্ঞানকে মহান আল্লাহ তাআলা বান্দার জন্য কল্যাণকর হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

■ মাযহাবের সংজ্ঞা এবং বিভিন্ন মাযহাব উৎপত্তির কারণ

প্রশ্ন-৯. মাযহাব (مَذْهَبٌ) শব্দের অর্থ কী?
[ঢা. বো., চ. বো., ব. বো. '১৭]
উত্তর: মাযহাব অর্থ— চলার পথ, ধর্মমত বা বিশ্বাস।

প্রশ্ন-১০. 'মাযহাব' কী? *[রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. '১৮]*
উত্তর: মুজতাহিদদের উদ্ভাবিত মূলনীতির আলোকে বের হওয়া মাসয়ালার নাম মাযহাব।

প্রশ্ন-১১. 'আশারিয়া' কোন মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত?
উত্তর: দার্শনিক মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন-১২. তরফাইন বলা হয় কাদেরকে?
উত্তর: তরফাইন বলা হয় ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-কে।

প্রশ্ন-১৩. ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর প্রকৃত বা পূর্ণ নাম কী?
[রা. বো., দি. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. '২২]
উত্তর: ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর প্রকৃত বা পূর্ণ নাম হলো— নুমান বিন সাবিত।

প্রশ্ন-১৪. ইমাম আবু হানিফা (রহ.) কতজন সদস্য নিয়ে 'সম্পাদনা পরিষদ' গঠন করেন?
উত্তর: ৪০ জন সদস্য নিয়ে।

প্রশ্ন-১৫. ইমাম আবু হানিফা (রহ.) কীভাবে শহিদ হয়েছিলেন?
উত্তর: বন্দি অবস্থায় বিষ প্রয়োগে।

প্রশ্ন-১৬. ইমাম শাফেয়ি (রহ.) কখন জন্মগ্রহণ করেন?
[ঢা. বো., দি. বো., সি. বো., য.বো. '১৮]
উত্তর: ১৫০ হিজরিতে ইমাম শাফেয়ি (রহ.) জন্মগ্রহণ করেন।

প্রশ্ন-১৭. হাম্বলি মাযহাব বলতে কী বোঝায়?
[দি. বো., সি. বো., ব. বো. '২৫]
উত্তর: ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) প্রবর্তিত ইসলামি আইনশাস্ত্রের ধারাকে হাম্বলি মাযহাব বলে।

খ. অনুধাবনমূলক

প্রশ্ন-১. স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে ফিকহশাস্ত্র কখন উৎপত্তি লাভ করে?
উত্তর: হিজরি দ্বিতীয় শতকের গোড়ার দিকে স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে ফিকহশাস্ত্রের উদ্ভব হয়।
সাহাবিগণের শেষ যুগে ও তাবেয়িগণের প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলামি শরিয়ত সম্পর্কিত তাদের ব্যাপক গবেষণা স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপ লাভ করেনি। পরবর্তীকালে হিজরি দ্বিতীয় শতকের গোড়ার দিকে ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) ফিকহশাস্ত্রের প্রচলিত বর্তমান রূপটি দান করেন। তার অবিস্মরণীয় চেষ্টা-সাধনায়, পাশাপাশি আরও কিছু ইমামের প্রচেষ্টায় ফিকহশাস্ত্র স্বকীয়, স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ একটি নতুন ধারার শাস্ত্র হিসেবে উৎপত্তি লাভ করে।

প্রশ্ন-২. সাহাবিদের যুগে ফিকহশাস্ত্র কীভাবে বিকশিত হয়?
উত্তর: ইসলামের প্রসারের ফলে সাহাবিদের যুগে ফিকহশাস্ত্র বিকশিত হয়।
সাহাবিদের যুগে ইসলাম দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়। সাহাবিগণ সম্মিলিতভাবে কুরআন-হাদিসের মূলনীতির আলোকে এসব সমস্যার সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করেন। এ চেষ্টায় তারা ইজতিহাদের সূচনা করেন। এরপর ইজতিহাদি বিষয়ে ইজমা প্রতিষ্ঠিত করে সমস্যার সর্বসম্মত সমাধান দেওয়ার প্রয়াস পান। ফলে এ যুগে স্বতন্ত্র ফিকহশাস্ত্র সৃষ্টির পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়।

প্রশ্ন-৩. ফিকহশাস্ত্রের প্রয়োজন কেন?

উত্তর: কুরআন ও সুন্নাহ জীবনে প্রতিফলিত করার জন্যই ফিকহশাস্ত্রের প্রয়োজন।

ইসলামি শরিয়তকে জানা ও মানার জন্য ইসলামি আইন শিখতে হবে। সাধারণত ইসলামি আইন বলতে ফিকহশাস্ত্রকেই বোঝানো হয়। ইসলাম অনুসারে জীবন পরিচালনা করার জন্য ইসলামি আইন তথা ফিকহশাস্ত্র অধ্যয়ন জরুরি। কোনো সমস্যার সৃষ্টি হলে কুরআন ও হাদিসের আলোকে গবেষণা করে ফিকহশাস্ত্রে সেই সমস্যার সমাধান দেওয়া হয়েছে। তাই আমাদের জীবনযাপনের যেসব বিষয় কুরআন ও হাদিসে সুস্পষ্ট বর্ণনা দেওয়া নেই সেসব বিষয়ে সঠিক জ্ঞান অর্জনের জন্য ফিকহশাস্ত্রের প্রয়োজন রয়েছে।

প্রশ্ন-৪. 'শয়তানের নিকট হাজার আবিদের চেয়েও একজন ফকিহ বেশি শক্তিশালী'— ব্যাখ্যা করো।

[ঢা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., ব. বো. '১৯]

উত্তর: শরিয়ত সম্বন্ধে অভিজ্ঞ থাকার কারণে একজন ফকিহ শয়তানের কাছে এক হাজার আবিদের চেয়েও বেশি শক্তিশালী।

একজন ফকিহ শরিয়তের বিধানগুলো প্রবর্তনের কারণ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখেন। ফলে শয়তানের পক্ষে তাকে বিপথগামী করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে যায়। কিন্তু একজন আবিদ ব্যক্তির শরিয়তের গভীর জ্ঞান না থাকলে, ইবাদতে একনিষ্ঠ হলেও সীমাবদ্ধ জ্ঞানের কারণে তার বিপথে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই রাসুলুল্লাহ (সা.) এক হাজার আবিদের চেয়েও একজন ফিকহবিদকে শয়তানের কাছে বেশি শক্তিশালী ঘোষণা করেছেন।

প্রশ্ন-৫. 'মহান আল্লাহ যাকে কল্যাণ দেন তাকে দীনের শিক্ষা দেন'— ব্যাখ্যা করো। *[রা. বো., দি. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. '২২]*

উত্তর: মহান আল্লাহ যাকে কল্যাণ দেন, তাকে দীনের শিক্ষা দেন— বাক্যটি দ্বারা ফিকহশাস্ত্রের গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে।

ইসলামি শরিয়তের ব্যবহারিক দিকের প্রধান ভিত্তি হলো ফিকহশাস্ত্র। ফিকহ ব্যক্তির জীবন শৃঙ্খলা ও শান্তিপূর্ণ করতে পারে। ইসলামি হুকুম-আহকাম অনুশীলনের মাধ্যমে সে মহান আল্লাহর প্রিয়পাত্রে পরিণত হয়। সেজন্য পার্থিব জীবনে ইসলামি জীবনযাপন করে পরকালীন মুক্তি এবং পার্থিব শান্তি লাভের জন্য ফিকহের জ্ঞানার্জন অত্যাবশ্যক। এর মাধ্যমে ব্যক্তি দু'জগতেই প্রভূত কল্যাণ লাভ করতে পারে। এ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন— "আল্লাহ তাআলা যে ব্যক্তির কল্যাণ সাধনের ইচ্ছা করেন, তিনি তাকে দীন সম্পর্কে সুক্ষ্ম জ্ঞান দান করেন" (বুখারি ও মুসলিম)।

প্রশ্ন-৬. মুফসিরুল ফকিহ বলতে কাদেরকে বোঝায়?

উত্তর: সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যারা অগাধ পান্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন এবং ইলমুল ফিকহের বহুসংখ্যক মাসয়ালার ফতোয়া প্রদান করেছেন বা বিধান নির্ণয় করেছেন তাদেরকে মুফসিরুল ফকিহ বলা হয়। যেমন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.), হযরত আলি ইবনে আবু তালেব (রা.) প্রমুখ।

প্রশ্ন-৭. কুতুবে হানাফিয়া বলতে কী বোঝ?

উত্তর: হানাফি মাযহাবের বিখ্যাত গ্রন্থ কুতুবে হানাফিয়া নামে পরিচিত।

ফিকহশাস্ত্রকে নির্ভুল ও গ্রন্থাবদ্ধরূপ দানের জন্য ইমাম আবু হানিফা (রহ.) নিজের ৪০ জন শ্রেষ্ঠতম ফকিহ শিক্ষার্থীকে নিয়ে 'সম্পাদনা পরিষদ' গঠন করেন। এ পরিষদটি দীর্ঘ ২২ বছর অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনা করে ৮৩ হাজার মাসয়ালা সংযুক্ত করে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এটিই কুতুবে হানাফিয়া।

প্রশ্ন-৮. 'মুজতাহিদ ভুল করলেও প্রতিদান প্রাপ্ত হবেন'— ব্যাখ্যা করো। *[ঢা. বো., চ. বো., ব. বো. ২০১৭]*

উত্তর: মুজতাহিদ ভুল করলেও প্রতিদানের কথা পরিষ্কার বর্ণনা হয়েছে।

কুরআন ও হাদিসের আলোকে যিনি যাবতীয় প্রশ্নের সমাধান পেশ করতে সক্ষম তিনিই মুজতাহিদ। মুজতাহিদগণ কুরআন ও হাদিসে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মুক্তাসম সূক্ষ্মজ্ঞানসমূহকে বিন্যস্ত করে আমলের উপযোগী করেন। আর এ কাজ করতে গিয়ে যদি ভুল হয় তাহলে তা মার্জনীয় এবং এর জন্যও প্রতিদানের কথা বলা হয়েছে।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন- যখন হাকিম সঠিক ইজতিহাদ করেন, তখন তার জন্য দু'টি প্রতিদান থাকে। আর ইজতিহাদে ভুল করলে একটি প্রতিদান পাবেন।

প্রশ্ন-৯. তাকলিদের যুগ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: তাকলিদের যুগ বলতে অনুসরণের যুগকে বোঝায়।

আব্বাসীয় খিলাফতের পতন থেকে আজ পর্যন্ত তাকলিদের ধারায় ফিকহশাস্ত্রের ক্রমবিকাশ অব্যাহত রয়েছে। বর্তমান সময়ে নতুন কোনো ইজতিহাদ হচ্ছে না বরং পূর্ববর্তী মুজতাহিদদের ফতোয়ার পূর্ণ অনুসরণ করা হচ্ছে। সম্ভাব্য গবেষণার ক্ষেত্রে তাদের মতামতই মূলনীতি হিসেবে প্রাধান্য পাচ্ছে। নিরবচ্ছিন্ন অনুসরণের জন্য এ যুগ তাকলিদ বা অনুসরণের যুগ নামে খ্যাত।

প্রশ্ন-১০. ইমাম আবু হানিফা কেন কারাবরণ করেন?

উত্তর: ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর জীবদ্দশায় বাগদাদের স্বৈরাচারী খলিফা ছিলেন আল-মনসুর। খলিফা আল-মনসুর তাকে বাগদাদের কাজির পদ গ্রহণের প্রস্তাব দিলে আবু হানিফা (রা.) এ পদ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। এজন্য খলিফা আল-মনসুর তাকে গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করে।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মানুষকে মহান আল্লাহর নির্ধারিত হুকুম-আহকাম পালনের সঠিক রীতি পদ্ধতি নির্দেশ করে কোনটি?
ক. অলংকারশাস্ত্র খ. আইনশাস্ত্র
গ. দর্শনশাস্ত্র ঘ. ফিকহশাস্ত্র

২. ফিকহশাস্ত্রে 'মাসআলা' শব্দের অর্থ কী?
ক. জিজ্ঞাসা খ. গভীর জ্ঞান
গ. বিধিবিধান ঘ. আমল

৩. ফিকহ-এর মূলভিত্তি স্থাপিত হয় কখন?
ক. রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে
খ. সাহাবিদের যুগে
গ. তাবিয়িদের যুগে
ঘ. খলিফাদের যুগে

৪. শ্রেষ্ঠতম ইবাদতের শামিল কোনটি?
ক. দান করা খ. ফিকহ চর্চা করা
গ. দেশকে ভালোবাসা ঘ. ব্যবসা করা

৫. ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর আসল নাম কী?
ক. নুমান বিন মাজিদ খ. নুমান বিন সাবিত
গ. নুমান বিন রাফিক ঘ. নুমান বিন আশিক

৬. ইমাম শাফেয়ি (রহ.) কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
ক. লেবাননে খ. ফিলিস্তিনে
গ. লিবিয়ায় ঘ. আফ্রিকায়

৭. মৌলিক ইবাদতের নির্দেশ এসেছে কোথায়?
ক. কুরআন-হাদিসে খ. ফিকহশাস্ত্রে
গ. তাফসিরে ঘ. আইনশাস্ত্রে

৮. কোন ইমাম ইসতিসলাহ বা জনকল্যাণ নীতিকে শরিয়তের পঞ্চম উৎস হিসেবে গণ্য করতেন?
ক. ইমাম আবু হানিফা (রহ.) খ. ইমাম শাফেয়ি (রহ.)
গ. ইমাম আহমদ (রহ.) ঘ. ইমাম মালিক (রহ.)

৯. জনাব মাহতাব কোনো মাসআলায় আমল করার ক্ষেত্রে মারফু এবং মাওকুফ দু'ধরনের হাদিসকেই দলিল হিসেবে গ্রহণ করেন। তার এরূপ আমল কোন মাযহাবের বৈশিষ্ট্যের সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ?
ক. হানাফি খ. শাফিঈ
গ. মালিকি ঘ. হাম্বলি

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন

১০. ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে বিষ প্রয়োগে শহিদ করা হয়—
i. পদ প্রত্যাখান করায়
ii. মাসয়ালা দেওয়ার জন্য
iii. কারারুদ্ধ অবস্থায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১১. শাওন ফিকহশাস্ত্র অধ্যয়ন করছে। এটি তাকে ধারণা প্রদান করবে—
i. মহান আল্লাহর নির্ধারিত হুকুম-আহকাম সম্পর্কে
ii. কুরআনের বিধান সম্পর্কে
iii. হাদিসের বিধান সম্পর্কে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১২ ও ১৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
জনাব সাদ একটি মাযহাবের অনুসারী যেটিতে অজুর ফরজ ছয়টি। সাদের বন্ধু মুহিত সহজ একটি মাযহাবের অনুসারী যেটি অমুসলিমদের বিষয়ে তুলনামূলক উদার। তার মাযহাবে অজুর ফরজ চারটি।

১২. জনাব সাদ কোন মাযহাবের অনুসারী?
ক. হানাফি খ. শাফিঈ
গ. মালেকি ঘ. হাম্বলি

১৩. মুহিতের অনুসৃত মাযহাবের দৃষ্টিভঙ্গির ফলে—
i. এর অনুসারীদের সংখ্যা বেশি হবে
ii. সাদের সাথে দূরত্ব সৃষ্টি হবে
iii. মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

খ. বোর্ড পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৪. আল-ফিকহ (اَلْفِقْهُ) শব্দের অর্থ কী? *[সকল বোর্ড ২০২৩; ২০২২; ২০১৯]*
ক. আইন-কানুন খ. অনুধাবন করা
গ. বিচার করা ঘ. সিদ্ধান্ত নেওয়া

১৫. হিজরি কত শতাব্দীতে ফিক্হ শাস্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ হয়? *[সকল বোর্ড ২০১৭]*
ক. ১ম খ. ২য়
গ. ৩য় ঘ. ৪র্থ

১৬. কোন ইমাম ৪০ জনের সম্পাদনা পরিষদ গঠন করেন? *[সকল বোর্ড ২০১৭]*
ক. ইমাম মালিক (রহ.) খ. ইমাম আবু হানিফা (রহ.)
গ. ইমাম আহমদ (রহ.) ঘ. ইমাম শাফেয়ি (রহ.)

১৭. 'ইমাম আজম' কার উপাধি? *[সকল বোর্ড ২০২২]*
ক. ইমাম মালেক (রহ.) খ. ইমাম শাফেয়ি (রহ.)
গ. ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ঘ. ইমাম আহমদ (রহ.)

১৮. ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর রচিত গ্রন্থ কোনটি? *[সকল বোর্ড ২০২৩]*
ক. ফিকহুল আকবর খ. কিতাবুল উম্ম
গ. আল-মুয়াত্তা ঘ. মুসনাদে আহমদ

১৯. মুয়াত্তা গ্রন্থের প্রণেতা কে? *[সকল বোর্ড ২০২৫]*
ক. ইমাম আবু হানিফা (রহ.) খ. ইমাম তিরমিযি (রহ.)
গ. ইমাম মালিক (রহ.) ঘ. ইমাম বুখারি (রহ.)

২০. ইমাম শাফেয়ি (রহ.) কত হিজরিতে ফিকহি মাযহব প্রতিষ্ঠা করেন? *[সকল বোর্ড ২০২৫]*
ক. ১৬৪ খ. ১৮৭
গ. ১৯৫ ঘ. ১৯৮

২১. মানব জীবনে ফিকাহশাস্ত্রের প্রয়োজন হওয়ার কারণ হলো, এতে— *[সকল বোর্ড ২০২৫]*
i. জীবনের সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে
ii. কুরআন-হাদিসের অনুসরণ রয়েছে
iii. জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ার সুযোগ রয়েছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২২ ও ২৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
জনাব আরমান একজন মুফাসসির। তিনি পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মহানবি (সা.)-এর জীবন দর্শনের সাহায্য গ্রহণ করেন। তিনি মনে করেন, মহানবি (সা.)-এর জীবনাদর্শ ছাড়া ইসলামি শরিয়তের মাসয়ালা-মাসায়েল উদ্ভাবন বিষয়ে মুসলিম মনীষীগণের গবেষণা অসম্ভব ছিল। *[সকল বোর্ড ২০১৯]*

২২. জনাব আরমান পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কোন বিষয়টির সাহায্য গ্রহণ করেন?
ক. হাদিস খ. ফিকহ গ. ইজমা ঘ. কিয়াস

২৩. উদ্দীপকে উল্লিখিত মুসলিম মনীষীদের গবেষণার ফলে—
i শরিয়তের বিধান পালন সহজ হয়েছে
ii. ইসলাম ধর্ম মানুষের নিকট সহজবোধ্য হয়েছে
iii. মুসলমানদের মাঝে মতপার্থক্য হ্রাস পেয়েছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
রিফাত একজন ব্যবসায়ী। একদিন তিনি নামাজ সম্পর্কে ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন। ইমাম সাহেব তার প্রশ্নের জবাব দেন এবং এমন একজন ফকিহ সম্পর্কে আলোচনা করেন, যাকে ১৫০ হিজরিতে হত্যা করা হয়। *[সকল বোর্ড ২০২৫]*

২৪. উদ্দীপকে উল্লেখিত ফকিহ কে?
ক. ইমাম আবু হানিফা (রহ.)
খ. ইমাম শাফেয়ি (রহ.)
গ. ইমাম মালিক (রহ.)
ঘ. ইমাম আহমদ (রহ.)

উত্তরমালা

১	ঘ	২	গ	৩	ক	৪	খ	৫	খ	৬	খ	৭	ক	৮	ঘ	৯	ঘ	১০	খ	১১	ঘ	১২	খ
১৩	খ	১৪	খ	১৫	খ	১৬	খ	১৭	গ	১৮	ক	১৯	গ	২০	গ	২১	ঘ	২২	ক	২৩	ঘ	২৪	ক

গ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ফিকহশাস্ত্রের সংজ্ঞা দাও।
২. ফিকহশাস্ত্রের মূল উৎস কয়টি? সংক্ষেপে লেখো।
৩. ফিকহশাস্ত্রের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করো।
৪. ইলমে ফিকহের গুরুত্ব সংক্ষেপে বর্ণনা করো।
৫. মাযহাব বলতে কী বোঝ? চার মাযহাবের ইমামগণের নাম লেখো।
৬. মাযহাবের উৎপত্তির কারণ কী?
৭. হানাফি মাযহাবের বৈশিষ্ট্য লেখো।
৮. শাফিঈ মাযহাবের বৈশিষ্ট্য লেখো।
৯. ফিকহশাস্ত্রে ইমাম আবু হানিফার অবদান সংক্ষেপে লেখো।

ঘ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. অধ্যাপক আফতাব ইসলাম শিক্ষার পাঠদান কালে বলেন— সাধারণ মানুষের জন্য ইসলামকে সহজ করতে মুজতাহিদগণ এর যাবতীয় বিধি-বিধান কুরআন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াসের আলোকে সংকলন করেন। *[ঢা. বো., য. বো., কু. বো. '২২]*
ক. আযিমাত কী?
খ. "প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল ও রক্ষক।"— ব্যাখ্যা করো।
গ. মুজতাহিদগণের কার্যক্রমের ফলে কোন শাস্ত্রের উদ্ভব হয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. ইসলামকে কালজয়ী করতে মুজতাহিদগণের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।

২. মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি (রহ.) বলেছেন, "কুরআন বোঝা হাদিস বোঝার উপর নির্ভরশীল। আর হাদিস অনুধাবন করলে মানুষের ব্যাবহারিক জীবনে প্রয়োজনীয় আইন-কানুন তৈরির শাস্ত্র সম্পর্কে জানা যায়।" এ প্রসঙ্গে তিনি একটি হাদিস উল্লেখ করলেন, "মহান আল্লাহ যার মঙ্গল (কল্যাণ) করতে চান, তাকে দ্বীনের সূক্ষ্ম জ্ঞান দান করেন।" *[রা. বো., সি. বো., য. বো. '২৩]*

ক. ফিকাহ শাস্ত্রের জনক কে?
খ. "আল-কুরআন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান।"— ব্যাখ্যা করো।
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি (রহ.)-এর বক্তব্যে ইসলামের যে বিষয়টির ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তা চিহ্নিতপূর্বক এটি উৎপত্তির কারণ বিশ্লেষণ করো।
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত হাদিসটির যথার্থতা তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

৩. শরিফ, সাহেদ ও মকবুল তিন বন্ধু। ইসলামের আইন বিষয়ে আলোচনা করছিলো। শরিফ বলল, মহানবি (সা.)-এর যুগের পর যা কিছু উদ্ভব হয়েছে সবই বিদআত। সাহেদ প্রতিবাদ করে বলে সবকিছুই বিদআত নয়; বরং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কথা, কাজকে ভিত্তি করে পরবর্তীতে এমন একটি জ্ঞানের শাখা তৈরি হয়েছে যা ইসলামি শরিয়াহ পালনকে সহজ করেছে। শরিফ বলল, ৮০ হিজরিতে ইরাকের কুফাতে জন্ম নেন এক শিশু। পিতা-মাতা তার নাম রাখেন নুমান। ব্যবসায়ী পরিবারে জন্ম হলেও তার আগ্রহ ছিল জ্ঞান চর্চায়। তার চিন্তাধারা এবং ফিকহের পদ্ধতি ইসলামি আইন ব্যবস্থায় যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেছে।
[ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো. '২৫]
ক. 'আল-হাওয়া' শব্দের অর্থ কী?
খ. মাযহাব বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো।
গ. উদ্দীপকে সাহেদ ইসলামের কোন জ্ঞানের শাখাকে বুঝিয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উদ্দীপকে শরিফ যে ব্যক্তিত্বের কথা বলেছে ইসলামি শরিয়তের আইন প্রণয়নে তার অবদান মূল্যায়ন করো।

৪.

প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যু-১৫০ হিজরি	প্রতিষ্ঠাতার জন্ম-১৫০ হিজরি
(ক) অধিকাংশ লোক অনুসারী	(ক) তুলনামূলকভাবে কমসংখ্যক অনুসারী
(খ) হাদিসের অনুসরণ কম করা হয়	(খ) হাদিসই দালিলিক ভিত্তি
(গ) কিয়াস ও ইজতিহাদ গ্রহণযোগ্য	(গ) যথাসম্ভব কিয়াস পরিত্যাজ্য বিষয়
(ঘ) উদার ও বাস্তবধর্মী পন্থা	(ঘ) তুলনামূলকভাবে কঠোর ও গভীরতার প্রতি আকৃষ্ট

[দি. বো., সি. বো., ব. বো. '২৫]
ক. হাম্বলি মাযহাব বলতে কী বোঝায়?
খ. "মসজিদে নববীতে তিনি ফিকাহ শিক্ষা দিতেন।" উক্তিটিতে কার কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
গ. ১৫০ হিজরিতে জন্মগ্রহণকারী ইসলামি মনীষীর পরিচয় দাও।
ঘ. ১৫০ হিজরিতে মৃত্যুবরণকারী মনীষীর ইসলামে অবদান মূল্যায়ন করো।

৫. সুলাইমান তার মেয়ের বিয়েতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জিনিস উপহার দিবেন বলে ঘোষণা দেন। কিন্তু সেই শ্রেষ্ঠ জিনিস সম্পর্কে তিনি জানেন না। এ বিষয়ে তিনি খুবই চিন্তায় পড়ে যান। এর সমাধান খুঁজতে তিনি মাওলানা শফিক সাহেবের নিকট গমন করেন। মাওলানা শফিক সাহেব তাকে সান্ত্বনা দেন এবং বলেন— 'কুরআন-হাদিসের গবেষণালব্ধ সমাধান আছে ইলমে ফিক্হর মধ্যে।'
[রা. বো., দি. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. '২২]
ক. ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর পূর্ণ নাম কী?
খ. 'মহান আল্লাহ যাকে কল্যাণ দেন তাকে দ্বীনের শিক্ষা দেন'— ব্যাখ্যা করো।
গ. শরয়ি সমস্যা সমাধানে ইলমে ফিক্হর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো।
ঘ. মাওলানা শফিক সাহেবের বক্তব্যের যথার্থতা মূল্যায়ন করো।

ঙ. সমন্বিত অধ্যায়ের সৃজনশীল প্রশ্ন

৬. জনাব আলিম দৈনিক ফজর নামাজের পর অর্থসহ কুরআন অধ্যয়ন করেন। তার পিতা তাকে বলেন— আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কুরআনের পাশাপাশি এর সম্পূরক শিক্ষা হিসেবে বিবেচিত দ্বিতীয় উৎসও রীতিমত অধ্যয়ন করতে হবে। তবেই ইহকাল ও পরকালে কল্যাণ ও মুক্তি পাওয়া যাবে। অপরদিকে জনাব হালিম কুরআন-হাদিস গবেষণা করে তার বিধি-বিধান সংক্রান্ত পাণ্ডুলিপি রচনা করে প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং এর আলোকে নিজ জীবন পরিচালনা করে। অধ্যাপক সালাম বলেন— 'তার গবেষণা কর্মটি অত্যন্ত প্রশংসনীয়। মহান আল্লাহ তাকে সূক্ষ্ম জ্ঞানদান করেছেন। তাই সে মহান আল্লাহর কল্যাণ লাভ করবে।' *[রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. '১৮]* ◀২য় ও ৫ম অধ্যায়ের সমন্বয়ে
ক. মাজহাব কী?
খ. সিহাহ সিত্তাহ বলতে কী বোঝায়?
গ. উদ্দীপকে জনাব আলিমের পিতার উপদেশে কোন বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উদ্দীপকে জনাব হালিমের কর্মটি চিহ্নিত করে অধ্যাপক সালামের মন্তব্যটি মূল্যায়ন করো।

৭. পাকিস্তানে কিছু বোতলজাত কোমল পানীয়ের মধ্যে নেশা জাতীয় উপাদান পাওয়া যায়। সংশ্লিষ্ট দেশের সরকার খুব দ্রুত ঐ ধরনের কোমল পানীয় বাজারে নিষিদ্ধ করেন। অপরদিকে, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া সুলতানা তার বাবা-মার অমতে নিজের পছন্দের ছেলেকে বিয়ে করে। তাই সুলতানার বাবা সুলতানা ও তার বরের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করলে বিচারক সুলতানার পক্ষে রায় দেয়।
◀৪র্থ ও ৫ম অধ্যায়ের সমন্বয়ে
ক. ফিকহ-এর মূলভিত্তি স্থাপিত হয় কখন?
খ. ফিকহশাস্ত্র কীভাবে ব্যক্তিকে শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীকে পরিণত করে? ব্যাখ্যা করো।
গ. বিচারক তার রায়ে কোন মাজহাবের অনুসরণ করেছেন— ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সরকারের সিদ্ধান্তটি ইসলামি শরিয়তের কোন বিধানের আলোকে গৃহীত হয়েছে মূল্যায়ন করো।

৬

মৌলিক ইবাদত

Fundamental Ibadat

প্রধান প্রধান শব্দ

- হাক্কুল্লাহ
- হাক্কুল ইবাদ
- ইমান
- সালাত
- জাকাত
- নিসাব
- সাওম
- হজ

আল্লাহ তাআলা মানুষ ও জিন জাতিকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। দৈনন্দিন জীবনে মানুষের মহান আল্লাহর আদেশ যেমন— সালাত, জাকাত, হজ, সাওম পালন করা এবং নিষেধ যেমন— সুদ, ঘুষ, হিংসা, ফিতনা-ফাসাদ, বেপর্দা, বেহায়াপনা ইত্যাদি পরিহার করে চলাকে ইবাদত বলে। তেমনিভাবে নবি ও রাসুলের দেখানো পথ অনুযায়ী একে অপরের সাথে উত্তম আচার-ব্যবহার করাও ইবাদত। মূলত ইবাদতের মাধ্যমে মহান আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্ব প্রকাশ করা হয়। এর মধ্যেই মানুষের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তবে আমাদের সব ইবাদত মৌলিক ইবাদত নয়। মৌলিক ইবাদত মোট চারটি। ১. সালাত, ২. জাকাত, ৩. সাওম ও ৪. হজ। সালাত এমন এক মহান ইবাদত যা দৈনিক পাঁচবার আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরজ। এর মাধ্যমে আমরা মহান আল্লাহর প্রতি আমাদের আনুগত্য প্রকাশ করি। আমরা যে সকাল, দুপুর, বিকাল, রাত তথা সবসময়ের জন্য আল্লাহ তাআলার অনুগত দাস, তা সালাতের মাধ্যমে জানাতে চেষ্টা করি। এ মহান ইবাদত আমাদেরকে সবসময় এবং সর্বক্ষেত্রে অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে হিফাজতে রাখে। জাকাত আমাদেরকে অর্থের প্রতি সীমাহীন মোহ এবং কৃপণতা থেকে মুক্ত রাখে। আমাদেরকে দরিদ্রের প্রতি দরদি করে তোলে। সাওম আমাদের আত্মশুদ্ধি অর্জনে সহায়তা করে। রিয়া তথা প্রদর্শনেচ্ছা থেকে বিরত রাখে। নিষিদ্ধ কাজ বর্জনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ করে। হজ আমাদেরকে আল্লাহ তাআলার সমীপে নিজেকে সঁপে দেওয়ার শিক্ষা দেয়। ঐক্যবদ্ধ ও পাপাচারমুক্ত জীবনযাপনে প্রেরণা যোগায়। মৌলিক ইবাদতগুলো কেবল আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং আমাদের নৈতিক চরিত্র গঠনের প্রশিক্ষণ এবং মহান আল্লাহর প্রেম অর্জনের সোপান।

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে যা যা শিখব

- মৌলিক ইবাদতসমূহের পরিচয়, গুরুত্ব ও তাৎপর্য
- মৌলিক ইবাদতসমূহ— সালাত, জাকাত, সাওম ও হজের গুরুত্ব ও শিক্ষা এবং বাস্তবজীবনে নিষ্ঠার সাথে ইবাদত পালন এবং এর শিক্ষা প্রয়োগ

পাঠ পরিকল্পনা	
পাঠ ১	ইবাদতের পরিচয় ও প্রকারভেদ
পাঠ ২	ইবাদতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য
পাঠ ৩	সালাতের গুরুত্ব
পাঠ ৪	সালাতের শিক্ষা
পাঠ ৫	জাকাতের গুরুত্ব
পাঠ ৬	জাকাতের শিক্ষা
পাঠ ৭	সাওমের গুরুত্ব
পাঠ ৮	সাওমের শিক্ষা
পাঠ ৯	হজের গুরুত্ব
পাঠ ১০	হজের শিক্ষা

পাঠ ১ ইবাদতের পরিচয় ও প্রকারভেদ
Introduction and Types of Ibadat

ইবাদতের পরিচয়

ইবাদত (عِبَادَةٌ) আরবি পরিভাষা। এর অর্থ: দাসত্ব করা, গোলামি করা বা আনুগত্য করা। নিঃশর্তভাবে কারো আদেশ মেনে চলাকেও ইবাদত বলা যায়। যিনি ইবাদত করেন তাকে আবিদ (عَابِدٌ) বলা হয়।

ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায়, ইবাদত হলো– মহান আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা। সুতরাং আল্লাহ তাআলা মানুষকে যে কাজগুলো করতে বলেছেন তা করা এবং যেসব কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন তা থেকে বিরত থাকাই ইবাদত। আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন ইবাদতের মূল লক্ষ্য। সেজন্য মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যেকোনো উত্তম কাজই ইবাদত। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা ও রাসুলুল্লাহ (সা.) নির্দেশিত পথে জীবনযাপন করা ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত।

কর্ডোভার বিখ্যাত মুফাসসির মালিকি মাযহাবের অনুসারী; তাফসিরে কুরতুবির গ্রন্থকার **ইমাম কুরতুবি (রহ.)** এর মতে– 'ইবাদত হলো— মহান আল্লাহর একাত্মতা এবং তাঁর দীনের বিধানসমূহ অনুসরণ করা। আর ইবাদতের মূল হলো বিনয় এবং নিজেকে তুচ্ছ করে প্রকাশ করা [আল-কুরতুবি আল-জামে লিআহকামিল কুরআন, বৈরুত, পৃ. ২৪০]।

হানাফি মাযহাবের প্রখ্যাত ইমাম **ফখরুদ্দীন রাযি (রহ.) বলেন**— 'ইবাদত হলো সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শনের নাম। আর এ সর্বোচ্চ সম্মান পাওয়ার অধিকারী তিনিই, যার কাছে সর্বোচ্চ নিয়ামত প্রাপ্ত হওয়া যায়।'

ইবাদতের প্রকার

মহান আল্লাহ যা করতে বলেছেন তা করা এবং যা করতে নিষেধ করেছেন তা না করা হলো ইবাদত। তাই মহান আল্লাহর আদেশ মেনে সালাত আদায় করা যেমন ইবাদত, তেমনি মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করা, কাউকে কষ্ট না দেওয়া বা দায়িত্ব ঠিক মতো পালন করাও ইবাদত। এ বিশ্লেষণ থেকে দু'রকম ইবাদতের ধারণা পাওয়া যায়। এগুলো হলো— **'হাক্কুল্লাহ'** বা মহান আল্লাহর হক এবং 'হাক্কুল ইবাদ' বা বান্দার হক।

হাক্কুল্লাহ বা মহান আল্লাহর অধিকার

আল্লাহ তাআলার ইবাদতের মধ্যে এমন কিছু কাজ রয়েছে যেগুলো প্রত্যক্ষভাবে তাঁর সাথে সম্পৃক্ত। এগুলোকে হাক্কুল্লাহ বা মহান আল্লাহর হক বলে। যেমন– সালাত, সাওম, হজ, জিকির, তাসবিহ, শোকর ইত্যাদি কেবল মহান আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত। কোনো মাধ্যম বা মধ্যস্থতা ছাড়া এ কাজগুলো করা সম্ভব হয়। এজন্য মহান আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে জবাবদিহি করতে হয় না, এগুলো আদায় না করলে কোনো মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয় না বরং ব্যক্তি নিজে মহান আল্লাহর হুকুম পালন না করার জন্য দায়ী থাকে। এ ইবাদতগুলো পালন করার আগে সব মানুষকে শিরকমুক্ত মনোভাব পোষণ করতে হবে। এ কথা দৃঢ়তার সাথে সর্বাবস্থায় বিশ্বাস করতে হবে যে, মহান আল্লাহই আমাদের একমাত্র উপাসনা পাওয়ার যোগ্য এবং তাঁর কোনো অংশীদার নেই। নিজেকে মহান আল্লাহর কাছে সঁপে দিয়ে তাঁর আদেশ-নিষেধ যথাযথভাবে পালন করাই হাক্কুল্লাহ বা মহান আল্লাহ হক।

হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার অধিকার

হাক্কুল ইবাদ অর্থ হলো— বান্দার হক। মানুষসহ পৃথিবীতে মহান আল্লাহর আরো অসংখ্য সৃষ্টি রয়েছে। মহান আল্লাহ এদের মধ্যে মানুষকে 'আশরাফুল মাখলুকাত' বা সৃষ্টির সেরা মর্যাদা দিয়েছেন। এজন্য মহান আল্লাহ অন্য মানুষের প্রতি এবং অন্যান্য সৃষ্টির প্রতি মানুষকে বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করার আদেশ দিয়েছেন। এ দায়িত্ব ও কর্তব্য সুনির্ধারিত এবং সুনির্দিষ্ট। মা, বাবা, ভাই, বোন, আত্মীয়, বন্ধু, প্রতিবেশী, সহকর্মী, জীবজন্তু, উদ্ভিদ, প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক নানা বস্তু, বিষয় ও পদার্থের প্রতি মানুষের দায়িত্ব রয়েছে। মহান আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে এ দায়িত্ব পালন করা হয় বলে এর মাধ্যমেও মূলত মহান আল্লাহর ইবাদত করা হয়। এর নাম হাক্কুল ইবাদ। বান্দার সাথে সম্পৃক্ত হলেও এর জবাবদিহি মহান আল্লাহর কাছেই করতে হবে।

কুরআন মজিদে হাক্কুল্লাহর বর্ণনার সাথে সাথে হাক্কুল ইবাদেরও বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। বিশেষত সুরা নিসার শুরু থেকে প্রায় শেষ পর্যন্ত এ বিষয়ের বর্ণনাই স্থান পেয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোনো মুমিন ব্যক্তির পার্থিব দুঃখ-কষ্ট দূর করবে, মহান আল্লাহ কেয়ামতের দিন তার দুঃখ-কষ্ট দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোনো সংকটাপন্ন ব্যক্তির সংকট নিরসন করবে, মহান আল্লাহ তার দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় সংকট নিরসন করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে, মহান আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। মহান আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দাকে সাহায্য করে থাকেন যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা নিজ ভাইয়ের সাহায্যে রত থাকেন' (মুসলিম)।

রাসুলুল্লাহ (সা.) আরও বলেছেন, 'এক মুসলিমের ওপর অপর মুসলিমের ৬টি হক বা অধিকার রয়েছে। যেমন— ১. যখন কোনো মুসলমানের সাথে সাক্ষাত হয় তখন সালাম দেওয়া। ২. কোনো মুসলমান দাওয়াত করলে তা কবুল করা। ৩. কোনো মুসলমান হাঁচি দিলে হাঁচির জবাব দেওয়া। ৪. কোনো মুসলমান অসুস্থ হলে তার সেবা শুশ্রূষা করা। ৫. কোনো মুসলমান মারা গেলে তার জানাজায় অংশগ্রহণ করা। ৬. প্রত্যেক মুসলমানের জন্য সেই জিনিস পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে' (তিরমিযি ও দারেমি)।

এছাড়াও মহান আল্লাহ তাআলার আদেশ পালন ও নিষেধ থেকে বিরত থাকার দিক দিয়ে ইবাদত আবার দুই প্রকার। যথা—

১. মহান আল্লাহর আদেশাবলি বাস্তবায়ন।
২. মহান আল্লাহর নিষেধাবলি বর্জন।

১. **মহান আল্লাহর আদেশাবলি বাস্তবায়ন:** আল্লাহ তাআলা যেসব কাজ বাধ্যতামূলকভাবে করার নির্দেশ দিয়েছেন সেসব কাজ বাস্তবায়ন করা মহান আল্লাহর ইবাদত। যেমন— ১. ইমান আনয়ন; ২. সালাত প্রতিষ্ঠা; ৩. জাকাত দেওয়া; ৪. হজ আদায় করা; ৫. সিয়াম পালন করা; ৬. সত্য কথা বলা; ৭. মিথ্যা পরিহার করা; ৮. মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করা ইত্যাদি।

২. **মহান আল্লাহর নিষেধাবলি বর্জন:** আল্লাহ তাআলা যেসব কাজ করতে নিষেধ করেছেন সেগুলো থেকে বিরত থাকাও ইবাদত। যেমন— ১. মিথ্যা বলা; ২. শিরক করা; ৩. হিংসা-বিদ্বেষ; ৪. গিবত করা; ৫. অন্যায়ভাবে হত্যা; ৬. অপরের অধিকার হরণ; ৭. সুদ-ঘুষের প্রচলন; ৮. হারাম জিনিসের প্রতি লোভ ইত্যাদি।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. عِبَادَةٌ (ইবাদাতুন) অর্থ কী? *[ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো. ২০২৫; রা. বো., দি. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০২২]*
২. ইবাদত কী? *[সকল বোর্ড ২০২৫, ২০১৮]*
৩. ইবাদতের মূল লক্ষ্য কী? *[সকল বোর্ড ২০২৫, ২০২২, ২০২১]*
৪. কুরআন মাজিদে হাক্কুল্লাহর বর্ণনার সাথে সাথে কীসের বিস্তারিত বর্ণনাও দেওয়া হয়েছে?
৫. ইবাদত কয় রকমের? *[সকল বোর্ড ২০২৫]*
৬. মহান আল্লাহর আদেশ পালন ও নিষেধ থেকে বিরত থাকার দিক দিয়ে ইবাদত কয় প্রকার?

উত্তরের জন্য দেখো ২৮৫ পৃষ্ঠা।

খ. দলীয় কাজ

শিক্ষার্থীরা দুটি দলে ভাগ হয়ে একদল হাক্কুল্লাহ এবং অন্যদল হাক্কুল ইবাদ সম্পর্কে বর্ণনা করবে।

পাঠ ২

ইবাদতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য
Importance and Significance of Ibadat

মানুষের জীবনধারায় ইবাদতকে উপেক্ষা বা অস্বীকার করা যায় না। ইবাদতের মাধ্যমেই মুমিন বান্দা মুমিন হিসেবে টিকে থাকে, মুসলিম ব্যক্তি মুসলিম হিসেবে জীবনযাপন করতে পারে। ইবাদত ছাড়া বান্দা মুমিন বা মুসলিম থাকতে পারে না। এখানেই ইবাদতের গুরুত্ব। একজন মানুষ মহান আল্লাহর ওপর ইমান আনলেন কিন্তু তিনি মহান আল্লাহর ইবাদত করলেন না, তাহলে তার ঐ ইমান তার জীবনকে ফলপ্রসূ করে তুললো না। ইমানের অপরিহার্য অঙ্গ হচ্ছে— সৎকর্ম করা, ইবাদত-বন্দেগী করা। বাস্তবে ইবাদতের মাধ্যমেই ইমান স্থায়িত্ব লাভ করে। একজন মুমিনের ইবাদত না করার অর্থ হচ্ছে, মহান আল্লাহর আদেশ অমান্য করা। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর আদেশ অমান্য করে, সে কখনো পরিপূর্ণ ইমানদার হতে পারে না। খালেস ইবাদত করা মুমিনের অপরিহার্য কর্তব্য। আল্লাহ তাআলা বলেন—

اُعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ۔

অর্থ: তোমরা এক মহান আল্লাহর ইবাদত করো এবং মহান আল্লাহর বিরোধী শক্তিসমূহকে বর্জন করো (সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৩৬)।

মহান আল্লাহর ইবাদত বাদ দিলে মানবজাতির সৃষ্টির উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ۔

অর্থ: আর জিন ও মানুষ জাতিকে আমি কেবল আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি (সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত: ৫৬)।

পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহ তাআলার খলিফা বা প্রতিনিধি। মানুষকে মহান আল্লাহ তাঁর প্রতিনিধিত্বের সুমহান ও বিরাট দায়িত্ব দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। পৃথিবীর সবকিছু দিয়েছেন মানুষের ভোগ, ব্যবহার ও সুখ নিশ্চিত করার জন্য। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ فِى الْاَرْضِ۔

অর্থ: আর তিনিই মহান আল্লাহ, যিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি নির্বাচন করেছেন (সূরা আল-আনআম, আয়াত: ১৬৫)।

মহান আল্লাহর দেওয়া প্রতিনিধিত্বের এই দায়িত্ব পালন করাই ইবাদত। ইবাদত কেবল নিছক উপাসনা নয়। মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত প্রয়োজনে সম্পাদিত দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কাজই ইবাদত, যদি তা মহান আল্লাহর নির্দেশনানুসারে সম্পন্ন হয়। আল্লাহ তাআলা এ সম্পর্কে বলেন—

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ۔

অর্থ: সালাত আদায় করার পর তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড়ো, মহান আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ করো এবং মহান আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও (সূরা আল-জুমুআহ, আয়াত: ১০)।

কেবল মহান আল্লাহর নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদতেই তাঁর পরিপূর্ণ সন্তুষ্টি লাভ করা সম্ভব। আর মানবজীবনের পরম আরাধ্য ও একমাত্র প্রয়োজনীয় বিষয় হলো মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। যেজন্য ইবাদত সীমাহীন তাৎপর্যবহ ও গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ কীভাবে মহান আল্লাহর ইবাদত করবে, কীভাবে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করবে সে পথও মহান আল্লাহ নির্দেশ করেছেন। কুরআন মজিদে এসেছে—

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ۔

অর্থ: হে মুহাম্মাদ (সা.) বলুন, তোমরা মহান আল্লাহর আনুগত্য করো ও রাসুলের অনুগত হও। আর যদি তোমরা এ আনুগত্য থেকে বিমুখ হও, তাহলে জেনে রেখো মহান আল্লাহ কাফিরদের ভালোবাসেন না (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৩২)।

এ আয়াতের মর্মার্থ হলো মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.)-এর নির্দেশিত পথই ইবাদতের মূল। সেজন্য আনুষ্ঠানিক ইবাদত যেমন– সালাত, সাওম, হজ, জাকাত প্রভৃতি সম্পাদনের পর যে ব্যক্তি যে পর্যায়ের দায়িত্বশীল, যিনি যেক্ষেত্রে নিয়োজিত, মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.)-এর নির্দেশিত পথ অবলম্বন করা তার জন্য সেক্ষেত্রে ইবাদত। আর আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুলের নির্দেশিত পথের বিপরীত পথ অবলম্বন করা বা এর পরিপন্থি জীবনযাপন করা স্পষ্টত মহান আল্লাহ ও রাসুলের (সা.) আনুগত্য থেকে বিমুখ হওয়া।

মৌলিক ইবাদত

মৌলিক ইবাদত হলো মূল বা প্রধান ইবাদত। যে ইবাদতের ওপর ইসলামের মূল কাঠামো দাঁড়িয়ে থাকবে তাই মৌলিক ইবাদত। অন্যান্য ইবাদত সে কাঠামোর পূর্ণতা বিধান করবে, সৌন্দর্য বাড়াবে এবং সুশোভিত করবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) ইসলামের মৌলিক ইবাদত হিসেবে পাঁচ রকমের ইবাদতের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন–

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অর্থ: ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সাক্ষ্য দেওয়া যে, মহান আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর বান্দা এবং রাসুল, সালাত কায়েম করা, জাকাত আদায় করা, হজ করা ও রমজানে সাওম পালন করা (বুখারি ও মুসলিম)।

এ পাঁচ রকমের ইবাদতের মধ্যে মহান আল্লাহর একত্ববাদ এবং মুহাম্মাদ (সা.)-এর রিসালাতের সাক্ষ্য দেওয়া আকিদাগত বিষয়। এটি আনুষ্ঠানিক ইবাদত নয়। আনুষ্ঠানিক ইবাদত হলো সালাত, জাকাত, হজ ও সাওম। এজন্য সাধারণভাবে মৌলিক ইবাদত বলতে এ চারটি ইবাদতকেই বোঝায়।

প্রত্যেক মুমিনের অবশ্য কর্তব্য হলো– এ ইবাদতগুলোর গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং বিধানাবলি বিস্তারিতভাবে অবহিত হয়ে তার দাবি ও শিক্ষা জীবনে রূপায়িত করা।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কীসের মাধ্যমে বান্দা মুমিন হিসেবে টিকে থাকে?
২. সৎকর্ম ও ইবাদত-বন্দেগি করা কীসের অপরিহার্য অঙ্গ?
৩. মহান আল্লাহ জিন ও মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন কেন?
৪. মৌলিক ইবাদত কী? *[সকল বোর্ড ২০১৭]*
৫. মৌলিক ইবাদত মোট কয়টি?
৬. মহান আল্লাহর একত্ববাদ এবং মুহাম্মাদ (সা.)-এর রিসালাতের সাক্ষ্য দেওয়া কোন ধরনের বিষয়?

উত্তরের জন্য দেখো ২৮৫ পৃষ্ঠা।

খ. দলীয় কাজ

শিক্ষার্থীরা দুটি দলে ভাগ হবে। এরপর একদল ইবাদতের গুরুত্ব সম্পর্কে এবং অন্যদল মৌলিক ইবাদত সম্পর্কে ৫টি করে বাক্য লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৩ সালাতের গুরুত্ব
Importance of Salat

সালাতের পরিচয়

মুসলিম সমাজে সালাত আদায় করা অপরিহার্য কর্তব্য। প্রত্যেক মুসলমানের উপর দিবা রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা ফরজ। যে মুসলমান সালাত ছেড়ে দেবে তাকে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

সালাত (صَلٰوةٌ) শব্দটি আরবি। ফারসি ভাষায় একে নামাজ বলা হয়। এর একটি আভিধানিক অর্থ– ইস্তিকামাত বা বাঁকা কাঠকে তাপ দিয়ে সোজা করা। কেননা সালাত মানুষের হৃদয়ের বক্রতা দূর করে সরল ও সোজা করে দেয় এবং ব্যক্তির পাপ প্রবৃত্তিকে ধ্বংস করে। ব্যাবহারিক ক্ষেত্র ও পাত্রভেদে সালাত শব্দটির চারটি বিশেষ অর্থ রয়েছে। যেমন–

১. মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে হলে সালাত অর্থ হবে– রহমত, দয়া, করুণা বা অনুগ্রহ করা।
২. রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে– দরুদ পাঠ করা।
৩. সালাত যদি মানুষের পক্ষ থেকে হয় তাহলে অর্থ হবে– ইস্তেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করা।
৪. ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে সালাত হলে তার অর্থ হবে– তাসবিহ বা পবিত্রতা বর্ণনা করা।

সালাতের পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে– নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট ইবাদত আদায় করার নাম সালাত।

صَلٰوةٌ তথা নামাজের সংজ্ঞায়– اَلْمُعْجَمُ الْوَسِيْطُ প্রণেতা বলেন– هِىَ الْعِبَادَةُ الْمَخْصُوْصَةُ الْمُبَيَّنَةُ حُدُوْدُ اَوْقَاتِهَا فِى الشَّرِعِيَّةِ ـ **অর্থ:** সালাত হচ্ছে এমন একটি নির্দিষ্ট ইবাদতের নাম, শরিয়তে যার নির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে।

আল্লামা জুরজানি (রহ.) বলেন– هِىَ عِبَادَةٌ عَنْ اَرْكَانٍ مَخْصُوْصَةٍ وَاَذْكَارٍ مَعْلُوْمَةٍ بِشَرَائِطَ مَخْصُوْصَةٍ ـ
অর্থ: সালাত এমন একটি ইবাদত, যার জন্য কিছু রুকন রয়েছে এবং তা নির্ধারিত কিছু জিকির ও সীমাবদ্ধ কিছু শর্তের মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ে সম্পাদন করতে হয়।

বিস্তারিতভাবে বললে– সূর্যোদয়ের আগে, দুপুরের পর, অপরাহ্ণ, সূর্যাস্তের পর ও রাতে মহান আল্লাহর নির্ধারিত পদ্ধতিতে কুরআন তিলাওয়াত, তাসবিহ, রুকু, সিজদা, তাশাহুদ, কিয়াম ও বৈঠকের মাধ্যমে ফরজ হিসেবে মুসলিমরা প্রতিদিন পাঁচবার মহান আল্লাহ নির্ধারিত ও রাসুলুল্লাহ (সা.) নির্দেশিত বিশেষ যে ইবাদত সম্পাদন করেন, তার নাম সালাত। প্রতিদিনের পাঁচ ওয়াক্ত সালাত হলো– ফজর, জোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা।

সালাতের ধর্মীয় গুরুত্ব

মৌলিক আনুষ্ঠানিক ইবাদত হিসেবে সালাতের বিশেষ ধর্মীয় গুরুত্ব রয়েছে। যেমন–

১. **ফরজ ইবাদত:** সালাত একটি ফরজ বা অবশ্যকরণীয় ইবাদত। কুরআন মাজিদে অসংখ্য স্থানে আল্লাহ তাআলা সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর নির্দেশ পালন করা ফরজ, অস্বীকার করা কুফরি। সালাত পালন না করা কবিরা গুনাহ। সেজন্য রাসুলুল্লাহ (সা.)ও ব্যাপকভাবে সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেছেন– اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ **অর্থ:** তোমরা সালাত কায়েম করো (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১১০)।

২. **ইসলামের স্তম্ভ:** ইসলামের ধর্মীয় কাঠামো যে পাঁচটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে সালাত তার মধ্যে দ্বিতীয়। মূল স্তম্ভ বা বুনিয়াদ ছাড়া কোনো ঘর বা স্থাপনার অস্তিত্ব লাভ যেমন সম্ভব নয়, তেমনি সালাত বাদ দিয়ে ইসলামকে কল্পনা করাও অসম্ভব। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন–

بُنِىَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অর্থ: ইসলাম পাঁচটি বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সাক্ষ্য দেওয়া যে, মহান আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রাসুল, সালাত কায়েম করা, জাকাত দেওয়া, হজ করা ও রমজানের সাওম পালন করা (বুখারি ও মুসলিম)।

৩. **ইসলাম ও ইমানের প্রতীক:** সালাত ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণ করা ও ইমান নবায়নের বাস্তব প্রমাণ। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ وَعَلَمُ الْإِيْمَانِ اَلصَّلٰوةُ

অর্থ: প্রতিটি বস্তু বা বিষয়েরই নিদর্শন রয়েছে আর ইমানের নিদর্শন হলো সালাত (বুখারি)।

ব্যক্তি মুসলিম কি-না, সে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.)-এর প্রতি ইমান পোষণ করে কি-না, তা জানা যায় সালাত থেকে।

সালাত কুফর ও ইমানের মধ্যে পার্থক্য রচনা করে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন—

اَلْفَرْقُ بَيْنَ الْإِسْلَامِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلٰوةِ.

অর্থ: ইসলাম ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হলো সালাত ত্যাগ (সুনানে ইবন মাজাহ)।

মুমিন ব্যক্তি সালাত কায়েম করে, কাফির তা বর্জন করে। এজন্য স্বেচ্ছায় সালাত ত্যাগ করা কুফরির মতো অপরাধ। রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, مَنْ تَرَكَ الصَّلٰوةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ **অর্থ:** যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত ত্যাগ করে, সে যেন কুফরি করল (বুখারি)।

৪. **মহান আল্লাহ ও মানুষের যোগসূত্র:** যথাযথভাবে সালাত আদায়ে মানুষের মধ্যে মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উপলব্ধি হয়। তাকবিরে তাহরিমা উচ্চারণের সাথে সাথে ব্যক্তি পৃথিবীর সব বিষয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে একান্তভাবে মহান আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলেছেন, 'তুমি এমনভাবে ইবাদত করবে যেন তুমি মহান আল্লাহকে দেখছ। আর যদি তুমি তাঁকে নাও দেখ, তিনি তোমাকে অবশ্যই দেখছেন' (বুখারি ও মুসলিম)। সালাতের মাধ্যমে মানুষের সাথে মহান আল্লাহর সুন্দর সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়টি উল্লেখ করে 'হাদিসে কুদসিতে' আল্লাহ তাআলা বলেন— 'আমার ও আমার বান্দার মধ্যে সালাত ভাগ করা আছে। এ সময় বান্দা যা চায়, আমি তাই দেই। সে যখন বলে 'আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামিন' তখন মহান আল্লাহ ফেরেশতাদের শুনিয়ে বলেন— আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল। বান্দা যখন বলে, 'আর রহমানির রহিম' তখন তিনি বলেন— 'আমার বান্দা আমার গুণগান করছে।' সে যখন বলে, 'মালিকি ইয়াওমিদ্দিন' মহান আল্লাহ তখন বলেন— 'বান্দা আমার মর্যাদার স্বীকৃতি দিল।' বান্দা যখন বলে, 'ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতাইন' তখন তিনি বলেন— 'এটা আমার এবং আমার বান্দার আত্মিক সম্পর্কের মূল রহস্য।' সে যখন পাঠ করে 'ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম' মহান আল্লাহ বলেন— 'এর সম্পূর্ণটাই আমার বান্দার জন্য। আমার বান্দা যা চায় তাই পায়। বান্দা যখন সিজদা করে; তখন আমি তার সবচেয়ে নিকটবর্তী হই।'

৫. **আনুগত্যের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ:** সালাত মহান আল্লাহর প্রতি মানুষের আনুগত্যের বাস্তব প্রকাশ। এর মাধ্যমে ব্যক্তি নিয়ম মতো সালাতের জন্য দাঁড়ায়। তার নিজস্ব পদ, পরিচয় বাদ দিয়ে মহান আল্লাহর সামনে নিষ্ঠা ও আনুগত্য নিয়ে সে দাঁড়ায়। মহান আল্লাহর কুদরতি চরণে প্রতিটি রুকু-সিজদায় সে বিনয়ে অবনত হয়। তাঁর আত্মসম্মান, অহঙ্কার ও গর্ব মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের কাছে সমর্পিত হয়।

৬. **সর্বোত্তম ইবাদত:** ইবাদতসমূহের মধ্যে সালাত সর্বোত্তম এবং সার্বজনীন। ধনী, গরিব, সুস্থ, অসুস্থ, পথচারী, প্রবাসী সবার জন্য সালাত আদায় করা ফরজ। মহান আল্লাহকে স্মরণ করা, তাঁর বিধানাবলি মেনে চলা বা শয়তানের প্ররোচনা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখায় সালাতের কার্যকারিতা অপরিসীম। এর মাধ্যমে সার্বক্ষণিক মহান আল্লাহর জিকির সম্ভব। মহান আল্লাহ বলেন— وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ **অর্থ:** আর আমার স্মরণের জন্য সালাত কায়েম কর (সূরা ত্ব-হা, আয়াত: ১৪)।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন— 'সময় মতো সালাত আদায় করা সর্বোত্তম ইবাদত' (সহিহ বুখারি)।

৭. **আখিরাতে সাফল্য লাভ:** ইসলামি চিন্তাধারায় দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী। চিরস্থায়ী হলো আখিরাতের জীবন। আখিরাতের সুখই প্রকৃত সুখ। আখিরাতের সাফল্য হলো আসল সাফল্য। সালাত ব্যক্তিকে আখিরাতে সাফল্য লাভের পূর্ণ নিশ্চয়তা দেয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন— قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ. اَلَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ. **অর্থ:** মুমিনরা সাফল্য লাভ করেছে, যারা তাদের সালাতে বিনয়ী ও নম্র (সূরা আল-মুমিনুন, আয়াত: ১-২)।

কিয়ামতের কঠিন দিনে সালাত হবে মুক্তির কারণ। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন— مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُوْرًا وَّبُرْهَانًا وَّنَجَاةً يَّوْمَ الْقِيَامَةِ. **অর্থ:** যে ব্যক্তি সালাত হিফাজত করে, কিয়ামতের দিন তার জন্য সালাত হবে জ্যোতি, তার হিদায়েতের দলিল এবং মুক্তির উপায় (বায়হাকি)।

৮. **ক্ষমা ও পুরস্কার লাভ:** সালাত ব্যক্তির গুনাহ দূর করে। তার জন্য ক্ষমা লাভ সহজ হয়। পৃথিবী ও আখিরাতে সালাত আদায়কারী বিপুল পুরস্কারে ভূষিত হয়। সাহাবিদের সমাবেশে রাসুলুল্লাহ (সা.) একবার বলেন— 'যদি কারও বাড়ির পাশ দিয়ে একটি নদী প্রবাহিত হয় আর ব্যক্তি যদি প্রতিদিন সে নদীতে গোসল করে, তবে কি তার দেহে কোনো ময়লা থাকবে? সাহাবিগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসুল (সা.)! না, কোনো ময়লা থাকবে না। তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, পাঁচ ওয়াক্ত সালাতও ঠিক তেমনি তার গুনাহসমূহ দূর করে দেয়।'

সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার ক্ষমা পাওয়া যায়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ভালোভাবে অজু করে রুকু-সিজদায় গভীর মনোযোগসহ সময়মতো সালাত আদায় করে, অবশ্যই আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দেবেন' (সুনানে আবু দাউদ)।

সালাতের আধ্যাত্মিক গুরুত্ব

সালাত আনুষ্ঠানিক এবং দৈহিক ইবাদত। তা সত্ত্বেও এর মূল আবেদন দৈহিক বা আনুষ্ঠানিক নয়। সালাতের মূল ক্রিয়া ব্যক্তির আত্মার ওপর। এর মাধ্যমে মানুষের কাঙ্ক্ষিত মানসিক উৎকর্ষ সাধিত হয়। যেমন—

১. **আত্মিক প্রশান্তি লাভ:** মানবাত্মার উৎপত্তি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং এর গন্তব্যও মহান আল্লাহর কাছে। তাঁর সুমহান সত্তার সান্নিধ্য লাভের জন্য আত্মা তাই সবসময় উদগ্রীব থাকে। মহান আল্লাহর কাছে সমর্পিত হওয়া, সম্পূর্ণ নিবেদিত হওয়ার মধ্যেই আত্মার তৃপ্তি ও সাফল্য। সালাতের মাধ্যমে মানবাত্মা মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করে। কাঙ্ক্ষিত প্রিয় সত্তার সান্নিধ্য লাভ করায় আত্মার উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা দূর হয়ে যায়। তার মধ্যে প্রশান্তি বিরাজ করে। ফলে আত্মার সার্বিক অবস্থানে স্থিরতা ও তৃপ্তি নেমে আসে। এজন্যই রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'আমার চক্ষুর শীতলতা রাখা হয়েছে সালাতের মধ্যে' (সুনানে নাসাঈ)।

২. **কু-প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ:** সালাত মানুষের মধ্যে বিরাজিত বিভিন্ন পাশবিক প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে তার মূলোৎপাটন করে। প্রতিদিনের পাঁচ ওয়াক্ত সালাত এবং সালাতের প্রতিশ্রুতি, কুরআন তিলাওয়াত, মহান আল্লাহর জিকির মানুষকে ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ করে। তার মধ্যে প্রবৃত্তির ধ্বংসাত্মক অনুশীলন প্রবণতা হ্রাস পায়। সে প্রতি রাকাতে আল্লাহ তাআলার সাহায্য প্রার্থনা করে। সরল সঠিক পথ চায়। তাঁর ইবাদতে নিয়োজিত থাকার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে। এভাবে সালাত আদায়কারী কেবল সুন্দর ও সৎ বিষয় নিয়ে ভাবতে থাকে। তার মানসিকতা পুরোপুরি কু-প্রবৃত্তিবিরোধী হয়ে ওঠে। ফলে সালাতের আধ্যাত্মিক প্রভাব ব্যক্তিকে কু-প্রবৃত্তি মুক্ত করে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ـ

অর্থ: নিশ্চয়ই সালাত অশালীন ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে (সূরা আল-আনকাবুত, আয়াত: ৪৫)।

৩. **মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ:** সালাত মানুষকে মহান আল্লাহর সান্নিধ্য ও নৈকট্যে উপনীত করে। সালাতের শুরুতেই ব্যক্তি পৃথিবীর সব বিষয়ের সাথে নিজের সম্পর্ক ত্যাগের ঘোষণা দেয়। কুরআন মাজিদে এসেছে—

إِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ـ

অর্থ: নিশ্চয়ই আমি একমুখী হয়ে আমার সবকিছু সেই সত্তার সমীপে পেশ করছি, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই (সূরা আল-আনআম, আয়াত: ৭৯)।
এ ঘোষণা দেওয়ার মাধ্যমে ব্যক্তি নিয়ত করে এবং তাকবিরে তাহরিমা বা 'আল্লাহু আকবার' বলে হাত বাঁধে। তার তাকবিরে তাহরিমার সাথে সাথে পৃথিবীর সবকিছুর সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। কেবল সে আর মহান আল্লাহ তাআলা থাকেন।

৪. **আত্মশুদ্ধি:** সালাত মানুষের আত্মা পরিশুদ্ধ করে। পাপের কারণে মানুষের আত্মা কলুষিত হয়। মহান আল্লাহর জিকিরে গাফলতির জন্য বা তাঁকে অবিশ্বাস ও অস্বীকারের জন্য মানুষের আত্মা অপবিত্র থাকে। সালাত এ অপবিত্রতা ও কলুষতা দূর করে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'মানুষ পাপ করলে তার প্রতিটি পাপের জন্য কলব বা অন্তরে একটি করে কালো দাগ পড়ে। মানুষ গুনাহ করতে থাকলে তার অন্তর কালো দাগে ভরে যায়। আবার মহান আল্লাহর জিকিরে এ দাগসমূহ দূর হয়' (তিরমিযি)।

৫. **নৈতিক দৃঢ়তা অর্জন:** সালাত মানুষকে সুন্দরতম নৈতিক চরিত্রের অধিকারী করে তোলে। তার নৈতিক স্খলন ঘটার সম্ভাবনা কম থাকে। সালাতের শান্তিপূর্ণ নীরব অবস্থা মুসলিমকে প্রয়োজনীয় চিন্তা গবেষণার সুযোগ এনে দেয়। তার অস্থিরতা থাকে না। সিদ্ধান্ত গ্রহণে সে ঈর্ষণীয় দৃঢ়তা লাভ করে।

৬. **সব সৃষ্টির সাথে আত্মিক সম্পর্ক সৃষ্টি:** বিশ্বজাহানে এবং আকাশমণ্ডলীর সব সৃষ্টি নিজেদের প্রথা ও পদ্ধতি অনুযায়ী মহান আল্লাহর বিধান পালন করে। সালাত সম্পন্ন করে। তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ সালাত আদায়ের পদ্ধতি সম্পর্কে জানে। আল্লাহ তাআলা বলেন— 'তুমি কি দেখ না আকাশ ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা এবং উড়ন্ত পাখিরা মহান আল্লাহর পবিত্রতা বা মহিমা ঘোষণা করে? প্রত্যেকেই তাঁর সালাত ও তাসবিহ জানে' (সূরা আন-নুর, আয়াত: ৪১)। মানুষ নিয়মিত সালাত আদায়ের মাধ্যমে পৃথিবীর সব সৃষ্টির সাথে একটা অদৃশ্য, আত্মিক ও আধ্যাত্মিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে।

সালাতের সামাজিক গুরুত্ব

সালাত সম্মিলিত ইবাদত। একা একা পালন করলে সালাত আদায় হয় বটে, কিন্তু রাসুলুল্লাহ (সা.) জামায়াতবদ্ধ সালাত আদায়ের ওপরেই গুরুত্বারোপ করেছেন। সালাত মানষের জন্য দৈনন্দিন পালনীয় একটি ফরজ ইবাদত হলেও সমাজজীবনে রয়েছে এর সুদূর প্রসারী প্রভাব ও উপকারিতা। যেমন—

১. **অশ্লীলতা ও অন্যায় দূরকারী:** সালাত ব্যক্তির মধ্যে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ চেতনার জন্ম দেয়। সে নৈতিক দিক থেকে পবিত্র হয়ে ওঠে। মন্দ, নিষিদ্ধ ও অশ্লীল আচরণ থেকে নিজেকে বিরত রাখে। তার মধ্যে এসব অনৈতিক আচরণ প্রতিরোধের মানসিকতা তৈরি হয়। ফলে সমাজ অশালীন আচরণ থেকে মুক্তি পায়। সামাজিক শৃঙ্খলার উন্নতি হয়। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'নিশ্চয়ই সালাত অশালীন ও মন্দকাজ থেকে বিরত রাখে' (সূরা আল-আনকাবুত, আয়াত: ৪৫)।

২. **ঐক্য ও সম্প্রীতি সৃষ্টি:** সালাত মুমিনদের ঐক্যবদ্ধ থাকার প্রশিক্ষণ দেয় এবং তাদের মধ্যে সম্প্রীতি গড়ে দেয়। নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত স্থানে একজন ইমামের নেতৃত্বে সালাত আদায় করলে মুসল্লিরা নিজেদের একটি পরিপূর্ণ দেহ ভাবতে পারেন। এক ও অভিন্ন লক্ষ্য তাদেরকে ধর্মীয় ও আত্মিক আত্মীয়তায় গ্রথিত করে। নিয়ম মাফিক প্রতিদিন পাঁচবার জামায়াতে সালাত আদায় মুসলিমদেরকে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করে।

পাশাপাশি জামাআতে সালাত আদায়ের মাধ্যমে সমাজের উঁচু-নীচু, ধনী-নির্ধনের দূরত্ব হ্রাস করে সাম্য প্রতিষ্ঠা করে। এভাবে সামাজিক ঐক্য গড়ে ওঠে।

৩. **দায়িত্ববোধ ও সময় সচেতনকারী:** প্রতিদিন নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায়ের মাধ্যমে সব মানুষ সময়জ্ঞান ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়। মহান আল্লাহ বলেন— إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا. **অর্থ:** নিশ্চয়ই নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায় করা মুমিনদের জন্য ফরজ করা হয়েছে (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১০৩)।

এজন্য মানুষকে সালাতের সুনির্দিষ্ট সময়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ রাখতে হবে। বস্তুত নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায়ের এ পদ্ধতি মুসলিমকে দায়িত্বশীল ও সময়ানুবর্তী করে গড়ে তোলে।

৪. **শান্তি প্রতিষ্ঠা:** সালাত সামষ্টিক ইবাদত। পবিত্র পরিবেশে সর্বস্তরের মানুষ এতে অংশগ্রহণ করে। তাদের মধ্যে এ সময়ে অস্থিরতা ও চঞ্চলতা কাজ করে না। শান্ত-সুন্দর পরিবেশে তারা সালাত আদায় করে। এর প্রভাব পড়ে তাদের ব্যক্তি ও সমাজজীবনে। তারা শান্তিপ্রিয় হয়ে ওঠে। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) এজন্যই বলেছেন, 'সালাতের মধ্যেই আমার চক্ষুর শীতলতা আছে' (সুনানে নাসাঈ)।

৫. **শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত হওয়া:** সালাত আদায়ে শৃঙ্খলার পরম প্রশিক্ষণ লাভ করা যায়। নির্ধারিত সময়ে নির্দিষ্ট ওয়াক্তের সালাত আদায় করা হয়। যখন রুকু করার কথা তখন রুকু করা হয়, সিজদার সময় সিজদা করা হয়। ইমাম রুকুতে গেলে কেউ সিজদায় চলে যায় না বা ইমাম সিজদায় গেলে কেউ দাঁড়িয়েও থাকে না। অহেতুক নড়াচড়া করে সালাতের পরিবেশ নষ্ট করা বা চিৎকার-চেঁচামেচি ও কথাবার্তা বলার কোনো চেষ্টা কেউ করে না। প্রতিদিন পাঁচবার সামষ্টিক সালাতে শৃঙ্খলার এই কঠোর অনুশীলনের ফলে সমাজজীবনে শৃঙ্খলাবোধের উন্মেষ ঘটে।

৬. **সামাজিক সাম্য:** সালাত আদায়ে সমাজের মানুষের মধ্যে মানবিক মর্যাদা ও অধিকারের সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। জামায়াতে সালাত আদায়কারীরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ায়। এ সময় রাজা-প্রজা, আমির-ফকির, ধনী-গরিব, সাদা-কালো, অঞ্চল ও জাতীয়তার কোনো ব্যবধান থাকে না। মহান আল্লাহর বান্দা হিসেবে কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে তারা সালাত আদায় করে। মহান আল্লাহর কাছে নিজেদের সমর্পণ করে। প্রতি ওয়াক্ত সালাতের এ প্রশিক্ষণ ব্যক্তির মধ্যে সাম্যবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটায়। সমাজজীবনে এর প্রভাবে বংশগত গৌরব ও কৌলিন্যের অবসান ঘটে।

৭. **পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রশিক্ষণ:** সালাত আদায়ের জন্য পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা অনিবার্য। শরীর, পোশাক ও জায়গা পবিত্র-পরিচ্ছন্ন না হলে সালাত আদায় করা যায় না। এজন্য সালাত আদায়কারীর শরীর, পোশাক ও জায়গা পরিচ্ছন্ন রাখার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হয়। তাছাড়া অজু, মিসওয়াক, গোসল ব্যক্তির শারীরিক সুস্থতা নিশ্চিত করে।

৮. **নেতৃত্ব ও আনুগত্যবোধ:** জামাআতে সালাত আদায়কারী সমাজের প্রত্যেক মানুষের মাঝে ইমাম ও মুক্তাদির নেতৃত্ব ও আনুগত্যবোধ জাগ্রত হয়।

৯. **নেতা নির্বাচন:** জামায়াতে সালাত আদায়ের জন্য ইমাম প্রয়োজন। যোগ্য, দক্ষ, সর্বজনগ্রাহ্য একজন দীনি ইলম ও আমলসম্পন্ন ব্যক্তিকে সাধারণত ইমাম নির্বাচিত করা হয়। মুসলিমদের জন্য সব ক্ষেত্রেই ইমাম বা নেতা নির্বাচন করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'এমনকি তিনজনও যদি থাকো- তাহলে একজনকে নেতা বানাবে' (সুনানে আবু দাউদ)।

সালাতের জন্য ইমাম নির্বাচন মুসলিমদেরকে সামাজিক নেতা নির্বাচনে সচেতন করে তোলে। সে ক্ষেত্রেও তারা যোগ্য ও দক্ষ লোককেই নির্বাচিত করেন।

১০. **আইন মেনে চলার প্রশিক্ষণ:** সালাত আদায়কারীরা একজন ইমামের পেছনে সালাত আদায় করেন। নির্দ্বিধায় তার নির্দেশনা অনুযায়ী সালাত শুরু করেন, রুকু-সিজদা করেন এবং সালাত সমাপ্ত করেন। ইমামের আনুগত্য তাদের সমাজের বৃহত্তর অঙ্গনে সমাজ নেতা বা জাতীয় নেতার আনুগত্যের প্রশিক্ষণ দেয়। তারা সবরকম সঙ্গত আইন মেনে চলায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন।

১১. **গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ:** সালাত আদায়কারীরা নিজেদের পছন্দমতো যোগ্য ও দক্ষ লোককে ইমাম মনোনীত করেন। নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁর আনুগত্য করেন এবং তিনি ভুল করলে নির্দ্বিধায় তার সমালোচনা করেন, সংশোধনের উদ্যোগ নেন। সমাজের নেতার ক্ষেত্রেও এ চেতনা কাজ করে। ফলে সুস্থ ও সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক পরিবেশ গড়ে ওঠে।

সুতরাং নিয়মিত সালাত আদায় করলে মানুষের মাঝে এ গুরুত্বপূর্ণ গুণগুলোর সমাবেশ ঘটাবে। সালাত আদায়কারীর আত্মিক, আধ্যাত্মিক, ধর্মীয়, ও সামাজিক অবস্থা সুন্দর এবং ইসলামসম্মত করার এ হলো এক সমন্বিত ব্যবস্থা।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. 'সালাত' শব্দের অর্থ কী? *[ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো. ২০২৫; ঢা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., ব. বো. ২০১৯]*
২. কোন ইবাদতকে মুমিনদের মি'রাজ বলা হয়? *[সকল বোর্ড ২০১৯]*
৩. কোন ইবাদতে বিনয় ও আনুগত্যের পূর্ণ প্রকাশ ঘটে? *[সকল বোর্ড ২০২২, ২০২১, ২০১৮]*
৪. রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে সম্পৃক্ত হলে সালাত অর্থ কী হবে?
৫. সালাত পালন না করা কীরূপ গুনাহ?
৬. সময়মতো সালাত আদায় করা কী?

উত্তরের জন্য দেখো ২৮৫ পৃষ্ঠা।

খ. একক কাজ

শিক্ষার্থীরা সালাতের সামাজিক গুরুত্ব সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

গ. দলীয় কাজ

শিক্ষার্থীরা দুটি দলে বিভক্ত হবে। এরপর একদল সালাতের ধর্মীয় গুরুত্ব এবং অন্যদল সালাতের আধ্যাত্মিক গুরুত্ব সম্পর্কে পাঁচটি করে বাক্য লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৪

সালাতের শিক্ষা
Learning of Salat

সালাতের ধর্মীয় শিক্ষা

সালাত মানুষকে আল্লাহ তাআলার নিঃশর্ত আনুগত্য শিক্ষা দেয়। মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত বা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। আল্লাহ পাক তাদেরকে এ সম্মান দিয়েছেন। মানুষকে তাঁর খলিফা নির্বাচিত করেছেন। পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন মানুষের উপকার ও কল্যাণের জন্য। মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে একমাত্র তাঁকে ছাড়া পৃথিবীর কারো কাছে মানুষ মাথানত করতে পারে না। সালাতে মানুষ এক মহান আল্লাহর কাছে মাথানত করার বাস্তব শিক্ষা পায়। মানুষ তার সব পার্থিব মর্যাদা, পদ, সম্ভ্রম, সম্পত্তি, ক্ষমতা, বিত্ত, শ্রেষ্ঠত্ব, আভিজাত্য, দুর্বলতা, সবলতা, সবকিছু ভুলে গিয়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহর সামনে সিজদায় অবনত হয়। আল্লাহ তাআলার কাছে আনুগত্য প্রকাশের শ্রেষ্ঠতম পদ্ধতি সালাত। মুমিন ও কাফিরের মধ্যে সালাত পার্থক্য রচনা করে দেয়। মুমিন ব্যক্তি নির্ধারিত সময়ে যথাযথ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে সালাত আদায় করে। আর কাফির সালাত আদায় করে না বরং সালাত অস্বীকার করে। সুতরাং মুমিনের কর্তব্য হলো খুলুসিয়াত বা একনিষ্ঠতার সাথে সালাত আদায় করা।

সালাতের আধ্যাত্মিক শিক্ষা

সালাতের আধ্যাত্মিক শিক্ষা সীমাহীন। বাহ্যিকভাবে সালাতকে একটি আনুষ্ঠানিক ইবাদত মনে হলেও সালাত মূলত একটি আধ্যাত্মিক ইবাদত। এর আধ্যাত্মিক শিক্ষা হলো— বৈষয়িক বিভিন্ন কাজ মানুষকে মহান আল্লাহর জিকির থেকে গাফিল রাখে। পার্থিব জীবনের কর্মব্যস্ততার কারণে মানুষ আল্লাহ তাআলার স্মরণ থেকে দূরে সরে যায়। মহান আল্লাহর ইবাদত বন্দেগির কথা ভুলে গিয়ে দুনিয়ার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। মানুষের বিপুল ব্যস্ততার মধ্যে সালাতের আহ্বান মানুষকে মহান আল্লাহর স্মরণে ফিরিয়ে আনে। ব্যস্ততার মধ্যেও সে বুঝতে পারে, মহান আল্লাহর শক্তি ও ক্ষমতার ব্যাপ্তি থেকে মানুষ কখনোই দূরে থাকতে পারে না।

সালাত সবচেয়ে বেশি প্রভাব সৃষ্টি করে মানুষের আত্মার ওপর। সালাত আদায় করার সময়ে সালাত আদায়কারী আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়াবার অনুভূতি লাভ করে। সে উপলব্ধি করে সর্বশক্তিমান আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে সে ইবাদত করছে। এমন সর্বশক্তিমান সেই সত্তা, যিনি তাঁর বাহ্যিক দিকটাই শুধু দেখছেন না বরং দেখছেন তাঁর মনের ভেতরের সব গোপন বিষয়। তার চিন্তায় এখনো যা পুরো আকৃতি লাভ করেনি, তারও প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা আল্লাহ তাআলা। এই উপলব্ধি ব্যক্তির মন থেকে সব খারাপ ভাবনা দূর করে দেয়। ব্যক্তি নিজেকে আরো বেশি পবিত্র ও শুদ্ধ করার শিক্ষা পায় সালাত থেকে।

সালাতের সামাজিক শিক্ষা

জামায়াতে সালাত আদায়ের ব্যবস্থা সালাতকে একটি সামাজিক ইবাদতে পরিণত করেছে। সালাত সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার শিক্ষা দেয়। সমাজকে আচরণগত অশালীনতা ও অশ্লীলতা থেকে মুক্ত করার শিক্ষা দেয়। সময়ানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবোধের সুমহান শিক্ষা সালাতের মধ্যে পাওয়া যায়। আল্লাহ তাআলা নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিদিন পাঁচবার সালাত আদায়ের বিধান দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'নিশ্চয়ই নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায় করা মুমিনদের জন্য ফরজ করা হয়েছে' (সূরা আন-নিসা:১০৩)। পরম শৃঙ্খলার সাথে সুনির্দিষ্ট সময়ে সালাত আদায়ের মাধ্যমে মানুষ সব সামাজিক কর্তব্য যথাসময়ে এবং শৃঙ্খলার সাথে যথাযথ নিয়ম মেনে সম্পাদন করার শিক্ষা পায়। সালাত সাম্যবাদের সুমহান শিক্ষা দেয়। আল্লাহ তাআলার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ মর্যাদা ও অধিকার লাভে সমান। ভাষা, অঞ্চল, জাতীয়তা, বর্ণ, অর্থ, বিত্ত প্রভৃতি এ মর্যাদার কম বেশি করতে পারে না। জামায়াতে সালাত আদায়ের সময় শাসক-শাসিত, ধনী- নির্ধন সবাই এক কাতারে দাঁড়িয়ে মানবিক সমতার এক মহান প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। ঐক্যবদ্ধ থাকার এবং সম্প্রীতি সৃষ্টির শিক্ষা নিহিত রয়েছে সালাতের মধ্যে। একজন ইমামের নিঃশর্ত আনুগত্য, একই সাথে সব কাজ সম্পাদন এবং ভাবগম্ভীর ও অন্তরঙ্গ পরিবেশে পাশাপাশি অবস্থান মানুষকে বৃহত্তর সমাজে এ ধারা অব্যাহত রাখার প্রেরণা দেয়। এবং এ থেকে মানুষ বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে ঐক্যবদ্ধভাবে অংশগ্রহণ করা এবং নেতার নির্দেশ মেনে চলার শিক্ষা পায়।

সালাতের অর্থনৈতিক শিক্ষা

দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের মাধ্যমে আমাদের মধ্যে সময়ানুবর্তিতা ও কর্তব্যপরায়ণতার প্রকাশ ঘটে। সালাত আমাদের মনকে সতেজ, সবল ও কর্মক্ষম করে তোলে। নিয়মিত সালাত আদায়ের মাধ্যমে ব্যক্তির মধ্যে অলসতা বা কাজের প্রতি অনীহা থাকে না। হালাল উপার্জন ইবাদত কবুলের পূর্বশর্ত হওয়ায় সালাত আদায়কারী ব্যক্তি হালাল উপার্জনের প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়। এছাড়াও প্রাত্যহিক জামায়াতে সালাত আদায় করার কল্যাণে সমাজের প্রতিটি মানুষ একে অন্যের পাশে থাকতে পারে। মানুষের বিপদ-আপদ ও বিভিন্ন প্রয়োজনের প্রতি সহজেই চোখ পড়ে। এতে করে একে অপরকে সাহায্য-সহযোগিতার সুযোগ হয়। সর্বোপরি, সালাত আদায়ের স্থান তথা মসজিদে জাকাত, সাদাকাহ ইত্যাদির গুরুত্ব নিয়ে ইমাম সাহেবগণ জুমার দিন কিংবা অন্য কোনো উপলক্ষ্যে ওয়াজ-নসিহত করেন। এর মাধ্যমে ধনীদের হাত গরিবদের দিকে সম্প্রসারিত হতে উদ্বুদ্ধ হয়। আল্লাহ তাআলা কুরআনের অসংখ্য আয়াতে সালাতের পাশাপাশি জাকাতের কথাও বলেছেন। আর জাকাত, সাদাকাহ প্রভৃতি যথাযথভাবে আদায়ের মাধ্যমে সমাজে ধনী-গরিবের মধ্যেকার অর্থনৈতিক বৈষম্য কমে আসে।

জেনে রাখো

বিশ্বনবি (সা.) বলেছেন— যে ব্যক্তি যথারীতি নামাজ পড়ে মহান আল্লাহ তার নামাজের বদলে পাঁচটি বিশেষ সম্মান দান করেন। ১. নামাজির অভাব দূর করেন; ২. কবরের আজাব দূর করেন; ৩. কিয়ামতের দিন ডান হাতে আমলনামা দেবেন; ৪. বিদ্যুতের ন্যায় পুলসিরাত পার করবেন; ৫. যথারীতি নামাজ আদায়কারী বিনা হিসাবে বেহেস্তে প্রবেশ করবেন।

আমরা নিয়মিত যে সালাত আদায় করি তা নিচের ছকে দেখানো হলো—

ওয়াক্ত	ফরজের পূর্বে সুন্নত (মুয়াক্কাদাহ)	ফরজ	ফরজের পরে সুন্নত (মুয়াক্কাদাহ)	ওয়াজিব
ফজর	২ রাকাত	২ রাকাত		
জোহর	৪ রাকাত	৪ রাকাত	২ রাকাত	
আসর		৪ রাকাত		
মাগরিব		৩ রাকাত	২ রাকাত	
এশা		৪ রাকাত	২ রাকাত	৩ রাকাত (বিতর সালাত)

এছাড়াও প্রতি জুমাবার (শুক্রবার) জোহরের ওয়াক্তে আমরা কবলাল জুমআ ৪ রাকাত সুন্নত (মুয়াক্কাদাহ), ২ রাকাত ফরজ এবং ৪ রাকাত বা'দাল জুমআ সুন্নত (মুয়াক্কাদাহ) আদায় করি।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কী মানুষকে আল্লাহ তাআলার নিঃশর্ত আনুগত্য শিক্ষা দেয়?
২. মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাতের সম্মান দিয়েছেন কে?
৩. মহান আল্লাহ পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন কার উপকার ও কল্যাণের জন্য?
৪. আল্লাহ তাআলার আনুগত্য প্রকাশের শ্রেষ্ঠতম পদ্ধতি কী?
৫. বিপুল ব্যস্ততার মধ্যে সালাতের আহ্বান মানুষকে কার স্মরণে ফিরিয়ে আনে?
৬. নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায় করা মুমিনদের জন্য কী?

উত্তরের জন্য দেখো ২৮৫ পৃষ্ঠা।

খ. দলীয় কাজ

শিক্ষার্থীরা দুটি দলে বিভক্ত হবে। প্রথম দল সালাতের ধর্মীয় শিক্ষা এবং দ্বিতীয় দল সালাতের সামাজিক শিক্ষা সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লিখে শ্রেণিশিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৫ জাকাতের গুরুত্ব
Importance of Zakat

ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের মধ্যে জাকাত তৃতীয়। এটি একটি অর্থনৈতিক ইবাদত এবং ইসলামি অর্থব্যবস্থার মূলভিত্তি। শোষণ ও বঞ্চনাহীন সুষম অর্থব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যম হিসেবে জাকাত অতুলনীয়। অর্থ সম্পর্কীয় ইবাদত হলেও এর ধর্মীয়, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক আবেদন বিপুল। কুরআন মাজিদের বহুস্থানে সালাত আদায়ের হুকুম দেওয়ার পাশাপাশি জাকাত আদায়েরও জোরালো তাগিদ দেওয়া হয়েছে। যেমন– আল্লাহ তাআলা বলেন– وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ
অর্থ: আর তোমরা সালাত তথা নামাজ প্রতিষ্ঠা করো এবং জাকাত প্রদান করো (সূরা আল-মুজাম্মেল, আয়াত: ২০)।

জাকাতের সংজ্ঞা

اَلزَّكٰوةُ (জাকাত) শব্দটি ক্রিয়ামূল। প্রশংসা করা, প্রাচুর্য লাভ করা বা সংশোধন করা অর্থে শব্দটির ব্যবহার রয়েছে। তবে এর দুটি প্রসিদ্ধ অর্থ হলো– اَلتَّطْهِيْرُ বা পবিত্রকরণ এবং اَلزِّيَادَةُ বা বৃদ্ধিকরণ। পবিত্র করা অর্থে কুরআনে শব্দটির ব্যবহার রয়েছে। যেমন– মহান আল্লাহ বলেন– قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا **অর্থ:** যে নিজেকে পবিত্র করেছে সে সাফল্য লাভ করেছে (সূরা আশ-শামস, আয়াত: ৯)

পারিভাষিক দিক থেকে জাকাতকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়। যেমন–
উমদাতুল কারী এর গ্রন্থকার **আল্লামা বদরুদ্দিন আইনী (রহ.)** এর মতে, নিসাব পরিমাণ সম্পদ ব্যক্তিমালিকানায় এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর, তার থেকে একটি নির্দিষ্ট অংশ হাশেমী বংশ ছাড়া অন্যান্য দরিদ্রকে প্রদান করার নাম জাকাত।

যাকাতের نِصَابٌ (নিসাব) হলো— জাকাত ফরজ হওয়ার জন্য সম্পদের নির্ধারিত পরিমাণ।

দুররুল মুখতার এর প্রণেতা **আল্লামা ইবনে আবেদীন হানাফি (রহ.)**-এর মতে– মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত মালের একাংশ হাশেমী ও তাদের দাস-দাসী ছাড়া অন্য মুসলিম দরিদ্রকে বিনা স্বার্থে প্রদান করার নাম জাকাত।

বিস্তারিতভাবে বলা যায়, নিসাব পরিমাণ সম্পদ অর্থাৎ ৭.৫ তোলা সোনা বা ৫২.৫ তোলা রুপা কিংবা এর যেকোনো একটির সমপরিমাণ অর্থ যদি কোনো মুসলিম ব্যক্তির মালিকানায় পূর্ণ এক বছর থাকে এবং তা যদি তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়, তাহলে শরিয়তের নির্ধারণ অনুযায়ী সে সম্পদ থেকে ২.৫% হারে অর্থ নির্দিষ্ট আটটি খাতের যেকোনো খাতে দান করতে হয়। বস্তুত শরিয়তের নির্দেশানুযায়ী সম্পদ দানের এ পদ্ধতিকেই জাকাত বলা হয়।

জাকাত ফরজ হওয়ার শর্ত:
স্বাধীন, সুস্থ ও জ্ঞানী মুসলমান যদি নিসাব পরিমাণ সম্পত্তির মালিক হন এবং এর ওপর এক বছর সময়কাল অতিক্রান্ত হয়, তাহলে এই মুসলমানের ওপর জাকাত ফরজ হওয়ার প্রাথমিক শর্ত পূর্ণ হয়। নিসাব পরিমাণ সম্পত্তি ছাড়াও আরও কিছু শর্ত রয়েছে। যথা—

১. **মুসলিম হওয়া:** একজন অমুসলিম যদি অঢেল সম্পত্তিরও মালিক হয় তবু তার ওপর জাকাত ফরজ হবে না। জাকাত ফরজ হতে হলে ব্যক্তিকে মুসলিম হতে হবে।
২. **জ্ঞানবান হওয়া:** জাকাতদাতাকে অবশ্যই জ্ঞানবান হতে হবে। বিকৃত মস্তিষ্কের কোনো ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে নিসাব পরিমাণ সম্পত্তি থাকলেও জাকাত ফরজ হবে না।
৩. **স্বাধীন হওয়া:** জাকাত স্বাধীন ব্যক্তির উপর ফরজ। সুতরাং পরাধীন ব্যক্তির ওপর জাকাত ফরজ নয়।
৪. **প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া:** জাকাতদাতাকে অবশ্যই প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে।
৫. **ঋণমুক্ত হওয়া:** কোনো ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ওপর জাকাত ফরজ হবে না।
৬. **এক বছরের মালিকানা থাকা:** নিসাব পরিমাণ সম্পদ জাকাত দাতার মালিকানার পুরো এক বছর থাকতে হবে।

উপরের শর্তাবলি পূরণ করলে কোনো ব্যক্তির ওপর জাকাত ফরজ হবে।

মহান আল্লাহ কোনো একটি বিষয় একবার বললেই মানুষ তার গুরুত্ব উপলব্ধি করে পালন করে থাকে। যেমন— সাওম বা রোজা মাত্র একবার বলাতেই মানুষ দীর্ঘ একমাস সাওম পালন করে। অথচ জাকাত বিভিন্ন ভঙ্গিতে মোট ৮২ বার উল্লেখ করা হয়েছে। কোথাও জাকাত (৩০ বার), কোথাও সাদাকা (৯ বার), আবার কোথাও ইনসাফ (৪৩ বার) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। উপরন্তু জাকাত আদায় না করার পরিণতি হিসেবে জাহান্নামের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এতে সহজেই আমরা এর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারি। তারপরও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে জাকাতের কিছু গুরুত্ব আলোচনা করা হলো।

জাকাতের ধর্মীয় গুরুত্ব

আনুষ্ঠানিক ধর্মীয় ইবাদত হিসেবে জাকাতের গুরুত্ব অপরিসীম। যেমন—

১. **ফরজ ইবাদত:** জাকাত একটি ফরজ ইবাদত। প্রত্যেক স্বাধীন, প্রাপ্তবয়স্ক ও মুসলিম ব্যক্তি, যার কাছে নিসাব পরিমাণ সম্পদ আছে, যে সম্পদ ব্যক্তির স্বাভাবিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত এবং যার ওপর তার মালিকানার মেয়াদ ন্যূনতম এক বছর- এমন ব্যক্তির ওপর জাকাত দেওয়া ফরজ।

২. **ইসলামের বুনিয়াদ:** ইসলামকে যে পাঁচটি বুনিয়াদ বা মূল স্তম্ভের ওপর অস্তিত্ববান বিবেচনা করা হয় জাকাত তার মধ্যে অন্যতম। এটা বিধ্বস্ত হয়ে গেলে ইসলামের প্রাসাদও ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। এজন্যই হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর ইন্তেকালের পর যখন আরবের কোনো এক গোত্রের লোক জাকাত আদায় করতে অস্বীকার করেছিল, তখন (প্রথম খলিফা) আবু বকর (রা.) তাদের বিরুদ্ধে; কাফিরদের বিরুদ্ধে যেমন করতে হয় ঠিক তেমনি যুদ্ধের কথা ঘোষণা করেছিলেন। অথচ তারা নামাজ পড়তো, মহান আল্লাহ ও তার রাসুলের প্রতি তাদের ইমানও বর্তমান ছিল। এতে প্রমাণিত হয় যে, জাকাত আদায় না করলে নামাজ-রোজা ইত্যাদি তার কোনো কাজই মহান আল্লাহর কাছে গৃহীত হতে পারে না। আর এরূপ ব্যক্তির ইমানদার হওয়ার দাবীর আদৌ কোনো মূল নেই।

৩. **ইমানের বহিঃপ্রকাশ:** জাকাত দেওয়া মুমিনের বৈশিষ্ট্য। জাকাত দিয়ে মুমিন নিজের ইমানি দৃঢ়তার প্রমাণ পেশ করে। মুশরিকরা জাকাত দেয় না। সেজন্য শিরকের নিদর্শন হলো জাকাত না দেওয়া। আল্লাহ তাআলা জাকাত না দেওয়ার জন্য মুশরিকদের অভিশাপ দিয়েছেন। তিনি বলেন— وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ ـ اَلَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ـ **অর্থ:** মুশরিকদের জন্য ধ্বংস, যারা জাকাত আদায় করে না এবং তারাই আখিরাত অস্বীকারকারী (সূরা ফুস্‌সিলাত, আয়াত: ৬-৭)।

৪. **আখিরাতে সাফল্য ও ব্যর্থতার মাপকাঠি:** ব্যক্তি পরকালে সফলতা লাভ করবে নাকি তার জীবন ব্যর্থতা ও গ্লানিতে ভরে ওঠবে, তা নির্ভর করে তার জাকাত আদায় করা বা না করার ওপর। জাকাত ফরজ হওয়ার পর ব্যক্তি যদি তা যথাযথভাবে আদায় করে তাহলে সে সাফল্য লাভ করবে। সে পাবে অনন্ত সুখের চিরস্থায়ী নিবাস জান্নাত। আল্লাহ তাআলা তার এ সাফল্যের ঘোষণা দিয়ে বলেছেন— قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ .... وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُوْنَ ـ **অর্থ:** মুমিনগণ সাফল্য ও কল্যাণ লাভ করেছে ... আর যারা নিষ্ঠার সাথে ঠিকভাবে জাকাত আদায় করে (সূরা আল-মুমিনুন, আয়াত: ১-৪)। অপরদিকে জাকাত ফরজ হওয়ার পরও যারা তা আদায় না করে আখিরাতে পরিণতি বরণ করতে হবে। তাদের জন্য আল্লাহ তাআলা চরম শাস্তির অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন—
আর যারা সোনা ও রূপা জমা রাখে কিন্তু তা থেকে মহান আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদের কঠোর আজাবের সুসংবাদ দিন (সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ৩৪)। এ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন— 'যাদের ওপর জাকাত দেওয়া ফরজ, তারা যদি তা আদায় না করে, তাহলে আল্লাহ তাআলা পরকালে তাদের কঠোর শাস্তি দেবেন।'

জাকাতের আধ্যাত্মিক গুরুত্ব

মানুষের আত্মিক উৎকর্ষ সাধনে জাকাত বিশেষ কার্যকর। দৃশ্যত অর্থ সম্পর্কীয় ইবাদত হলেও এর আধ্যাত্মিক আবেদন বিস্ময়কর। জাকাতের এ পর্যায়ের শিক্ষা ব্যক্তিকে পরিপূর্ণ মানুষ হওয়ার পথে এগিয়ে দেয়। যেমন–

১. **সম্পদের মোহ ও লোভ নির্মূল:** সচ্ছল ও শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের জন্য অর্থ সম্পদের প্রয়োজন রয়েছে। এজন্য অত্যন্ত কষ্ট করে মানুষ অর্থ উপার্জন করে। অর্থের উপযোগিতার জন্যই এর প্রতি মানুষের তীব্র মোহ ও লোভ থাকে। কখনো কখনো অতিরিক্ত অর্থলোভ মানুষকে বিপথে নিয়ে যায়। সে খারাপ ও অন্যায় কাজ করে। মহান আল্লাহর নির্দেশ তার মনে থাকে না। জাকাত অর্থের প্রতি মানুষের এই মোহ ও লোভের কবর রচনা করে। বাহ্যত বিনা লাভে নিঃস্বার্থভাবে একটা বিপুল অঙ্কের অর্থ জাকাত হিসেবে তাকে আদায় করতে হয়। ফলে তার অন্তরে তীব্র মোহ ও লোভ আসন করে নিতে পারে না। কেননা মহান আল্লাহর নির্দেশে যে জাকাত দেয়, সে জানে ধনসম্পদ মহান আল্লাহর নিয়ামত। এগুলো নিতান্তই পরীক্ষার উপাদান মাত্র।

২. **সম্পদ পবিত্রকরণ:** জাকাত মানুষের সম্পদ পবিত্র করে। কেননা ধনী ব্যক্তির সম্পদে জাকাত হলো দরিদ্রের অধিকার। যতক্ষণ না এ অধিকার আদায় করা হয়, ততক্ষণ সম্পদ থাকে অপবিত্র। এজন্যই মহানবি (সা.) বলেছেন।

مَنْ اَدّٰى زَكٰوةَ مَالِهٖ فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ شَرُّهٗ ـ

অর্থ: যে ব্যক্তি তার সম্পদের জাকাত আদায় করে, সে তার সম্পদের দোষ দূর করে দেয়।

৩. **আত্মশুদ্ধি:** জাকাতের আধ্যাত্মিক শিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এর দ্বারা ব্যক্তির আত্মা পবিত্র হয়। কেননা জাকাত আদায় করে সে তা প্রচার করতে পারে না। এজন্য গর্ব করতে পারে না। এমনকি যাকে জাকাতের অর্থ দিয়েছে তার কাছ থেকে কোনো উপকারও আশা করতে পারে না। এসব করলে জাকাতদান অর্থহীন হয়ে যাবে। ফলে অনিবার্যভাবেই জাকাতদাতা এসব পাশবিক প্রবৃত্তি থেকে নিজেকে পবিত্র রাখেন। এ জন্যই আল্লাহ তাআলা বলেন—

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا۔

অর্থ: তাদের সম্পদ থেকে জাকাত গ্রহণ করুন। এতে তারা পবিত্র হবে এবং এর মাধ্যমে তারা পরিশুদ্ধ হবে (সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ১০৩)। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ প্রদত্ত ধন-সম্পদ তাঁর বান্দাদের জন্য নির্দিষ্ট অংশ ব্যয় করে না, তার সমস্ত ধন অপবিত্র এবং সেই সাথে তার নিজের মন ও আত্মা পংকিল হতে বাধ্য।

৪. **তাকওয়া অর্জন:** মহান আল্লাহর ভালোবাসা হারানোর ভয় এবং তাঁর প্রতি ভালোবাসা জন্মানোর ক্ষেত্রেও জাকাত ভূমিকা পালন করে। ধন-সম্পদ মানুষের অত্যন্ত প্রিয় বিষয়। তার সুখ- স্বাচ্ছন্দ্য ও সামাজিক প্রতিপত্তির মাধ্যম এটি। তীব্র আল্লাহপ্রেমের কারণেই ব্যক্তি এ সম্পদ মহান আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী বাহ্যত কোনো লাভ ছাড়াই দান করে। কুরআন মাজিদে এসেছে- وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ **অর্থ:** মহান আল্লাহর ভালোবাসার ভিত্তিতেই তারা ধনসম্পদ দান করে (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৭৭)।
বস্তুত জাকাত দিয়ে ব্যক্তি সম্পদের ভালোবাসার চেয়ে মহান আল্লাহর প্রতি তাঁর অসীম ভালোবাসারই প্রমাণ পেশ করে।

৫. **কৃপণতা থেকে মুক্তি:** জাকাত মানুষকে দানশীল ও উদার হওয়ার শিক্ষা দেয়। নিঃস্বার্থ ও বিনা উপকারে কেবল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে ব্যক্তি নিয়মিত তার সম্পদের একটা বিপুল অংশ জাকাত হিসেবে আদায় করে। ফলে সে কৃপণতার জঘন্য ত্রুটি থেকে মুক্তি পায়। তার মধ্যে দানশীলতার অভ্যাস গড়ে ওঠে। পরিণতিতে সে হয় সফল মানুষ। মহান আল্লাহ বলেন— وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ
অর্থ: আর যারা মনের কৃপণতা থেকে মুক্ত, বস্তুত তারাই সফলকাম (সূরা আত-তাগাবুন, আয়াত: ১৬)।

জাকাতের সামাজিক গুরুত্ব

জাকাত সামষ্টিক ইবাদত। সমাজের ধনী ও গরিব মানুষের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে এটি সম্পন্ন হয়। সেজন্য সামাজিক ক্ষেত্রে জাকাতের গুরুত্ব ও প্রভাব রয়েছে।

১. **ভ্রাতৃত্ববোধের উন্মেষ:** সমাজের মুসলিম জনগোষ্ঠী এক সুমহান আদর্শিক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। জাকাতের মাধ্যমে ইসলামি ভ্রাতৃত্ব যথাযথ রূপ ও সৌন্দর্যে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। এজন্যই মহান আল্লাহ বলেন—

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ۔

অর্থ: এরপর তারা যদি তওবা করে, সালাত কায়েম করে এবং জাকাত দেয়- তাহলে দীনের সূত্রে তারা তোমাদের ভাই হবে (সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ১১)।

২. **সহানুভূতি সৃষ্টি:** জাকাত সমাজের নিঃস্ব, দরিদ্র ও ভাগ্য বিড়ম্বিত লোকদের প্রতি ধনীদের সহানুভূতি সৃষ্টি করে। জাকাত দেওয়া ধনীর দায়িত্ব। দরিদ্রদের প্রতি এটা তার দয়া নয়। যথাযথভাবে এ কর্তব্য পালনের জন্য ধনী অধিকতর হকদার জাকাতগ্রহীতা খুঁজে বের করে। এ কাজে সে গরিব-দুঃখী মানুষের গভীর দুঃখ ও অভাব-অভিযোগের সাথে পরিচিত হয়। আবার গরিব মানুষও তার আন্তরিকতা ও মমত্বে মুগ্ধ হয়। ফলে সমাজের সব শ্রেণির মানুষের মধ্যে সহানুভূতি সৃষ্টি হয়। তারা একে অপরের সহযোগিতায় এগিয়ে আসে। এজন্যই রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন— اَلزَّكٰوةُ قَنْطَرَةُ الْاِسْلَامِ **অর্থ:** জাকাত ইসলামের সেতুবন্ধন (মুসলিম)।

৩. **সামাজিক নিরাপত্তা বিধান:** জাকাতের সু-প্রভাবে সমাজের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। অর্থাভাবে বাধ্য হয়ে মানুষ অন্যায় করে। চুরি, ডাকাতি বা ছিনতাইয়ে লিপ্ত হয়। হারাম উপার্জনে আত্মনিয়োগ করে। ফলে সমাজে নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি হয়। মানুষ তার জীবন ও সম্পদ নিয়ে শঙ্কাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। জাকাত মানুষের কর্মসংস্থান করে, অভাব দূর করে, অভাবী, বেকার লোকদের হারাম উপার্জন এবং চুরি, ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের কবল থেকে সমাজকে নিরাপত্তা দেয়।

৪. **সার্বজনীন কল্যাণসাধন:** জাকাত জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও অঞ্চল নির্বিশেষে সমাজের সব মানুষের কল্যাণসাধন করে। ধনীদের জাকাতলব্ধ অর্থ গরিবদের আর্থিক প্রয়োজন পূরণের পর যদি উদ্বৃত্ত হয়, তাহলে সে অর্থে সমাজের বিভিন্ন কল্যাণমূলক ও জনহিতকর কার্যাবলি সম্পাদন করা যায়। কেননা কুরআন মাজিদে জাকাত বণ্টনের যে আটটি খাত উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, 'ফি সাবিলিল্লাহ' বা মহান আল্লাহর পথে।

৫. **সমৃদ্ধ সমাজ প্রতিষ্ঠা:** জাকাত সমাজের মানুষ এবং সমাজকে সমৃদ্ধ করে। মানুষ অভাবমুক্ত এবং সচ্ছল হলে সমাজও অভাবমুক্ত এবং সচ্ছল হবে। দরিদ্রতার কষাঘাতে জীবন জর্জরিত না থাকলে মানুষের পক্ষে বিভিন্ন মানবিক গুণাবলির বিকাশ ও পরিচর্যায় মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হবে। অভাব-অনটনহীন জীবন হলে মানুষ তার মেধা সৃষ্টি ও উদ্ভাবনের কাজে ব্যয় করতে সক্ষম হবে। ফলে কেবল অর্থনৈতিক বিবেচনাতেই নয় বরং সামগ্রিক বিবেচনাতেই মানবসমাজ সমৃদ্ধ এবং উন্নত হবে। সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠিত হবে কাঙ্ক্ষিত শান্তি-শৃঙ্খলা ও স্বস্তি। মানুষের বেঁচে থাকা আনন্দময় বিবেচিত হবে।

জাকাতের অর্থনৈতিক গুরুত্ব

অন্যান্য মৌলিক ইবাদতের তুলনায় অর্থ সম্পকীয় বিষয়ে কেবল জাকাতেরই প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। সেজন্য এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম।

১. **সার্বজনীন অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান:** সমাজের সব মানুষের অধিকার আছে সচ্ছলভাবে বসবাসের। ধর্ম, বর্ণ, অঞ্চল ও জাতীয়তা নির্বিশেষে সবাই সমাজের কাছে আপদকালীন সময়ে আর্থিক সহযোগিতা পাবার অধিকার রাখে। জাকাত এ দাবি পূরণের অন্যতম মাধ্যম। এর মাধ্যমে সমাজের সব শ্রেণির মানুষ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নির্ভরতা ও নিরাপত্তা লাভ করে। আল্লাহ তাআলার ঘোষণায় বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি বলেন— "জাকাত কেবল ফকির, মিসকিন, জাকাত আদায়কারী কর্মচারী ও যাদের মন আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হক। দাসমুক্তি, ঋণমুক্তি, মহান আল্লাহর পথে ব্যয় এবং পথচারীদের জন্য এটা হলো মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত বিধান। মহান আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়" (সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ৬০)।

২. **মৌলিক অধিকার পূরণ:** খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বিনোদন লাভের অধিকার মানুষের জন্মগত মানবিক মৌলিক অধিকার। মানুষ নিজস্ব চেষ্টা ও উপার্জনে এ অধিকার পূরণে ব্যর্থ হলে এর দায়িত্ব সমাজের ওপর বর্তায়। জাকাতের অর্থে সমাজ এ দায়িত্ব পালন করতে পারে। ফলে ব্যক্তি মর্যাদা সম্পন্ন মানুষ হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। তাকে মানবেতর জীবনযাপন করতে হয় না।

৩. **অর্থনৈতিক বৈষম্য নির্মূল:** সমাজের সব মানুষ সমান অর্থসম্পদের মালিক হবে না। এক্ষেত্রে বৈষম্য ও পার্থক্য থাকবেই। কিন্তু এ বৈষম্য অমানবিক ও অযৌক্তিক হয়ে ওঠে তখনই, যখন একটি বিশেষ শ্রেণির কাছে সম্পদ পুঞ্জিভূত হয় আর অপর একটি শ্রেণি নিঃস্ব হয়ে পড়ে। সুন্দর ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রার জন্য এ অব্যবস্থা কাম্য নয়। জাকাত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর হাতে বিপুল ও অপ্রয়োজনীয় অর্থের পাহাড় গড়ে অন্যদের বঞ্চিত ও নিঃস্ব রাখার পথ বন্ধ করে। এর মাধ্যমে সমাজের সব শ্রেণির মানুষের কাছে সম্পদ আবর্তিত হয়। বস্তুত জাকাতের বিধানও এ লক্ষ্যেই প্রবর্তিত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন— كَیْ لَا یَكُوْنَ دُوْلَةً بَیْنَ الْاَغْنِیَاءِ مِنْكُمْ. **অর্থ:** যেন সম্পদ শুধু তোমাদের ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয় (সূরা আল-হাশর, আয়াত: ০৭)।

৪. **অভাব-অনটন নির্মূল:** জাকাতলব্ধ অর্থ পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহ ও ব্যয় করা হলে সমাজে অভাব-অনটন থাকবে না। কেননা সমাজের ধনীদের কাছ থেকে জাকাত সংগ্রহ করে তা গরিবদের সচ্ছলতার জন্যই ব্যয় করা হবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন— تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِیَائِهِمْ وَتُرَدُّ اِلٰی فُقَرَائِهِمْ. **অর্থ:** জাকাত মুসলিম ধনী ব্যক্তিদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হবে, আর তা ব্যয় করা হবে মুসলিম দরিদ্রদের মধ্যেই (বুখারি ও মুসলিম)।

৫. **কর্মসংস্থান:** বেকার সমস্যা একটি মারাত্মক অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা। কর্মহীন যুবশক্তি জাতীয় বিপর্যয়ের প্রধান কারণ। এ অবস্থা নিরসনে জাকাত কার্যকর ভূমিকা পালন করে। রাষ্ট্রীয়ভাবে সংগৃহীত জাকাতের বিপুল পরিমাণ অর্থে ছোট বড় শিল্পকারখানা গড়ে তোলা যায়। এতে করে নতুন নতুন কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে জাকাতের হকদার লোকদের এসব কাজে নিয়োগ করা যায়। আবার ব্যক্তিগত পর্যায়েও জাকাত কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে। হকদার ব্যক্তিকে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গড়ে দিয়ে বা জীবিকা অর্জনের কোনো পদ্ধতি দিয়ে জাকাত তাকে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করে। ফলে যুবশক্তি বেকার থাকে না; তারা যোগ্য কাজ পেয়ে জাতীয় উন্নতিতে অবদান রাখতে পারে।

৬. **ভিক্ষাবৃত্তি রোধ:** ভিক্ষা একটি নিন্দনীয় পেশা। ভিক্ষাবৃত্তি একটি গুরুতর সামাজিক ব্যাধি। এর ফলে ব্যাপক শ্রমশক্তির অপচয় হয়। এ বৃত্তি পরিবেশেরও মারাত্মক বিপর্যয় ঘটায়। জাকাতের অর্থে ভিক্ষুকদের পুনর্বাসন ও প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকে কাজের উপযুক্ত করে গড়ে তুলে ভিক্ষাবৃত্তি রোধ করা যায়।

৭. **ঋণমুক্তি:** ঋণগ্রস্ততা একটি ভয়ানক অসম্মানের বিষয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন—

إِيَّاكُمْ وَالدَّيْنَ فَإِنَّهُ هَمٌّ بِاللَّيْلِ وَمَذِلَّةٌ بِالنَّهَارِ -

অর্থ: তোমরা ঋণ থেকে বেঁচে থাক। কেননা ঋণ হলো রাতের দুশ্চিন্তা আর দিনের অসম্মান। তা সত্ত্বেও ব্যক্তি ও রাষ্ট্রকে ঋণ করতে হয়। যদি অবস্থা এমন হয় ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের পক্ষে সে ঋণ পরিশোধ অসম্ভব হয়ে পড়ে, সে ক্ষেত্রে জাকাতের অর্থে ঋণমুক্ত হওয়া সম্ভব।

৮. **জাতীয় আয়:** ইসলামি অর্থব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় আয়ের প্রধান উৎস জাকাত। যার ওপর জাকাত ফরজ হবে সে ২.৫% হারে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জাকাতের অর্থ জমা দেবে। এভাবে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাবে। পরে পরিকল্পিতভাবে বিনিয়োগ ও ব্যয়ের মাধ্যমে এ অর্থ অধিকতর লাভজনক অর্থে পরিণত করা সম্ভব হবে।

৯. **উৎপাদন বৃদ্ধি:** জাকাতের অর্থ সব শ্রেণির মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। তারা এ অর্থে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনেন। ফলে বাজার চাহিদা সৃষ্টি হয়। বাজারে দ্রব্যের চাহিদা সৃষ্টি হলে তার উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হয়। আবার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কাঁচামালের সরবরাহ বাড়াতে হয়। ফলে জাতীয় উৎপাদন ব্যবস্থায় গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।

১০. **সম্পদ বৃদ্ধি:** জাকাত সম্পদে প্রাচুর্য এনে দেয়। অভাব-অনটন নির্মূল করে জাকাত মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। কর্মসংস্থান ও উৎপাদন ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় পণ্যের উৎকৃষ্ট উপস্থাপনায় উদ্বুদ্ধ করে। অর্থব্যবস্থার সব বিভাগে গতিশীলতা আসে। ফলে মোট সম্পদ বৃদ্ধি পায়। এজন্যই মহান আল্লাহ বলেন—

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللهِ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ -

অর্থ: আর মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যে জাকাত তোমরা দাও, তাই বৃদ্ধি পায়। অতএব (যারা জাকাত দেয়) তারাই দ্বিগুণ লাভ করে (সূরা আর-রুম, আয়াত: ৩৯)।

বস্তুত মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনে জাকাত হলো আল্লাহ তাআলার দেওয়া এক অর্থব্যবস্থা। এর যথাযথ প্রয়োগ ও বাস্তবায়নই কেবল সব মানুষের আর্থিক সচ্ছলতা নিশ্চিত করতে পারে। দুনিয়ার জীবনে কল্যাণের পাশাপাশি নিশ্চিত করে পরকালীন সাফল্য।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. জাকাত (اَلزَّكٰوةُ) অর্থ কী? *[ঢা. বো., য. বো., রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. ২০২৫; সকল বোর্ড ২০২২, ২০১৮]*

২. জাকাতের نِصَابٌ (নিসাব) কী? *[রা. বো., দি. বো., কু. বো., সি. বো., য. বো. ২০১৭; ঢা. বো., রা. বো., কু. বো., ব. বো. ২০১৮]*

৩. জাকাত কোন ধরনের ইবাদত?

৪. কুরআন মাজিদের বহুস্থানে সালাত আদায়ের হুকুমের পাশাপাশি কী আদায়েরও জোরালো তাগিদ দেওয়া হয়েছে?

৫. স্বর্ণ এবং রৌপ্যের জাকাতের নিসাব কত?

৬. জাকাত ইসলামের কী?

উত্তরের জন্য দেখো ২৮৫ পৃষ্ঠা।

খ. একক কাজ

শিক্ষার্থী জাকাতের অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে ১০টি বাক্য লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

গ. দলীয় কাজ

শিক্ষার্থীরা দুইটি দলে ভাগ হবে। এরপর একদল জাকাতের ধর্মীয় গুরুত্ব এবং অপর দল জাকাতের সামাজিক দুরুত্ব সম্পর্কে ৫টি করে বাক্য লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ৬ জাকাতের শিক্ষা
Learning of Zakat

জাকাতের ধর্মীয় শিক্ষা

মানুষ নিজের শ্রম ও সময় ব্যয় করে অর্থোপার্জন করে। নিজস্ব বুদ্ধি ও শক্তিতে তার সম্পদের প্রাচুর্য আসে। কিন্তু এই শক্তি, শ্রম ও বুদ্ধি মানুষ সৃষ্টি করেনি। আল্লাহ তাআলা তাকে এগুলো দিয়েছেন। আবার সে যা অর্জন ও উপার্জন করে তাও তার তৈরি নয়। আল্লাহ তাআলার তৈরি জিনিসই সে উপার্জন করে। সুতরাং মানুষের উচিত নয় সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখা। তার উচিত নয় নিজস্ব মালিকানাধীন বিষয় মনে করে সম্পদকে স্বেচ্ছাচারিতার সাথে ব্যয় করা বরং অর্থ সম্পদ তার কাছে মহান আল্লাহর আমানত। মহান আল্লাহর বিধান অনুসারে তার এ সম্পদ ব্যয় ও ব্যবহার করা উচিত। এ সম্পদে আল্লাহ তাআলা অপরের যেসব হক নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা আন্তরিকতা ও সততার সাথে আদায় করা উচিত।

জাকাতের আধ্যাত্মিক শিক্ষা

মানুষের জীবনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় হলো সম্পদ। অমানুষিক পরিশ্রম ও অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করে মানুষ অর্থোপার্জন করে। কিন্তু এই অর্থোপার্জনের মোহ যেন মানুষের অন্তরকে কলুষিত না করে, জাকাত সে শিক্ষা প্রদান করে। জাকাত শিক্ষা দেয় অর্থ, বিত্ত ও সম্পদের প্রতি মানুষের ভালোবাসা কখনোই এত প্রবল হবে না, যাতে মানুষ মহান আল্লাহর বিধান ভুলে যেতে পারে। পৃথিবীর বেশিরভাগ সংঘাত, সংঘর্ষ, কলহ, হিংসা, বিদ্বেষ যেখানে অর্থ নিয়ে, সেখানে জাকাত মানুষকে এসব থেকে মুক্ত থাকার শিক্ষা দেয়।

জাকাতের সামাজিক শিক্ষা

জাকাত পারস্পরিক সহযোগিতা, সহানুভূতি, নিরাপত্তা বিধান, সর্বজনীন কল্যাণসাধন এবং সমৃদ্ধ সমাজ প্রতিষ্ঠার শিক্ষা দেয়। জাকাত ব্যবস্থায় বিত্তহীন মুসলিমকে অর্থ সাহায্য করা বিত্তশালী মুসলিমের জন্য বাধ্যতামূলক। এ অর্থ দান বিত্তহীনের প্রতি বিত্তশালীর দয়া নয় বরং এ হলো বিত্তহীনের প্রতি মহান আল্লাহ প্রদত্ত অধিকার। এ প্রক্রিয়ায় জাকাত দিয়ে মুসলিম সহযোগী ও সহানুভূতিশীল সমাজ গড়ার শিক্ষা পায়। জাকাতভিত্তিক সমাজে কেউ নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে না। কেননা জাকাত সবাইকে কাজ করার ক্ষেত্র তৈরি করে দেয় এবং অভাব দূর করতে সাহায্য করে। ফলে অনেক সামাজিক অপরাধ কমে যায়। জাকাত মানুষকে অপরাধমুক্ত নিরাপদ সমাজ গড়ার পদ্ধতি শেখায়।

জাকাতের অর্থনৈতিক শিক্ষা

জাকাতের অর্থনৈতিক শিক্ষা হলো সম্পদ বিত্তশালী মানুষের হাতে পুঞ্জিভূত রাখা যাবে না বরং সমাজের সব শ্রেণির মানুষের কাছে অর্থের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে। কেননা সম্পদ যদি গুটি কয়েক মানুষের হাতে জমা থাকে তাহলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়। কর্মক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে পড়ে। উৎপাদন ও বিপণন কমে যায়। জাতীয় আয় হ্রাস পায়। সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য তীব্র আকার ধারণ করে। অভাব-অনটন ও দরিদ্রতা মানুষের আর্থিক জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনে। এসব বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য প্রতিহত করার জন্যই সহমর্মিতা ও সহযোগিতার প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর জাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা চালু করতে হবে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. অর্থ-সম্পদ মানুষের কাছে মহান আল্লাহর কী?
২. জাকাত ব্যবস্থায় বিত্তহীন মুসলিমকে সাহায্য করা বিত্তশালী মুসলিমের জন্য কীরূপ বিধান?
৩. সম্পদ বিত্তশালী মানুষের হাতে কী করা যাবে না?
৪. অভাব-অনটন ও দরিদ্রতা মানুষের আর্থিক জীবনে কী ডেকে আনে?

উত্তরের জন্য দেখো ২৮৫ পৃষ্ঠা।

পাঠ ৭

সাওমের গুরুত্ব
Importance of Saum

সাওমের সংজ্ঞা

সাওম (اَلصَّوْمُ) অর্থ বিরত থাকা বা আত্মসংযম করা। 'মাসানি' গ্রন্থে আছে- সাওম ও সিয়াম উভয় শব্দই মাসদার বা ক্রিয়ামূল। এর প্রচলিত নাম 'রোজা', যা ফার্সি ভাষার শব্দ। এর অর্থ জ্বালিয়ে দেওয়া, নির্বাপিত করা। সাওম মানুষের জৈবিক চাহিদা ও রিপুর অসৎ কামনা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নির্বাপিত করে। এজন্য একে সাওম বলা হয়।

- ইমাম রাগিব ইস্পাহানি বলেন– সাওম অর্থ হলো– اِمْسَاكٌ عَنِ الْفِعْلِ বা কাজ থেকে বিরত থাকা। এজন্য সফর থেকে বিরত থাকা ঘোড়াকে সা-ইম (صَائِمٌ) বলা হয়।
- কুদুরি গ্রন্থকার আল্লামা আবুল হাসান বলেন– নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে, নির্দিষ্ট সময়ে, নির্ধারিত বিষয়বস্তু থেকে বিরত থাকার নাম সাওম।
- ইবনে মানযুর বলেন– সুবহে সাদিক বা ফজরের উদয়লগ্ন থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিয়তের সাথে পানাহার থেকে বিরত থাকাই সাওম।
- 'আল কামুসুল ফিকহি' গ্রন্থে আছে– সাওম হলো নির্দিষ্ট সময়ে সুনির্দিষ্ট কার্যাবলি থেকে বিরত থাকা।
- আল্লামা জুরযানি বলেন– সুবহি সাদিক থেকে মাগরিব পর্যন্ত খাদ্যগ্রহণ ও যৌনাচার থেকে নিয়তের সাথে বিরত থাকার নাম সাওম।

মোটকথা, রমজান মাসে সাওমের নিয়তে সুবহি সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যৌনক্রিয়া থেকে বিরত থাকাই সাওম।

সাওমের ধর্মীয় গুরুত্ব

১. **ফরজ ইবাদত:** মুসলিম জাতির জন্য আল্লাহ তাআলা যে ইবাদতসমূহ পালন করা ফরজ করেছেন রমজান মাসের সাওম পালন তার মধ্যে অন্যতম। কুরআন মাজিদে মহান আল্লাহ বলেছেন–

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ۔

অর্থ: হে ইমানদারগণ! তোমাদের ওপর সিয়াম পালন ফরজ করা হয়েছে, যেমন ফরজ ছিল তোমাদের পূর্ববতীদের ওপর (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৩)। শরিয়তসম্মত কারণ ছাড়া সিয়াম পালন না করা ভয়ানক অন্যায়। সঙ্গত কারণ থাকলে পরে কোনো মাসে তা কাযা করতে হবে। কেউ সাওম অস্বীকার করলে সে কাফির হবে।

২. **ইসলামের বুনিয়াদ:** ইসলামের মূল অবকাঠামো যে পাঁচটি বুনিয়াদ বা স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে তার মধ্যে সাওম অন্যতম। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন– بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ ۔ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অর্থ: ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। সাক্ষ্য দেওয়া যে, মহান আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রাসুল, সালাত কায়েম করা, জাকাত আদায় করা, হজ পালন করা ও রমজানের সাওম পালন করা (বুখারি ও মুসলিম)।

৩. **গুনাহ মাফের মাধ্যম:** সাওম পালন করলে ব্যক্তি এর জন্য সওয়াব পায়। তার চেয়ে বড় কথা হলো সিয়াম সাধনার মাধ্যমে মানুষের বিভিন্ন ধরনের গুনাহ মাফ হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন—

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

অর্থ: যে ব্যক্তি ইমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় রমজানের সাওম পালন করে, তার আগের সব গুনাহ ক্ষমা করা হয় (বুখারি ও মুসলিম)।

৪. **বরকত ও রহমত লাভ:** রমজান মাসকে বলা হয় রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের মাস। এর প্রথম দশদিন সাওম পালনকারীদের প্রতি মহান আল্লাহর বিশেষ রহমত অবিরত ধারায় বর্ষিত হতে থাকে। দ্বিতীয় দশদিন আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করেন। ব্যক্তি তার বিভিন্ন রকমের অপরাধের জন্য তওবা করলে এ সময়ে তা কবুলের বিশেষ সুযোগ রয়েছে। আর শেষ দশদিন হলো আজাব থেকে নাজাতের সময়। এ সময় মহান আল্লাহ জাহান্নামীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত ব্যক্তিদের শাস্তি মওকুফ করে দেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন— 'তোমাদের কাছে বরকতময় রমজান মাস এসেছে, যে মাসে আল্লাহ তাআলা তোমাদের ওপর সাওম ফরজ করেছেন। এ মাসে আকাশসমূহের সব দরজা খুলে দেওয়া হয়। জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। বিদ্রোহী শয়তানদের এ মাসে শৃঙ্খলিত করা হয়। রমজান মাসে এমন একটি রাত আছে যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। যে ব্যক্তি এ রাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে, সে প্রকৃতই বঞ্চিত হয়েছে (সব কল্যাণ থেকে)' (সুনানে তিরমিযি, নাসাঈ ও ইবন মাযাহ)।

৫. **কিয়ামতে সাফল্যলাভ:** মানবজাতির জন্য কিয়ামত এক ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা। পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর এ সময়ে সব মানুষ এক জায়গায় সমবেত হবে। সূর্য অত্যন্ত নিকটবর্তী হবে। প্রচণ্ডতম সূর্যতাপ থেকে বাঁচার কোনো ছায়া থাকবে না। এমন অবস্থায় সাওমের কল্যাণে সাওম পালনকারীরা পাবে আরশের ছায়া। সেখানে তারা পরম শান্তিতে বিচারের অপেক্ষা করবে। আবার বিচার কাজের ক্ষেত্রে তারা বিশেষ সুবিধা পাবে। সাওম তাদের মুক্তির জন্য মহান আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে এবং সে সুপারিশ গৃহীত হবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন—

اَلصِّيَامُ وَالْقُرْاٰنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَقُوْلُ الصِّيَامُ اَىْ رَبِّ اِنِّىْ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ وَيَقُوْلُ الْقُرْاٰنُ اَىْ رَبِّ اِنِّىْ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ فَيُشَفَّعَانِ.

অর্থ: সাওম ও কুরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। সাওম বলবে, হে প্রভু! আমি তাকে দিনের বেলায় পানাহার ও যৌনকামনা থেকে বিরত রেখেছি। কাজেই তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। আর কুরআন বলবে হে প্রভু! আমি তাকে রাতের বেলায় ঘুম থেকে বিরত রেখেছি, কাজেই তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। অতঃপর তাদের উভয়ের সুপারিশ কবুল করা হবে (মিশকাত)।

৬. **বেহেশত লাভ:** সাওম মানুষকে বেহেশতে প্রবেশের উপযুক্ত করে তোলে। সে ধৈর্য ধারণ করতে শেখে। তার মধ্যে প্রয়োজনীয় সদগুণাবলির বিকাশ ঘটে। সাওম ব্যক্তির জান্নাত লাভের কারণে পরিণত হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন—

وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ.

অর্থ: আর রমজান হলো ধৈর্যের মাস এবং ধৈর্যের বিনিময় হচ্ছে জান্নাত (মিশকাত)।

সাওমের আধ্যাত্মিক গুরুত্ব

১. **তাকওয়া অর্জন:** সাওমের মূল লক্ষ্য হলো তাকওয়া অর্জন করা। তাকওয়া অর্জনের উদ্দেশ্যেই সাওম ফরজ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

অর্থ: তোমাদের ওপর সিয়াম সাধনা ফরজ করা হয়েছে, যেভাবে ফরজ করা হয়েছে তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর। যেন তোমরা তাক্‌ওয়া অর্জন করতে পার (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৩)। বস্তুত পদ্ধতিগত কারণেই সাওম একটি তাকওয়া নির্ভর ইবাদত। মানুষ সাওমকালীন সময়ে পানাহার ও যৌনাচার থেকে বিরত থাকে। তাকওয়া না থাকলে সে গোপনে এ কাজগুলো করতে পারে। পৃথিবীর সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে তার পক্ষে খাদ্য গ্রহণ বা যৌনাচারে লিপ্ত হওয়া খুবই সহজ। কিন্তু তাকওয়ার জন্যই সাওমের মধ্যে এ কাজটি করা হয় না। কেননা ব্যক্তি জানে, গোপনে কাজ করা হলেও আল্লাহ তাআলা দেখেন সবসময়ই।

২. **মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ:** সাওম কেবল মহান আল্লাহর জন্যই হয়ে থাকে। এতে লোক দেখানোর ইচ্ছা থাকে না। ব্যক্তি বিশেষ পরিচর্যায় তার মিথ্যাচার ও গিবতের অভ্যাস রমজান মাসেই ত্যাগ করে। কারো সাথে ঝগড়া করে না। তার মধ্যে মহান আল্লাহর নির্দেশ ও ভালোবাসাই কার্যকর থাকে। ফলে সাওমের মাধ্যমে সে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও ভালোবাসা লাভ করে। যেমন হাদিসে কুদসিতে তিনি ইরশাদ করেন—

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعِ مِائَةِ ضَعْفٍ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِلَّا الصَّوْمَ فَاِنَّهٗ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهٖ -

অর্থ: আদম সন্তানের প্রতিটি আমলের প্রতিদান দশ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেন। মহান আল্লাহ বলেন— শুধু সাওম ব্যতীত। নিশ্চয়ই সাওম আমার জন্য আর আমিই এর প্রতিদান দেবো (বুখারি ও মুসলিম)।

৩. **মহান আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ:** আল্লাহ তাআলা পরম সত্তা। তাঁর সাক্ষাৎ ও সান্নিধ্য লাভ মানুষের জন্য এক পরম পাওয়া। তিনি সব সুন্দরের উৎস, সব সৎ গুণাবলির সমন্বয়। তাঁর দিদার লাভ হলো চূড়ান্ত সাফল্য। তাকওয়াবান সব মানুষেরই প্রথম প্রার্থনা হয় মহান আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করা। সাওম এ প্রার্থনা পূরণের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। সাওমের মাধ্যমে সাওম পালনকারী মহান আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভের নিশ্চয়তা পায়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন—

لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهٖ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهٖ -

অর্থ: সাওম পালনকারীর জন্য দুটো আনন্দ। একটি আনন্দ তার ইফতারের সময়। অপর আনন্দ হচ্ছে, তার রবের সাথে সাক্ষাতের সময় (বুখারি ও মুসলিম)।

৪. **অন্যায় থেকে সুরক্ষা:** সাওম পালনের সময়ে ব্যক্তি পানাহার ও যৌনাচার থেকে বিরত থাকে। মিথ্যাচার, গিবত, অশালীন কথাবার্তা বা ঝগড়া সাওমের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে বলে সে এগুলোতেও লিপ্ত হয় না। পাশাপাশি সে যেখানে হালাল পানাহার ও যৌনাচার থেকে বিরত থাকে সেখানে হারাম ভোগ-সম্ভোগ নিয়ে চিন্তা করার অবকাশও তার থাকে না। এভাবে সাওম পালনের মাধ্যমে সে শয়তানের কুমন্ত্রণা ও জৈবিক পাশবিক কামনা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। এজন্যই নবি করিম (সা.) বলেছেন— اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ অর্থ: 'সাওম হলো ঢাল।'

সাওমের সামাজিক গুরুত্ব

১. **সহানুভূতি সৃষ্টি:** সাওম সমাজের বিত্তবান মানুষদের মনে বিত্তহীনদের জন্য ভালোবাসা ও সহানুভূতি সৃষ্টি করে। স্বাভাবিকভাবে সম্পদশালী মানুষের না খেয়ে থাকতে হয় না। সেজন্য তারা বুঝতে পারে না অনাহারে থাকার কষ্ট। সাওমের মাধ্যমে ধনী-গরিব নির্বিশেষে সবাই সুবহি সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোনো রকম খাদ্যগ্রহণ করে না। এতে সমাজের ধনী মানুষগুলো ক্ষুধার তীব্র কষ্ট সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করে। ফলে সমাজের অনাহারী সদস্যদের দুঃখ-কষ্টের ব্যাপারে তাদের মধ্যে গভীর সহানুভূতি সৃষ্টি হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন— وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ **অর্থ:** আর এই মাস (রমজান) হলো সহানুভূতি ও সহমর্মিতার মাস (মিশকাত)।

২. **সহযোগিতা বৃদ্ধি:** সাওম বিত্তবান মুসলিমদের পক্ষ থেকে দরিদ্র মানুষের প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে। নিবিড় উপলব্ধি ও গভীর ভালোবাসার সাথে দরিদ্র ভাইদের দুঃখ-কষ্ট দূর করতে সচেষ্ট হয়। আত্মীয় বা প্রতিবেশী কিংবা শুধু মুসলিম ভাই হিসেবে তারা যে অধিকার পাওয়ার যোগ্য তা আদায়ে সচেষ্ট হয়।

৩. **আদর্শ সমাজ গঠন:** সহযোগিতা ও ভালোবাসাপূর্ণ সুন্দর সমাজ গড়ে তোলার অব্যর্থ হাতিয়ার সাওম। সাওম ব্যক্তিকে মিথ্যাচার, হিংসা-বিদ্বেষ, ঝগড়া, অশ্লীলতা, পরনিন্দা প্রভৃতি পাপাচার থেকে দূরে রাখে। আর তার মধ্যে তৈরি করে সহানুভূতি, ভালোবাসা, সহযোগিতা, তাকওয়া ও সংযম। ফলে গড়ে ওঠে একদল আদর্শিক লোক। যারা একটি কাঙ্ক্ষিত আদর্শিক সমাজ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করে।

৪. **আর্থিক উপযোগ:** সাধারণত রমজান মাসে জাকাত বণ্টন করা হয়। অন্যান্য মাসের তুলনায় রমজান মাসের দানে বহুগুণ বেশি সওয়াব বলে এ সময়ে দানের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। আর সাওমের শেষের দিকে এসে শরিয়তের নির্ধারণ অনুযায়ী ব্যক্তি তার নিজের ও পরিবারের পক্ষ থেকে ফিতরা আদায় করে। এভাবে সাওম সমাজের লোকদের মধ্যে প্রয়োজনীয় আর্থিক উপযোগ তৈরি করে।

৫. **ঐক্য ও সাম্য প্রতিষ্ঠা:** রমজান মাসে পৃথিবীর সব অঞ্চলের মুসলিম সিয়াম সাধনায় আত্মনিয়োগ করে। এক্ষেত্রে ধনী-নির্ধন, রাজা-প্রজা, বর্ণ, অঞ্চল বা জাতীয়তায় কোনো প্রভেদ করা হয় না। রমজান শেষে ঈদুল ফিতরের সার্বজনীন ও পবিত্র উৎসব হয়। ফলে সাধারণভাবে সব মুসলিম ঐক্য ও সাম্যের চেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

৬. **পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা বৃদ্ধি:** সাওম পালনকারীর আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীর সাথে তার বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা বৃদ্ধি করে দেওয়ার ক্ষেত্রেও সাওম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ সময়ে বিপুল সওয়াব লাভের আশায় এক মুসলিম অন্য মুসলিমকে সাহরি-ইফতার খাওয়ায়। এক পরিবার অন্য পরিবারে খাবার তৈরি করে পাঠায়। এতে সমাজের মুসলিমদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় ও বন্ধুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

৭. **সময়ানুবর্তিতা ও নিয়মানুবর্তিতার প্রশিক্ষণ:** সময়ের কাজ সময়ে এবং নিয়ম মেনে সম্পন্ন করার মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা হলো সাওম। এ সময়ে ব্যক্তি যথাসময়ে সাহরি ও ইফতার করে। সাওম পালনের প্রতিটা মুহূর্তে প্রয়োজনীয় বিধান পালন করে। তার খাওয়া, ঘুমানো, সালাত আদায় প্রভৃতি সবকিছুতেই পরিপূর্ণ শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। যা সমাজকে শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল করে তোলে।

৮. **স্বাস্থ্য সচেতনতার শিক্ষা:** সাওম মানুষকে পরিমিত ও নিয়মিত আহারের শিক্ষাদান করে যা দৈহিক সুস্থতার বিকল্প উপায়। তাছাড়া একমাসের সিয়াম সাধনা তার পাকস্থলীকে আরো কর্মক্ষম করে তোলে।

এভাবে জীবনের সব ক্ষেত্রে প্রভাবক শক্তি হিসেবে বিরাজ করে সাওম মানুষকে প্রকৃত মানুষ হওয়ার শিক্ষা দেয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. 'সাওম' অর্থ কী? *[ঢা. বো., য. বো., কু. বো. ২০২২; ঢা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., ব. বো. ২০১৯]*

২. 'রোজাদারের জন্য দুটি আনন্দ'—আনন্দ দুটির নাম লেখো। *[রা. বো., দি. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০২২]*

৩. সাওম পালনের ফলে কী হয়? *[সকল বোর্ড ২০১৯]*

৪. সুবহি সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খাদ্যগ্রহণ ও যৌনাচার থেকে নিয়তের সাথে বিরত থাকার নাম কী?

৫. রমজান মাসকে কীসের মাস বলা হয়?

৬. সাওমের মূল লক্ষ্য কী?

উত্তরের জন্য দেখো ২৮৫ পৃষ্ঠা।

খ. দলীয় কাজ

শিক্ষার্থীরা দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে প্রথম দল সাওমের আধ্যাত্মিক গুরুত্ব এবং দ্বিতীয় দল সাওমের সামাজিক গুরুত্ব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য উপস্থাপন করবে। শিক্ষক সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করবেন।

পাঠ ৮

সাওমের শিক্ষা
Learning of Saum

সাওমের ধর্মীয় শিক্ষা

সাওমের ধর্মীয় শিক্ষা হলো, সাওম একটি ফরজ ইবাদত। সাওম পালন না করলে মহান আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। সাওম অস্বীকার করলে কাফির হতে হয়। আর কাফিরদের স্থায়ী আবাস হয় জাহান্নাম। অপরদিকে সাওম পালন করলে মহান আল্লাহর রহমত লাভ সম্ভব হয়। আল্লাহ তাআলা ব্যক্তির ইবাদতে ও উপার্জনে বরকত নাজিল করেন। তার কিয়ামতে সাফল্য লাভ নিশ্চিত হয়। সে বেহেশতে নিজের স্থায়ী আবাস গড়ে নেয়।

সাওমের আধ্যাত্মিক শিক্ষা

১. **আত্মিক উৎকর্ষ সাধন:** সাওম ব্যক্তির আত্মাকে পরিশোধিত করে তার উৎকর্ষ সাধন করে। এর মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মানুষের আত্মা মানবিক স্তরের সীমাবদ্ধতা ও চাহিদা অতিক্রম করে। সে ভোগ থেকে বিরত থাকে। তার মধ্যে মহান আল্লাহর জিকির ও তাকওয়ার পূর্ণ রূপ ফুটে ওঠে। আত্মার মধ্যে যে কলুষ-কালিমা জমা হয়, সাওম তা দূর করে। ফলে আত্মা পবিত্র ও পরিশুদ্ধ হয়ে ওঠে।

২. **উন্নত চরিত্র গঠন:** বিভিন্ন বদঅভ্যাস ত্যাগ করে সাওম উন্নত নৈতিক চরিত্র গড়ে তোলার শিক্ষা দেয়। এ সময়ে পানাহার থেকে বিরত থাকতে হয় বলে সহজেই ধূমপান ছেড়ে দেওয়া যায়। শক্তি ও সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তি পানাহার বা যৌনাচারে লিপ্ত না হয়ে সুন্দরতম সংযমের অনুশীলন করে। তার মধ্যে সবর বা ধৈর্যশীলতার দুর্লভ গুণ স্থান করে নেয়। সাওমলব্ধ তাকওয়া তাকে হিংসা, পরনিন্দা ও পাপাচারের বিপরীতে কুরআন তিলাওয়াত, দানশীলতা ও ইবাদতে অভ্যস্ত করে তোলে। ফলে ব্যক্তি সুদৃঢ় ও উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হয়।

সাওমের সামাজিক শিক্ষা

সমাজের নিরন্ন ও ক্ষুধাপীড়িত মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার শিক্ষা দেয় সাওম। সাওমের মূল সামাজিক শিক্ষা হলো— নিঃস্ব, দুঃখী ও দরিদ্র মানুষদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া। এছাড়া আরো কিছু সামাজিক শিক্ষা হলো—

১. **আদর্শ সমাজ বিনির্মাণ:** সিয়াম সাধনায় মানুষের অন্তর কলুষতা ও পাপাচার মুক্ত হয়। আর সুন্দর ও আদর্শ সমাজ গঠনে মানুষের চারিত্রিক পবিত্রতা খুবই প্রয়োজন। সিয়াম পালন আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে সহযোগিতা করে।

২. **ঝগড়া-বিবাদ থেকে মুক্তি:** সাওমের অন্যতম একটি সামাজিক শিক্ষা হচ্ছে— ঝগড়া-বিবাদ থেকে মুক্তি পাওয়া। সিয়াম পালনরত কোনো মুসলিম কারো সাথে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হবে না। এমনকি কেউ ঝগড়া বাধাতে উদ্যোগী হলেও 'আমি রোজাদার' একথা বলে সে নিজেকে নিবৃত্ত রাখবে।

৩. **ধনী-দরিদ্রের দূরত্ব হ্রাস:** সাওমের মাধ্যমে ধনী-দরিদ্রের মধ্যেকার যে মানসিক দূরত্ব তা কমে আসে। ধনী-দরিদ্র উভয়কেই উপবাস করে মহান আল্লাহর হুকুম পালন করতে হয়।

৪. **নৈতিক শিক্ষা:** সাওম অর্থই হচ্ছে— বিরত থাকা। যাবতীয় অপকর্ম, অনাচার, যৌনসম্ভোগ ইত্যাদি কাজ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে মানুষের নৈতিক উন্নতি ঘটে।

৫. **ঐক্য ও সংহতি:** একই সময়ে অনেকে মিলে সাহরি গ্রহণ, ইফতার করা, তারাবিহ সালাত আদায় ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে লোকদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি ভাব চলে আসে।

৬. **আর্থিক কুরবানি:** বেশিরভাগ মানুষ রমজান মাসকে জাকাত ও অন্যান্য সাদাকাত আদায়ের মোক্ষম সময় হিসেবে গ্রহণ করে। নিজের আর্থিক কুরবানির মাধ্যমে অন্তরের স্বচ্ছতা ও দরিদ্রের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সাওম অস্বীকার করলে বান্দা কী হয়ে যায়?
২. কাফিরদের স্থায়ী আবাস কোথায়?
৩. সাওম ব্যক্তির আত্মাকে পরিশোধিত করার মাধ্যমে কী করে?

উত্তরের জন্য দেখো ২৮৫ পৃষ্ঠা।

পাঠ ৯ হজের গুরুত্ব
Importance of Hajj

হজের সংজ্ঞা

কুরআন মাজিদে 'হজ' শব্দটির দু'রকম ব্যবহার রয়েছে। একটি প্রচলিত 'হজ' (اَلْحَجُّ) এটি মাসদার যা ক্রিয়ামূল। অপরটি হলো হিজ্জ (اَلْحِجُّ) এটি ইসম বা বিশেষ্য। ইচ্ছা বা অভিপ্রায় পোষণ, আগ্রহ ব্যক্ত করা, সুদৃঢ় প্রত্যয় বা সিদ্ধান্ত নেওয়া অর্থে হজ শব্দটির ব্যবহার রয়েছে। 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া' গ্রন্থকার ইবনে কাসীর বলেছেন, শাব্দিকভাবে যেকোনো বিষয়ের প্রতি ইচ্ছা পোষণ করাই হজ। এটি ইসলামে দৈহিক ও আর্থিক ইবাদত।

ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায়: মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে জিলহজ মাসের নির্ধারিত দিনসমূহে নির্ধারিত নিয়মে পবিত্র কাবাঘর ও সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহ প্রদক্ষিণ করাকে হজ বলে।

ক. আল-ফিকহুল ইসলামি গ্রন্থে আছে, নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কাজের মাধ্যমে নির্ধারিত স্থান জিয়ারত করা হলো হজ।

খ. শরহে বিকায়া গ্রন্থকার বলেন— নির্দিষ্ট সময়ে সুনির্দিষ্ট স্থান জিয়ারত করাই হজ।

গ. 'আল-কামুসুল ফিকহ' গ্রন্থে আছে, মহান আল্লাহর নৈকট্যলাভের আশায় একটা নির্ধারিত সময়ে মক্কা মুয়াযযামার বায়তুল হারামে গমনের নিয়ত পোষণ করাই হজ।

মোটকথা, প্রাপ্তবয়স্ক এবং আর্থিক ও দৈহিকভাবে সক্ষম মুসলিমের জন্য জীবনে একবার জিলহজ মাসে নির্দিষ্ট দিনে ইহরামের সাথে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ ও আরাফাতে অবস্থানের মাধ্যমে একটি ফরজ কাজ সম্পন্ন করাই হজ।

হজের ধর্মীয় গুরুত্ব

১. **ফরজ ইবাদত:** হজ একটি ফরজ ইবাদত। সুস্থ, প্রাপ্তবয়স্ক, স্বাধীন এবং প্রয়োজনীয় অর্থসম্পত্তি আছে, এমন মুসলিমের ওপর আল্লাহ তাআলা সারাজীবনে একবার হজ পালন করা ফরজ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন—

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ـ

অর্থ: মানুষদের মধ্যে যার সেখানে (মহান আল্লাহ ঘরে) যাওয়ার সামর্থ আছে, মহান আল্লাহর (সন্তুষ্টির) উদ্দেশ্যে ঐ ঘরের (কাবা) হজ করা তার জন্য অবশ্য কর্তব্য (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৯৭)। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন—

يَاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوْا

অর্থ: হে মানবমণ্ডলী! আল্লাহ তাআলা তোমাদের ওপর হজ ফরজ করে দিয়েছেন। কাজেই তোমরা হজ পালন করো (মুসলিম)।

২. **ইসলামের বুনিয়াদ:** ইসলাম যে পাঁচটি মূলভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত তার মধ্যে হজ অন্যতম। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন—

بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ ـ

অর্থ: ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। সাক্ষ্য দেওয়া যে, মহান আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রাসুল, সালাত কায়েম করা, জাকাত দেওয়া, হজ করা এবং রমজানে সাওম পালন (বুখারি ও মুসলিম)।

৩. **ক্ষমা লাভ:** যথাযথভাবে হজ পালন করা হলে আল্লাহ তাআলা ব্যক্তির আগের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন— مَنْ اَتٰى هٰذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ اُمُّهٗ

অর্থ: যে ব্যক্তি হজ করার জন্য বায়তুল্লাহ আগমন করে তারপর সবরকমের যৌনক্রিয়া ও পাপাচারে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকে, সে যেন সদ্য জন্ম নেওয়া নিষ্পাপ শিশুর মতো প্রত্যাবর্তন করে (বুখারি ও মুসলিম)।

৪. **আখিরাতে সাফল্য লাভ:** দুনিয়া ও আখিরাতে হাজিদের সম্মান ও মর্যাদা অনেক বেশি। যথাযথভাবে শরিয়তের বিধান মেনে হজ পালন করা হলে আখিরাতে সাফল্য লাভ নিশ্চিত। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন—

اَلْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهٗ جَزَآءٌ اِلَّا الْجَنَّةُ ـ

অর্থ: কবুল হজের প্রতিদান বেহেশত ছাড়া আর কিছুই নয় (সুনানে নাসাঈ)। সঠিক নিয়মে হজ করতে রওয়ানা হওয়ার পর বা হজে গমনের বিশুদ্ধ নিয়তের পর কেউ যদি মারা যায় তাহলেও সে হজের সওয়াব পাবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি হজ বা উমরাহ কিংবা জিহাদের জন্য বের হয়ে পথে মারা যায় মহান আল্লাহ তাকে গাজি, হাজি ও উমরাহকারীর সওয়াব লিখে দেবেন' (মিশকাত)।

৫. **আদায় না করা মহাপাপ:** নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক, হজ ফরজ হওয়ার অন্যান্য শর্তসমূহ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কেউ যদি হজ আদায় না করেন তাহলে তার কঠিন পরিণতি হবে, এমনকি ধর্মচ্যুতি হওয়ারও আশঙ্কা আছে। মহানবি (সা.) বলেন— 'যার ওপর হজ ফরজ হয়েছে; অথচ সে হজ করে না, তার ব্যাপারে আমি বলতে পারি না সে ব্যক্তি কি ইসলাম ধর্মের ওপর, নাকি অন্যকোনো ধর্মের ওপর' (বুখারি)।

৬. **আখিরাতের সফরের নিদর্শন:** মানুষ যখন হজের উদ্দেশ্য নিয়ে বাড়িঘর, আত্মীয়-স্বজন; বন্ধু-বান্ধবকে ত্যাগ করে বের হয়, তখন তারা যেন আখিরাতের সফরে বের হয়। মৃত্যুর সময় মানুষ যেমন বাড়িঘর, দোকান ত্যাগ করে তেমনই হজের সময়ও মানুষ এসব ছেড়ে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। এ যেন আখিরাতের একটি পূর্ব নিদর্শন।

হজের আধ্যাত্মিক গুরুত্ব

১. **মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ:** হজের মাধ্যমে মুমিন মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করে। এ সময়ে মহান আল্লাহর আহ্বানে সাড়া দিয়ে মানুষ মক্কা মুয়াযযামায় হাজির হয়। অগণিত মানুষের পবিত্র সমাবেশে মহান আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার প্রেরণা নিয়ে তারা ঘোষণা করতে থাকে—

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ لَا شَرِيْكَ لَكَ ـ

অর্থ: আমি তোমার কাছে হাজির, হে মহান আল্লাহ! আমি তোমার কাছে উপস্থিত। তোমার কোনো শরিক নাই। আমি তোমার কাছে হাজির। নিশ্চয় সব প্রশংসা, নিয়ামত এবং সার্বভৌমত্ব তোমারই। তোমার কোনো শরিক নাই।
বস্তুত হজের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি মহান আল্লাহর আতিথ্য গ্রহণের দুর্লভ সুযোগ লাভ করে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন—

اَلْحَاجُّ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللّٰهِ اِنْ دَعَوْهُ اَجَابَهُمْ وَاِنِ اسْتَغْفَرُوْهُ غَفَرَلَهُمْ ـ

অর্থ: হজ ও উমরাহ পালনকারীরা মহান আল্লাহর মেহমান। যদি তাকে ডাকে, তিনি তাদের জবাব দেন আর যদি তাঁর কাছে ক্ষমা চায় তিনি তাদের ক্ষমা করে দেন (সুনানে ইবনে মাজাহ)।

২. **আত্মিক প্রশান্তিলাভ:** হজের মাধ্যমে মুসলিম ব্যক্তি আত্মিক প্রশান্তি লাভ করে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

ذٰلِكَ وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ ـ

অর্থ: যারা মহান আল্লাহর নিদর্শনাবলির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করবে তা তাদের অন্তরসমূহেরই তাকওয়া (সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত: ৩২)।

হজের সামাজিক গুরুত্ব

১. **ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টি:** হজ বিশ্ব মুসলিমের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা করে। দীর্ঘদিন নিঃস্বার্থ ও আন্তরিক চিত্তে তারা পাশাপাশি অবস্থান করে। পবিত্রতম পরিবেশে তারা মহান আল্লাহর কাছে আত্মনিবেদন করে। লক্ষ্যগত ঐক্য, অবস্থানগত নৈকট্য, মানসিক পবিত্রতা এবং পরিবেশের দীনি চরিত্র তাদের মধ্যে সুদৃঢ় ঐক্য গড়ে তোলে।

২. **সাম্যবাদী চেতনার উন্নয়ন:** হজ মুসলিমদের মধ্যে বিরাজমান সাম্যবাদী চিন্তা চেতনা ও মানসিকতায় আরো উন্নতি ঘটায়। সামাজিক সাম্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন হলো হজ। এখানে সব মুসলিমকে এক ধরনের পোশাক পরতে হয়, এক জায়গায় থাকতে হয়, একই খাদ্যপানীয় গ্রহণ করতে হয়। সালাত আদায়, তাওয়াফ সমাপন এবং অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতায় সব শ্রেণি ও পর্যায়ের মানুষ এক ও অভিন্ন নীতি অনুসরণ করে।

৩. **সুদৃঢ় ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক তৈরি:** মুসলিমরা ইসলামি আদর্শের সুমহান ভ্রাতৃত্বে সম্পৃক্ত। পৃথিবীর সব সম্পর্কের ওপর এর স্থান ও মর্যাদা রয়েছে। হজ মুসলিম জাতির এই আদর্শিক ভ্রাতৃত্বে নতুন মাত্রা যুক্ত করে। ভাবগম্ভীর ও আন্তরিক পরিবেশে দীর্ঘসময় একত্রে অবস্থানের ফলে তাদের এ সম্পর্ক অধিকতর সুন্দর এবং সুদৃঢ় হয়।

৪. **শৃঙ্খলার প্রশিক্ষণ:** হজ মুসলিমদের নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা শেখার সুমহান কেন্দ্র। এ সময়ে তারা অন্য সব কাজ থেকে নিজেদের মুক্ত রেখে ধর্মীয় চেতনায় কেবল শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতারই অনুশীলন করে। হজের সময় মিনায় শয়তানকে পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার উজ্জল দৃষ্টান্ত ফুটে উঠে।

৫. **ইতিহাস সচেতনতা:** হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)-এর প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে মক্কা মুয়াযযামায়। হযরত ইব্রাহীম (আ.) এখানে বায়তুল্লাহ তৈরি করেন। ইসমাঈল (আ.) মক্কায় জনবসতি গড়ে তোলেন। বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর জীবন ও কর্মক্ষেত্র এ পবিত্র নগরী। এখানে তাঁর পবিত্র স্মৃতি ছড়িয়ে রয়েছে। হজের সময় মুসলিম এসব বিষয়ের সংস্পর্শে আসে। সে ইসলামের ইতিহাস সচেতন হয় এবং নতুন প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠে।

হজের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব

১. **বার্ষিক মহাসম্মেলন:** হজ মূলত আন্তর্জাতিক ইবাদত। বিশ্ব মুসলিমের একীভূত হওয়ার, একই চিন্তা ও পথে পথপরিক্রমার এক মহান প্লাটফর্ম তৈরী করে দেয় এই হজ। পৃথিবীর সব দেশের, সব বর্ণের, সব শ্রেণির সব মতের মানুষ হজ উপলক্ষে মক্কায় সমবেত হন এবং একই ইমামের পেছনে নামাজ আদায় করেন। প্রতিবছর একটা নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত স্থানে মুমিনদের এ সমাবেশ তাদের বার্ষিক কার্যক্রম মূল্যায়ন ও পরবর্তী বছরের কর্মসূচি প্রণয়নে ভূমিকা রাখে। এতে ভিন্নমতসহ ঐক্যের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়।

২. **আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি:** হজ কেবল ইবাদত নয় বরং মুসলিমদের জাতীয় সমস্যা সমাধান এবং পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির ধর্মীয় ফোরাম। এতে মুসলিমরা আন্তরিক পরিবেশে একে অপরের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে। সমস্যা সমাধানে নিজেদের করণীয় নির্ধারণ এবং অপরের দেশ বা জাতির সমস্যা সমাধানে সাধ্য মতো ভূমিকা পালন করতে পারে। এভাবে হজ আন্তর্জাতিক জীবনে পারস্পরিক সহযোগিতার ধারা অব্যাহত রাখে।

হজের অর্থনৈতিক গুরুত্ব

১. **আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন:** হজের সময় মুসলিম রাষ্ট্রনায়ক বা রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিরা মক্কায় সমবেত হন। এ সময় দারিদ্র্যপীড়িত রাষ্ট্রসমূহ ধনী ও বিত্তশালী রাষ্ট্রের আর্থিক সহযোগিতা চাইতে পারে। অসচ্ছল ও অভাবগ্রস্ত রাষ্ট্রকে বিত্তশালী রাষ্ট্র বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসেবে নির্ধারণ করতে পারে। এমনকি জাকাতলব্ধ অর্থ পাঠিয়েও অনুন্নত রাষ্ট্রের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে। আর এসব সুচারুরূপে সম্পন্ন করার ক্ষেত্র তৈরি করতে পারে হজ।

২. **কর্মসংস্থান:** হজ মৌসুমে হিজাযে বিপুল মুসলিম সমবেত হয়। এদের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তোলা এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনা পরিচালনার জন্য বিপুল জনশক্তির প্রয়োজন হয়। যা সাময়িককালের জন্য হলেও কর্মক্ষম বেকার লোকদের জন্য কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে। তাছাড়া হজের মৌসুমে সেবার বিনিময়ে উপার্জিত অর্থে শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠা করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান করা যায়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. হজ কী? *[রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. ২০১৮]*
২. ইসলামে দৈহিক ও আর্থিক ইবাদত কোনটি? *[সকল বোর্ড ২০২২, ২০১৭]*
৩. হজের সময় শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করা হয় কোথায়? *[সকল বোর্ড ২০২২]*
৪. যথাযথভাবে হজ পালন করা হলে আল্লাহ তাআলা ব্যক্তির আগের গুনাহসমূহ কী করেন?
৫. কবুল হজের প্রতিদান কী?
৬. হজের মাধ্যমে মুমিন কী লাভ করে?

উত্তরের জন্য দেখো ২৮৫ পৃষ্ঠা।

খ. একক কাজ

শিক্ষার্থীরা হজের ধর্মীয় গুরুত্ব ১০টি বাক্যে লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ১০ হজের শিক্ষা
Learning of Hajj

প্রকৃত হাজি তারা, যারা হজের শিক্ষা লাভ করে ধন্য হন। তারা হজকে জীবন পরিবর্তনের অপূর্ব সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করেন এবং হজ-পরবর্তী জীবনে হজের শিক্ষা বজায় রেখে জীবন পরিচালনা করেন। এরকম হাজির সংখ্যা বাড়লে দেশ ও জাতির মঙ্গল সাধিত হবে, জন-মানুষের কল্যাণ হবে। অন্যথা অর্থের অপচয়, সময়ের অপচয়, শক্তি সামর্থের অপব্যবহার ও নফসের গোলামি বা আত্মপূজাই সার হবে।

হজের ধর্মীয় শিক্ষা

১. **মুসলিম থাকার শর্ত:** ফরজ হওয়ার পর যদি কেউ হজ অস্বীকার করে তবে সে কাফির হবে। আর স্বীকার করেও যদি হজ পালন না করে সে অত্যন্ত জঘন্য গুনাহগার হবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) হজ পালন করা বা না করাকে মুসলিম থাকা বা না থাকার কারণ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন—

لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اَبْعَثَ رِجَالًا اِلٰى هٰذِهِ الْاَمْصَارِ فَيَنْظُرُوْا كُلَّ مَنْ كَانَ لَهٗ جِدَّةٌ وَلَمْ يَحُجَّ فَيَضْرِبُوْا عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ مَاهُمْ بِمُسْلِمِيْنَ مَاهُمْ بِمُسْلِمِيْنَ -

অর্থ: আমার ইচ্ছে হয় এসব শহরগুলোতে লোক পাঠিয়ে খবর নেই। তারপর সেসব লোকদের ওপর জিযিয়া কর ধার্য করি, যারা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ পালন করছে না। তারা মুসলিম নয়, তারা মুসলিম নয় (বুখারি)।

২. **সামগ্রিক ইবাদত:** হজ একটি সামগ্রিক ইবাদত। সালাত দৈহিক ও আত্মিক ইবাদত, সাওমও তাই। আবার জাকাত হলো আর্থিক ও আত্মিক ইবাদত, কিন্তু হজ একই সাথে দৈহিক, আত্মিক ও আর্থিক ইবাদত। মানুষের সামগ্রিক কর্মতৎপরতার সব কিছুই হজে নিবেদিত হয়। এজন্য রাসুলুল্লাহ (সা.) হজকে উত্তম কাজ বলে অভিহিত করেছেন।

হজের আধ্যাত্মিক শিক্ষা

১. **আত্মশুদ্ধি:** মানুষের মধ্যে আত্মগর্ব, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, ঘৃণা, পরনিন্দা, ক্রোধ, কাম প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি রয়েছে। এসব পাশবিক প্রবৃত্তি তার অন্তর কলুষিত করে। হজ মানুষকে এ কলুষতা থেকে মুক্ত করে। এসময়ে সব হাজি মৃত্যু পোশাকে নিজেকে সাজায়। এসময় তার সন্তান-সন্তুতি, পরিবার, অর্থ-সম্পদ, ব্যবসায় আর পদমর্যাদায় কোনো সংযোগ থাকে না। সে একান্তভাবেই মহান আল্লাহর দরবারে উপনীত হয়। পাপাচার, মিথ্যাচার, বৈধ-অবৈধ যৌনাচার, অশ্লীলতা এবং সব মানবিক দুর্বলতার বিপরীতে এখানে সে মহান আল্লাহর জিকিরে মশগুল থাকে। ফলে তার অন্তর পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। কেননা মহান আল্লাহর জিকিরেই অন্তর প্রশান্ত ও পবিত্র হয়।

২. **সবরের প্রশিক্ষণলাভ:** হজে মুসলিমরা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করে। দীর্ঘ সময়ে তারা হজের বিভিন্ন কাজ আঞ্জাম দেয়। নিষ্ঠার সাথে হজের কার্যক্রম সম্পন্ন করে তারা ধৈর্যের বাস্তব প্রশিক্ষণ পায়।

হজের সামাজিক শিক্ষা

১. **দায়িত্ববোধ ও অধিকার সচেতনতা:** হজে ব্যক্তি নিজের দায়িত্বসমূহ সুচারুরূপে সম্পন্ন করে। সম্ভাব্য সব ক্ষেত্রে প্রাপ্ত নিজের অধিকারসমূহ বুঝে নেয়। পাশাপাশি অন্যের প্রতি নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়। তার মধ্যে হজের বিভিন্ন কার্যক্রম পালনের ক্ষেত্রে অপর ভাইকে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রবণতা গড়ে ওঠে। সমাজজীবনে এ শিক্ষা ব্যক্তিকে দায়িত্ববোধ সম্পন্ন এবং অধিকার সচেতন একজন মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে।

২. **ত্যাগের প্রশিক্ষণ:** হজের মাধ্যমে ব্যক্তি ত্যাগের মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সে পশু কুরবানি করে। তার সহচর-সহহাজিদের জন্য নিজের সুবিধা ত্যাগ করে। এভাবে ক্ষুদ্রতর ত্যাগ থেকে সে বৃহত্তর ত্যাগের প্রশিক্ষণ পায়।

হজের আন্তর্জাতিক শিক্ষা

হজ পৃথিবীর সব অঞ্চল, বর্ণ ও ভাষার মুসলিমদের সম্মিলিতভাবে কাজ করার শিক্ষা দেয়। হজের মধ্যে ইসলামি উখওয়াতের বা ভ্রাতৃত্বের বাস্তবরূপ লক্ষ করা যায়। মুসলিমদের আন্তর্জাতিক সমস্যা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করার এবং ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগে তার সমাধান করার শিক্ষা হজের মধ্যে নিহিত রয়েছে। সুতরাং শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ আন্তর্জাতিক জীবন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মুমিনগণ হজের শিক্ষা কাজে লাগাবেন।

হজের অর্থনৈতিক শিক্ষা

হজ মুসলিমদের আন্তঃবাণিজ্য ও আর্থিক সহযোগিতা বৃদ্ধির শিক্ষা দেয়। হজের মাধ্যমেই উন্নত মুসলিম দেশ অনুন্নত ও দরিদ্র মুসলিম সম্পর্কে জানতে পারে এবং তাদের দরিদ্রতা নিরসনে জাকাত ও অন্যান্য আর্থিক সাহায্য পাঠাতে পারে। হজের আর্থিক শিক্ষার মধ্যে এটাও অন্তর্ভুক্ত যে, কোনো মুসলিম দেশে বিপুল কাজের সুযোগে অপর দেশ থেকে শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে মুসলিমদেরকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে।

বস্তুত ইসলামের মৌলিক ইবাদতসমূহ নিছক আনুষ্ঠানিকতা নয়। বরং এসব ইবাদত হচ্ছে— মানুষের দৈহিক, আত্মিক, ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক জীবনযাত্রার বাস্তব দিকনির্দেশনা। এর মাধ্যমে মুমিনদেরকে বৃহত্তর জীবনে যোগ্যতার সাথে দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত করা হয়।

জেনে রেখো

হজ কবুলের আলামত:

হজ কবুল হলো কি না, তা জানেন আল্লাহ তাআলা। তবে হজ কবুলের কিছু বাহ্যিক আলামত বা নিদর্শন রয়েছে। যেমন— যারা হজের পরে কাজকর্মে, আমল-আখলাকে, চিন্তাচেতনায় পরিশুদ্ধি অর্জন করবেন। তারাই হবেন প্রকৃত হাজি। এরকম শুদ্ধ হাজিগণ ভালো কাজে অগ্রগামী হবেন এবং খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকবেন। এ মহান আল্লাহর মেহমানের দ্বারা মানুষ উপকৃত হবে।

হজ পালনের নিয়ম—

ক্রম	পর্যায়ক্রমিক কাজ	বিধান
১	ইহরাম বাঁধা	ফরজ
২	তাওয়াফে কুদুম (আগমনী তাওয়াফ)	সুন্নত
৩	সাফা ও মারওয়া সাঈ করা	ওয়াজিব
৪	উকুফে আরাফাহ (৯ই জিলহজ তারিখে আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা)	ফরজ
৫	মিনায় শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করা	ওয়াজিব
৬	কুরবানি করার পর মাথা মুড়ানো বা চুল কাটা	ওয়াজিব
৭	তাওয়াফে যিয়ারত	ফরজ
৮	বিদায়ী তাওয়াফ	ওয়াজিব

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. রাসুলুল্লাহ (সা.) হজ পালন করা না করাকে কীসের কারণ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন?

২. হজ একই সাথে কী কী ইবাদত?

৩. রাসুলুল্লাহ (সা.) হজকে কী কাজ বলে অভিহিত করেছেন?

৪. মহান আল্লাহর জিকিরে অন্তর কী হয়?

৫. হজের মাধ্যমে ব্যক্তি কীসের মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে?

উত্তরের জন্য নিচে দেখো।

খ. দলীয় কাজ

শিক্ষার্থীরা দুটি দলে ভাগ হয়ে এক দল হজের সামাজিক ও অন্য দল আন্তর্জাতিক শিক্ষা বর্ণনা করবে।

পাঠ মূল্যায়নের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর

পাঠ-১: ১. দাসত্ব করা, গোলামি করা, আনুগত্য করা; ২. মহান আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা; ৩. মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন; ৪. হাক্কুল ইবাদের; ৫. দুই রকমের; ৬. দুই প্রকার।

পাঠ-২: ১. ইবাদতের মাধ্যমে; ২. ইমানের; ৩. কেবল ইবাদতের জন্য; ৪. মূল বা প্রধান ইবাদত; ৫. চারটি; ৬. আকিদাগত বিষয়।

পাঠ-৩: ১. দু'আ, ইসতেগফার, রহমত ও তাসবিহ; ২. সালাতকে; ৩. সালাতে; ৪. দরুদ পাঠ; ৫. কবিরা গুনাহ; ৬. সর্বোত্তম ইবাদত।

পাঠ-৪: ১. সালাত; ২. আল্লাহ তাআলা; ৩. মানুষের; ৪. সালাত; ৫. মহান আল্লাহর; ৬. ফরজ।

পাঠ-৫: ১. পবিত্রকরণ, বৃদ্ধিকরণ; ২. জাকাত ফরজ হওয়ার জন্য সম্পদের নির্ধারিত পরিমাণ; ৩. অর্থনৈতিক; ৪. জাকাত; ৫. যথাক্রমে ৭.৫ তোলা এবং ৫২.৫ তোলা; ৬. সেতুবন্ধন।

পাঠ-৬: ১. আমানত; ২. বাধ্যতামূলক; ৩. পুঞ্জিভূত রাখা; ৪. বিপর্যয়।

পাঠ-৭: ১. বিরত থাকা; ২. i. ইফতারের সময়, ii. তার রবের সাথে সাক্ষাতের সময়; ৩. সহানুভূতি ও সহমর্মিতা সৃষ্টি হয়; ৪. সাওম; ৫. রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের; ৬. তাকওয়া অর্জন।

পাঠ-৮: ১. কাফির; ২. জাহান্নাম; ৩. উৎকর্ষ সাধন।

পাঠ-৯: ১. নির্দিষ্ট সময়ে সুনির্দিষ্ট জিয়ারত; ২. হজ; ৩. মিনায়; ৪. ক্ষমা করে দেন; ৫. বেহেশত; ৬. মহান আল্লাহর সান্নিধ্য।

পাঠ-১০: ১. মুসলমান থাকা না থাকার; ২. দৈহিক, আত্মিক ও আর্থিক ইবাদত; ৩. উত্তম কাজ; ৪. প্রশান্ত ও পবিত্র; ৫. ত্যাগের।

৫ এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

হাক্কুল্লাহ	হাক্কুল্লাহ বলতে মহান আল্লাহর হককে বোঝায়। আল্লাহ তাআলার ইবাদতের মধ্যে এমন কিছু ইবাদত রয়েছে যেগুলো প্রত্যক্ষভাবে তাঁর সাথে সম্পৃক্ত। যেমন- সালাত, সাওম, জাকাত, হজ, জিকির, শোকর, তাসবিহ ইত্যাদি। এ ইবাদতগুলোর জন্য মহান আল্লাহ ছাড়া আর কারও কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। এ জাতীয় ইবাদতই হাক্কুল্লাহ হিসেবে পরিচিত।
হাক্কুল ইবাদ	হাক্কুল ইবাদ অর্থ বান্দার অধিকার। মহান আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে বান্দার প্রতি দায়িত্ব পালন করাই হলো হাক্কুল ইবাদ। মানুষসহ পৃথিবীতে মহান আল্লাহর আরও অসংখ্য সৃষ্টি রয়েছে। আল্লাহ তাআলা এদের মধ্যে মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা মর্যাদা দিয়েছেন। এজন্য তিনি অন্য মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্টির প্রতি মানুষকে বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করার আদেশ দিয়েছেন। এসব দায়িত্ব ও কর্তব্যই হলো হাক্কুল ইবাদ।
ইমান	আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অস্তিত্ব এবং প্রাসঙ্গিক কিছু বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার নাম ইমান। আরবি 'ইমান' শব্দের অর্থ হলো বিশ্বাস স্থাপন করা। ইসলামের পরিভাষায় ইসলামি শরিয়তের যাবতীয় বিধিবিধান অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করা মুখে বা প্রত্যক্ষ স্বীকার করা এবং বাস্তব জীবনে তার আমল করাকে ইমান বলে। ইমানের মৌলিক বিষয় ৭টি। যেমন— ১. আল্লাহ তাআলার প্রতি বিশ্বাস; ২. ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস; ৩. আসমানি কিতাবে বিশ্বাস; ৪. নবি ও রাসুলে বিশ্বাস; ৫. আখিরাতে বিশ্বাস; ৬. তাকদিরে বিশ্বাস; ৭. মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের বিশ্বাস।
সালাত	ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে দ্বিতীয় হলো সালাত। এটি একটি মৌলিক আনুষ্ঠানিক ইবাদত। সালাত অর্থ- দোয়া, ক্ষমা প্রার্থনা, তাসবিহ, রহমত। প্রতিদিন পাঁচবার মহান আল্লাহর নির্ধারিত এবং রাসুলুল্লাহ (সা.) নির্দেশিত সময়ে যে ইবাদত সম্পাদন করা হয় তার নাম সালাত। সালাত বাদ দিয়ে ইসলামকে কল্পনা করা যায় না। সালাত কুফর ও ইমানের মধ্যে পার্থক্য রচনা করে।
জাকাত	জাকাত শব্দের অর্থ পবিত্রকরণ, বৃদ্ধিকরণ। ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পদের নিসাব পূর্তির পর যে কোনো মুসলিমের শরিয়তের নির্ধারণ অনুযায়ী নির্দিষ্ট অংশ নির্দিষ্ট খাতে ব্যয়কেই জাকাত বলে। এটি অন্যতম ফরজ ইবাদত। জাকাত আদায়ের মাধ্যমে ইমানের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। জাকাত হলো ইসলামের একমাত্র ফরজ আর্থিক ইবাদত। এটি মানুষের অভাব-অনটন নির্মূল করে এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করে।
নিসাব	নিসাব অর্থ নির্ধারিত পরিমাণ। জাকাত ফরজ হওয়ার জন্য সম্পদের নির্ধারিত পরিমাণকে নিসাব বলে। সারাবছর জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের পর বছর শেষে যার হাতে নিসাব পরিমাণ সম্পদ উদ্বৃত্ত থাকে তাকে বলা হয় সাহিবে নিসাব বা নিসাবের মালিক। আর সাহিবে নিসাবের ওপরই জাকাত ফরজ। নিসাবের পরিমাণ হলো- সোনা কমপক্ষে সাড়ে সাত তোলা অথবা রূপা কমপক্ষে সাড়ে বায়ান্ন তোলা অথবা ঐ মূল্যের অর্থ বা সম্পদ।
সাওম	সাওম আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হলো- বিরত থাকা। সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় নিয়তের সাথে পানাহার ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি থেকে বিরত থাকা। সাওমের মাধ্যমে মানুষের মনে তাকওয়া ও মহান আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেক নারী ও পুরুষের উপর রমজানে এক মাস সাওম পালন করা ফরজ।
হজ	হজ এর আভিধানিক অর্থ হলো সংকল্প করা, ইচ্ছা করা। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে জিলহজ মাসের নির্ধারিত দিনসমূহে নির্ধারিত পদ্ধতিতে বাইতুল্লাহ (মহান আল্লাহর ঘর) ও সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহ জিয়ারত করাকে হজ বলে। হজ ঐ সমস্ত ধনী-মুসলমানের উপর ফরজ যাদের পবিত্র মক্কায় যাতায়াত ও হজের কাজ সম্পাদন করার মতো আর্থিক ও দৈহিক সামর্থ্য রয়েছে।

সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

ক. জ্ঞানমূলক

■ ইবাদতের পরিচয়

প্রশ্ন-১. 'ইবাদত' (عِبَادَةٌ) অর্থ কী? *[ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো. '২৫, রা. বো., দি. বো., চ. বো. সি. বো., য. বো., ব. বো.'২২]*

উত্তর: 'ইবাদত' (عِبَادَةٌ) অর্থ হলো— দাসত্ব করা, গোলামি করা বা আনুগত্য করা।

প্রশ্ন-২. ইবাদত কী? *[দি. বো., সি. বো., ব. বো. '২৫; সকল বোর্ড-২০১৮]*

উত্তর: মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাঁর ও তাঁর রাসুল (সা.)-এর নির্দেশিত পথে যেকোনো কাজই ইবাদত।

প্রশ্ন-৩. ইবাদতের মূল লক্ষ্য কী? *[দি. বো., সি. বো., ব. বো. ২০২৫]*

উত্তর: ইবাদতের মূল লক্ষ্য মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন।

প্রশ্ন-৪. মহান আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত অধিকারকে কী বলে?

উত্তর: মহান আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত অধিকারকে হাক্কুল্লাহ বলে।

প্রশ্ন-৫. হাক্কুল ইবাদ কী?

উত্তর: বান্দার প্রতি বান্দার যে হক রয়েছে তাই হাক্কুল ইবাদ।

প্রশ্ন-৬. মৌলিক ইবাদত কী? *[সকল বোর্ড-২০১৭]*

উত্তর: যে ইবাদতের ওপর ইসলামের মূল কাঠামো দাঁড়িয়ে থাকবে তাই মৌলিক ইবাদত।

প্রশ্ন-৭. এক মুসলিমের ওপর অপর মুসলিমের অধিকার কয়টি?

উত্তর: এক মুসলিমের ওপর অপর মুসলিমের অধিকার ৬টি।

■ সালাত

প্রশ্ন-৮. সালাত শব্দের অর্থ কী? *[ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো. '২৫; ঢা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., ব. বো. '১৯]*

উত্তর: সালাত শব্দের অর্থ দোয়া, ইসতেগফার, রহমত ও তাসবিহ।

প্রশ্ন-৯. কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম কীসের হিসাব নেওয়া হবে?

উত্তর: কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম সালাতের হিসাব নেওয়া হবে।

প্রশ্ন-১০. নিয়মিত সালাত আদায়ের ফলে কীসের সমাবেশ ঘটবে?

উত্তর: নিয়মিত সালাত আদায় করলে মানুষের মাঝে মানবীয় গুণগুলোর সমাবেশ ঘটবে।

■ জাকাত

প্রশ্ন-১১. জাকাত শব্দের অর্থ কী? *[ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো. '২৫]*

উত্তর: জাকাত শব্দের অর্থ পবিত্রকরণ বা বৃদ্ধিকরণ।

প্রশ্ন-১২. ইসলামি অর্থব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় আয়ের প্রধান উৎস কী?

উত্তর: ইসলামি অর্থব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় আয়ের প্রধান উৎস জাকাত।

প্রশ্ন-১৩. কোন ইবাদতের মাধ্যমে মানুষের সম্পদ পবিত্র হয়?

উত্তর: জাকাতের মাধ্যমে মানুষের সম্পদ পবিত্র হয়।

প্রশ্ন-১৪. জাকাত কার ওপর ফরজ?

উত্তর: প্রত্যেক নিসাবধারী প্রাপ্তবয়স্ক ও স্বাধীন মুসলিম ব্যক্তির ওপর জাকাত ফরজ।

প্রশ্ন-১৫. জাকাতের নিসাব কী? *[রা বো., দি. বো., কু. বো., সি. বো., য. বো. '১৭; রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. '১৮]*

উত্তর: জাকাত ফরজ হওয়ার জন্য সম্পদের নির্ধারিত পরিমাণকে জাকাতের নিসাব বলে।

প্রশ্ন-১৬. অসম অর্থবণ্টন রোধ করতে মহান আল্লাহ কোন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন?

উত্তর: জাকাত ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন।

প্রশ্ন-১৭. হযরত আবু বকর (রা.) খলিফা হওয়ার প্রথমদিকেই ইসলাম কবুলকারী আরবের এক গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন কেন?

উত্তর: জাকাত দিতে অস্বীকার করায় আবু বকর (রা.) আরবের ঐ গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

প্রশ্ন-১৮. ইসলামে সুদের বিধান কী?

উত্তর: ইসলামে সুদ সম্পূর্ণ হারাম বা নিষিদ্ধ।

■ সাওম

প্রশ্ন-১৯. সাওম অর্থ কী? *[ঢা. বো., ম. বো., কু. বো. '২২; ঢা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., ব. বো. '১৯]*

উত্তর: সাওম অর্থ বিরত থাকা।

প্রশ্ন-২০. সাওম কাকে বলে? *[ঢা. বো., ম. বো., কু. বো. '২২]*

উত্তর: সুবহি সাদিক থেকে মাগরিব পর্যন্ত খাদ্যগ্রহণ ও যৌনাচার থেকে নিয়তের সাথে বিরত থাকার নাম সাওম।

প্রশ্ন-২১. 'রোজাদারের জন্য দুটি আনন্দ'— আনন্দ দুটির নাম লেখো। *[রা. বো., দি. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. '২২]*

উত্তর: আনন্দ দুটির নাম হলো— i. একটি আনন্দ ইফতারের সময়, ii. অপরটি তার রবের সাথে সাক্ষাতের সময়।

প্রশ্ন-২২. হযরত মুহাম্মাদ (সা.) সাওম এবং ধৈর্য সম্পর্কে কী বলেছেন?

উত্তর: রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন— রমজান হলো ধৈর্যের মাস এবং ধৈর্যের বিনিময় হচ্ছে জান্নাত।

প্রশ্ন-২৩. 'রাইয়্যান' কী? **উত্তর:** জান্নাতের দ্বার।

■ হজ

প্রশ্ন-২৪. 'হজ' শব্দের অর্থ কী? *[ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. '২৫]*

উত্তর: 'হজ' শব্দের অর্থ— ইচ্ছা বা অভিপ্রায় পোষণ, আগ্রহ ব্যক্ত করা।

প্রশ্ন-২৫. হজ কী? *[রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. '১৮]*

উত্তর: মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে জিলহজ মাসের নির্ধারিত দিনসমূহে নির্ধারিত নিয়মে পবিত্র কাবাঘর প্রদক্ষিণ করাকে হজ বলে।

প্রশ্ন-২৬. হজ ফরজ হওয়ার বিষয়ে আল্লাহ তাআলা কী বলেছেন?

উত্তর: মানুষদের মধ্যে যার সেখানে (মহান আল্লাহর ঘরে) যাওয়ার সামর্থ্য আছে, মহান আল্লাহর (সন্তুষ্টির) উদ্দেশ্যে ঐ ঘরের (কাবা) হজ করা তার জন্য অবশ্য কর্তব্য। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৯৭)

খ. অনুধাবনমূলক

প্রশ্ন-১. ইবাদত বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: ইবাদত বলতে মহান আল্লাহ যা করতে নির্দেশ দিয়েছেন তা করা এবং যা করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকাকে বোঝায়।

ইবাদত শব্দের- অর্থ দাসত্ব করা, গোলামি করা, আনুগত্য করা, নিঃশর্তভাবে কারো আদেশ নিষেধ মেনে চলা। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই হলো ইবাদতের একমাত্র লক্ষ্য। সেজন্য মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর নির্দেশিত যেকোনো উত্তম কাজই ইবাদত। যেটি মহান আল্লাহ ও রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশিত পথে জীবনযাপন করাটা ব্যাপক বিবেচনায় ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন-২. 'মৌলিক ইবাদত' বলতে কী বোঝায়?

[রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. '১৮]

উত্তর: যেসব ইবাদতের ওপর ইসলামের মূল কাঠামো দাঁড়িয়ে রয়েছে তাই মৌলিক ইবাদত।

মহানবি (সা.) কালিমা তায়্যিবাসহ ইসলামের মৌলিক ইবাদত হিসেবে পাঁচ রকমের ইবাদতের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন— 'ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সাক্ষ্য দেওয়া যে, মহান আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রাসুল, সালাত কায়েম করা, জাকাত আদায় করা, হজ করা ও রমজানে রোজা পালন করা'। এ পাঁচটি ইবাদতের মধ্যে প্রথমটি আকিদাগত বিষয়। বাকি চারটি হলো আনুষ্ঠানিক ইবাদত। আর মৌলিক ইবাদত বলতে সাধারণত এ চারটি ইবাদতকেই বোঝায়।

প্রশ্ন-৩. 'ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত'—ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: ইসলামের স্তম্ভ পাঁচটি।

ইসলামকে যদি একটি তাঁবু ধরা হয় তাহলে এটি পাঁচটি খুঁটির উপর প্রতিষ্ঠিত। এগুলো হলো মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, হজ পালন করা এবং রমজানের সাওম পালন করা। তাঁবুতে যেমন প্রতিটি খুঁটিই গুরুত্বপূর্ণ তেমনি ইসলামের এ পাঁচটি খুঁটি বা স্তম্ভই সমান গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন-৪. কীভাবে প্রকৃত মুমিন হওয়া যায়?

উত্তর: মহান আল্লাহর প্রতি ইমান এনে তাঁর দেওয়া বিধান পালন করার মাধ্যমে প্রকৃত মুমিন হওয়া যায়।

মুমিন হলো মহান আল্লাহর সবচেয়ে পছন্দনীয় ব্যক্তি। যারা মহান আল্লাহর হুকুম মেনে সঠিকভাবে নামাজ, রোজা, হজ ও জাকাত আদায় করে এবং কুফরি কাজে লিপ্ত হয় না, মহান আল্লাহ তাদের অধিক পছন্দ করেন। এ ইবাদতগুলো পালন করে মহান আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ্যের মাধ্যমে মুমিন হওয়া যায়।

প্রশ্ন-৫. "তোমরা রুকুকারীদের সাথে রুকু করো"— আয়াতটি ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: আল্লাহ তাআলার বাণী, "তোমরা রুকুকারীদের সাথে রুকু কর।"

উক্ত আয়াতাংশে আল্লাহ তাআলা সম্মিলিতভাবে নামাজ আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা, রুকুকারীদের সাথে নামাজ পড়তে হলে একাকী তা সম্ভব নয়। প্রয়োজন জামায়াত বন্ধ সালাত ও নামাজি মানুষের সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। তাছাড়া এখানে 'রুকু'র কথা উল্লেখ করে উম্মতে মুহাম্মাদির সালাতকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করা হয়েছে। কেননা বনি ইসরাইলদের সালাতে রুকু ছিল না।

প্রশ্ন-৬. 'সালাত মুমিনের জন্য মিরাজ স্বরূপ'— বুঝিয়ে লেখো।

[সকল বোর্ড ২০২৫; রা. বো., দি. বো., চ. বো. সি. বো., য. বো., ব. বো. '২২; রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. '১৮]

উত্তর: আলোচ্য হাদিসাংশে সালাত আদায়ের তাৎপর্য বর্ণিত হয়েছে।

নির্দিষ্ট আহকাম-আরকানের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করার একটি মাধ্যম হলো সালাত। সালাতের মাধ্যমে বান্দা ও মহান আল্লাহর সাথে বান্দার যোগসূত্র স্থাপিত হয়। আল্লাহ তাআলা নামাজে বান্দার প্রতিটি কথার উত্তর দেন। মহানবি (সা.) মিরাজ লাভ করেছিলেন এটা তাঁর অন্যতম মুজিজা। মিরাজ লাভের প্রতি সাহাবিদের আকাঙ্ক্ষা দেখে মহানবি (সা.) নামাজকেই তাদের মিরাজ স্বরূপ বলেছেন। মহানবি (সা.) প্রত্যক্ষভাবে যেমন মহান আল্লাহর সান্নিধ্য বা মিরাজ লাভ করেছিলেন, বান্দা পরোক্ষভাবে নামাজের মাধ্যমে তা পেতে পারে।

প্রশ্ন-৭. 'ইকামাতুস সালাত' বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: সমাজে সালাত প্রতিষ্ঠা করাই হলো— 'ইকামাতুস সালাত।'

পবিত্র কুরআন হাদিসে অসংখ্য-অগণিত স্থানে নামাজ বা সালাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন— أَقِيمُوا الصَّلٰوةَ অর্থ: 'তোমরা সালাত কায়েম করো' (সুর আল-মুজ্জাম্মিল, আয়াত: ২০)।

এখানে সালাত কায়েম বলতে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সালাতের প্রচলন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অথবা 'ইকামতে সালাত' বলতে জামায়াতের সহিত সালাত আদায় করার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আমাদের উচিৎ সালাতকে যথাযথভাবে আদায় করা।

প্রশ্ন-৮. মহান আল্লাহর বান্দা ও কুফরের মধ্যে ব্যবধান হচ্ছে সালাত— বুঝিয়ে লেখো।

উত্তর: সালাত আদায় অনুসারে মুসলিম ও কাফির চেনা যায়।

মুসলমান ব্যক্তি মহান আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলে এবং তার আনুগত্য প্রকাশের জন্য সালাত আদায় করে। অপরদিকে কাফির ব্যক্তি বিনা কারণে সালাত আদায় থেকে বিরত থাকে। এতে মুমিন বান্দা ও কাফিরকে সহজে আলাদা করা যায়।

প্রশ্ন-৯. "জাকাত সম্পদের প্রবৃদ্ধি ঘটায়"— বুঝিয়ে লেখো।

[ঢা. বো., চ. বো., ব. বো. '১৭]

উত্তর: জাকাত কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে সম্পদের প্রবৃদ্ধি ঘটায়।

জাকাতের একটি অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া। জাকাত সম্পদ পুঞ্জিভূত না রেখে তাতে গতিশীলতা সৃষ্টি করে। জাকাতের অর্থ মানুষের অভাব-অনটন ও দারিদ্র্য নির্মূলে ভূমিকা রাখে। দরিদ্ররা জাকাতের অর্থ সঠিক ব্যবস্থাপনা বা উৎপাদন কাজে ব্যয় করে। ফলে সম্পদের গতিশীলতা সৃষ্টি হয় এবং সম্পদ বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে জাকাত প্রদানকারীদের ওপর মহান আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে তাদের সম্পদের পরিমাণ বাড়িয়ে দেন। অর্থাৎ জাকাত সম্পদের প্রবৃদ্ধি ঘটায়।

প্রশ্ন-১০. জাকাত ইসলামের সেতুবন্ধন— ব্যাখ্যা করো।

[সকল বোর্ড ২০২৫; রা. বো., দি. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. '২২]

উত্তর: জাকাত ধনী ও গরিবের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করে।

ধনীদের প্রদেয় অর্থ তাদের জন্য ইবাদতস্বরূপ। আবার এ অর্থনৈতিক ইবাদত রাষ্ট্রের অর্থনীতির ভিতকে শক্তিশালী করে। এতে গরিবদের অভাব কিছুটা দূর হয় এবং সমাজে শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলামি রাষ্ট্রে জাকাতভিত্তিক কোষাগার তৈরি হয়। অতি গরিবদের এ কোষাগার থেকে অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়। এতে রাষ্ট্রে সকল মানুষের অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত হয়। যেহেতু এ ধরনের ইবাদতের ফলে অন্যান্য গরিব মানুষ অর্থনৈতিক নিরাপত্তা পায় তাই এটি সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে। জাকাত দেওয়ার মাধ্যমে ধনীদের সাথে গরিবদের সুসম্পর্ক গড়ে উঠে। পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা তৈরি হয়।

প্রশ্ন-১১. জাকাতের নিসাব কী? বুঝিয়ে লেখো।

[ঢা. বো., ম. বো., কু. বো. '২২]

উত্তর: নিসাব আরবি শব্দ। এর অর্থ নির্ধারিত পরিমাণ। শরিয়তের পরিভাষায়, জাকাত ফরজ হওয়ার জন্য সম্পদের নির্ধারিত পরিমাণকে নিসাব বলে। সারা বছর জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের পর বছর শেষে যার হাতে নিসাব পরিমাণ সম্পদ উদ্বৃত্ত থাকে তাকে বলা হয় সাহিবে নিসাব বা নিসাবের মালিক। আর সাহিবে নিসাবের ওপরই জাকাত ফরজ। নিসাবের পরিমাণ হলো— সোনা কমপক্ষে সাড়ে সাত তোলা অথবা রুপা কমপক্ষে সাড়ে বায়ান্ন তোলা অথবা ঐ মূল্যের অর্থ বা সম্পদ।

প্রশ্ন-১২. জাকাত আদায়ে কীভাবে তাকওয়া সৃষ্টি করে? ব্যাখ্যা দাও।

উত্তর: জাকাত আদায়ে বান্দার অন্তরে তাকওয়া সৃষ্টি হয়।

ধন-সম্পদ মানুষের অত্যন্ত প্রিয় বিষয়। এটি তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সামাজিক প্রভাব প্রতিপত্তির মাধ্যম, কিন্তু মহান আল্লাহর প্রতি তীব্র ভালোবাসা ও গভীর প্রেমের কারণে বাহ্যিকভাবে কোনো লাভ ও বিনিময় ছাড়াই বান্দা তার সম্পদ থেকে দান করে। তাছাড়া সে এটাও জানে যে, সম্পদের জাকাত না দিলে ইসলামের মৌলিক ইবাদত ও ফরজ আদায় হবে না এবং এর জন্য পরকালে মহান আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন— মহান আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার ভিত্তিতে তারা ধনসম্পদ দান করে (সূরা বাকারা: ১৭৭)। আর এজন্য বলা হয়, জাকাতের মাধ্যমে বান্দার অন্তরে তাকওয়া সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন-১৩. জাকাতের অর্থনৈতিক ভূমিকা কী? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: অর্থনৈতিক সচ্ছলতা লাভের অন্যতম একটি ব্যবস্থা 'জাকাত'।

ইসলাম সম্পদ পুঞ্জিভূত করে রাখাকে নিষেধ করেছে। সমাজের কতিপয় লোকের হাতে সম্পদের পাহাড় রচিত হবে আর বেশিরভাগ মানুষ খেয়ে, না খেয়ে, অনাহারী, অর্ধাহারী হয়ে থাকবে, এমন হওয়া উচিৎ না। সম্পদের সুষ্ঠু বিন্যাসকরণে জাকাত একটি অন্যতম মাধ্যম। জাকাত সমাজের সব শ্রেণির মানুষের কাছে অর্থের প্রবাহ নিশ্চিত করতে চেষ্টা করে। ধনী শ্রেণির জাকাত প্রদানের ফলে দরিদ্র শ্রেণির মানুষগুলো সচ্ছলতার মুখ দেখে। তাছাড়া একজনের হাত থেকে অপরজনের হাতে অর্থের প্রবাহের ফলে সমাজের অর্থব্যবস্থা সচল থাকে।

প্রশ্ন-১৪. 'সাওম ঢাল স্বরূপ'— ব্যাখ্যা করো।

[ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো. '২৫]

উত্তর: সাওম বা রোজা পালনের মাধ্যমে মানুষ শয়তানের কুমন্ত্রণা, জৈবিক ও পাশবিক কামনা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে।

সাওম বা রোজা পালনের সময় ব্যক্তি পানাহার, যৌনাচারসহ সব অন্যায় থেকে বিরত থাকে। অন্যায় কাজের মাধ্যমে সাওমের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে বলে সে কোনো অন্যায় কাজে লিপ্ত হয় না। এমনকি তার হারাম ভোগ-সম্ভোগ ও অন্যায় কাজের চিন্তা করার অবকাশ থাকে না। এসব প্রেক্ষিতেই সাওম বা রোজাকে ঢালস্বরূপ ইবাদত বলা হয়।

প্রশ্ন-১৫. 'হাজিদের সম্মান ও মর্যাদা অনেক বেশি'— বিষয়টি বুঝিয়ে লেখো।

উত্তর: ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে হজ পালনকারীদের সম্মান ও মর্যাদা অনেক বেশি।

হজ পালনকারীকে হাজি বলা হয়। হজ পালন করলে গুনাহ মাফ হয়ে যায়। হজ পালনকারী নিষ্পাপ শিশুর ন্যায় হয়ে যায়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি হজ পালন করে সে যেন নবজাত শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়ে যায়। অন্যত্র বলেছেন, 'মাকবুল হজের বিনিময় জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়।'

প্রশ্ন-১৬. "হজ বিশ্বভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করে।"— ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: হজ পৃথিবীর সব অঞ্চল, বর্ণ ও ভাষার মুসলিমদের সম্মিলিত করে বিশ্বভ্রাতৃত্ব তৈরি করে।

মুসলিমরা ইসলামী আদর্শের সুমহান ভ্রাতৃত্বে সম্পৃক্ত। পৃথিবীর সব সম্পর্কের ওপর এ আদর্শিক সম্পর্কের স্থান ও মর্যাদা রয়েছে। হজ মুসলিম জাতির এই আদর্শিক ভ্রাতৃত্বে নতুন মাত্রা যুক্ত করে। ভাবগাম্ভীর ও আন্তরিক পরিবেশে দীর্ঘসময় একত্রে অবস্থানের ফলে তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে অধিকতর সুন্দর ও সুদৃঢ় ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক। আর এজন্যই বলা হয়, হজ বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করে।

? অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. হাক্কুল্লাহ অর্থ কী?
ক. বান্দার হক খ. মহান আল্লাহর হক
গ. প্রতিবেশীর হক ঘ. পিতামাতার হক

২. এক মুসলিমের ওপর অপর মুসলিমের কয়টি হক রয়েছে?
ক. ৪টি খ. ৬টি
গ. ৮টি ঘ. ১০টি

৩. কোন ইবাদতের সাথে মানুষের শরীর ও আত্মার সংশ্লিষ্টতা রয়েছে?
ক. জাকাত ও সাওম খ. সালাত ও সাওম
গ. সালাত ও জাকাত ঘ. হজ ও সাওম

৪. কোন ইবাদতের অনুপস্থিতি মানুষকে কাফির বানায়?
ক. হজ খ. সাওম
গ. জাকাত ঘ. সালাত

৫. কোন অর্থে জাকাতকে ইসলামের সেতুবন্ধন করা হয়েছে?
ক. পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধি
খ. ধনী-গরিবের মাঝে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা
গ. অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা
ঘ. সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করা

৬. কোন ইবাদত নিসাব পরিমাণ সম্পদের সাথে সম্পৃক্ত?
ক. সালাত খ. জাকাত
গ. হজ ঘ. সাওম

৭. জনাব শাহ আলম প্রতি বছর তার সম্পদের হিসাব করে সঠিকভাবে জাকাত আদায় করেন। এর মাধ্যমে তিনি ইসলামের কোন বিধানটি পালন করেছেন?
ক. ফরজ খ. ওয়াজিব
গ. সুন্নত ঘ. মানদুব

৮. সাওমের মূল লক্ষ্য কী?
ক. তাকওয়া অর্জন খ. আনুগত্য করা
গ. নেকি অর্জন ঘ. উপবাস করা

৯. কোন ইবাদত লোভ লালসা থেকে মুক্ত রাখে?
ক. সালাত খ. জাকাত
গ. সাওম ঘ. হজ

১০. বান্দার জন্য মহান আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে—
ক. সালাত ও সাওম খ. সাওম ও কুরআন
গ. সালাত ও জাকাত ঘ. জাকাত ও হজ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন

১১. মৌলিক ইবাদতগুলোর মাধ্যমে—
i. নৈতিক চরিত্র গঠিত হয় ii. ধনী হওয়া যায়
iii. মহান আল্লাহর প্রেম অর্জিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১২. বান্দা যদি সঠিক নিয়ম-কানুন মেনে সাওম পালন করেন তাহলে তিনি লাভ করবেন—
i. মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ii. অন্যায় থেকে সুরক্ষা
iii. দয়া, ক্ষমা ও মুক্তি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৩ ও ১৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
আসাদ পাবনা থেকে ঢাকায় আসে পড়াশোনা করার জন্য। পথে ছিনতাইকারীদের হাতে সর্বস্ব হারায়। তখন সে ঢাকায় বসবাসরত আজমল সাহেবের কাছে যায়, তিনি আসাদকে কিছু টাকা দিয়ে সাহায্য করেন।

১৩. আজমল সাহেবের কাজটিকে কী বলা হয়?
ক. হাক্কুলাহ খ. হাক্কুল ইবাদ
গ. হাক্কুল ওয়ালিদাইন ঘ. হাক্কুল ইয়াতিম

১৪. আজমল সাহেবের এ কাজের ফলে—
i. সমাজে সম্মান বৃদ্ধি পাবে
ii. ধনসম্পদ বৃদ্ধি পাবে
iii. প্রার্থীর হক আদায় হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

খ. বোর্ড পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৫. ইবাদতের মূল লক্ষ্য কী? *[সকল বোর্ড ২০২২; ২০২১]*
ক. জান্নাত পাওয়া
খ. জাহান্নাম থেকে মুক্তি
গ. মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন
ঘ. সওয়াব অর্জন

১৬. প্রধানত ইবাদত কত প্রকার? *[সকল বোর্ড ২০২৫]*
ক. দুই খ. তিন
গ. চার ঘ. পাঁচ

১৭. কোন মৌলিক ইবাদতটি মানুষকে নেতৃত্ব শেখায়? *[সকল বোর্ড ২০২৫]*
ক. সালাত খ. জাকাত
গ. সাওম ঘ. হজ

১৮. কোন ইবাদতে বিনয় ও আনুগত্যের পূর্ণ প্রকাশ ঘটে? *[সকল বোর্ড ২০২২; ২০২১; ২০১৮]*
ক. সালাত খ. জাকাত
গ. সাওম ঘ. হজ

১৯. কোনটি বান্দার হক? *[সকল বোর্ড ২০২১]*
ক. সালাত আদায় করা
খ. রমজান মাসে রোজা রাখা
গ. পিতা-মাতার খেদমত করা
ঘ. হজব্রত পালন করা

২০. ইসলামের সেতুবন্ধন কোনটি? *[সকল বোর্ড ২০২৩]*
ক. সালাত খ. সাওম
গ. জাকাত ঘ. হজ

২১. সাওম পালনের ফলে— *[সকল বোর্ড ২০১৯]*
ক. নেতৃত্বের গুণাবলি সৃষ্টি হয়
খ. বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়
গ. সহানুভূতি ও সহমর্মিতা সৃষ্টি হয়
ঘ. ধনী-গরিব বৈষম্য দূর হয়

২২. দৈহিক ও আর্থিক ইবাদত কোনটি? *[সকল বোর্ড ২০২২; ২০১৭]*
ক. সালাত খ. জাকাত
গ. সিয়াম ঘ. হজ

২৩. কোন ইবাদত সারা জীবনে একবার ফরজ? *[সকল বোর্ড ২০২৫]*
ক. সালাত খ. সাওম
গ. জাকাত ঘ. হজ

২৪. মহান আল্লাহর হক আদায়ে আমাদের করণীয়— *[সকল বোর্ড ২০২১]*
i. সামগ্রিক জীবনে মহান আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্ব স্বীকার করা
ii. মহান আল্লাহ প্রদত্ত সকল প্রকার বিধি-নিষেধ মেনে চলা
iii. সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণকারী হয়ে থাকা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. i ও ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২৫. জাকাত প্রদানে সম্পদ—
i. বৃদ্ধি পায়
ii. হ্রাস পায়
iii. পবিত্র হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i,ii, ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৬ ও ২৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
আব্বাস মহান আল্লাহর হুকুম পালনার্থে দিনের বেলা পানাহার থেকে বিরত আছেন। আবুজর প্রতিবছর সম্পদের হিসাব করে শতকরা আড়াই ভাগ অসহায় দরিদ্রসহ নির্দিষ্ট আটটি খাতে ব্যয় করেন। *[সকল বোর্ড ২০২২]*

২৬. আব্বাসের কার্যক্রমটি কোন ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত?
ক. সালাত খ. সাওম
গ. হজ ঘ. যাকাত

২৭. আবুজরের কার্যক্রমের ফলে—
i. নতুন সমস্যার সমাধান হবে
ii. দারিদ্র বিমোচন হবে
iii. সামাজিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i,ii, ও iii

উত্তরমালা

১	খ	২	খ	৩	খ	৪	ক	৫	খ	৬	খ	৭	ক	৮	ক	৯	খ	১০	খ	১১	খ	১২	ঘ
১৩	খ	১৪	খ	১৫	গ	১৬	ক	১৭	ক	১৮	ক	১৯	গ	২০	গ	২১	গ	২২	ঘ	২৩	ঘ	২৪	ঘ
২৫	খ	২৬	খ	২৭	গ																		

গ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. সংক্ষেপে মৌলিক ইবাদতের পরিচয় দাও।
২. হাক্কুল্লাহর পরিচয় দাও।
৩. এক মুসলিমের ওপর অপর মুসলিমের অধিকারগুলো লেখো।
৪. সালাত শব্দটির চারটি বিশেষ অর্থ লেখো।
৫. সালাতের ধর্মীয় শিক্ষাসমূহ সংক্ষেপে লেখো।
৬. জাকাতের পরিচয় দাও।
৭. জাকাত বন্টনের খাতগুলো লেখো।
৮. সাওমের আধ্যাত্মিক শিক্ষা সংক্ষেপে লেখো।
৯. হজের পরিচয় দাও।
১০. হজ ফরজ হওয়ার শর্তগুলো লেখো।

ঘ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. মহানবি (সা.) মিরাজ রজনীতে মহান আল্লাহর দিদার লাভ করেন এবং উম্মতের জন্য প্রতিদিন পাঁচবার আদায়যোগ্য একটি ইবাদত নিয়ে আসেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন যে, একমাত্র ইবাদত করার জন্যই তিনি জিন এবং মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। সামাজিক, মানসিক, ধর্মীয় ও আরো অনেক গুরুত্ব রয়েছে এই ইবাদত পালনে।
[রা. বো., দি. বো., চ. বো. সি. বো., য. বো., ব. বো. ২২]
ক. عِبَادَةٌ (ইবাদাতুন) অর্থ কী?
খ. 'সালাত মুমিনের জন্য মিরাজ স্বরূপ'—বুঝিয়ে লেখো।
গ. 'নিশ্চয় সালাত অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে'—পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করো।
ঘ. সালাতের সামাজিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো।

২. আরিফ ও তুহিন দুই বন্ধু। তারা ইসলামের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা করছিল। আরিফ বলল, ইসলামে মানুষের মাঝে সহানুভূতি, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টির জন্য বিশেষ একটি ইবাদত আছে, যা পাপ-পূণ্যের মাঝে ঢাল স্বরূপ। তুহিন বলল, বন্ধু! মানুষের মাঝে আর্থিক সমতা ও ভারসাম্য আনার জন্যও একটি ইবাদত আছে, যাকে ইসলামের 'সেতু বন্ধন' বলা হয়েছে। *[রা. বো., দি. বো., য. বো., ২৩; ঢা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., ব. বো. ১৯]*

ক. 'সালাত' শব্দের অর্থ কী?
খ. "তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল বা রক্ষক।"— ব্যাখ্যা করো।
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত আরিফ কোন ইবাদতের প্রতি ইঙ্গিত করেছে? তা ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত তুহিন যে ইবাদতের কথা বলেছে তার অর্থনৈতিক প্রভাব বিশ্লেষণ করো।

৩. রিফা একটি নির্দিষ্ট মাসে সুবহি সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও অন্যান্য কাজ থেকে বিরত থাকে। আড়ালে-আবডালে গিয়েও কোনো কিছু খায় না। তার বন্ধু নিজা বছর শেষে সম্পদের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশ নির্ধারিত ৮টি খাতে খরচ করে। *[ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., দি. বো. '২১]*
ক. 'হজ'-এর আক্ষরিক অর্থ কী?
খ. "ইমানের নিদর্শন হলো সালাত"— বুঝিয়ে লেখো।
গ. রিফা যে ইবাদত পালন করে তার পরিচয় ও সামাজিক গুরুত্ব বর্ণনা করো।
ঘ. নিজার কর্মকাণ্ডে কোন ইবাদতের পরিচয় ফুটে উঠেছে? দারিদ্র্য বিমোচনে উক্ত ইবাদতের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো।

৪. জনাব আরমান প্রচুর ধনসম্পদের মালিক। এত সম্পদ থাকার পরও তিনি জাকাত দিতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন— জাকাত হলো এক ধরনের আয়কর, আর আমি প্রতি বছর সরকারকে আয়কর দিয়ে থাকি। এজন্য আলাদাভাবে জাকাত দেয়ার প্রয়োজন নেই। এ কথা শুনে জনাব ইমরান বললেন, জাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে হযরত আবু বকর (রা.) যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন।
ক. কোন বিধানটি ইসলামের সেতুবন্ধন?
খ. সালাতের সামাজিক শিক্ষা কী? ব্যাখ্যা দাও।
গ. পবিত্র কুরআনের আলোকে জনাব আরমানের এরূপ আচরণ কাদের আচরণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা দাও।
ঘ. জনাব ইমরানের বক্তব্যের আলোকে জনাব আরমানের এরূপ কাজের পরিণতি বিশ্লেষণ করো।

৫. শিহাব একটি নির্দিষ্ট মাসে ভোর হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত পানাহার ও যৌন সম্ভোগ থেকে বিরত থাকেন। এ মাসে গরিব অসহায় লোকদের মাঝে অনেক দান-খয়রাত করেন। মাগরিবের সময় মানুষকে খাবার দেন। একটি বিষয়ে ভিন্নমত পোষণকারী তার সাথে তর্কে লিপ্ত হলে শিহাব বলেন, আমি একটি বিশেষ ইবাদত পালন করছি তাই বেশি কথা বলতে পারবনা। *[দি. বো., সি. বো., ব. বো. ২০২৫]*
ক. ইবাদতের মূল লক্ষ্য কী?
খ. 'ইমানের নিদর্শন সালাত'— বুঝিয়ে লেখো।
গ. শিহাব কর্তৃক পালনকৃত ইবাদতের ধর্মীয় গুরুত্ব বর্ণনা করো।
ঘ. আত্মশুদ্ধি ও সংযম কোন ইবাদতের মাধ্যমে অর্জিত হয়? তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

৬. রহিম সাহেব দূরদেশে গিয়ে একটি ইবাদত পালনের জন্য অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করেন। কিন্তু করোনা মহামারির কারণে দুইবছর সেই ইবাদতটি সীমিত লোকজন পালন করার কারণে তিনি সেটা করতে পারেন নাই। তবে এবছর সরকার সেই ইবাদত পালনের জন্য অনুমতি দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে। *[রা. বো., দি. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. '২২]*
ক. 'রোজাদারের জন্য দুটি আনন্দ'— আনন্দ দুটির নাম লেখো।
খ. যাকাত ইসলামের সেতু বন্ধন— ব্যাখ্যা করো।
গ. উদ্দীপকে কোন ইবাদতের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. 'বিশ্বের সকল মুসলিমের সাথে যোগাযোগের মাধ্যম হলো এই ইবাদত'—পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মূল্যায়ন করো।

ঙ. সমন্বিত অধ্যায়ের সৃজনশীল প্রশ্ন

৭. **দৃশ্যপট-১ :** আল্লাহ তাআলা আমাদের আদি পিতা-মাতাকে সৃষ্টি করে সুখ-শান্তির উদ্যানে বসবাস করতে বলেন। কিন্তু তাদেরকে সুখময়স্থান থেকে বের করতে বিশেষ একজন খুবই তৎপর হয়ে ওঠে।
দৃশ্যপট-২ : ইসলামে এমন একটি বিধান রয়েছে, যা পবিত্র অবস্থায় সকল মুসলিমকে প্রতিদিন পাঁচ বার সম্পাদন করতে হয়। *[ঢা. বো., ম. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. '২৩]* ◀ ১ ও ৬ অধ্যায়ের সমন্বয়ে
ক. ذٰلِكَ الْكِتٰبُ (ইহা সেই কিতাব) বলতে কোন কিতাবকে বোঝানো হয়েছে?
খ. কীভাবে মুসলমানগণ পরস্পর ভাই ভাই? বুঝিয়ে লেখো।
গ. আদি পিতা-মাতাকে সুখময় স্থান থেকে বের করতে কে তৎপর হয়ে উঠেছিল? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উদ্দীপকে কোন ইবাদতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? এর গুরুত্ব ও শিক্ষা বিশ্লেষণ করো।

৮. আব্দুল হাই একজন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী। এবারের রমজান মাসে তিনি তার সমুদয় সম্পদের হিসাব করে শতকরা আড়াইভাগ এতিম মিসকিনদের দান করলেন। দানের সময় তিনি নিজের পরিচয় গোপন রাখলেন। এতে তার মনে একধরনের প্রশান্তি লাভ করলেন। অপরদিকে তার প্রতিবেশী রানা কথা বলার সময় মিথ্যা বলে, তার কাছে কারও গোপন কথা বললে প্রকাশ করে দেয়। তার কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির কথা বলে আবার অস্বীকার করে। *[ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো. ২০২৫]* ◀ ২ ও ৬ অধ্যায়ের সমন্বয়ে
ক. 'ইবাদত' অর্থ কী?
খ. সালাত আনুগত্য ও সময়ানুবর্তিতা শিক্ষা দেয়।— ব্যাখ্যা করো।
গ. আব্দুল হাইয়ের কার্যক্রমে কোন ইবাদত পালন ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত রানার কার্যক্রমের পরিণতি হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

৭

তাসাউফ

Tasawuf (Sufism)

প্রধান প্রধান শব্দ
- সুফি
- আহলে সুফফা
- শরিয়ত
- আত্মশুদ্ধি
- তরিকা
- ইলম
- ইবাদত

ইসলামের প্রতিটি বিধানের বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ দিক রয়েছে। ইসলামের বাহ্যিক দিক হচ্ছে শরিয়ত এবং অভ্যন্তরীণ দিক হচ্ছে তাসাউফ। তাসাউফ মূলত আত্মশুদ্ধি অর্জনের সোপান। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ককে আধ্যাত্মিক ধ্যান ও জ্ঞানের মাধ্যমে জানার প্রচেষ্টাকে তাসাউফ বলে। কুরআন মাজিদের বহুসংখ্যক আয়াতে মানুষকে আত্মশুদ্ধি অর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে, আত্মশুদ্ধিই সফলতার একমাত্র পথ। হাদিসেও আত্মশুদ্ধি অর্জনের প্রতি অত্যধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আত্মাকে পবিত্র, কলুষমুক্ত ও পরিশুদ্ধ রাখার মধ্যেই মানুষের সত্যিকারের কল্যাণ ও সাফল্য নিহিত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন—

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا

অর্থ: যে ব্যক্তি আত্মাকে পূত-পবিত্র রাখল, সে সাফল্য লাভ করল। আর যে ব্যক্তি আত্মাকে কলুষিত করল, সে ধ্বংস হয়ে গেল (সূরা আশ-শামস, আয়াত: ৯-১০)।

আধ্যাত্মিকতা অর্জনের প্রচেষ্টা শুরু হয় ইসলামের প্রথম যুগ থেকেই। এরপর ধীরে ধীরে বিভিন্ন দেশে ইলমে তাসাউফ ছড়িয়ে পড়ে। সব নবি-রাসুল দিনের বেলায় ইসলাম প্রচার করতেন এবং গভীর রাতে আল্লাহ তাআলার ইবাদতে নিমগ্ন হতেন। মহান আল্লাহর প্রেমে বিলীন হয়ে পরম প্রশান্তি লাভ করার চেষ্টা করতেন। আমাদের প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) হেরা পর্বতের গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন। তাঁর সাহাবিগণ (রা.) গভীর রাতে আল্লাহ তাআলার ইবাদত-বন্দেগিতে নিমগ্ন হয়ে তাঁর প্রেমাচ্ছাদনে ব্রতী হতেন। কয়েকজন সাহাবি (রা.) মসজিদের বারান্দায় ধ্যানমগ্ন

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে যা যা শিখব

- তাসাউফের পরিচয়, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ
- শরিয়ত ও তাসাউফের মধ্যে সম্পর্ক
- তাসাউফ-এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা
- ইসলামে বিশিষ্ট সুফিগণের (হাসান বসরি, আবদুল কাদির জিলানি, বাহাউদ্দিন নকশবন্দ, মুইনুদ্দিন চিশতি, শায়খ আহমদ সিরহিন্দি) জীবনাদর্শ এবং তাদের আদর্শের আলোকে নিজেদের জীবন গঠনে উদ্বুদ্ধ হতে
- নৈতিক, অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন পূত-পবিত্র জীবন গঠনে তাসাউফের ভূমিকা এবং বাস্তব জীবনে তা অনুশীলনে অনুপ্রাণিত হতে

পাঠ পরিকল্পনা	
পাঠ ১	তাসাউফের পরিচয় ও উদ্দেশ্য
পাঠ ২	তাসাউফের উৎপত্তি
পাঠ ৩	তাসাউফের ক্রমবিকাশ
পাঠ ৪	শরিয়ত ও তাসাউফের মধ্যে সম্পর্ক
পাঠ ৫	তাসাউফের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা
পাঠ ৬	আত্মাকে সুস্থ ও পবিত্র রাখার উপায়
পাঠ ৭	হযরত হাসান বসরি (রহ.) (২১-১১০ হি.)
পাঠ ৮	হযরত আব্দুল কাদির জিলানি (রহ.) এবং হযরত বাহাউদ্দিন নকশবন্দ (রহ.)
পাঠ ৯	হযরত মুইনুদ্দিন চিশতি (রহ.) এবং হযরত শায়খ আহমদ সিরহিন্দি (রহ.)
পাঠ ১০	নৈতিক, অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক মূল্যবোধ গঠনে তাসাউফের ভূমিকা

পাঠ ১ তাসাউফের পরিচয় ও উদ্দেশ্য
Definition and Objectives of Tasawuf

তাসাউফের পরিচিতি

মানুষের পরম সত্তাকে জানার আকাঙ্ক্ষা চির নতুন। এই জানার পথে কোনো বিরতি নাই। যুগে যুগে মানুষ আপনার অন্তরের অন্তস্তলে আপনার পরম প্রিয়জনকে, শ্রেয় ও প্রেয়কে খুঁজে বের করেছে এবং তার সাথে অন্তরের নিবিড় যোগসূত্র স্থাপন করেছেন। পরম সত্তাকে জানার এই প্রয়াস দর্শনের ইতিহাসে মরমিরাদ নামে পরিচিত।

মরমিবাদ মুসলিম দর্শনে অত-তাসাউফ বা সুফিবাদ নামে খ্যাত। সুফিবাদ ইসলাম ধর্মের 'বাতেনি' দিকের পরিচায়ক; শরিয়ত যেমন এর সামাজিক বিধি-বিধানের নির্দেশক। মুসলিম জাতির চিন্তাধারার অন্যান্য দিকের মতো সুফিবাদও কুরআন ও হাদিসের শিক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

ইসলাম মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনের সাথে, দুনিয়ার জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগের সাথে এবং শারীরিক ও আত্মিক জীবনযাত্রার সাথে একটি সুদৃঢ় সম্পর্ক তৈরি করে দিয়েছে। এর ফলে বাহ্যিকভাবে দেখা মানুষের সীমিত ও সংকীর্ণ এ জীবন এক মহাজীবনের সাথে যুক্ত হয়েছে। মিলে গেছে এক শাশ্বত অমর জীবনের সাথে। এর ফলে মানুষের জীবনের মূল্যবোধ অসীমলোকে উন্নীত হয়েছে। কেননা ইসলামে আখিরাতের যে জীবনের কথা বলা হয়েছে সে জীবন অনন্ত। সে জীবনের শুরু আছে, শেষ নেই। মানুষও সেই অন্তহীন জীবনে উপনীত হবে।

ইসলাম তাই কেবল নীতি বা বিশ্বাসসর্বস্ব ধর্ম নয় বরং ইসলাম হলো নীতি ও বিশ্বাসের মিলিত বাস্তবরূপ। প্রতিদিনের স্বাভাবিক জীবনযাপনে সে নীতি ও বিশ্বাস বাস্তবায়িত হয়। মানবজীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ, জীবনে অন্তর্নিহিত অমিত সম্ভাবনা বাস্তবায়নের ওপর নির্ভরশীল। ইসলাম সেই সম্ভাবনা বাস্তবায়নের পথ ও পদ্ধতি নির্দেশ করে। উপেক্ষা করে না জীবনের অবাস্তব অদৃশ্য দিক। বরং তা ভেতরের সাথে বাইরের, দেহের সাথে অন্তরের, দৃশ্যের সাথে অদৃশ্যের সর্বাধিক যৌক্তিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে। বাইরের জীবনের সমস্যাবলি যেমন মানুষের আত্মিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে, তেমনি মানুষের ভেতরের জীবনের সমস্যাও তার বাইরের জীবনকে প্রভাবিত করে। এ দু'রকম প্রভাবের ভিত্তিতে মানুষের নীতি, আদর্শ, চরিত্র ও আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়। ইসলাম এ বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিশ্লেষণ করেছে। এর আলোকে মানুষের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবনের সাথে তার সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক জীবনেরও পর্যালোচনা করেছে।

মানুষের জীবনের দুটি দিক। একটি বাহ্যিক আর অপরটি অদৃশ্য বা আত্মিক। ইসলাম মানুষের বাহ্যিক জীবনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় বিধান দিয়েছে। এর নাম শরিয়ত। একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা হিসেবে মানুষের অদৃশ্য আত্মিক দিকটি পরিচালনার জন্যও ইসলাম প্রয়োজনীয় বিধিবিধান এবং নীতি-আদর্শের দিক নির্দেশনা দিয়েছে। মানুষের বাহ্যিক কার্যক্রম চলবে ইসলামি হুকুমে আর তার অন্তর পরিচালিত হবে নিজের ইচ্ছায়– তা হতে পারে না। তাহলে ব্যক্তির নিজস্ব সত্তার মধ্যেই সংঘাত সৃষ্টি হবে। আর ইসলামের পরিপূর্ণতার বিষয়টিও সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হবে না। অথচ আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন—

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا۔

অর্থ: আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণ করলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত: ৩)।

সেজন্য মানুষের বাহ্যিক দিকের মতো তার অন্তর নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা, সংশোধন ও শুদ্ধকরণের জন্যও ইসলাম প্রয়োজনীয় বিধান দিয়েছে। এ বিধানাবলির সাধারণ ও প্রচলিত নামই 'তাসাউফ'। হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ইসলামের

জাহিরি বা বাহ্যিক শিক্ষা সব সাহাবিকেই দিয়েছেন। তাদেরকে অন্তর পবিত্র ও শুদ্ধ করার শিক্ষা দিয়েছেন। পরবর্তীতে হযরত আবু বকর (রা.) সূত্রে সালমান আল ফারসি (রা.) এবং হযরত আলি (রা.) সূত্রে হাসান আল বসরি (রা.) ইসলামি জীবনাচারের বাতেনি এ দিক সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেন। তাসাউফের নিগূঢ় তত্ত্ব অনুশীলনের জন্য তাই একজন পির বা শায়খের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে হয়। পির বা শায়খ তিনিই হতে পারেন, যিনি শরিয়ত ও তাসাউফের বিস্তারিত জ্ঞান রাখেন এবং সে অনুযায়ী আমল করেন। তাছাড়া যিনি নিজে একজন শায়েখের অধীনে তাসাউফ সাধনার সব পর্যায় অতিক্রম করেছেন। সর্বোপরি, যিনি তার শিক্ষার্থীদের প্রতি সহানুভূতিশীল। শায়খ তার শিষ্যকে শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রতি জোর দেন এবং একটি স্তর অতিক্রমের পরই কেবল পরবর্তী স্তরের প্রশিক্ষণ দেন। এভাবেই তাসাউফের শিক্ষা বিস্তৃত হয়।

তাসাউফের শাব্দিক সংজ্ঞা

তাসাউফ (تَصَوُّفٌ) শব্দটি মাসদার বা ক্রিয়ামূল। সাধারণত এটিকে صُوْفٌ (সুফ) মূলধাতু থেকে উদ্ভূত শব্দ মনে করা হয়। 'সুফ' অর্থ পশম বা Wool। কাজেই তাসাউফের শাব্দিক অর্থ হলো অভ্যস্থরূপে পশমি পোশাক পরিধান করা। যারা পশমি পোশাক পরিধান করেন তাদের বলা হয় সুফি। এটাকে তারা গ্রহণ করেছিলেন কৃচ্ছতাপূর্ণ অবিলাসী জীবনের প্রতীক হিসেবে। কিন্তু তাদের এ অভ্যাসই শুধু তাদেরকে সুফি হিসেবে পরিচিত করেনি। বরং তাদের উচ্চ স্তরের সাধনাই এক্ষেত্রে বেশি ভূমিকা পালন করেছে। এজন্য কোনো কোনো শব্দতত্ত্ববিদ বলেছেন, 'তাসাউফ' হচ্ছে একটি শব্দ সংক্ষেপ। এর প্রতিটি বর্ণ এক একটি স্বতন্ত্র ভাব বহন করে। যেমন 'তা' বর্ণ দিয়ে তাওয়াক্কুল (আল্লাহ তাআলার ওপর নির্ভরতা), তাওবা (কৃত পাপের জন্য অনুশোচনা), সোয়া দিয়ে সবর (ধৈর্য) সাফা (পবিত্রতা), 'ওয়া' দিয়ে ওয়াকফ (উৎসর্গ করা) এবং 'ফা' দিয়ে ফিকহ (দীনের গভীর জ্ঞান) ফিকির (চিন্তা গবেষণা) প্রভৃতি বিষয় বোঝানো হয়েছে। কাজেই যে ব্যক্তি নিরন্তর সাধনায় চিন্তা গবেষণার মাধ্যমে দীনের গভীর জ্ঞানলাভ করে, মহান আল্লাহর ওপর নির্ভরতা ও কৃত পাপের অনুশোচনা যাকে পবিত্র করে এবং ধৈর্য ধারণের শক্তি দেয়; সর্বোপরি, যে নিজের জীবন উৎসর্গ করে শুধুই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তাকে সুফি বলা যাবে। তার মধ্যে তাসাউফ বাস্তবরূপ পেয়েছে।

অবশ্য তাসাউফ শব্দটির উৎপত্তি সম্পর্কিত উল্লিখিত মতামত অধিকাংশের কাছে গৃহীত হলেও তা অবিসংবাদিত নয়। এক্ষেত্রে ভিন্নমতও লক্ষ করা যায়।

১. ইতিহাস বিখ্যাত পারস্য কবি আবদুর রহমান ইবনে আহমদ মোল্লা জামি (রহ.) বলেন— صَفَاءٌ (সাফা) থেকে তাসাউফ শব্দটি উৎপত্তি লাভ করেছে। সাফা অর্থ পবিত্রতা, আলো। তাসাউফের সাধনা মানুষকে কুপ্রবৃত্তি ও পাপ থেকে পবিত্র রাখে, তার হৃদয়ে পবিত্র আলো জ্বলে ওঠে।

২. প্রখ্যাত মরমি সাধক সামআনীর মতে, তাসাউফ শব্দের উৎপত্তি বনু সাফা থেকে। কেননা এ ধারার সাধনায় তারাই বেশি অগ্রণী ছিলেন।

৩. অথবা শব্দটি اَلصَّفُّ الْاَوَّلُ (আসসাফফুল আউয়াল) থেকে নিষ্পন্ন। এর অর্থ হলো প্রথম সারি। তাসাউফের সাধনা মানুষকে প্রথম সারির মানুষে পরিণত করে।

৪. কিংবা اَهْلُ الصُّفَّةِ (আহলুস সুফফা) থেকে তাসাউফ শব্দটির উৎপত্তি। আহলুস সুফফা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর একদল বিশিষ্ট সাহাবি, যারা সবসময় নিজেদেরকে জ্ঞান ও পবিত্রতার সাধনায় লিপ্ত রেখেছেন।

৫. আধুনিক শব্দতত্ত্ববিদগণ বলেছেন, গ্রিক শব্দ Sophia,:heosophia বা Sophos থেকে আরবিতে তাসাউফ শব্দটি গৃহীত হয়েছে। গ্রিকভাষায় শব্দগুলোর অর্থ জ্ঞান। তাসাউফ তাই জ্ঞানসাধনা। একে সুফিবাদও বলা হয়।

তাসাউফের পারিভাষিক সংজ্ঞা

সুফি-সাধক ও ইসলামি চিন্তাবিদগণ তাসাউফকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমন—

১. মিশরের বিখ্যাত তাপস যুননুন মিশরি (রহ.) বলেন— 'আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর সবকিছু বর্জন করা তাসাউফ।'

২. বাগদাদের কুতুব ও মারেফাত জগতের শাহেন শাহ জুনায়েদ বাগদাদি (রহ.) বলেছেন, 'তাসাউফ হলো জীবন-মৃত্যুসহ সব বিষয়ে মহান আল্লাহর ওপর নির্ভর করা।'

৩. সুফি আবুল কাশেম আল-কুশায়রীর মতে, 'দেহ ও অন্তরকে পবিত্র করার সাধনাকে তাসাউফ বলা যায়।'

৪. বর্তমান ইরান; তৎকালীন পারস্যের সুফি বায়েজীদ বোস্তামী (রহ.)-এর মতে, 'তাসাউফ হলো পরিপূর্ণভাবে মহান আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দুঃখ, কষ্ট ভোগ করা।'

৫. প্রখ্যাত সুফি দার্শনিক গাযযালি (রহ.)-এর মতে, 'আল্লাহ তাআলা ছাড়া অপর মন্দ সবকিছু থেকে আত্মাকে পবিত্র করে সর্বদা মহান আল্লাহর আরাধনায় নিমজ্জিত থাকা এবং সম্পূর্ণরূপে মহান আল্লাহতে নিমগ্ন হওয়ার নামই তাসাউফ।'

৬. The Encyclopaedia of Religion- এ আছে: One of the truely creative manifestation of religious life in Islam in the mystical tradition is known as sufism.

বস্তুত মানুষের অন্তরে বিদ্যমান বিভিন্ন পাশবিক প্রবৃত্তি যেমন কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ বা নির্মূল করে আত্মাকে মহান আল্লাহর গুণে গুণান্বিত করে তোলার সাধনাই তাসাউফ।

তাসাউফের উদ্দেশ্য

আত্মা ও দেহের পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার পরিচয় লাভ করা তাসাউফের প্রধান উদ্দেশ্য। শরিয়তের পূর্ণ জ্ঞানার্জনের জন্য তাসাউফের প্রয়োজন। শরিয়তের ব্যাপারে জ্ঞানার্জনের জন্য ইমান ও ইসলামের পরে আরো কিছু বিষয় আছে যার নাম 'ইহসান'। কুরআন ও হাদিসের ভাষায় যাকে ইখলাস বলা হয়। আর সুফিদের ভাষায় একে তাসাউফ বলা হয়। সুতরাং শরিয়তের পূর্ণতা লাভ হয় ইমান, ইসলাম ও ইহসান তথা তাসাউফের সমন্বয়ে।

ইসলামের পূর্ণতা এবং মানবজীবনের সাধনার উত্তম দৃষ্টান্ত হলো তাসাউফ। তাই তাসাউফকে কোনোভাবে উপেক্ষা, অবজ্ঞা বা অবহেলা করার সুযোগ নেই। ইমানকে সুদৃঢ় করে প্রতিনিধিত্ব করার গুণাবলি অর্জন করার মাধ্যমে মানুষের সফলতা, আত্মিক প্রশান্তি, ইহকালীন শান্তি এবং পরকালীন মুক্তিই তাসাউফের উদ্দেশ্য।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আত্মশুদ্ধি অর্জনের সোপান কী?
২. আত্মাকে পবিত্র, কলুষমুক্ত ও পরিশুদ্ধ রাখার মধ্যেই মানুষের কী নিহিত?
৩. পরম সত্তাকে জানার প্রয়াস দর্শনের ইতিহাসে কী নামে পরিচিত?
৪. সুফিবাদ কোন শিক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত?
৫. ইসলাম মানুষের বাহ্যিক জীবনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার জন্য যে প্রয়োজনীয় বিধান দিয়েছে তার নাম কী?
৬. تَصَوُّفٌ শব্দের মূল صُوْفٌ হলে অর্থ কী? *[সকল বোর্ড ২০১৭]*

উত্তরের জন্য দেখো ৩১৩ পৃষ্ঠা।

খ. একক কাজ

শিক্ষার্থীরা তাসাউফের পরিচিতি ১০ বাক্যে লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ২ তাসাউফের উৎপত্তি
Origin of Tasawuf

তাসাউফের উৎপত্তি

মুসলিম দর্শনের বিভিন্ন চিন্তাগোষ্ঠীর উৎপত্তির ন্যায় তাসাউফ তথা সুফিবাদও কুরআনের শিক্ষা থেকে উদ্ভূত হয়েছে। অথচ পাশ্চাত্য পন্ডিতদের অনেকেই সুফিবাদের কুরআনিক উৎস স্বীকার করতে রাজি নন। এদের মধ্যে ভনক্রেমার, ডেজি, ব্রাউন, নিকলসন প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। অপরপক্ষে আল-কুশাইরি থেকে আরম্ভ করে ইকবাল পর্যন্ত বহু মুসলিম চিন্তাবিদ কুরআনকে সুফিবাদের মূল উৎস বলে নির্দেশ করেছেন। কাজেই সুফিবাদের উৎপত্তি সম্পর্কে মতবাদ চারটি। এগুলো হলো— ১. বেদান্ত ও বৌদ্ধ দর্শনের প্রভাব মতবাদ। ২. খ্রিষ্টানি ও নিও প্লেটোনিক প্রভাব মতবাদ। ৩. পারসিক প্রভাব মতবাদ। ৪. কুরআন সুন্নাহভিত্তিক মতবাদ।

১. **বেদান্ত ও বৌদ্ধদর্শনের প্রভাব মতবাদ:** H. Merten ও Goldziher মনে করেন, তাসাউফ বেদান্ত দর্শন ও বৌদ্ধদর্শনের শিক্ষা থেকে উদ্ভূত হয়েছে। তারা দেখিয়েছেন, ভারতীয় জীবনধারার সংস্পর্শে আসার পর উল্লিখিত দুই দর্শনানুসারী ভারতীয় যোগী, ঋষি ও ভিক্ষুদের কঠোর সংযম আর কৃচ্ছ্রতা মুসলিমদের মাঝে দারুণ প্রভাব বিস্তার করে। পর্যায়ক্রমে এ প্রভাবই পরিণত হয়ে তাসাউফ রূপলাভ করে।

   কিন্তু H. Merten ও Goldziher-এর এ মতবাদটি যথার্থ নয়। কেননা ভারতীয় চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসার আগেই মুসলিম জীবনধারায় তাসাউফের সাধনা বিদ্যমান ছিল। সর্বোপরি, বেদান্ত ও বৌদ্ধদর্শনের সাথে মুসলিম দর্শনের নীতিগত বিরাট প্রভেদের কারণেও এটা সম্ভব ছিল না।

২. **খ্রিষ্টানি ও নিও প্লেটোনিক প্রভাব মতবাদ:** Nicholson, Voncreamar প্রমুখের মতে, নবম শতকে ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগে খ্রিষ্টানি মরমীবাদ ও গ্রিক দর্শনের সাথে মুসলিমদের সংযোগ সেতু গড়ে ওঠার প্রভাবে ইসলামে তাসাউফের উদ্ভব ঘটে।

   কিন্তু ঐতিহাসিক বিবেচনায় এ মতবাদটিও অসার। কেননা নবম শতকের আগেই ইসলামে তাসাউফের উদ্ভব। সুতরাং কারো চিন্তার সাথে মিল থাকলেই বলা যায় না যে, সেটা অন্য মতবাদের প্রভাবের ফসল। আল্লামা ইকবাল যথার্থই বলেছেন, "No idea can seize a people's soul unless, is some sense its people's own."

৩. **পারসিক প্রভাব মতবাদ:** E. G. Brown ও তার অনুসারীদের মতে, ইসলামে তাসাউফের প্রবর্তক পারসিকরা। পারস্য সাম্রাজ্যের পতনের পর পারসিক জাতি নৈরাশ্যে কঠোর সংযম ও মরমীবাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। পরবর্তীকালে বিপুলসংখ্যক সুফির পারস্যে জন্মগ্রহণ করার পরিপ্রেক্ষিতে প্রমাণিত হয়-তাসাউফ মূলত পারসিক প্রভাবজাত একটি বিষয়।

   বস্তুত এ মতবাদটি অযৌক্তিক। কেননা বহু সুফি পারস্যে জন্মগ্রহণ করেছেন বলেই তাসাউফকে পারসিক প্রভাবজাত বলা যায় না। কেননা মুসলমানদের পারস্য বিজয়ের আগে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর যুগেই ইসলামে তাসাউফ সাধনার সূচনা হয়।

৪. **কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক মতবাদ:** এ মতবাদে তাসাউফকে কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষানির্ভর একটি আধ্যাত্মিক বিধি ব্যবস্থা হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়। কেননা কুরআন ও হাদিসে এমন অসংখ্য রহস্যময় আধ্যাত্মিক বক্তব্য পাওয়া যায়, যা থেকে সহজেই প্রতিভাত হয়ে ওঠে তাসাউফ কেবল কুরআন-সুন্নাহ থেকে উদ্ভূত হতে পারে। যেমন—

   وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ -

   অর্থ: আর যখন আমার বান্দা তোমাকে আমার সম্পর্কে প্রশ্ন করে, তখন তুমি বলো, নিশ্চয়ই আমি নিকটবর্তী (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৬)। هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ - **অর্থ:** তিনি প্রথম, তিনিই শেষ। তিনি প্রত্যক্ষ আর গোপনও তিনিই। আর সব কিছু সম্পর্কে তিনি সম্যক অবহিত (সূরা আল-হাদিদ, আয়াত: ৩)।

وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ **অর্থ:** আর আমি তার কণ্ঠনালীর চেয়েও অধিক নিকটবর্তী (সূরা ক্বাফ, আয়াত: ১৬)।

وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ **অর্থ:** তোমরা যেখানে থাকো, তিনি আছেন তোমাদের সাথেই (সূরা আল-হাদিদ, আয়াত: ৪)।

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ **অর্থ:** আল্লাহ তাআলা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি (সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩৫)।

فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ **অর্থ:** তারপর যেদিকেই তোমরা মুখ করো, সেদিকেই মহান আল্লাহর মুখ (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১১৫)।

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ـ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا **অর্থ:** যে পবিত্র হয়েছে সে কল্যাণলাভ করেছে। আর ধ্বংস হয়েছে সে, যে অপবিত্র থেকেছে (সূরা আশ-শামস, আয়াত: ৯–১০)।

(ক) কথিত আছে, مَنْ عَرَفَ نَفْسَهٗ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهٗ

অর্থ: যে ব্যক্তি নিজের সত্তাকে চিনেছে, সে চিনেছে তার রবকে।

(খ) আমার আকাশ বা পৃথিবী আমাকে ধারণ করতে পারে না, কিন্তু সেসব বান্দার অন্তর আমাকে ধারণ করতে পারে, যারা মুমিন (হাদিসে কুদসি)।

(গ) আমি ছিলাম গুপ্ত, আমার প্রকাশের ইচ্ছে হলো, আমি সৃষ্টি করলাম, যাতে আমাকে জানতে পারো (হাদিসে কুদসি)।

সুতরাং ওপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তাসাউফ কুরআন-সুন্নাহ থেকে উৎসারিত আধ্যাত্মিক ব্যবস্থাপনা।

তাসাউফ অর্জনের উপায়

তাসাউফ অর্জনের কিছু উপায়—

১. সৎগুণাবলি অর্জন এবং যাবতীয় অশ্লীল ও পাশবিক চরিত্রের দমন করার মাধ্যমে তাসাউফ বা মহান আল্লাহর নৈকট্যে পৌঁছে যায়।

২. ঐকান্তিকতার সাথে আমল করার মাধ্যমে মানুষ মহান আল্লাহর প্রিয় হতে পারে। মহানবি (সা.) ইরশাদ করেন—'তুমি এমনভাবে ইবাদত করো, যেন মহান আল্লাহকে দেখছো। আর তুমি যদি মহান আল্লাহকে নাও দেখতে পারো, তবে মনে রেখো মহান আল্লাহ তোমাকে দেখছেন' (মিশকাত)।

৩. ধ্যান মগ্ন হওয়া— দুনিয়ার যাবতীয় স্বার্থান্বেষী চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে শুধু মহান আল্লাহর ধ্যানে নিজেকে মগ্ন করতে পারলে মহান আল্লাহ বান্দাকে তার নৈকট্য লাভে সুযোগ দেন।

৪. ইহর্তিসাব বা নিজের ওপর অন্যের অভিযোগকে একনিষ্ঠভাবে গ্রহণ করা।

সর্বোপরি, পূত-পবিত্র মনে একনিষ্ঠভাবে মহান আল্লাহর ইবাদতের মাধ্যমে 'তাসাউফ' অর্জন করা যায়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মুসলিম দর্শনের বিভিন্ন চিন্তাগোষ্ঠীর ন্যায় তাসাউফ তথা সুফিবাদও কোন শিক্ষা থেকে উদ্ভূত হয়েছে?

২. কারা সুফিবাদের কুরআনিক উৎস স্বীকার করতে রাজি নয়?

৩. মুসলিম চিন্তাবিদগণ কাকে সুফিবাদের মূল উৎস বলে নির্দেশ করেছেন?

৪. কে প্রথম ও শেষ, কে প্রত্যক্ষ আর গোপন?

৫. কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি?

উত্তরের জন্য দেখো ৩১৩ পৃষ্ঠা।

খ. দলীয় কাজ

শিক্ষার্থীরা চারটি দলে বিভক্ত হয়ে তাসাউফের উৎপত্তি সংক্রান্ত চারটি মতবাদ শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ৩

তাসাউফের ক্রমবিকাশ
Evolution of Tasawuf

পৃথিবীতে আদম (আ.)-এর আগমনের সময়ে তাসাউফের উৎপত্তি ঘটে। প্রায় পৌনে চার শতাব্দী অনুশোচনার আগুনে জ্বলে আদম মূলত তাসাউফের সাধনাতেই আত্মনিয়োগ করেন। বংশ পরম্পরায় হাবিল, শীষ, নুহ, ইব্রাহিম, ইসমাইল (আ.) প্রমুখ নবিদের মাধ্যমে 'তাসাউফ' বিকশিত হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর মাধ্যমে পূর্ণতা পায়। এ সময় থেকে তাসাউফের ক্রমবিকাশের ধারায় এক নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। যেমন—

১. **রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর যুগ:** হেরা পর্বতে ধ্যানমগ্নতার মাধ্যমে মহানবি (সা.) তাসাউফের সূচনা করেন। পরবর্তীতে, কর্মময় তেইশ বছরের নবুয়তি জিন্দেগিতে অসংখ্যবার তন্ময়তা-ধ্যান মগ্নতায় তিনি অনন্য হয়ে ওঠেন।

২. **আহলি সুফফার যুগ:** রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর আদর্শের অনুসারী একদল সাহাবি (রা.) বিশেষভাবে তাঁর আধ্যাত্মিকতায় গুরুত্বারোপ করে মসজিদে নববিতে পড়ে থাকতেন। সেখানে তারা ইবাদত-বন্দেগি ও মহান আল্লাহর ধ্যানে মশগুল থাকতেন। এরা 'আহলি সুফফা' নামে পরিচিত। বলা হয়, এ আহলি সুফফাই তাসাউফের গোষ্ঠীবদ্ধ সাধনার জনক। তাদের মাধ্যমেই তাসাউফ ক্রমবিকাশ লাভ করে।

৩. **খুলাফায়ে রাশিদার যুগ:** উমাইয়া যুগে তাসাউফ বা সুফিবাদ আরো পূর্ণতা লাভ করে। এ সময়ে চার খলিফার মধ্যে প্রধানত হযরত আলি (রা.) এবং সাহাবিদের মধ্যে ইবনে মাসউদ (রা.) তাসাউফের ক্রমবিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। এ যুগে ইমাম হাসান বসরি (রহ.), আবু ইসহাক, রাবেয়া বসরি প্রমুখ ছিলেন উঁচু স্তরের সুফি।

৪. **কৃচ্ছ্রতা সাধনের যুগ:** আবুল হাশিম কুফি, হাসান বসরি, যাবির বিন হাইয়্যান, রাবেয়া বসরি প্রমুখ তাসাউফের স্বতন্ত্র ধারার সূচনা করেন। শুরু হয় কৃচ্ছ্রতা সাধনার মাধ্যমে তাসাউফ সাধনার নতুন যুগের।

৫. **নীতি প্রণয়ণের যুগ:** সুফি যুননুন মিশরি থেকে এ যুগের সূচনা। এটা ছিল তাসাউফের তত্ত্বগত উন্মেষের যুগ। আবদুল কাদির জিলানি, যুনায়েদ বাগদাদি প্রমুখ এ যুগে তাসাউফ সাধনার নীতিমালা প্রণয়ন করেন।

৬. **সর্বখোদাবাদের যুগ:** হযরত বায়জীদ বোস্তামির (রহ.) মাধ্যমে এ যুগের উন্মেষ ঘটে এবং মনসুর হাল্লাজ (রহ.)-এর মাধ্যমে এ ধারা পূর্ণতা পায়। এ যুগে তাসাউফ সাধনায় 'ফানা ফিল্লাহ' ও 'বাকাবিল্লাহ' ধারণার সংযোগ ঘটে।

৭. **সুন্নি মাযহাবের সাথে সমন্বয়ের যুগ:** ইমাম গাযযালি (রহ.) তাসাউফকে সুন্নি মাযহাবভুক্ত করেন এবং ঘোষণা দেন-তরিকত ও শরিয়তকে বিপরীত ধর্মী মনে করা প্রায় কুফর।

৮. **আধ্যাত্মিকতা ও সর্বখোদাবাদের সমন্বয়:** জালালুদ্দীন রুমি, নসর আল-সাররাজ, হুজাইরী, আল-কুশায়রী থেকে নিজামুদ্দীন আউলিয়া পর্যন্ত এ যুগ বিস্তৃত। এ যুগে সৃষ্টিকূলের অস্তিত্বকে প্রত্যক্ষভাবে স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপনের ধারা সূচিত হয়। একে সর্বখোদাবাদ বলে।

৯. **وَحْدَةُ الْوُجُوْدِ এর তাত্ত্বিক রূপ:** মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবি এ স্তরের প্রধান সুফি। এরপরে সদরুদ্দিন কোনাবী ও মোল্লা জামী (রহ.) পর্যন্ত এ যুগ বিকাশ লাভ করে। এ যুগে কেবল একটিমাত্র সত্তার অস্তিত্ব থাকার ধারণা তাসাউফ সাধনায় যুক্ত হয়। সেই অস্তিত্ববান সত্তা হলেন আল্লাহ তাআলা। মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য সব সৃষ্টি অস্তিত্বহীন। তাসাউফের এ ধারার নাম 'ওয়াহদাতুল উজুদ'।

১০. **وَحْدَةُ الشُّهُوْدِ এর ধারণা:** হযরত বাহাউদ্দিন নকশবন্দ থেকে শায়খ আহমদ সিরহিন্দি পর্যন্ত এ ধারণার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধিত হয়। এ স্তরে তাসাউফে সব সৃষ্টির সাথে মহান আল্লাহর নিঃশর্ত ও সার্বিক সম্মিলনের ধারণা যুক্ত হয়। এর নাম 'ওয়াহদাতুল শুহুদ'।

১১. **وَحْدَةُ الْوُجُوْدِ وَالشُّهُوْدِ এর মিলন যুগ:** হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (রহ.) থেকে এ স্তরের সূচনা হয়ে আজকের যুগের বিভিন্ন পির-মাশায়েখ ও ওলির মাধ্যমে এ ধারার বিকাশ অব্যাহত রয়েছে। শাহ ওয়ালীউল্লাহ ওয়াহদাতুল উজুদ ও ওয়াহদাতুশ শুহুদ এর মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন।

১২. **উপমহাদেশে তাসাউফের প্রসার ও তরিকার ব্যাপ্তি:** এ সময়ে পাক-ভারত উপমহাদেশে তাসাউফ এর প্রচার শুরু হয়। এতে নেতৃত্ব দেন খাজা মুইনুদ্দিন চিশতি (রহ.)। এ যুগের অন্য শ্রেষ্ঠ সুফি নিজামুদ্দিন আউলিয়া। এ সময়ে এদেশে কাদেরিয়া, মুজাদ্দিদিয়া, নকশবন্দিয়া ও চিশতিয়া তরিকার প্রসার ঘটে।

১৩. **তাসাউফের ক্রমবিকাশের ধারায় বাংলাদেশ:** ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয়ের পর পরই সুফি-সাধকগণ এ দেশে আসেন এবং তাদের চেষ্টাতেই ইসলাম বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময়ের সুফিদের মধ্যে হযরত শাহজালাল (রহ.), শাহ পরাণ (রহ.), শাহ মাখদুম (রহ.), সুলতান মাহী সাওয়ার (রহ.) প্রমুখ অন্যতম।

বস্তুত তাসাউফ ইসলামি বিধি-ব্যবস্থায় কোনো বাহ্য আরোপিত বিষয় নয় বরং তাসাউফ ইসলামের অন্তর্গত ও ইসলামসম্মত আধ্যাত্মিক সাধনার ঐশী নির্দেশনা। এর ক্রমবিকাশের ধারাও ইসলামি ঐতিহ্য ও নীতিমালায় সমৃদ্ধ। তাসাউফ বা সুফিবাদ প্রথম নবি হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু হয়। সব নবিই এর অনুশীলন করেছেন। আমাদের মহানবি (সা.) ছিলেন সুফিকুল শ্রেষ্ঠ। এজন্যই তিনি মুস্তাফা নামে আখ্যায়িত। সময়ের সাথে সাথে তাসাউফের ক্রমবিকাশ ঘটেছে এবং তা অদ্যাবধি অব্যাহত আছে এবং থাকবে। আমরা নিষ্ঠার সাথে শরিয়ত ও তাসাউফ অনুশীলনের মাধ্যমে আমাদের ভেতর-বাহির পরিচ্ছন্ন ও পরিশুদ্ধ করবো। মহান আল্লাহর প্রিয়বান্দা হওয়ার চেষ্টা অব্যাহত রাখবো। যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে তাসাউফ সাধনার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি ও আত্মার পবিত্রতা অর্জন করতে পারলে মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করা যায়। আর আল্লাহ তাআলার প্রিয় বান্দা হয়ে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারলে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জীবনে সাফল্য ও মুক্তি পাওয়া যাবে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. প্রায় পৌনে চারশ বছর অনুশোচনার আগুনে জ্বলে আদম (আ.) মূলত কীসে আত্মনিয়োগ করেন?
২. প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) কোথায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন?
৩. কোন নবির মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত তাসাউফ পূর্ণতা পায়?
৪. তাসাউফের গোষ্ঠীবদ্ধ সাধনার জনক কারা?
৫. তাসাউফের তত্ত্বগত উন্মেষের যুগের সূচনা কার থেকে?
৬. তাসাউফে ওয়াহদাতুল উজুদ ও ওয়াহদাতুশ শুহুদ এর মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন কে?

উত্তরের জন্য দেখো ৩১৩ পৃষ্ঠা।

খ. একক কাজ

শিক্ষার্থীরা তাসাউফের ক্রমবিকাশের ধারাগুলোর নাম খাতায় লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৪ শরিয়ত ও তাসাউফের মধ্যে সম্পর্ক
Relationship between Shariah and Tasawuf

ইসলাম মানবজীবনের সব দিক ও বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। সেজন্য ইসলামের সব বিধিবিধানও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। তাসাউফ ও শরিয়ত ইসলামি বিধানাবলির প্রধান দুটি দিক। তাসাউফ মানুষের আত্মা পরিশোধনের বিধান। শরিয়ত নিয়ন্ত্রণ করে তাদের বাহ্যিক দিক। শরিয়ত অর্থ বিধান, চলার পথ, জীবনব্যবস্থা। ব্যক্তির জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সময়কালে আল্লাহ তাআলা অবশ্য পালনীয় যে বিধানাবলি দিয়েছেন তাই শরিয়ত। ব্যক্তিগত ও সামাজিক কর্তব্য হলো শরিয়তের নিয়ম কানুন অনুযায়ী চলা। এর কোনো বিধান অমান্য করা পাপ। মানুষের জন্য ভালো ও মন্দ নির্ধারণ করে শরিয়ত। এটি মানবজীবনের দৃশ্যমান দিকের বিস্তারিত বিধি-ব্যবস্থা। সব কাজের ঔচিত্য-অনৌচিত্যের মাপকাঠি। মুসলিম জাতির ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ও ব্যক্তিগত জীবনের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা আছে শরিয়তে। ফলে তাসাউফ ও শরিয়তের মধ্যে যেমন সাদৃশ্য রয়েছে তেমনি রয়েছে বৈসাদৃশ্য।

সাদৃশ্যমূলক সম্পর্ক:

১. **উৎসগত অভিন্নতা:** শরিয়ত ও তাসাউফ দুটি বিষয়ই এক ও অভিন্ন উৎস থেকে উৎসারিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর মানুষকে যেমন শরিয়ত দিয়েছেন, তেমনি তাসাউফও দিয়েছেন। আল কুরআনে এসেছে—

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا۔

অর্থ: তোমাদের প্রত্যেক জাতিকে আমি শরিয়ত ও মিনহাজ তথা স্পষ্ট পথ দিয়েছি (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত: ৪৮)।

এ আয়াতের ‘মিনহাজ’ অধিকাংশ শীর্ষস্থানীয় তাফসিরকারগণের মতে তাসাউফ। কাজেই শরিয়ত ও তাসাউফের মধ্যে উৎসগত ঐক্য বিদ্যমান।

২. **পরস্পর নির্ভরশীলতা:** শরিয়ত ও তাসাউফ- একটি অপরটির ওপর নির্ভরশীল। সেজন্য কেবল শরিয়ত মেনে চললে যেমন গ্রহণযোগ্য হবে না, তেমনি শুধু তাসাউফের অনুসরণেও সাফল্য লাভ সম্ভব নয়। বরং এজন্য একই সাথে শরিয়ত ও তাসাউফের অনুসরণ অনিবার্য। যেমন শরিয়ত সালাত আদায়ের নির্দেশ দেয়। কুরবানির নির্দেশ দেয়। কিন্তু ইবাদত গ্রহণযোগ্য হওয়া না হওয়া নির্ভর করে তাসাউফের ওপর। কেননা ইবাদত গ্রহণযোগ্য হয় তাকওয়া ও খুলুসিয়াতের মাধ্যমে। তাসাউফ ব্যক্তির আত্মা পরিশুদ্ধ করে তাকে তাকওয়া ও খুলুসিয়াতের গুণে ভূষিত করে। আবার শুধু তাসাউফে কোনো ইবাদতই সম্পন্ন হবে না। মহান আল্লাহ বলেন—

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ۔

অর্থ: কুরবানির পশুর গোশত এবং রক্ত মহান আল্লাহর কাছে পৌছায় না। বরং পৌছায় তোমাদের তাকওয়া (সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত: ৩৭)।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, শরিয়ত ছাড়া ইবাদত অসম্ভব, আবার তাসাউফ ছাড়া সেই ইবাদত মহান আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না। সুতরাং শরিয়ত ও তাসাউফ পরস্পর নির্ভরশীল।

৩. **দেহ-আত্মার সম্পর্ক:** দেহের সাথে আত্মার যেমন সম্পর্ক শরিয়তের সাথেও তাসাউফের তেমন সম্পর্ক। আত্মা থাকে নিভৃতে, দেহ প্রকাশ্যে। কিন্তু দেহের চঞ্চলতা ও গতি নির্ভর করে একান্তই আত্মার ওপর। আবার আত্মা গোপন, আত্মাকে দেখা যায় না। দেহের সজিবতাই প্রমাণ করে আত্মা অস্তিত্বশীল। তাসাউফও এমনি গোপন বিধান। আত্মার মাধ্যমে এ বিধানের অনুশীলন করা হয়। আল্লাহভীতি, বিশ্বাস, ধৈর্য প্রভৃতি আত্মিক ইবাদত। এগুলো তাসাউফ। আর মহান আল্লাহকে বিশ্বাস ও ভয় করার ফলে মানুষের মধ্যে ইবাদত করার মানসিকতা গড়ে ওঠে। সালাত, জাকাত, সাওম, হজ প্রভৃতি ইবাদত করা শরিয়তের বিধান। তাসাউফের অনুশীলন ছাড়া শরিয়তের এ সব আনুষ্ঠানিকতাকে প্রাণহীন মনে হয়। বস্তুত ইবাদতের দেহ যদি শরিয়ত হয়- তাসাউফ তার আত্মা। এ দুয়ের সম্মিলন ছাড়া ইবাদত অর্থহীন, অগ্রহণযোগ্য।

৪. **একই বিধানের দু'রকম ধারা:** শরিয়ত ও তাসাউফ মূলত একই বিধানের দুটি ধারা। ইসলামি বিধানের এটা হলো দুটি পর্যায়। এ হিসেবে শরিয়ত ও তাসাউফের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। হাসান বসরি (রহ.) শরিয়ত ও তাসাউফকে জ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন দুটো ধারা হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'ইলম দু'প্রকার: এক প্রকার হলো অন্তরের ইলম। এ ইলম মহা উপকারী। আর দ্বিতীয় প্রকার ইলম হলো মৌখিক। এ প্রকার ইলম মানবজাতির জন্য মহান আল্লাহর দলিল।' এখানে হাসান বসরি (রহ.)-এর বিবেচনায় তাসাউফ অন্তরের এবং শরিয়ত মৌখিক জ্ঞান হিসেবে অভিহিত হয়েছে। কাজেই তাসাউফের যাত্রা শরিয়তের সাথে। এটি ইসলামের অবিভাজ্য দিক। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটিকে কল্পনা করা যায় না।

বৈসাদৃশ্যমূলক সম্পর্ক

তাসাউফ ও শরিয়তের মধ্যে যেমন মিল রয়েছে, তেমনি অমিলও কম নেই। এ অমিল কার্যকারিতা ও প্রকৃতিগত দিক থেকে, এ বৈসাদৃশ্য তাসাউফ ও শরিয়তকে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত করায় না। একটাকে অন্যটার বিপরীতেও দাঁড় করিয়ে দেয় না। পার্থক্যগুলো হলো—

১. কেউ শরিয়ত অস্বীকার করলে তা স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় এবং এজন্য তাকে কাফির বলা যায়। কিন্তু কেউ তাসাউফ অস্বীকার করলে তা বোঝা যায় না। এজন্য ব্যক্তিকে কাফির বলা যায় না।

২. শরিয়ত দৈহিক বিধান আর তাসাউফ হলো আত্মার বিধান। ফলে শরিয়তের অনুশীলন হয় দৈহিকভাবে আর আত্মার মাধ্যমে তাসাউফ অনুশীলন করা হয়।

৩. তাসাউফে যে হুকুম পালনের নির্দেশ দেওয়া হয় তা দৃশ্যমান নয়। কিন্তু শরিয়তে যে হুকুম পালনের নির্দেশ দেওয়া হয় তা প্রত্যক্ষ।

৪. শরিয়ত ব্যক্তির বাহ্যিক মুসলমানিত্ব প্রকাশ করে। এছাড়া ব্যক্তির মুসলমান হওয়া না হওয়া শরিয়তের ওপর নির্ভর করে। তাসাউফের ক্ষেত্রে এমন কোনো ব্যাপার নেই।

৫. শরিয়ত ইবাদতের বিধান ও পদ্ধতি বর্ণনা করে, কিন্তু এর গ্রহণযোগ্যতার মান নির্ধারণ করে না। তাসাউফ বিধান বর্ণনা করে না, বরং ইবাদতের গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারণ করে।

বস্তুত প্রকৃতিগত দিক থেকে এ পার্থক্যগুলো থাকলেও উদ্দেশ্য ও উৎসগত দিক থেকে তাসাউফ ও শরিয়ত এক এবং অভিন্ন। শরিয়ত ও তাসাউফ- দুটোই চায় মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি, পরকালে সাফল্য এবং মানুষের যথার্থ ও প্রকৃত বিকাশ। সুতরাং সামগ্রিক বিবেচনাতেই শরিয়ত ও তাসাউফের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ইসলাম মানবজীবনের সব দিক ও বিভাগের মধ্যে কী করে?
২. তাসাউফ ও শরিয়ত ইসলামের বিধানাবলির কী?
৩. ব্যক্তির জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সময়কালে আল্লাহ তাআলা অবশ্য পালনীয় যে বিধানাবলি দিয়েছেন তাকে কী বলে?
৪. উদ্দেশ্য ও উৎসগত দিক থেকে তাসাউফ ও শরিয়ত পরস্পর কী?
৫. শরিয়ত ও তাসাউফের অমিল কোন দিক থেকে?

উত্তরের জন্য দেখো ৩১৩ পৃষ্ঠা।

খ. দলীয় কাজ

শিক্ষার্থীরা ২টি দলে বিভক্ত হয়ে এক দল শরিয়ত ও তাসাউফের সাদৃশ্যমূলক সম্পর্ক ও অন্য দল বৈসাদৃশ্যমূলক সম্পর্ক নিয়ে ৫টি করে বক্তব্য উপস্থাপন করবে।

পাঠ ৫ তাসাউফের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা
Importance and Necessity of Tasawuf

জীবন জগতের পূর্ণতার উপলব্ধির জন্য তাসাউফের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ইসলামি জীবনব্যবস্থার এক অবিচ্ছেদ্য ও অনিবার্য দিক হলো তাসাউফ। একে ছাড়া মানবিক বিকাশ পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। পৃথিবী ও পরকালে সামগ্রিক সাফল্য লাভের নেপথ্যে এর কার্যকারিতা প্রশ্নাতীত। সার্বিক বিবেচনাতেই ইসলামে তাসাউফ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং বিপুল গুরুত্ববহ একটি বিষয়। বিভিন্নভাবে বিষয়টি বিশ্লেষণ করা যায়। যেমন—

১. **সমন্বিত জীবনধারার প্রতীক:** মানুষের জীবনের দু'টি দিক, বাহ্যিক ও আত্মিক। বাহ্যিক দিকের বিধিবিধান ইসলামে শরিয়ত হিসেবে বিধৃত হয়েছে। এরপরে আসে আত্মিক দিকের বিষয়টি। তাসাউফ এ স্তরের ইসলামি ব্যবস্থাপনা বলে তাসাউফকে বলা যায় ইসলাম পরিকল্পিত সমন্বিত জীবনধারার প্রতীক। সুতরাং একে উপেক্ষা করা যায় না।

২. **দীনের পূর্ণতা অর্জন:** তাসাউফের অনুশীলনসহ শরিয়তের বিধি-বিধান পালন করলে ইবাদতে একাগ্রতা বেশি আসে। ফলে মানুষের জীবনে দীনের পূর্ণতা অর্জিত হয়। এ ব্যাপারে ইমাম মালিক (রহ.)-এর উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন— مَنْ تَفَقَّهَ وَلَمْ يَتَصَوَّفْ فَقَدْ تَفَسَّقَ وَمَنْ تَصَوَّفَ وَلَمْ يَتَفَقَّهْ فَقَدْ تَزَنْدَقَ وَ مَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ تَحَقَّقَ . **অর্থ:** যে ব্যক্তি শুধু ফিকহ বা শরিয়ত চর্চা করলো কিন্তু তাসাউফ চর্চা করল না, সে ফাসিক। যে ব্যক্তি কেবল তাসাউফ চর্চা করল কিন্তু ফিকহ বা শরিয়ত চর্চা করলো না সে যিন্দিক বা কাফির। আর যে ব্যক্তি উভয়ই চর্চা করলো সে সত্যিকার দীনদার (মুয়াত্তা-ইমাম মালেক)।

৩. **আল্লাহ তাআলাকে জানার মাধ্যম:** তাসাউফ মানুষকে আত্মা, পরমাত্মা ও নিজসত্তা বিষয়ে জ্ঞানদান করে। কথিত আছে—
مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ . **অর্থ:** যে নিজেকে চিনেছে, সে চিনেছে তার রবকে (সুতরাং আত্মজ্ঞানের মাধ্যমে মহান আল্লাহকে জানার মাধ্যম হিসেবে তাসাউফ গুরুত্বপূর্ণ)।

৪. **আত্মশুদ্ধির উপায়:** আপত্তিকর বিষয় থেকে দূরে থেকে, মহান আল্লাহর প্রেমে নিমগ্ন হয়ে বাহ্য ও অন্তর শুদ্ধতা অর্জনের নামই তাসাউফ। সুতরাং আত্মশুদ্ধির অবিকল্প উপায় হিসেবে তাসাউফ শিক্ষা অনিবার্য। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন— لِكُلِّ شَيْءٍ صِقَالَةٌ وَصِقَالَةُ الْقُلُوْبِ ذِكْرُ اللهِ . **অর্থ:** প্রতিটি বিষয়েরই পরিষ্কারক যন্ত্র আছে। আর অন্তর পরিষ্কারের যন্ত্র হলো মহান আল্লাহর জিকির (বায়হাকি)।

৫. **স্থায়ী কল্যাণলাভের মাধ্যম:** তাসাউফের সাধনা ব্যক্তির সামগ্রিক পরিশুদ্ধতার নির্দেশক বলে একে স্থায়ী কল্যাণলাভের মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা যায়। মহান আল্লাহ বলেন— قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا . وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا .
অর্থ: সে কল্যাণলাভ করেছে, যে নিজেকে পবিত্র করেছে। আর ধ্বংস হয়েছে সে, যে নিজের আত্মাকে অপবিত্র করেছে (সূরা আশ-শামস: ৯–১০)। قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى . وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى . **অর্থ:** সে কল্যাণলাভ করেছে যে পবিত্র হয়েছে আর তার রবের জিকির করেছে এবং সালাত আদায় করেছে (সূরা আল-আ'লা, আয়াত: ১৪-১৫)। সুতরাং তাসাউফ শিক্ষার বিকল্প নেই।

৬. **আল্লাহ তাআলার সান্নিধ্য লাভ:** তাসাউফের সাধনা মানুষের অন্তরকে পাপ-পঙ্কিলতা ও কলুষতা থেকে মুক্ত করে। তার অন্তর পবিত্র ও পরিশুদ্ধ হয়। আর পরিশুদ্ধ অন্তরের মানুষ আখিরাতে পরম পবিত্র সত্তা আল্লাহ তাআলার সান্নিধ্য লাভের যোগ্য হয়।

৭. **ইমানের স্বাদ আস্বাদন:** ইমানকে সুদৃঢ় করতে এবং ইমানের স্বাদ আস্বাদন করতে তাসাউফের বিকল্প নেই।

৮. **আমল কবুলের পর্যায়ে উন্নীতকরণ:** আমল কবুল হওয়ার জন্য পূর্বশর্ত আত্মিক নিষ্ঠা ও তাকওয়া। যেমন মহান আল্লাহর ঘোষণা- لَنْ يَّنَالَ اللهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ . **অর্থ:** এগুলোর (কুরবানি পশুর) গোশত ও রক্ত মহান আল্লাহর কাছে পৌছে না, কিন্তু তাঁর কাছে পৌছে তোমাদের মনের তাকওয়া (সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত: ৩৭)।
আর তাসাউফ হচ্ছে তাকওয়া ও নিষ্ঠা অর্জনের অবিকল্প উপায়। সুতরাং আমলকে কবুলিয়াতের পর্যায়ে উন্নীত করার জন্যও তাসাউফ শিক্ষা জরুরি।

৯. **পরম জ্ঞানলাভ:** তাসাউফ সাধনায় ব্যাপৃত সাধকগণ সত্তা, আত্মা, পরমাত্মা, ইহকাল, পরকাল ও সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে পরম জ্ঞানলাভে সমর্থ হন। কেননা তাসাউফ সাধনায় তাদের অন্তর্দৃষ্টি খুলে যায়।

১০. **পরম জ্যোতিলাভ:** কুরআনে এসেছে— اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ. **অর্থ:** আল্লাহ তাআলাই হচ্ছেন আসমানসমূহ ও জমীনের নূর (জ্যোতি) (সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩৫)। তাসাউফ হচ্ছে বিশ্বজাহানে বিস্তৃত আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের এ অবিনাশী আলোক ধারায় ব্যক্তিকে আলোকিত করে তোলার সাধনা। সুতরাং তাসাউফ শিক্ষা প্রয়োজন।

১১. **আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ লাভ:** তাসাউফ ব্যক্তিকে সার্বক্ষণিকভাবে মহান আল্লাহর জিকিরে নিমগ্ন থাকার শিক্ষা দেয়। ফলে ব্যক্তি মহান আল্লাহর অনুগ্রহলাভের যোগ্য হয়ে ওঠে। মহান আল্লাহ বলেন—

فَاذْكُرُوْنِىْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِىْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ.

অর্থ: তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমি তোমাদের স্মরণ করবো (নিয়ামত বাড়িয়ে দিবো) এবং তোমরা আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো আর কুফরি করো না (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৫২)।

১২. **উপকারী ইলম:** হযরত হাসান বসরি (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে— اَلْعِلْمُ عِلْمَانِ عِلْمٌ فِى الْقَلْبِ وَذٰلِكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ. **অর্থ:** ইলম দু'প্রকার– এক প্রকার ইলম হলো অন্তরের ইলম আর এ ইলমই মহা উপকারী (দারেমি)। আর অন্তরের ইলম হলো তাসাউফ। সুতরাং উপকারী এ ইলম শিক্ষা অনিবার্য।

১৩. **হিদায়াতের পুরোধা:** রাসুলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেন—

اَلشَّيْطَانُ جَاثِمٌ عَلٰى قَلْبِ اِبْنِ اٰدَمَ فَاِذَا ذَكَرَ اللّٰهَ خَنَسَ وَاِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ.

অর্থ: শয়তান আদম সন্তানের অন্তর নখ দিয়ে আঁকড়ে রেখেছে। যখন মহান আল্লাহর জিকির করা হয় তখন সে দূর হয়ে যায়। আর যখন মহান আল্লাহকে বিস্মৃত হয়, কুমন্ত্রণা দেয়। তাসাউফ মূলত সার্বক্ষণিক মহান আল্লাহর জিকিরেরই সাধনা বলে- হিদায়াতের পুরোধা হিসেবে একে অবশ্যই শিক্ষা করা কর্তব্য।

১৪. **পাপাচারমুক্ত জীবনযাপন:** দৃশ্য-অদৃশ্য পাপাচার ত্যাগে তাসাউফের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। মহান আল্লাহ বলেন— وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهٗ. **অর্থ:** তোমরা প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য পাপ থেকে দূরে থাকো (সূরা আল-আনআম, আয়াত: ১২০)। আর একমাত্র আধ্যাত্মিক সাধনা ও আত্মিক শুদ্ধতাই মানুষকে অদৃশ্য পাপাচার থেকে বিরত রাখতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে তাসাউফ ইসলামি চিন্তাধারায় মানুষের সামগ্রিক জীবনব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ দিক। বস্তুত ইসলামের সর্বজনীনতা এবং পূর্ণতার এক অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত তাসাউফ।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. জীবন ও জগতের পূর্ণতার উপলব্ধির জন্য কীসের গুরুত্ব অনস্বীকার্য?
২. তাসাউফের অনুশীলনসহ শরিয়তের বিধি-বিধান পালন করলে ইবাদতে কী আসে?
৩. কোন প্রকারের ইলম মহাউপকারী?

উত্তরের জন্য দেখো ৩১৩ পৃষ্ঠা।

খ. একক কাজ

শিক্ষার্থীরা তাসাউফের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ১০টি বাক্য খাতায় লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৬ আত্মাকে সুস্থ ও পবিত্র রাখার উপায়
The Way to Keep the Soul Well and Sacred

মানুষের চালিকাশক্তি ও জীবনীশক্তি হলো আত্মা। আত্মা পবিত্র থাকলে মানুষ পবিত্র থাকে। আত্মা সুস্থ থাকলে মানুষও সুস্থ থাকে। শরীর সুস্থ ও পবিত্র থাকার পরও যদি কেবল আত্মা অপবিত্র বা অসুস্থ থাকে, তাহলে মানুষের পক্ষে সুস্থ ও পবিত্র থাকা সম্ভব হয় না। আত্মার সুস্থতা ও পবিত্রতা তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিভিন্নভাবে আত্মাকে সুস্থ ও পবিত্র রাখা যায়। যেমন—

১. **আল্লাহ তাআলার জিকির:** জিকির মানে স্মরণ করা। দুইভাবে মহান আল্লাহর জিকির করে আত্মাকে সুস্থ ও পবিত্র রাখা যায়। প্রথমত আল্লাহ তাআলার নাম ও গুণ এবং কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করে।
দ্বিতীয়ত যেকোনো কাজ করার সময় মহান আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলে। মহান আল্লাহর জিকিরে আত্মা তৃপ্ত হয়।

২. **সালাত আদায়:** বিনয়, নম্রতা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে সব ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নত সালাত আদায় করা। পাশাপাশি গুরুত্বের সাথে তাহাজ্জুদ সালাত এবং অন্যান্য নফল সালাত আদায় করা। এর মাধ্যমে আত্মাকে অশালীন ও অশ্লীল আচরণ থেকে মুক্তি দেওয়া সম্ভব। আল্লাহ তাআলা বলেন— 'নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীল ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত রাখে' (সূরা আল-আনকাবুত, আয়াত: ৪৫)।

৩. **পাপাচার ও কুপ্রবৃত্তি পরিহার:** ইসলামি শরিয়ত যেসব আচরণ নিষিদ্ধ করেছে তা পরিহার করা। সর্বোতভাবে কাম, ক্রোধ, ক্ষোভ, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, ঈর্ষা, প্রতারণা, মিথ্যাবাদিতা, খারাপ ধারণা, পরনিন্দা প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি পরিহারের চেষ্টা করা। তাহলেই আত্মা সুস্থ ও পবিত্র থাকবে।

৪. **তাবলিগ করা:** অন্যকে ভালো কাজের উপদেশ দেওয়া, অপরকে ইসলামের নীতি আদর্শের প্রতি আহ্বান জানানো আত্মাকে পবিত্র ও শুদ্ধ রাখার একটি প্রধান উপায়।

৫. **সৎগুণাবলির অনুসরণ:** রাসুলুল্লাহ (সা.) ও তার সাহাবিগণের জীবনাচারে যেসব সৎগুণের বিকাশ ঘটেছিলো তার অনুশীলন ও চর্চা ব্যক্তির আত্মাকে পবিত্র ও সুস্থ রাখতে পারে।

৬. **তওবা করা ও মাগফিরাত কামনা:** সবসময় আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা, ভুলক্রমে কোনো পাপ কাজ করা হলে সেজন্য তীব্র অনুশোচনা প্রকাশ এবং পরবর্তীতে সে কাজ না করার সুদৃঢ় অঙ্গীকারও মানুষের আত্মাকে সুস্থ ও পবিত্র রাখে।

মুসলিম জাতি একদিন তাসাউফের অনুসরণ এবং পরিপূর্ণ অনুশীলনের মাধ্যমে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হয়েছিল। তাদের পবিত্রতা ও উন্নত নৈতিকতার শুদ্ধ আলোয় গোটা সমাজ আলোকিত হয়েছিল। মর্যাদা ও মাহাত্ম্যে তারা ছিলেন সবার ওপরে। তাসাউফের চর্চাই তাদের সাফল্য এনে দিয়েছিল। তারপর মুসলিমরা যখন তাসাউফ সাধনার এ ধারা ছেড়ে দিল, তখনি তাদের ওপর নেমে এল বিপর্যয়। বর্তমান অব্যবস্থা ও দুর্ভাগ্যের অবসান করতে হলে মুসলিম জাতিকে আবারো তাসাউফের প্রকৃত অনুশীলন শুরু করতে হবে। তাদের নৈতিক অবস্থার উন্নতি বিধান করতে হবে। আদর্শ চরিত্রের প্রভাবেই তারা নিজেদের অবস্থা উন্নত করতে পারবেন। সুতরাং জাতীয় মুক্তি ও সামগ্রিক উন্নতির জন্য আজ তাসাউফের পুরোপুরি এবং প্রকৃত অনুশীলন এক বাস্তব প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মানুষের চালিকাশক্তি ও জীবনীশক্তি কী?
২. আত্মা অপবিত্র থাকলে মানুষ কী থাকে?
৩. আত্মা তৃপ্ত হয় কীসে?
৪. কীসের মাধ্যমে আত্মাকে অশালীন ও অশ্লীল আচরণ থেকে মুক্তি দেওয়া সম্ভব?
৫. তওবা করা ও মাগফিরাত কামনা আত্মাকে কী রাখে?

উত্তরের জন্য দেখো ৩১৩ পৃষ্ঠা।

পাঠ ৭ হযরত হাসান বসরি (রহ.) (২১-১১০ হি.)

Hazrat Hasan Basri (R) (21–110)

জন্ম ও বংশ পরিচয়: হযরত হাসান বসরি (রহ.) ২১ হিজরি মোতাবেক ৬৪২ খ্রিষ্টাব্দে মদিনা মুনাওয়ারায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নবি পরিবারে লালিত-পালিত হওয়া একজন বিখ্যাত তাবেয়ি ছিলেন। তার নাম হাসান; উপনাম আবু আলি। জীবনের বেশিরভাগ সময় তিনি বসরায় অতিবাহিত করেছেন বিধায় তার নামের সাথে 'বসরি' শব্দটি যুক্ত করা হয়েছে। তাঁর পিতার নাম মুসারাযি, যিনি হযরত আবুবকর (রা.)-এর কাছে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হযরত যায়িদ বিন সাবিত (রা.)-এর সেবক ছিলেন। মায়ের নাম খায়েরাহ। তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা.)-এর সেবিকা ছিলেন।

হাসান নামকরণ: হাসান বসরি যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন হযরত উমর ফারুক (রা.) খলিফা হিসেবে অধিষ্ঠিত ছিলেন। জন্মের পরে তাহনিক (কোনো তাকওয়াবান বুজুর্গ কর্তৃক খেজুর বা অন্য কোনো মিষ্টিফল চিবিয়ে আজুলে নিয়ে নবজাতক শিশুর মুখে দেওয়াকে তাহনিক বলে) করার জন্য হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। হযরত উমর ফারুক (রা.) তাকে কোলে তুলে নিয়ে তাহনিক করার পর বললেন, বাহ! শিশুটিতো খুব সুন্দর! এর নাম রাখবে হাসান। হাসান অর্থ সুন্দর। খলিফার ইচ্ছানুযায়ী তাঁর নাম রাখা হয় হাসান।

উম্মুল মুমিনীনের দুগ্ধ পান: হযরত হাসান বসরি (রহ.)-এর মা খায়েরাহ উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা.)-এর সেবিকা ছিলেন। হাসান বসরিকে হযরত উম্মে সালমা (রা.)-এর গৃহে রেখে তিনি বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকতেন। হাসান বসরি যখনই ক্ষুধার কারণে কেঁদে উঠতেন, উম্মে সালমা (রা.) তাকে কোলে তুলে নিয়ে তাঁর স্তন হাসান বসরির মুখে দিতেন। হাসান বসরি তাঁর দুধ পান করে ক্ষুধা নিবারণের সৌভাগ্য লাভ করেন। উম্মে সালমা (রা.) তাকে খুব স্নেহ করতেন এবং তাঁর জন্য দুআ করতেন।

শিক্ষা-দীক্ষা: মহানবি (সা.)-এর পরিবারে হযরত হাসান বসরি (রহ.)-এর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর অসংখ্য সাহাবির সান্নিধ্য লাভ করেছেন এবং তাদের থেকে শিক্ষা লাভ করে কুরআন, হাদিস, ফিকহ ইত্যাদিতে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। মদিনার বাইরেও তিনি বসরায় সমকালীন শ্রেষ্ঠ মুফাসসির, মুহাদ্দিস ও ফকিহগণের কাছে জ্ঞানার্জন করেন।

হযরত আলি (রা.)-এর কাছে তিনি নিয়মিত আসা-যাওয়া করতেন। তাঁর থেকে তিনি ইলমে তাসাউফের দীক্ষা লাভ করেন। হযরত হাসান বসরি (রহ.)-কে সুফি তরিকার তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়।

হযরত হাসান বসরি (রহ.) নিজেকে খুবই ছোট মনে করতেন এবং বিনয়ী জীবনযাপন করতেন।

সাহসিকতা: হাসান বসরি (রহ.)-এর জীবদ্দশায় অত্যাচারী শাসক হাজ্জাজ বিন ইউসুফের শাসনামল ছিল। হাজ্জাজ হাজার হাজার আলেমকে হত্যা করেছে। সেই হাজ্জাজের অপকর্মের বিরুদ্ধে তিনি জোরালো বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। হাজ্জাজ সেখান দিয়ে গমন করছিলেন। হাজ্জাজকে দেখেও তিনি বক্তৃতা বন্ধ করেননি। হাজ্জাজ কিছুটা অনুতপ্ত হয়ে হাসান বসরির কাছে এসে তার হাতে চুম্বন করেন এবং তার সাহসিকতার প্রশংসা করেন।

তাসাউফের প্রসার: হাসান বসরি (রহ.)-এর প্রচেষ্টায় ইলমে তাসাউফ বসরা, কুফা, বাগদাদসহ বিভিন্ন অঞ্চলে প্রসার লাভ করে। তাকে সুফিবাদের শাস্ত্রীয় ও তাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

শিষ্যবর্গ: রাবেয়া বসরি, হাবিব আযমিসহ অনেক উঁচু স্তরের অলি ছিলেন হাসান বসরি (রহ.)-এর শিষ্য। তিনি আব্দুল ওয়াহিদ বিন যায়েদ (রহ.)-কে খিলাফত প্রদান করেন।

ইন্তেকাল: হযরত হাসান বসরি (রহ.) ১১০ হিজরিতে ৯০ বছর বয়সে বসরায় ইন্তেকাল করেন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. হযরত হাসান বসরি (রহ.) কত হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন?
২. কোন সুফি সাধক নবি পরিবারে লালিত পালিত হওয়া একজন বিখ্যাত তাবেয়ি ছিলেন?
৩. হযরত হাসান বসরির (রহ.) মাতা কার সেবিকা ছিলেন?
৪. সুফিবাদের শাস্ত্রীয় ও তাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় কাকে?

উত্তরের জন্য দেখো ৩১৩ পৃষ্ঠা।

পাঠ ৮ হযরত আব্দুল কাদির জিলানি (রহ.) এবং হযরত বাহাউদ্দিন নকশবন্দ (রহ.)
Hazrat Abdul Qadir Jilani (R) and Hazrat Bahauddin Naqshband (R)

আব্দুল কাদির জিলানি (রহ.) হলেন ইসলাম ধর্মের অন্যতম প্রধান আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব। তিনি ইসলামের অন্যতম প্রচারক হিসেবে সুবিদিত, সে কারণে তাকে 'গাউস-উল আজম' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। ইসলাম ধর্ম অনুসারীদের কাছে তিনি বড়পির আব্দুল কাদির জিলানি (রহ.) নামে খ্যাত।

হযরত আব্দুল কাদির জিলানি (রহ.) (৪৭১-৫৬২ হি.)

নাম, উপাধি ও জন্ম: তাঁর পূর্ণ নাম মুহিউদ্দিন আবু মুহাম্মদ ইবনে আবি সালিহ জঙ্গী দোস্ত (রহ.)। তার উপাধি মাহবুবে সুবহানি (আল্লাহ তাআলার প্রিয়), কুতুবে রব্বানি (প্রতিপালকের দলের নেতা)। তিনি ৪৭০ মতান্তরে ৪৭১ হিজরির ১ রমজান, কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ তীরে পর্বতঘেরা তৎকালীন ইরানের জিলান অথবা গিলান নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাই তাকে জিলানি বলা হয়। তাঁর পিতার নাম সাইয়্যেদ আবু সালিহ মুসা জঙ্গী এবং মাতার নাম সাইয়্যেদা উম্মুল খায়ের ফাতিমা। পিতার দিক দিয়ে তিনি হযরত হাসান বিন আলি (রা.) এবং মাতার দিক দিয়ে হযরত হুসাইন বিন আলি (রা.)-এর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। উভয় দিক দিয়েই তিনি মহানবি (সা.)-এর বংশোদ্ভূত ছিলেন।

শিক্ষা-দীক্ষা: বাল্যকাল থেকে আব্দুল কাদির জিলানি (রহ.) পড়াশুনার প্রতি খুব মনোযোগী ছিলেন। শিশু বয়সে তিনি কুরআন মাজিদ হিফয করেন। অল্প বয়সে তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেন। অতঃপর মা তার প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাণকেন্দ্র বাগদাদ গমন করেন।
বাগদাদে আব্দুল কাদির জিলানি (রহ.) নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। তিনি তিবরিযির কাছে ভাষাতত্ত্ব এবং কয়েকজন উস্তাদের কাছে হাম্বলি মতান্তরে শাফেই ফিকহ অধ্যয়ন করেন। এ সময় তিনি হজ পালন করেন এবং বিবাহ করেন। নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়ন করে তিনি তাফসির, হাদিস, ফিকহ, আরবি সাহিত্য, মানতিক, ফালসাফা (দর্শন), ইলমুল কালাম প্রভৃতি বিষয়ে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য: হযরত আব্দুল কাদির জিলানি (রহ.) বাল্যকাল থেকেই সত্যবাদী, সাহসী এবং মিষ্টভাষী ছিলেন। তিনি ছিলেন সত্যবাদিতার এক মূর্ত প্রতীক। তিনি যে সত্যবাদিতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন তা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবন্ধ আছে। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য বাগদাদ গমন করেন। বাগদাদ গমনকালে তাঁর মা তাঁর জামার আস্তিনের নিচে চল্লিশটি স্বর্ণ মুদ্রা সেলাই করে দেন এবং বলেন— 'কখনো মিথ্যা কথা বলবে না।' তাঁর কাফেলা 'হামদন' নামক স্থানে পৌঁছালে ডাকাত কবলিত হয়। ডাকাতদল যাত্রীদের সব মালামাল লুট করে নেয়। ডাকাতদল তাঁর কাছে কোন কিছু আছে কিনা জানতে চাইলে, তিনি তাঁর জামার আস্তিনের নিচে লুকানো স্বর্ণামুদ্রা দেখিয়ে বলে আমার কাছে চল্লিশটি স্বর্ণমুদ্রা আছে। ডাকাতরা বলল, তুমি তো লুকানো স্বর্ণমুদ্রা কথা স্বীকার না করলেও পারতে। কিসে তোমাকে সত্য বলতে উদ্বুদ্ধ করেছে? তখন তিনি উত্তরে বললেন, 'মা আমাকে মিথ্যা না বলতে উপদেশ দিয়েছেন। তাই আমি সত্য বলেছি।' তাঁর সত্যবাদিতায় মুগ্ধ হয়ে ডাকাতদল লজ্জিত হলো এবং খালেস তাওবা করে খাঁটি মুসলমানে পরিণত হয়ে গেলো।

অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন ও ইসলাম প্রচার: আব্দুল কাদির জিলানি (রহ.)-এর শায়খ আবু সা'দ মুখারিমি (রহ.) একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং আব্দুল কাদির জিলানি (রহ.)-কে ঐ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। আবদুল কাদির জিলানি (রহ.) ঐ মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি ইলমে শরিয়ত ও তাসাউফ প্রচার করতেন। প্রতি শুক্রবার ও সোমবার মাদ্রাসায় এবং প্রতি রবিবার খানকায় তিনি ধর্মোপদেশ দিতেন। অতি দ্রুত শ্রোতার সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাঁর ওয়াজ-নসিহত (ধর্মোপদেশ) শুনে অনেক ইয়াহুদি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং অনেক মুসলমান উঁচু স্তরের অলিতে পরিণত হন।

রচনাবলি: হযরত আব্দুল কাদির জিলানি (রহ.)-এর রচনাবলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে: ১. গুনিয়াতুত তালেবিন, ২. ফাতহুল গায়ব, ৩. আল ফাতহুর রব্বানি, ৪. হিযবু বাশারিল খাইরাত, ৫. জালালুল খাতির ৬. আল মাওয়াহিবুর রহমানিয়্যা, ৭. বাহজাতুল আসরাত।

কাদিরিয়া তারিকা: আব্দুল কাদির জিলানি (রহ.)-এর নামানুসারে সুফিদের একটি তরিকা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর নাম তারিকা-ই-কাদিরিয়া। (اَلطَّرِيْقَةُ الْقَادِرِيَّةُ) এ তরিকায় ইলমে শরিয়ত এবং তাসাউফকে সমানভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। হুবহু রাসুলুল্লাহ (সা.) এবং সাহাবিগণের আদর্শে এর সব ইবাদত-বন্দেগি, মুরাকাবা, মুশাহাদা পরিচালিত হয়। হযরত আব্দুল কাদির জিলানি (রহ.) ঐ তরিকার ইমাম।

ইন্তেকাল: ৫৬২ হিজরির ১১ রবিউস সানি তিনি ইন্তেকাল করেন। আমাদের দেশে তাঁকে 'বড়পির' বলা হয়ে থাকে। অনেকে তাঁকে গাউসুল আযম (মহান সাহায্যকারী) বলেন। তবে অধিকাংশ আলেমের মতে, কোনো মানুষকে গাউসুল আযম বলা ঠিক নয়।

হযরত বাহাউদ্দিন নকশবন্দ (রহ.) (৭১৭-৭৯১ হি.)

নাম, জন্ম ও জন্মস্থান: তাঁর নাম মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ বাহাউদ্দিন আল-বুখারি। তিনি নকশবন্দ (نَقْشِ بَنْد) নামে পরিচিত। নকশবন্দ অর্থ 'চিত্রকর'। অর্থাৎ মহান আল্লাহ তত্ত্বের অতুলনীয় চিত্রাঙ্কনকারী, হৃদয়ে প্রকৃত পবিত্রতার স্বরূপ ধারণকারী। তিনি ৭১৭ হিজরি মোতাবিক ১৩১৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ ফেব্রুয়ারি বুখারার কাছে কুশক হিন্দুওয়ান (পরবর্তীকালে এর নাম হয় কুশক আরিফান) নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই তাঁর চরিত্র ও আদর্শে আধ্যাত্মিকতার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যাচ্ছিল।

শিক্ষা-দীক্ষা: ১৮ বছর বয়সে তিনি বুখারার কাছে সামমাস গ্রামে মুহাম্মদ বাবা আস সামমাসি (Muhammad Baba As-Sammasi) এর কাছে সুফি তরিকার দীক্ষা গ্রহণ করেন। আস-সামমাসির ইন্তেকালের পর বাহাউদ্দিন নকশবন্দ (রহ.) বুখারায় ফিরে যান এবং কুশক হিন্দুওয়ানে বসবাস শুরু করেন। এরপর তিনি নাসাফ গমন করে আস-সামমাসির বিখ্যাত শিষ্য আমির কুলানের কাছে শিক্ষা গ্রহণ অব্যাহত রাখেন। অতঃপর বুখারায় ফিরে এসে আমির কুলানের বিখ্যাত শিষ্য আরিফ আদ আদীক কিরানির কাছে সুফিবাদের শিক্ষা গ্রহণ করেন। এখানে তিনি দীর্ঘ সাত বছর শিক্ষাগ্রহণ ও সাধনায় নিয়োজিত থাকেন।

তাঁর তরিকা: বাহাউদ্দিন নকশবন্দ (রহ.)-এর নামানুসারে চার তরিকার মধ্য হতে একটি বিখ্যাত তরিকা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এর নাম নকশবন্দিয়া (نَقْش بَنْدِيَّة) তরিকা। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) ও হযরত সালমান ফারিসি (রা.) সিলসিলা এসে তাঁর পর্যন্ত এসে পৌছে নকশবন্দিয়া তরিকা নাম ধারণ করে। তরিকার ক্ষেত্রে তিনি ওয়াস করনি (রহ.)-এর অনুসারী ছিলেন বিধায় তাকে 'ওয়ারসি' বলা হতো।

উক্ত তরিকার আটটি বিশেষ পরিভাষা রয়েছে। এর সাথে তিনি আরও তিনটি পরিভাষা সংযোজন করেন। তা হচ্ছে—

وُقُوْفِ زَمَانِىْ ওয়াকুফ-ই-যমানি (Awareness of Time) وُقُوْفِ قَلْبِىْ ওয়াকুফ-ই-কালবি (Awareness of Heart)

وُقُوْفِ عَدَدِىْ ওয়াকুফ-ই-আদাদি (Awareness of Numbers)

বাণী সংকলন: আলাউদ্দিন আত্তার আল-বুখারির অনুরোধে মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ বাহাউদ্দিন নকশবন্দ (রহ.)-এর বাণীসমূহ সংকলন করেন। তাঁর বাণীসমূহ ফারসি হাদাইক-এ উল্লিখিত হয়েছে।

ইন্তেকাল: ৭৯১ হিজরির, ৩ রবিউল আউয়াল, মোতাবেক ১৩৮৯ খ্রিষ্টাব্দের, মার্চের, সোমবার তিনি ইন্তেকাল করেন। রাশাহাত অনুসারে নিজ গ্রাম কুশক হিন্দুওয়ানে তাকে সমাহিত করা হয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মুহিউদ্দিন আবু মুহাম্মদ ইবনে আবি সালিহ জঙ্গী সাধারণ মানুষের কাছে কোন নামে পরিচিত?
২. আমাদের দেশে হযরত আব্দুল কাদির জিলানি (রহ.) কী নামে পরিচিত?
৩. হযরত আব্দুল কাদির জিলানি ও ডাকাতদলের মধ্যে সংঘটিত ঘটনার মূল শিক্ষা কী? *[সকল বোর্ড ২০১৯]*
৪. নকশবন্দ (نَقْشِ بَنْد) শব্দের অর্থ কী?

উত্তরের জন্য দেখো ৩১৩ পৃষ্ঠা।

পাঠ ৯ হযরত মুইনুদ্দিন চিশতি (রহ.) এবং হযরত শায়খ আহমদ সিরহিন্দি (রহ.)
Hazrat Mueenuddin Chisti (R) and Hazrat Sheikh Ahmad Shirhindi (R)

হযরত মুইনুদ্দিন চিশতি (রহ.) (৫৩৬-৬৩২ হি.)

পরিচয় ও জন্ম: তাঁর নাম মুইনুদ্দিন হাসান। চিশতিয়া তরিকার দীক্ষা গ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব করার কারণে তাঁর নামের শেষে 'চিশতি' শব্দটি যুক্ত করা হয়েছে। 'চিশতি' একটি গ্রামের নাম, যা খোরাসানে অবস্থিত। উক্ত গ্রামে তাঁর সপ্তম ঊর্ধ্বতন পীর খাজা ইসহাক চিশতি (রহ.) বসবাস করতেন। বিধায় তাঁর প্রচারিত তরিকাকে চিশতিয়া তরিকা বলা হয়। মুইনুদ্দিন চিশতির (রহ.) পিতার নাম গিয়াস উদ্দিন হাসান (রহ.) এবং মাতার নাম উম্মুল ওয়ারাহ। পিতৃকুলের দিক দিয়ে তিনি হোসাইন (রা.) এবং মাতৃকুলের দিক দিয়ে হযরত হাসান (রা.)-এর বংশধর। মুইনুদ্দিন চিশতি (রহ.) ৫৩০ মতান্তরে ৫৩৬ বা ৫৩৭ হিজরিতে ইস্পাহানের অন্তর্গত সিস্তান জনপদের সাঞ্জার নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর উপাধি হচ্ছে আফতাবে হিন্দ (ভারতের সূর্য), সুলতানুল হিন্দ (ভারতের আধ্যাত্মিক বাদশাহ) এবং গরিবে নওয়াজ (দরিদ্রের প্রতি দয়াবান)।

শিক্ষা-দীক্ষা: নয় বছর বয়সে মুইনুদ্দিন পবিত্র কুরআন মাজিদ মুখস্থ করেন। এরপর খোরাসানের আলিমদের কাছে তাফসির, হাদিস, ফিকহ ও ইলমে তাসাউফের জ্ঞান অর্জন করেন। ১৫ বছর বয়সে তিনি পিতৃহারা হন। এর কিছুদিন পর তার মাও ইন্তেকাল করেন। অতঃপর তিনি বুখারা গমন করেন এবং মাওলানা শরফুদ্দিন ও মাওলানা হাসান উদ্দিনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ২২ বছর বয়সে তিনি বুখারা ত্যাগ করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাণকেন্দ্র বাগদাদ গমন করে বড়পীর আব্দুল কাদির জিলানি (রহ.)-এর সান্নিধ্য লাভ করেন। আব্দুল কাদির জিলানি (রহ.) তাঁকে শরিয়ত, মারিফত, তরিকত ও হাকিকতের বাতিনী ফায়েয দান করেন। আব্দুল কাদির জিলানি (রহ.) সান্নিধ্যে থেকে তিনি কুরআন, হাদিস, ফিকহ ও তাসাউফের গভীর জ্ঞানার্জন অব্যাহত রাখেন। শুধু তাই নয়, ওলি-দরবেশগণের সাহচার্য লাভের জন্য তিনি সিরিয়া, কিরমান, হামাদান, তাবরিয, আস্তারাবাদ, সমরকন্দ, আরাকান, হিরাত, বলখ প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করেন।

ভারতবর্ষে ইসলাম প্রচার: স্বীয় পীর উসমান হারুনি (রহ.)-এর নির্দেশনা এবং স্বপ্নে রাসুলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে তিনি ভারতবর্ষে আগমন করেন। তখন ভারতবর্ষের সর্বত্র কুফর ও শিরকে পরিপূর্ণ ছিল। দীন প্রচারের মহান ব্রত নিয়ে তিনি আজমিরে মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেন। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, খাজা মুইনুদ্দিন চিশতির প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষে ৯০ লক্ষাধিক লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। কুফর, শিরকের পরিবর্তে দলে দলে লোক ইসলামে দীক্ষিত হয়।

চিশতিয়া তরিকাচর্চা: চিশতিয়া তরিকার সূচনা হয়েছিল খোরাসানে খাজা ইসহাক চিশতি (রহ.)-এর হাতে, তবে ভারতবর্ষে মুইনুদ্দিন চিশতির প্রচেষ্টায় এ তরিকা এত ব্যাপকতা লাভ করেছিল যে, মুইনুদ্দিন চিশতি (রহ.)-কে এ তরিকার অন্যতম ইমাম হিসেবে গণ্য করা হয়।

লিখিত গ্রন্থসমূহ: তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে রয়েছে: ১. আনিসুল আরওয়াহ, ২. গাঞ্জুল আসরার, ৩. হাদিসুল মাআরিফ, ৪. রিসালায়ে অযুদিয়া, ৫. দিওয়ানে খাজা, ৬. রিসালায়ে দর কাসবে লাফুস ইত্যাদি।

বিখ্যাত শিষ্য: তাঁর অসংখ্য শিষ্যের মধ্যে বিশ্ববিখ্যাত তিনজন ব্যক্তিত্ব হলেন, ১. কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকি (রহ.) ২. আহাদুদ্দিন কিরমানি (রহ.) ও ৩. শিহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দি (রহ.)।

ইন্তেকাল: ৬৩২ হিজরিতে মতান্তরে ৬৩৩ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন। ভারতের আজমিরে তাকে সমাহিত করা হয়।

হযরত শায়খ আহমদ সিরহিন্দি (রহ.) (৯৭১-১০৩৪ খ্রি.)

জন্ম ও বংশ পরিচয়: শায়খ আহমদ সিরহিন্দি ৯৭১ হিজরির ৪ শাওয়াল ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের ওমরগড় অঞ্চলের 'সিরহিন্দ' শহরে জন্মগ্রহন করেন। তাঁর পুরো নাম আবুল বারাকাত বদরুদ্দিন শায়খ আহমদ। উপাধি ইমামে রব্বানি এবং মুজাদিদ-ই আলফেসানি। পিতার নাম শায়খ আব্দুল আহাদ (রহ.)। শায়খ আহমদ সিরহিন্দির পিতা ছিলেন হযরত উমর (রা.)-এর বংশধর এবং তার মাতা হযরত হুসাইন (রা.)-এর বংশধর।

শিক্ষাজীবন: হযরত শায়খ আহমদ সিরহিন্দি (রহ.)-এর পিতা একজন উঁচু স্তরের আলিম ও অলি ছিলেন এবং মাতাও বিদূষী ও আবেদা (ইবাদতকারিণী) ছিলেন। পিতামাতার কাছে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন প্রখর স্মৃতি শক্তির অধিকারী। মাত্র ৬ বছর বয়সে তিনি পবিত্র কুরআন হিফয করেন। এরপর উর্দু ও ফার্সি ভাষা শিক্ষা গ্রহণ করেন। ৭ বছর বয়সে স্থানীয় মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে হাদিস, তাফসির ও ফিকহের জ্ঞানার্জন করেন। ১০ বছর বয়সে কানপুর গমন করে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে ব্রতী হন। দীর্ঘ সাত বছর তাফসির, হাদিস, ফিকহ, আকাইদ, আরবি সাহিত্য, কাব্য, ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন ও বিজ্ঞান বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। বিশ্ববিখ্যাত বহু আলিম ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিবর্গের কাছে পড়াশুনা করে ফতোয়া প্রদান ও হাদিস বর্ণনার ইযাযত লাভ করেন। অতঃপর শিয়ালকোট গমন করে মাওলানা কামালউদ্দিন কাশ্মিরী (রহ.)-এর কাছে ইলমে মানতিকে (তর্কশাস্ত্রে) পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি আকবরাবাদ (আগ্রা)সহ বিভিন্ন স্থানে গমন করে বিশ্ববিখ্যাত আলিমগণের কাছে জ্ঞানার্জন করত ইজতিহাদ করার সর্বোচ্চ যোগ্যতা অর্জন করেন। লাহোরে অবস্থানকালে মাওলানা জালালউদ্দিন তিলভী ও মাওলানা আব্দুল হাকিম শিয়ালকোটী তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁর সংস্কার কর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে মুজাদ্দিদ-ই-আলফেসানি (দ্বিতীয় সহস্রাব্দের সংস্করক) উপাধিতে ভূষিত করেন।

ধর্মীয় সংস্কার: হযরত শায়খ আহমদ সিরহিন্দি (রহ.) যখন ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন তখন ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বত্র শিরক, বিদআত, পিরপূজা এবং কুসংস্কারে ছেয়ে গিয়েছিল। তিনি সব অন্যায় কর্ম থেকে ইসলামকে মুক্ত করে সত্যিকারে শরিয়ত সর্বশ্বেরবাদের পরিবর্তে তিনি 'আল্লাহ তাআলাই সব শক্তির উৎস' মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন।

রচনাবলি: হযরত শায়খ আহমদ সিরহিন্দি (রহ.) রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে: ১. মাআরিফ-ই-লাদুন্নিয়া, ২. রিসালা-ই-মাবদা ওয়া মাআদ, ৩. মুকাশিফাত-ই-গায়বিয়্যা, ৪. শারহি রুবাইয়্যাত, ৫. রিসালায়ে রদ্দে রাওয়াফিয, ৬. মাকতুবাত শরিফ ইত্যাদি।

ইন্তেকাল: ১০৩৪ হিজরির, ২৮ সফর, মোতাবেক ১৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দের, ৩০ নভেম্বর এই মহান সংস্কারক ও সাধক ইন্তেকাল করেন। সিরহিন্দে তাকে সমাহিত করা হয়। তাঁর নামানুসারে নকশবন্দিয়া তরিকাকে নকশাবন্দিয়া মুজাদ্দিদিয়া তরিকা বলা হয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. হযরত মুইনুদ্দিন চিশতি (রহ.) ইস্পাহানের কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
২. 'আফতাবে হিন্দ', 'সুলতানুল হিন্দ' কার উপাধি?
৩. হযরত মুইনুদ্দিন চিশতি (রহ.) কার সান্নিধ্যে থেকে কুরআন, হাদিস, ফিকহ ও তাসাউফের গভীর জ্ঞানার্জন অব্যাহত রাখেন?
৪. স্বীয় পির উসমান হারুনি (রহ.)-এর নির্দেশনা এবং স্বপ্নে রাসুলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে কে ভারতবর্ষে আগমন করেন?
৫. 'ইমামে রব্বানি' এবং 'মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানি' কার উপাধি?
৬. নকশবন্দিয়া তরিকাকে কার নামানুসারে 'নকশবন্দিয়া মুজাদ্দিদিয়া তরিকা' বলা হয়?

উত্তরের জন্য দেখো ৩১৩ পৃষ্ঠা।

খ. দলীয় কাজ

শিক্ষার্থীরা দুটি দলে ভাগ হয়ে এক দল হযরত মুইনুদ্দিন চিশতি (রহ.)-এর ভারতবর্ষে ইসলাম প্রচার এবং অন্য দল হযরত শায়খ আহমদ সিরহিন্দি (রহ.)-এর ধর্মীয় সংস্কার সম্পর্কে লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ১০ নৈতিক, অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক মূল্যবোধ গঠনে তাসাউফের ভূমিকা
Role of Tasawuf in Forming Moral, Non-communal and Human Values

তাসাউফ মানুষকে উত্তম চরিত্রের আবশ্যকীয় গুণাবলি অর্জনে উদ্বুদ্ধ করে এবং সকল ধরনের অন্যায়, পাপাচার এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বিরত রাখে। ফলে মানুষের মধ্যে নৈতিক গুণাবলির বিকাশ ঘটে এবং অসাম্প্রদায়িকতার চেতনা সৃষ্টি হয়। কুরআন ও হাদিসের আলোকে এবং সুফি-সাধকদের জীবনাচরণ থেকে এর সত্যতা প্রমাণিত। যেমন—

মহান আল্লাহর পরিচয় লাভ: আল্লাহ তাআলা সকল শক্তি, ক্ষমতা, জ্ঞান ও গুণের মূল উৎস। মহান আল্লাহ বলেন— اِنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا **অর্থ:** সমস্ত শক্তি মহান আল্লাহরই (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৬৫)। তাসাউফ মানুষকে মহান আল্লাহর স্বত্তা ও শক্তির পরিচয় প্রদান করে। ফলে সে মহান আল্লাহর দিকে ধাবিত হয় এবং সৎকর্ম সম্পাদনে অভ্যস্ত হয়। এভাবে তাসাউফ চর্চাকারীর মধ্যে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঘটে।

প্রকৃত উপকারী ইলম অর্জন: হযরত হাসান বসরি (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে, ইলম দুই প্রকার। তন্মধ্যে এক প্রকার ইলম হচ্ছে অন্তরের ইলম। আর এই ইলমই উপকারী (দারেমি)। অন্তরের ইলম এর অপর নাম তাসাউফ। একে উপকারী ইলম বলার কারণ হলো, এর মাধ্যমে ব্যক্তির অন্তর পরিশুদ্ধ হয়, আমল হয় গ্রহণযোগ্য এবং ইমান হয় পরিশোধিত। কাজেই ইলমে তাসাউফ চর্চার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ গড়ে ওঠে।

কুপ্রবৃত্তি দমন: কুপ্রবৃত্তি তথা নফসে আম্মারা মানুষের বড় শত্রু। মহান আল্লাহ পাক বলেন— اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّوْٓءِ **অর্থ:** মানুষের নফস অবশ্যই মন্দ কর্মপ্রবণ (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৫৩)। তাসাউফ চর্চার মাধ্যমে সহজেই কুপ্রবৃত্তিকে দমন করা যায়। ফলে নৈতিক গুণাবলি, অসাম্প্রদায়িক চেতনা এবং মানবিক মূল্যবোধ অর্জন করা সহজতর হয়।

পাপাচার বর্জন: আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে সকল পাপাচার বর্জন করার নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন— وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهٗ **অর্থ:** তোমরা প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য পাপ থেকে দূরে থাকো (সূরা আল-আনআম, আয়াত: ১২০)। তাসাউফ চর্চার মাধ্যমে মিথ্যাবাদিতা, ওয়াদা ভঙ্গকরণ, আমানতের খিয়ানত, মদপান, জুয়া খেলা, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, গিবত, বেপর্দা, বেহায়াপনা, সুদ, ঘুষ, হত্যা, ধর্ষণ, চুরি, ডাকাতি, প্রতারণা ইত্যাদি বর্জন করা যেমন সম্ভব; তেমনি হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, ব্যাভিচার, ক্রোধ, ঈর্ষা, ঘৃণা ইত্যাদি অপ্রকাশ্য পাপাচারও বর্জন করা সম্ভব। এগুলো বর্জন করতে পারলে নৈতিকতার উন্নয়ন হয় এবং মানবিক মূল্যবোধ শক্তিশালী হয়।

আত্মশুদ্ধি অর্জন: আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার অন্যতম পন্থা হচ্ছে তাসাউফ চর্চা। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

اَلَا اِنَّ فِى الْجَسَدِ لَمُضْغَةً اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ اَلَا وَهِىَ الْقَلْبُ۔

অর্থ: নিশ্চয়ই মানুষের দেহের মধ্যে এমন একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে, যদি তা সুস্থ থাকে, তাহলে গোটা শরীর সুস্থ থাকে এবং যদি তা অসুস্থ হয়, তাহলে সমস্ত শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে। আর সেই মাংসপিণ্ড হচ্ছে কালব (বুখারি ও মুসলিম)। অনেক বিজ্ঞজনের মতে, তাসাউফ চর্চার মাধ্যমে কালব পরিশুদ্ধ হয়। মূলত কালব পরিশুদ্ধ হলে সকল কর্মকাণ্ড হয় সুষ্ঠু, সুন্দর, শরিয়তসম্মত, নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন।

সাফল্য অর্জনের আকাঙ্খায় সৎকর্ম: মহান আল্লাহ বলেন— قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا **অর্থ:** যে আত্মাকে পবিত্র করেছে, সে সাফল্য অর্জন করেছে। আর যে আত্মাকে কলুষিত করেছে সে ধ্বংস হয়েছে (সূরা আশ-শামস, আয়াত: ৯-১০)। তাসাউফ আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার একটি হাতিয়ার। তাসাউফ চর্চাকারীরা এই হাতিয়ারের মাধ্যমে নিজেদের আত্মিক উন্নয়নের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করে। উভয় জাহানের সাফল্য লাভের আশায় তারা নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন জীবনযাপন করে।

ইবাদতের আগ্রহ বৃদ্ধি: তাসাউফ চর্চার ফলে ইবাদতের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। ফলে মানুষ পার্থিব লোভ-লালসা ত্যাগ করে মহান আল্লাহর ইবাদতে অধিক মনোনিবেশ করে। এসকল ইবাদতই মানুষকে অন্যায় ও অসৎ কর্ম থেকে দূরে রাখে এবং নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের প্রতি অনুপ্রাণিত করে।

শয়তান থেকে আত্মরক্ষা: রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'শয়তান মানুষের অন্তরের উপর হাঁটু গেড়ে বসে থাকে। যখন মানুষ মহান আল্লাহর জিকর করে তখন শয়তান বিতাড়িত হয়, আর যখন সে জিকর থেকে গাফেল থাকে তখন শয়তান কুমন্ত্রণা দেয়' (সহিহ বুখারি)। তাসাউফ চর্চার অন্যতম অঙ্গ হচ্ছে মহান আল্লাহর জিকর। এর মাধ্যমে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আত্মরক্ষা হয় এবং নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের ভিত্তি মজবুত হয়।

আল্লাহ তাআলার উপস্থিতি অনুভব: তাসাউফ চর্চাকারী সর্বদা মহান আল্লাহর উপস্থিতি অনুভব করে। এ কারণে সে অন্যায় কাজ করা থেকে বিরত থাকে এবং নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত হয়।

সুফি-সাধকদের জীবনাচরণে মানবিক মূল্যবোধ ও অসাম্প্রদায়িকতার শিক্ষা

হাসান বসরি (রহ.): হযরত হাসান বসরি (রহ.) তাসাউফ চর্চাকারী অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর একজন প্রতিবেশীর নাম শামউন। সে ছিল অগ্নি-উপাসক। শামউন হযরত হাসান বসরি (রহ.)-এর সাথে সর্বদা শত্রুতা পোষণ করত। সে হাসান বসরি (রহ.)-কে অনেক কষ্ট দিয়েছে। বৃদ্ধ বয়সে শামউন মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হল। হাসান বসরি (রহ.) জানতে পেরে শামউনের বাড়িতে গেলেন এবং তার সেবা-শুশ্রূষা করলেন। তার আন্তরিক সেবা-যত্নে শামউন অত্যন্ত খুশী হল। হাসান বসরি (রহ.)-এর আচরণে মুগ্ধ হয়ে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে শামউন ইসলাম গ্রহণ করল।

আবদুল কাদির জিলানি (রহ.): হযরত আবদুল কাদির জিলানি (রহ.) ছিলেন তাসাউফের প্রথমসারির ইমামদের অন্যতম। তিনি ছিলেন অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের মানুষ। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রতি ছিলেন দয়ালু এবং দানশীল। গরিব-দুঃখীদের সাথে ছিল তার ওঠাবসা। তার প্রতিষ্ঠিত লঙ্গারখানায় মুসলমান ছাড়াও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল।

মুঈনুদ্দীন চিশতি (রহ.): খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতি (রহ.) ছিলেন চিশতিয়া তরিকার অন্যতম ইমাম। তিনি মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টানদের কাছে সমানভাবে প্রিয় ছিলেন। তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অনেক বিধর্মী ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন।

শাহজালাল (রহ.): হযরত শাহজালাল (রহ.) বাংলাদেশ অঞ্চলে তাসাউফের দীক্ষাদাতা ছিলেন। তিনি তার গোটা জীবনে ইসলাম প্রচার ও তাসাউফের প্রশিক্ষণ কাজে অসাম্প্রদায়িকতার পরিচয় দিয়েছেন। সুরেন্দ্রকুমার দাস 'শাহজালালের মাটি' গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত শাহজালাল এবং তার অনুসারীদের মধ্যে কেউ কখনো কোনো অবস্থায় হিন্দু দেব-দেবীর বিষয়ে কোনোরূপ অন্যায় আচরণ করেছিলেন বলে শোনা যায়নি।

খান জাহান আলি (রহ.): তিনি দীর্ঘদিন বাংলাদেশের বৃহত্তর খুলনা ও যশোর অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেছেন এবং তাসাউফের দীক্ষা দিয়েছেন। এসব অঞ্চলে তিনি বহু মসজিদ, মাদরাসা ও স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন। অনাবাদি জমি চাষের উপযোগী করেছেন। বড় বড় দিঘি ও পুকুর খনন করে সুপেয় পানির ব্যবস্থা করেছেন। রাস্তাঘাট নির্মাণ করেছেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই এগুলো থেকে উপকৃত হয়েছে। খান জাহান আলির অসাম্প্রদায়িক কর্মকাণ্ডে মুগ্ধ হয়ে অনেক হিন্দু জমিদার মুসলমান হয়েছেন।

এ ধরনের অসংখ্য তাসাউফের দীক্ষাদাতা যুগে যুগে মানবতা ও অসাম্প্রদায়িক আদর্শের পরিচয় দিয়ে দেশ-বিদেশে ইসলামের বিজয়কে ত্বরান্বিত করেছেন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সকল শক্তি, ক্ষমতা, জ্ঞান ও গুণের মূল উৎস কে?
২. কী চর্চাকারীর মধ্যে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঘটে?
৩. কীসের মাধ্যমে ব্যক্তির অন্তর হয় পরিশুদ্ধ, আমল হয় গ্রহণযোগ্য এবং ইমান হয় পরিশোধিত?
৪. মানুষের বড় শত্রু কে?
৫. তাসাউফ চর্চার মাধ্যমে সহজেই কী দমন করা যায়?
৬. আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার অন্যতম পন্থা কী?
উত্তরের জন্য নিচে দেখো।

খ. একক কাজ

আত্মার পরিশুদ্ধতার জন্য তাসাউফের গুরুত্ব ১০টি বাক্যে লেখো।

পাঠ মূল্যায়নের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর

পাঠ-১: ১. তাসাউফ; ২. সত্যিকারের কল্যাণ ও সাফল্য; ৩. মরমিবাদ; ৪. কুরআন ও হাদিসের শিক্ষা; ৫. শরিয়ত; ৬. পশম বা Wool।

পাঠ-২: ১. কুরআনের শিক্ষা; ২. পাশ্চাত্য পন্ডিতদের অনেকেই; ৩. কুরআনকে; ৪. মহান আল্লাহ; ৫. মহান আল্লাহ।

পাঠ-৩: ১. তাসাউফের সাধনাতে; ২. হেরা পর্বতের গুহায়; ৩. মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর; ৪. আহলি সুফফা; ৫. সুফি যুননুন মিশরি থেকে; ৬. শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (রহ.)।

পাঠ-৪: ১. সমন্বয় সাধন; ২. প্রধান দুটি দিক; ৩. শরিয়ত; ৪. এক এবং অভিন্ন; ৫. কার্যকারিতা ও প্রকৃতিগত দিক থেকে।

পাঠ-৫: ১. তাসাউফের; ২. একাগ্রতা; ৩. অন্তরের ইলম বা তাসাউফ।

পাঠ-৬: ১. তার আত্মা; ২. অপবিত্র; ৩. মহান আল্লাহর জিকিরে; ৪. সালাতের মাধ্যমে; ৫. সুস্থ ও পবিত্র।

পাঠ-৭: ১. ২১ হিজরি; ২. হযরত হাসান বসরি (রহ.); ৩. উম্মুল মুমিনিন হযরত উম্মে সালমা (রা.)-এর; ৪. হযরত হাসান বসরি (রহ.)-কে।

পাঠ-৮: ১. হযরত আব্দুল কাদির জিলানি (রহ.); ২. বড় পির; ৩. সত্যবাদিতাই পরম মুক্তি; ৪. চিত্রকর।

পাঠ-৯: ১. সিস্তান জনপদের সাঞ্জারে; ২. হযরত মুইনুদ্দিন চিশতি (রহ.)-এর; ৩. হযরত আব্দুল কাদির জিলানি (রহ.)-এর; ৪. হযরত মুইনুদ্দিন চিশতি (রহ.); ৫. হযরত শায়খ আহমদ সিরহিন্দি (রহ.)-এর; ৬. হযরত শায়খ আহমদ সিরহিন্দি (রহ.)-এর।

পাঠ-১০: ১. মহান আল্লাহ; ২. তাসাউফ; ৩. তাসাউফ চর্চার; ৪. কুপ্রবৃত্তি তথা নফসে আম্মারা; ৫. কুপ্রবৃত্তি; ৬. তাসাউফ চর্চা।

৫ এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

সুফি	'সুফি' শব্দটির উৎপত্তি আরবি 'সুফ' শব্দ থেকে। সুফ এর আভিধানিক অর্থ 'পশম'। আর যারা স্বল্পমূল্যের পশমের পোশাক পরিধান করেন তারা হলেন সুফি। কেউ কেউ বলেন— সুফি শব্দটি আরবি 'সফ' শব্দ থেকে গৃহীত। এর অর্থ- কাতার বা লাইন। যেহেতু সম্মানিত সুফিগণ মহান আল্লাহর নৈকট্যের ক্ষেত্রে সবার আগের কাতারের তাই তাদের উপাধি সুফি হয়েছে।
আহলে সুফফা	আহলে সুফফা অর্থ— চত্তরবাসী। ঐ সকল মহৎপ্রাণ সাহাবি আহলে সুফফা নামে পরিচিত, যারা জ্ঞানার্জনের জন্য ভোগবিলাস ত্যাগ করে অতি সাধারণ জীবনযাপন করতে সর্বদা মসজিদে নববীর চত্তরে অবস্থান করতেন। আহলে সুফফার সদস্যগণ খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ ও মানবিক চাহিদার কোনো চিন্তা করতেন না। মহানবি (সা.)-এর দরবারে হাদিয়া হিসেবে যা আসতো তা থেকেই তাঁরা তাদের প্রয়োজন পূরণ করতেন। এদের সংখ্যা ছিল ৭০ থেকে ৮০ জন।
শরিয়ত	শরিয়ত আরবি শব্দ। এর অর্থ— পথ, রাস্তা। এটি জীবনপদ্ধতি, আইন-কানুন, বিধি-বিধান অর্থেও ব্যবহৃত হয়। ইসলামি আইন-কানুন ও বিধিবিধানকে একত্রে শরিয়ত বলা হয়। মানুষের জীবন পরিচালনার জন্য মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.) যেসব আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধান প্রদান করেছেন তাকে শরিয়ত বলে।
আত্মশুদ্ধি	আত্মশুদ্ধি অর্থ হলো নিজের সংশোধন, নিজেকে খাঁটি করা, পরিশুদ্ধ করা ইত্যাদি। সকল প্রকার অনৈসলামিক কথা ও কাজ থেকে নিজ অন্তরকে মুক্ত রাখাকে আত্মশুদ্ধি বলা হয়। দৈহিক পবিত্রতা লাভ করলেই চলবে না বরং অন্তরকেও পবিত্র করতে হবে। আত্মশুদ্ধি হলো সফলতা লাভের মাধ্যম। ইহজীবনে আত্মশুদ্ধি মানুষকে পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত করে।
তরিকা	তরিকা আরবি শব্দ। এর অর্থ— পথ। এটি সুফিবাদের একটি ধারা বা মতাদর্শ। তরিকাতে একজন মুর্শিদ থাকেন, যিনি আধ্যাত্মিক নেতার ভূমিকা পালন করেন। তরিকার অনুসারীদেরকে মুরিদ বলা হয়। মুসলমানদের আধ্যাত্মিক সাধনার নিয়ম-নীতি ও পদ্ধতিকে তরিকা বলে। শরিয়ত অনুযায়ী আমল করার জন্য যেমন মাযহাব প্রয়োজন, আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য তেমনি তরিকার প্রয়োজন। প্রধান সুফি তরিকা চারটি। যথা- চিশতিয়া, কাদেরিয়া, নকশবন্দিয়া, মুজাদ্দেদিয়া।
ইলম	ইলম আরবি শব্দ। এর অর্থ— জ্ঞান, জানা, অবগত হওয়া, বিদ্যা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায়, ইলম হলো কোনো বস্তুর প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করা। ইসলামে ইলমের গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলাম জ্ঞানার্জনকে সব মুসলিমের উপর ফরজ করেছে। ইলমের অনেক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। এর মধ্যে যে ধরনের ইলম অর্জন করলে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য করা যায়, বৈধ-অবৈধ বোঝা যায় এবং মহান আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভ করা যায় তাই হলো উত্তম ইলম।
ইবাদত	ইবাদত শব্দের অর্থ— আনুগত্য, বশ্যতা বা চূড়ান্ত বিনয় প্রকাশ করা। প্রকাশ্য কিংবা গোপনীয় যতসব কথা ও কাজ আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন ও পছন্দ করেন, সে সবের একটি সমষ্টির নাম ইবাদত। যেমন— সালাত কায়েম করা, সিয়াম পালন করা, জাকাত, সাদাকাহ, কুরবানি করা, কুরআন তিলাওয়াত, মহান আল্লাহর গুণ বর্ণনা, মানুষের হক আদায় ইত্যাদি ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত।

সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

ক. জ্ঞানমূলক

■ তাসাউফের পরিচয়

প্রশ্ন-১. তাসাউফের মূলকথা কী?

উত্তর: আত্মাকে পরিশুদ্ধ রেখে সব অনৈতিক কাজ থেকে মুক্ত থাকার মাধ্যমে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করাই তাসাউফের মূলকথা।

প্রশ্ন-২. আহলে সুফফা কারা?

উত্তর: যেসব সাহাবি (রা.) জ্ঞান অর্জন ও আধ্যাত্মিকতায় গুরুত্বারোপ করে মসজিদে নববি চত্বরে অবস্থান করতেন তারাই আহলে সুফফা নামে পরিচিত।

■ তাসাউফের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

প্রশ্ন-৩. শরিয়ত কী?

উত্তর: ইসলাম মানুষের বাহ্যিক জীবনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় যে বিধান দিয়েছেন তাই শরিয়ত।

প্রশ্ন-৪. কুরআনের ভাষ্য মতে প্রভুর সাথে সাক্ষাতের মাধ্যম কী?

উত্তর: প্রভুর সাথে সাক্ষাতের মাধ্যম হলো সৎকাজ করা।

■ আত্মাকে সুস্থ ও পবিত্র রাখার উপায়

প্রশ্ন-৫. তাহনিক কী?

উত্তর: কোনো তাকওয়াবান কর্তৃক খেজুর বা অন্য কোনো মিষ্টিফল চিবিয়ে আঙুলে নিয়ে নবজাতক শিশুর মুখে দেওয়াকে তাহনিক বলে।

প্রশ্ন-৬. তওবা কী?

উত্তর: কৃত গুনাহের জন্য অনুতপ্ত হয়ে ভবিষ্যতে ঐ গুনাহ না করার প্রতিশ্রুতি দেওয়াকে তওবা বলে।

প্রশ্ন-৭. সবর কী?

উত্তর: প্রবৃত্তির দাবি মানতে যে শক্তি বা অবস্থা মানুষকে বিরত রাখে তাকে সবর বলে।

প্রশ্ন-৮. বড়পীর নামে কে প্রসিদ্ধ? *[ঢা. বো., চ. বো., ব. বো. '১৭]*

উত্তর: হযরত আব্দুল কাদির জিলানি (রহ.)।

প্রশ্ন-৯. কে সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে ইসলাম প্রচার করেন?

উত্তর: খাজা মুইনুদ্দিন চিশতি (রহ.) সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে ইসলাম প্রচার করেন।

■ নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ গঠনে তাসাউফের ভূমিকা

প্রশ্ন-১০. নৈতিক মূল্যবোধ বলতে কী বোঝ?

[রা. বো., দি. বো., কু. বো., সি. বো., ব. বো. '১৭]

উত্তর: নৈতিক মূল্যবোধ বলতে মানুষের সেইসব সর্বজনীন মূল্যবোধকে বোঝায় যেগুলো নীতিজ্ঞান ও বিবেকবোধ থেকে উৎসারিত হয়ে মানুষের কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করে।

খ. অনুধাবনমূলক

প্রশ্ন-১. তাসাউফের উৎপত্তি বর্ণনা করো।

উত্তর: ইসলামি বিশেষজ্ঞগণের মতে তাসাউফের উৎপত্তি ইসলামের মূল উৎস হতেই হয়েছে।

পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণ মনে করেন, তাসাউফের উৎপত্তি হয়েছে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান কিংবা পারসিক পরিবেশের প্রভাব থেকে। একদল পণ্ডিতের মতে হিন্দুদের বেদান্ত দর্শন হতে তাসাউফের উদ্ভব হয়েছে। আরেক দল পণ্ডিতের মতে তাসাউফের মূল হলো বৌদ্ধ বা খ্রিষ্টান দর্শন। তৃতীয় একদল পণ্ডিতের মতে পারসিক আধ্যাত্মিকসাধকের প্রভাব হতে তাসাউফের উৎপত্তি হয়েছে।

প্রশ্ন-২. "তাসাউফ শরিয়তেরই একটি অংশ"— কথাটি বুঝিয়ে লেখো।

উত্তর: শরিয়তের সাথে তাসাউফের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় অর্থাৎ তাসাউফ শরিয়তেরই একটি অংশ।

শরিয়তের বিধি-বিধানের সাথে সম্পর্ক থাকবে না ইসলামে এমন তাসাউফের স্থান নেই। দেহ ও আত্মার সাথে যেমন সম্পর্ক, শরিয়তের সাথে তাসাউফেরও তেমন সম্পর্ক। তাসাউফ মহান আল্লাহর প্রেম ও ধ্যানের ওপর প্রতিষ্ঠিত আর শরিয়ত ইসলামের বাহ্যিক আচরণের ওপর প্রতিষ্ঠিত। দুটির সমন্বয়েই একজন ওলি বা সুফি কামিলিয়াত অর্জন করতে সক্ষম হন। তাই বলা যায়, তাসাউফ শরিয়তেরই একটি অংশ।

প্রশ্ন-৩. 'যে ব্যক্তি নিজের সত্তাকে চিনেছে সে চিনেছে তার রবকে'— কথাটি বুঝিয়ে লেখো।

উত্তর: 'যে ব্যক্তি নিজের সত্তাকে চিনেছে সে চিনেছে তার রবকে'— কথাটি দ্বারা তাসাউফের গুরুত্বকে বোঝানো হয়েছে।

তাসাউফের মাধ্যমে কুরআন ও সুন্নাহনির্ভর একটি আধ্যাত্মিক জীবন ব্যবস্থাকে নির্দেশ করা হয়েছে। কুরআন ও হাদিসে বর্ণনা পাওয়া যায়, যা থেকে সহজেই তাসাউফের অস্তিত্ব বোঝা যায়। আলোচ্য কথাটির মাধ্যমে তাসাউফের গভীর দার্শনিক শিক্ষা পাওয়া যায়। নিজের সত্তাকে চিনে আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে আল্লাহকে লাভ করা যায়। কুরআন ও হাদিসেও এর সমর্থন রয়েছে।

প্রশ্ন-৪. আত্মাকে সুস্থ ও পবিত্র রাখার উপায় কী? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: আত্মাকে সুস্থ ও পবিত্র রাখার উপায় হলো তাসাউফের অনুশীলন।

মানুষের চালিকাশক্তি ও জীবনীশক্তি হলো আত্মা। আত্মা পবিত্র থাকলে মানুষ পবিত্র থাকে। আত্মা সুস্থ থাকলে মানুষও সুস্থ থাকে। শরীর সুস্থ ও পবিত্র থাকার পরও যদি কেবল আত্মা অপবিত্র বা অসুস্থ থাকে তাহলে মানুষের পক্ষে সুস্থ ও পবিত্র থাকা সম্ভব হয় না। আর তাসাউফের মাধ্যমে আত্মিক পরিশুদ্ধতা অর্জনের মাধ্যমে আত্মাকে সুস্থ ও পবিত্র রাখা যায়।

প্রশ্ন-৫. কলুষমুক্ত জীবন গঠনে তাসাউফের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: কলুষমুক্ত জীবন গঠনে তাসাউফের ভূমিকা অপরিসীম।

কলুষমুক্ত জীবন গঠনে প্রয়োজন অন্তর পরিশুদ্ধকরণ। অন্তর পরিশুদ্ধ করার ইসলামসম্মত যেকোনো চেষ্টাই হলো তাসাউফ। তাসাউফের সাধনা মানুষের অন্তরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে। আর পরিশুদ্ধ অন্তরের মানুষ পরম পবিত্র সত্তা আল্লাহ তাআলার দিদার লাভে ধন্য হয়।

প্রশ্ন-৬. 'শরিয়ত ও তাসাউফ পরস্পর পরিপূরক'— বুঝিয়ে লেখো।

[ঢা. বো., চ. বো., ব. বো. '১৭]

উত্তর: শরিয়ত ও তাসাউফ একে অপরের ওপর নির্ভরশীল।

কেবল শরিয়ত মেনে চললে যেমন তা গ্রহণযোগ্য হয় না, তেমনি শুধু তাসাউফের অনুসরণেও সাফল্য লাভ সম্ভব নয়। এজন্য একই সাথে শরিয়ত ও তাসাউফের অনুসরণ অনিবার্য। যেমন-শরিয়ত সালাতের নির্দেশ দেয়। কিন্তু সালাতের গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে তাসাউফের ওপর। এ কারণে শরিয়ত ছাড়া তাসাউফ বা তাসাউফ ছাড়া শরিয়ত পালনে সাফল্য নেই। তাই শরিয়ত ও তাসাউফ পরস্পর পরিপূরক।

প্রশ্ন-৭. 'ইসলামে বৈরাগ্যবাদের স্থান নেই'— ব্যাখ্যা করো।

[ঢা. বো., দি. বো., সি. বো., য. বো. '১৮]

উত্তর: পরিবার-পরিজন ছেড়ে একাকিত্বের জীবন ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়— আলোচ্যাংশে এ বিষয়টিই প্রকাশিত হয়েছে।

ইসলামি শরিয়তে তাসাউফ বা মহান আল্লাহর নৈকট্যলাভে উৎসাহিত করা হয়েছে, কিন্তু এর নামে বৈরাগ্যবাদকে নিষেধ করা হয়েছে। বৈরাগ্যবাদ বলতে পরিবার-পরিজন ছেড়ে শুধু মহান আল্লাহকে পাওয়ার ধ্যানমগ্ন থাকাকে বোঝায়। মহানবি (সা.) বৈরাগ্যবাদকে নিরুৎসাহিত করেছেন। এমনকি বৈরাগ্যবাদের ভুল প্রবণতাকে নিরুৎসাহিত করতে নবি (সা.) অবিবাহিতদের বিবাহিতদের তুলনায় নিকৃষ্ট বলে অভিহিত করেছেন। এছাড়াও বৈবাহিক জীবন ত্যাগকারীদের শয়তানের ভাই বলে ভর্ৎসনা করেছেন।

প্রশ্ন-৮. তাওয়াক্কুল বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলার ওপর নির্ভরশীল থাকার নাম হলো তাওয়াক্কুল।

তাওহিদের ধারণা থেকে তাওয়াক্কুলের জন্ম। ইসলামে মহান আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটি একটি ইবাদত। মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ওপর তাওয়াক্কুল বা ভরসা রাখা শিরক। একজন ইমানদার কল্যাণকর বিষয়ের জন্য নিজের সাধ্যমত চেষ্টা করবে, আর ফলাফলের জন্য মহান আল্লাহ তাআলার ওপর ভরসা করবে। এটাই তাওয়াক্কুলের মূল কথা। তাওয়াক্কুলের নীতি অবলম্বনকারী ব্যক্তি কখনো হতাশ হয় না।

প্রশ্ন-৯. হাসান বসরির পরিচয় দাও।

[রা. বো., দি. বো., কু. বো., সি. বো., য. বো. '১৭]

উত্তর: হযরত হাসান বসরি (রহ.) একজন বিখ্যাত তাবেয়ি ও সুফি দার্শনিক।

হযরত হাসান বসরি (রহ.) হিজরি ২১ মোতাবেক ৬৪২ খ্রিষ্টাব্দে মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জীবনের বেশিরভাগ সময় বসরায় অতিবাহিত করেছেন বিধায় তাঁর নামের সাথে 'বসরি' শব্দটি যুক্ত হয়েছে। তাঁর পিতার নাম মুসারাযি, যিনি হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর মায়ের নাম খায়েরাহ। ইলমে ফিকহ ও ইলমে তাসাউফের চর্চার মাধ্যমে হযরত হাসান বসরি (রহ.) অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। তাঁকে সুফিবাদের শাস্ত্রীয় ও তাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

প্রশ্ন-১০. ইসলাম প্রচারে হযরত আব্দুল কাদির জিলানি (রহ.) এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: ইসলাম প্রচারে হযরত আব্দুল কাদির জিলানি (রহ.) অসাধারণ ভূমিকা রাখেন।

আব্দুল কাদির জিলানি (রহ.) মাদরাসার অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি ইলমে শরিয়ত ও তাসাউফ প্রচার করতেন। প্রতি শুক্র ও সোমবার এবং প্রতি রবিবার খানকায় তিনি ধর্মোপদেশ দিতেন। এতে অতি দ্রুত তার শ্রোতার সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তার ওয়াজ-নসিহত শুনে অনেক ইয়াহুদি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং অনেক মুসলমান উঁচু স্তরের ওলিতে পরিণত হন।

প্রশ্ন-১১. আব্দুল কাদির জিলানি (রহ.)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

উত্তর: হযরত আব্দুল কাদির জিলানি (রহ.)-কে রাসুলুল্লাহ (সা.) এর বংশধর বলে গণ্য করা হয়।

হযরত আব্দুল কাদির জিলানি ১০৭৭ খ্রিষ্টাব্দে ইরানের জিলান শহরে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মস্থানের নামানুসারে তাকে জিলানি বলা হয়। তার উপনাম আবু সালেহ, উপাধি মুহিউদ্দিন। তার পিতার নাম আবু সালেহ মুসা। তিনি হযরত ফাতেমা (রা.)-এর পুত্র ইমাম হাসান (রা.)-এর বংশধর ছিলেন। তার মাতার নাম উম্মুল খায়ের ফাতিমা। তিনি ইমাম হুসাইন (রা.)-এর বংশধর ছিলেন। এজন্য হযরত আব্দুল কাদির জিলানি (রহ.)-কে আওলাদে রাসুল বলে গণ্য করা হয়।

প্রশ্ন-১২. নকশবন্দিয়া তরিকা বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: বাহাউদ্দিন নকশবন্দী (রহ.) এর উদ্ভাবিত তরিকার নাম নকশাবন্দিয়া তরিকা। পূর্ণ আধ্যাত্মিকতা অর্জনে হযরত বাহাউদ্দিন (রহ.) যে দিকে তাকাতেন সেদিকেই মহান আল্লাহ নকশা অঙ্কিত হয় বলে তার নামে প্রচলিত তরিকাকে নকশা বন্দিয়া তরিকা বলা হয় এ তরিকার আটটি বিশেষ তরিকাতে নকশাবন্দিয়া তরিকা বলা হয়, এ তরিকার আটটি বিশেষ পরিভাষা রয়েছে। বাহাউদ্দিন নকশাবন্দ এর সাথে আরও তিনটি পরিভাষা সংযোজন করেন।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'তাসাউফ' শব্দের শাব্দিক অর্থ কী?
ক. পশমি পোশাক পরিধান করা
খ. রেশমি পোশাক পরিধান করা
গ. মখমলের পোশাক পরিধান করা
ঘ. সুতী পোশাক পরিধান করা

২. 'তাসাউফ' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে কোন শব্দ থেকে?
ক. মুসাফি থেকে খ. সুফ থেকে
গ. মাসাফি থেকে ঘ. সুফি থেকে

৩. আত্মশুদ্ধি অর্জনের প্রথম পথ কোনটি?
ক. শরিয়ত খ. তাসাউফ
গ. হাকিকত ঘ. মারেফাত

৪. 'দেহ ও অন্তর পবিত্র করার সাধনাকে তাসাউফ বলে' কথাটি কে বলেছেন?
ক. জুনায়েদ বাগদাদি খ. আল-কুশায়রী
গ. ইমাম গাযযালি ঘ. যুননুন মিশরি

৫. আত্মার পরিশুদ্ধতা কেন প্রয়োজন?
ক. আত্মাই জীবন বলে
খ. আত্মা শরীর দ্বারা প্রভাবিত বলে
গ. আত্মা শরীরকে পরিচালনা করে তাই
ঘ. আত্মা কালিমাযুক্ত তাই

৬. তাসাউফের মধ্যে কয়টি তরিকা খ্যাতি অর্জন করেছে?
ক. চার খ. পাঁচ
গ. ছয় ঘ. সাত

৭. আসহাবে সুফফার অবস্থান কোথায় ছিল?
ক. মক্কার মসজিদে খ. তায়েফের মসজিদে
গ. মদিনার মসজিদে ঘ. মীনার মসজিদে

৮. শরিয়ত ও তাসাউফের সম্পর্ক কেমন?
ক. দেহের সাথে আত্মার যেমন
খ. গাছের সাথে শেকড়ের যেমন
গ. প্রদীপের সাথে বাতির যেমন
ঘ. একটি অপরটির বিপরীত

৯. চিশতিয়া তরিকার প্রবর্তক কে ছিলেন?
ক. আব্দুল কাদের জিলানি
খ. খাজা মুইনুদ্দিন চিশতি
গ. খাজা ইসহাক চিশতি
ঘ. শায়খ আহমদ সিরহিন্দি

১০. জনাব মাসুদ এক সুফিসাধক। তিনি একজন শীর্ষস্থানীয় সুফির অনুস্মরণে সাধনা করেন। দুঃখ ও চিন্তাকে তিনি সর্বদা নিজের সঙ্গী করে নিয়েছেন। জনাব মাসুদ কোন মহান সুফির অনুসরণ করছেন?
ক. ইমাম গাযযালি (রহ.) খ. ইমাম আওযায়ী (রহ.)
গ. হাসান বসরি (রহ.) ঘ. আবু হালিম কুফি (রহ.)

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন

১১. 'যে ব্যক্তি নিজেকে চিনেছে সে চিনেছে তার প্রভুকে' এ বাণীটিতে যে বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে—
i. তাসাউফ
ii. আখিরাত iii. আত্মশুদ্ধি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

১২. ইসলাম একটি সুদৃঢ় সম্পর্ক তৈরি করে দিয়েছে—
i. শারীরিক জীবনযাত্রার সাথে
ii. আত্মিক জীবনযাত্রার সাথে
iii. আখিরাতের জীবনের সাথে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৩ ও ১৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া রানা ইসলামকে সেকেলে মনে করে। সে বলে বসে বসে তসবিহ পড়া আর ধ্যান করার নাম ইসলাম। আনিস তার প্রত্যুত্তরে বলে, ইসলাম শাশ্বত। অমর জীবনের গুরুত্বের সাথে ব্যাবহারিক জীবনেও সমান গুরুত্ব বহন করে।

১৩. আনিসের বক্তব্যে ইসলামের কোন বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশ পেয়েছে?
ক. আধ্যাত্মিকতা খ. প্রয়োগ উপযোগিতা
গ. ব্যাবহারিক জীবন ঘ. সর্বজনীনতা

১৪. আনিসের কথায় ইসলামের গুরুত্ব ফুটে উঠেছে—
i. দুনিয়ার জীবনের
ii. আখিরাতের জীবনের
iii. সমাজ জীবনের
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

খ. বোর্ড পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৫. "আল্লাহর জিকির দ্বারাই মানবাত্মাসমূহ প্রশান্তি লাভ করে থাকে"— এটি আদর্শ জীবনের কোন পর্যায়ে ঘটে থাকে? *[সকল বোর্ড ২০২৫]*

ক. ব্যক্তি জীবনে খ. পারিবারিক জীবনে
গ. সামাজিক জীবনে ঘ. রাষ্ট্রীয় জীবনে

১৬. تَصَوُّفٌ শব্দের মূল صُوْفٌ হলে এর অর্থ কী? *[সকল বোর্ড ২০১৭]*

ক. পরিচ্ছন্ন খ. পশম
গ. সারি ঘ. জ্ঞান

১৭. হযরত আবদুল কাদির জিলানি (রহ) ও ডাকাতদলের মধ্যে সংঘটিত ঘটনার মূল শিক্ষা হলো— *[সকল বোর্ড ২০১৭]*

ক. একত্ববাদ সাফল্যের চাবিকাঠি
খ. সাহসিকতা সাফল্যের মূলমন্ত্র
গ. আধ্যাত্মিকতাই পরম মুক্তি
ঘ. সত্যবাদিতাই পরম মুক্তি

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৮ ও ১৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে এমন কিছু মনীষী অবদান রেখেছেন যাঁরা মহান আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থেকে আত্মার পবিত্রতা এবং মানবাত্মার সাথে স্রষ্টার মিলন সাধনে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁরা মহানবি (সা.)-এর নিম্নোক্ত বাণীর পূর্ণ অনুসারী ছিলেন:
تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ-
ফলে সর্বসাধারণের নিকট তাঁরা সমাদৃত ছিলেন। *[সকল বোর্ড ২০১৯]*

১৮. উদ্দীপকে বর্ণিত মনীষীদের কী বলা হয়?
ক. ফকিহ খ. আবিদ গ. সুফি ঘ. আলিম

১৯. উদ্দীপকে উল্লিখিত মহানবি (সা.)-এর বাণীটি বাস্তব জীবনে অনুসরণ করলে সমাজে—
i. নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বৃদ্ধি পাবে
ii. একতা ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে
iii. মানুষের মাঝে সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. i ও ii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

উত্তরমালা

১	ক	২	খ	৩	খ	৪	খ	৫	গ	৬	ক	৭	গ	৮	ক	৯	গ	১০	গ	১১	গ	১২	ক
১৩	খ	১৪	ঘ	১৫	ক	১৬	খ	১৭	ঘ	১৮	গ	১৯	ঘ										

গ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. তাসাউফের পরিচয় সংক্ষেপে লেখো।
২. তাসাউফের উৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদ কয়টি ও কী কী?
৩. রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর যুগের তাসাউফের ধারণা দাও।
৪. শরিয়ত ও তাসাউফের মধ্যকার সম্পর্ক সংক্ষেপে লেখো।
৫. তাসাউফের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করো।
৬. হযরত হাসান বসরি (রহ.)-এর পরিচয় দাও।
৭. হযরত আব্দুল কাদির জিলানি (রহ.)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লেখো।
৮. হযরত বাহাউদ্দিন নকশবন্দ (রহ.)-এর পরিচয় দাও।
৯. হযরত মুইনুদ্দিন চিশতি (রহ.)-এর ভারতবর্ষে ইসলাম প্রচার সম্পর্কে লেখো।
১০. হযরত শায়খ আহমদ সিরহিন্দি (রহ.)-এর পরিচয় দাও।

ঘ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. Y একজন মধ্যবয়সী সচ্ছল মানুষ। কিন্তু তিনি কখনো অপব্যয় করেন না এবং মৌলিক ইবাদত বাদ দেন না। বর্তমানে তিনি অধিক রাত জেগে সালাত ও জিকির-আজকার করছেন অন্তরের পরিশুদ্ধি এবং মহান আল্লাহর নৈকট্যের আশায়। তার ভাই Z বিলাসবহুল জীবনযাপন করেন। তিনি শুধু মৌলিক ইবাদতটুকুই করেন। জীবনযাপনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেন— আমি ব্যস্ত মানুষ, সময় পাই না। তা ছাড়া একদমই রাত জাগতে পারি না। *[ঢা. বো., দি. বো., কু. বো., সি. বো., য. বো. '১৭]*

ক. নৈতিক মূল্যবোধ বলতে কী বোঝ?
খ. হাসান বসরির পরিচয় দাও।
গ. Y এর আচরণ কোন দিকে ইঙ্গিত করে? তার গুরুত্ব বর্ণনা করো।
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে আত্মশুদ্ধির উপায়গুলো বিশ্লেষণ করো।

২. রাজশাহীতে হযরত শাহ মাখদুম (রহ.)-এর মাজার রয়েছে। কথিত আছে যে, সেখানে শাহ মাখদুম (রহ.) কিছু অনুসারী নিয়ে ধ্যানমগ্ন হয়ে ইবাদত করতেন। দিন দিন তাঁর অনুসারীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। তাঁর মাধ্যমে অধিক সংখ্যক মানুষ ইসলাম ধর্মে দীক্ষা লাভ করে। কেউ কেউ মনে করে তিনি আধ্যাত্মিক ক্ষমতাবলে সমস্যার সমাধান করতেন।

ক. আহলুস সুফফা কারা?
খ. 'যে নিজেকে চিনেছে, সে চিনেছে তার রবকে'— কথাটি বুঝিয়ে লেখো।
গ. শাহ মাখদুম (রহ.)-এর মধ্যে কোন ইবাদতের পরিচয় পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. মানবীয় সমস্যা সমাধানে মহান আল্লাহর কাছে উক্ত ইবাদতভিত্তিক প্রার্থনা কি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে? তোমার মতামত বিশ্লেষণ করো।

৩. জনাব মিজান ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে সকল প্রকার হিংসা-বিদ্বেষ, কাম-ক্রোধ, লোভ-লালসা ও পাশবিকতা পরিহার করে নিষ্কলুষ জীবনযাপন করেন। তিনি মানবাত্মার সাথে পরমাত্মার নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনে এমন এক মনীষীর জীবনচরিত অনুসরণ করেন যিনি মদিনায় জন্মগ্রহণ করে বিখ্যাত সাহাবিদের সাহচর্যে কুরআন, হাদিস ও দীনের সূক্ষ্ম জ্ঞান অর্জন করেন। এ মহামনীষী ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ জ্ঞান-তাপস। *[রা. বো., সি. বো. '১৯]*

ক. 'তাসাউফ' শব্দের উদ্ভব কোন শব্দ থেকে হয়েছে?
খ. "মানবিক গুণাবলির বিকাশই তাসাউফের লক্ষ্য"— ব্যাখ্যা করো।
গ. উদ্দীপকে কোন মনীষীর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. জনাব মিজানের অনুসৃত বিষয়ের সাথে ইসলামি শরিয়াহ এর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো।

৪. জনাব জাফর দীর্ঘদিন যাবৎ বিভিন্ন অপকর্মে লিপ্ত থাকে। একদা বন্ধুর সাথে ইসলামি জলসায় গিয়ে বক্তার বক্তৃতা শুনে তার অনুশোচনা আসে। ফলে সে শ্বেত ও পশমি বস্ত্র পরিধান করে প্রভুর সান্নিধ্যলাভের আশায় ইবাদত বন্দেগিতে লিপ্ত হয় এবং পরিশুদ্ধি লাভ করে। অপরদিকে জালালপুর গ্রামের অধিকাংশ মুসলমান একদিকে নামাজ পড়ে অন্যদিকে যেকোনো বিপদে পড়লে নিকটস্থ ওলির মাজারে মানত করে। বিষয়টি লক্ষ্য করে স্থানীয় আলেম মাওলানা শিবলী গ্রামবাসীকে বিপদে কেবল মহান আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাওয়ার নসিহত করেন। *[রা.বো., কু. বো., চ.বো., ব. বো. '১৮]*

ক. 'শানে-নুজুল' কী?
খ. 'আহলুল ইজমা' বলতে কী বোঝায়?
গ. জনাব জাফরের কর্মকাণ্ডে কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. যে সুফির আন্দোলনের সাথে মাওলানা শিবলীর কর্মটি সাদৃশ্যপূর্ণ তা চিহ্নিতপূর্বক তাঁর নসিহতের যথার্থতা মূল্যায়ন করো।

৫. রমিজ একজন দিনমজুর। নামাজ-রোজার কথা ভাবার সময় তার তেমন একটা হয় না। সে মনে করে যে, "আল্লাহ তাআলা আমাকে অভাবে রাখছেন। আমার এ অপরাধও মহান আল্লাহ ক্ষমা করবেন।" একদিন তার গ্রামের আ. রহিমের সাথে সে একজন হক্কানি সুফির সাক্ষাতে যায়। সুফি সাহেব তাকে নামাজ পড়ে কিনা জিজ্ঞাসা করলে, সে অভাবের কারণে অপারগতার কথা জানায়। সুফি সাহেব তার ভুল শুধরে দিয়ে নামাজের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দিলেন। কর্মব্যস্ততার মাঝেও কীভাবে যথাসময়ে নামাজ আদায় করা যায় তার নিয়ম-কানুন শিখিয়ে দিলেন। এরপর থেকে সে নিয়মিত নামাজ পড়তে অভ্যস্ত হয়ে পড়ল। *[ঢা. বো., চ. বো., ব. বো. '১৭]*

ক. বড়পীর নামে কে প্রসিদ্ধ?
খ. "শরিয়ত ও তাসাউফ পরস্পর পরিপূরক" বুঝিয়ে লেখো।
গ. রমিজের ধারণা কেন ভুল ছিল? বুঝিয়ে লেখো।
ঘ. রমিজের জীবনের মোড় পরিবর্তনে হক্কানি সুফির ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।

৬. হাবিবুর রহমান পরিবারের সাথে ঈদ করার জন্য ঢাকা থেকে বাড়ি ফিরছিল। পথিমধ্যে তার বাস ডাকাত কবলিত হয়। ডাকাতরা যাত্রীদের সবকিছু লুটে নেয়। তার কাছে কিছু আছে কি না জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, আমার কাছে পাঁচ হাজার টাকা আছে। আমি আমার সন্তানদের জন্য নিয়ে যাচ্ছি। টাকাগুলো জামার ভিতরে সুন্দরভাবে লুকানো দেখে ডাকাত সর্দার জিজ্ঞাসা করল— তুমি তো টাকার কথা স্বীকার না করলেও পারতে? তিনি বললেন, আমার মা আমাকে আদেশ করেছেন শত বিপদেও মিথ্যা না বলতে। ডাকাত সর্দার মুগ্ধ হয়ে তার টাকা ফেরত দিল।

ক. হাসান বসরি (রহ.)-এর উপনাম কী?
খ. পাপাচারমুক্ত জীবনযাপনের উপায় ব্যাখ্যা করো।
গ. হাবিবুর রহমানের সত্যবাদিতার এরূপ নিদর্শন কোন মহান ব্যক্তির জীবনের সাথে মিলে যায়? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. সৎ ও আদর্শবান মানুষ হিসেবে হাবিব ও উক্ত মহান ব্যক্তি আমাদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ বর্ণনা করো।

ঙ. সমন্বিত অধ্যায়ের সৃজনশীল প্রশ্ন

৭. রবিউল আলম জীবনে অনেক অন্যায় করেছেন। কখনো ধর্মের বিধান মেনে চালার কোনো চেষ্টাই তিনি করেননি। ফলে তার আত্মা কলুষিত হয়ে পড়েছে। সম্প্রতি একটি সড়ক দুর্ঘটনায় তিনি অল্পের জন্য বেঁচে যান। এখন তিনি নিয়মিত সালাত আদায় করছেন। ফলে তার মধ্যে এক ধরনের আত্মিক প্রশান্তি সৃষ্টি হয়েছে। তিনি আত্মশুদ্ধির আনন্দ লাভ করেছেন। *◀৬ ও ৭ অধ্যায়ের সমন্বয়ে*

ক. 'রোজা' কোন ভাষার শব্দ?
খ. হজ সবার জন্য ফরজ নয় কেন?
গ. উদ্দীপকের সালাতের কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. রবিউল আলম আত্মশুদ্ধির জন্য আর কী কী পদক্ষেপ নিতে পারেন তা পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

সহায়ক গ্রন্থসমূহ (Reference Books)

১. আল-কুরআনুল করীম— ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
২. কুরআন পরিচিতি— ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান
৩. তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন- মুফতি মুহাম্মদ শফী (রহ.)
৪. কুরআন সংকলনের ইতিহাস— আল্লামা তকী উসমানী
৫. সহীহ আল বুখারী— আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা
৬. মিশকাত শরীফ— এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা
৭. ইসলামি শরীআহ ও সুন্নাহ— ড. মুসতাফা হুসনী আল সুবায়ী
৮. হাদীস সংকলনের ইতিহাস— মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম
৯. ফিকহ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ— আবু সাঈদ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ
১০. ফাতাওয়া ও মাসাইল— ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
১১. ইসলামি আইন— আফজ এ ফৈজী/গাজী শামসুর রহমান
১২. ইসলামি শরীঅতের উৎস— মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম
১৩. ইসলামি আইনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস— আব্দুল ওহাব আল্লাফ
১৪. নূরুল আনওয়ার— মুল্লা জিওয়ান (আরাফাত পাবলিকেশান্স, ঢাকা)
১৫. দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম— ইসলামিক ফাউন্ডেশন
১৬. ইসলাম পরিচয়— ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ
১৭. মুসলিম দর্শনের ভূমিকা— ড. রশীদুল আলম
১৮. মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস— অধ্যাপক কে. আলী
১৯. মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি— ড. আমিনুল ইসলাম
২০. দ্য স্পিরিট অব ইসলাম— সৈয়দ আমীর আলী
২১. সূফীতত্ত্বের আত্মকথা— মওলানা আব্দুর রহীম হাযারী
২২. সুন্নাত ও বিদআত— মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম
২৩. আল্লাহর দীদার— অধ্যাপক ড. এ আর এম আলী হায়দার
২৪. সংক্ষিপ্ত ইসলামি বিশ্বকোষ— ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
২৫. আউলিয়া কাহিনি— অধ্যক্ষ মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ আব্দুল কাদির
২৬. হযরত মুঈনদ্দীন চিশতি (রহ.)— মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ
২৭. হাদিসে কুদসি— মুহাম্মদ আল আমীন বান্না
২৮. অলীকুল শিরোমণি হযরত হাসান বসরি (রহ.)— মাওলানা মোহাম্মদ আবুল কালাম মাসুম
২৯. উলুমুল কুরআন— ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ
৩০. ইসলামি ফিকহের পটভূমি ও বিন্যাস—ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

পরিশিষ্ট

বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র

সকল বোর্ড-২০২১

সেট: ক

ইসলাম শিক্ষা দ্বিতীয় পত্র

বিষয় কোড | ২ | ৫ | ০ |

সময় — ৩০ মিনিট

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

পূর্ণমান — ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: — সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১. **সামাজিক সমস্যা সমাধানের মূল উৎস কোনটি?**
ⓚ আল-কুরআন ⓚh আল-হাদিস
ⓖ ইজমা ⓖh কিয়াস

২. **الٓمّٓ -এর অর্থ কী?**
ⓚ এর অর্থ আল্লাহ তাআলাই অধিক জানেন
ⓚh এর অর্থ ফেরেশতারা অবগত আছেন
ⓖ এর অর্থ মুহাম্মাদ (সা.) অবগত আছেন
ⓖh এর অর্থ সাহাবাগণ অবগত আছেন

৩. **هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ -এর মর্মকথা হলো—**
ⓚ কুরআন সকলের জন্য উন্মুক্ত
ⓚh কুরআন মুত্তাকিদের জন্য পথপ্রদর্শক
ⓖ কুরআন সকলের জন্য পথপ্রদর্শক
ⓖh কুরআন রহমতস্বরূপ অবতীর্ণ

৪. **মুসলিমের অন্তর সবসময় ব্যপ্ত থাকে—**
i. নিজের উন্নতি ও সমৃদ্ধির চিন্তায়
ii. মুসলিমের কল্যাণ কামনায়
iii. একনিষ্ঠভাবে মহান আল্লাহর নির্দেশ পালনে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚh i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓖh i, ii ও iii

৫. **ইমানদার যে কারণে মুনাফিক হয়—**
ⓚ ইসলামের কোনো বিধানকে অবজ্ঞা করলে
ⓚh রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাত অবজ্ঞা করলে
ⓖ ইসলামকে দীন হিসেবে মানতে রাজি না হলে
ⓖh অন্তরে ইসলামের বিরুদ্ধে চক্রান্ত লুকিয়ে রাখলে

৬. **আদম ও হাওয়া (আ.)-কে জান্নাতে আল্লাহ তাআলা ইতিবাচক নির্দেশ দিয়েছিলেন—**
ⓚ তোমরা পারস্পরিক অধিকার আদায় করো
ⓚh তোমরা যা ইচ্ছা আহার করো
ⓖ তোমরা শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করো
ⓖh তোমরা মহান আল্লাহর নির্দেশ স্মরণ করবে

৭. **আল-কুরআন বিশ্ববাসীর জন্য সর্বজনীন পথপ্রদর্শক। এর কারণ, এটি—**
i. সকল জাতির হেদায়েতের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে
ii. আরব জাতির হেদায়েতের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে
iii. সর্বকালের সকল মানুষের জন্য সমাধান দেয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚh ii ও iii
ⓖ i ও iii ⓖh i, ii ও iii

৮. **হাদিসের আলোকে প্রকৃত বীর কে?**
ⓚ যে রাগের সময় প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে পারে
ⓚh যে রাগের সময় নিজেকে সংযত রাখতে পারে
ⓖ যে রাগকে মোটেও ভয় পায় না
ⓖh যে সর্বদা অন্যায়ের প্রতিবাদ করে

৯. **বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী মুসলিম ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন থাকবেন—**
ⓚ ফেরেশতাদের সাথে
ⓚh গাজিদের সাথে
ⓖ শহিদদের সাথে
ⓖh বন্ধুদের সাথে

১০. **خَلِيْفَةٌ শব্দের অর্থ কী?**
ⓚ প্রতিনিধি ⓚh নেতা
ⓖ শাসক ⓖh বয়স্ক ব্যক্তি

১১. **ইসলামি বই রচনা, ইসলামি সাহিত্য ও কবিতা ইত্যাদি লেখা কোন ধরনের সদকা?**
ⓚ সদকায়ে যায়েদাহ
ⓚh সদকায়ে জারিয়াহ
ⓖ নফল সদকা
ⓖh সদকাতুল ফিতর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১২ ও ১৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
ফিকহশাস্ত্রের জনপ্রিয় একজন ইমাম ৮০ হিজরিতে ইরাকের কুফায় জন্মগ্রহণ করেন। তার ফিকহি চিন্তাধারার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একটি মাযহাব যা সর্বাধিক জনপ্রিয়।

১২. **উদ্দীপকে কোন ইমামের কথা বলা হয়েছে?**
ⓚ ইমাম মালিক (রহ.)
ⓚh ইমাম আবু হানিফা (রহ.)
ⓖ ইমাম শাফেয়ি (রহ.)
ⓖh ইমাম আহমদ (রহ.)

১৩. **উদ্দীপকে বর্ণিত মাযহাবের বৈশিষ্ট্য হলো—**
i. তত্ত্ব, তথ্য, হিকমত ও কল্যাণকামিতার ওপর প্রতিষ্ঠিত
ii. খুবই সহজ, সরল ও অনায়াসসাধ্য
iii. অনুসারী সংখ্যা বিশ্বে সর্বাধিক
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚh i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓖh i, ii ও iii

১৪. **ইসলাম প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার সর্ব পর্যায়ে সর্বাধিক ক্ষতি সাধন করেছে কারা?**
ⓚ মুশরিকরা ⓚh মুনাফিকরা
ⓖ ইহুদিরা ⓖh খ্রিষ্টানরা

১৫. **রাসুলুল্লাহ (সা.) সদকা হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন—**
i. বৃক্ষ রোপণকে
ii. ফসল ফলানোকে
iii. বৃক্ষ থেকে প্রাপ্ত দ্রব্যকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚh i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓖh i, ii ও iii

১৬. **ইবাদতের মূল লক্ষ্য কী?**
ⓚ জান্নাত পাওয়া
ⓚh জাহান্নাম থেকে মুক্তি
ⓖ আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন
ⓖh সওয়াব অর্জন

১৭. **কোন ইবাদতে বিনয় ও আনুগত্যের পূর্ণ প্রকাশ ঘটে?**
ⓚ সালাত ⓚh জাকাত
ⓖ সাওম ⓖh হজ

১৮. **কোনটি বান্দার হক?**
ⓚ সালাত আদায় করা
ⓚh রমজান মাসে রোজা রাখা
ⓖ পিতা-মাতার খেদমত করা
ⓖh হজব্রত পালন করা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৯ ও ২০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
জুহায়ের আসর সালাত আদায় করে বের হলে রাস্তার মোড়ে তালহার সাথে দেখা হলো। তালহা জুহায়েরকে চা পানের আহ্বান করলে জুহায়ের বলল, "আমি এমন একটি বিধান পালন করছি যা আমাকে এখন যাবতীয় পানাহার থেকে বিরত রেখেছে।"

১৯. **জুহায়ের যে বিধানের কথা বলল সেটি কী?**
ⓚ জাকাত ⓚh সালাত
ⓖ হজ ⓖh সিয়াম

২০. **উক্ত বিধান ব্যক্তির জন্য—**
i. আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনে সহায়তা করবে
ii. সমাজে তার নেতৃত্বের আসন তৈরি করবে
iii. জাহান্নাম হতে ঢাল স্বরূপ হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓚh i ও ii
ⓖ i ও iii ⓖh ii ও iii

২১. **রাতের দুশ্চিন্তা ও দিনের লাঞ্ছনা হিসেবে হাদিসে কোনটিকে উল্লেখ করা হয়েছে?**
ⓚ অর্থ ⓚh সম্পদ
ⓖ ঋণ ⓖh বংশমর্যাদা

২২. **হাদিসে জোর দেওয়া হয়েছে—**
i. নৈতিক গুণ অর্জন করার প্রতি
ii. আখলাকে যামিমা চর্চা করার প্রতি
iii. অনৈতিক কার্যকলাপ বর্জন করার প্রতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚh i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓖh i, ii ও iii

২৩. **দুইজন আইনবেত্তার মধ্যে মূল আইনের কোন বিষয়ে মতভেদ থাকতে পারে?**
ⓚ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ⓚh পর্যবেক্ষণে
ⓖ প্রমাণে ⓖh বাস্তবায়নে

২৪. **রাযি পার্থিব জীবনে তার কারবার, লেনদেন, সামাজিক আচরণ ইত্যাদি সঠিক ও সঙ্গতভাবে পরিচালনা করে। তার এ কার্যক্রম গণ্য হবে—**
ⓚ ইহসান হিসেবে
ⓚh ইবাদত হিসেবে
ⓖ ন্যায়-বিচার হিসেবে
ⓖh সুন্নাহ হিসেবে

২৫. "মানুষ তার বন্ধুর দীন বা জীবনাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়। অতএব, প্রত্যেকেরই দৃষ্টি রাখা উচিত যে, সে কার সাথে বন্ধুত্ব করছে।" হাদিসটি বাস্তব জীবনে অনুসরণ করলে তরুণ-তরুণীসহ সকলে—
i. বিপথগামীতা থেকে রক্ষা পাবে
ii. নিজেদের চরিত্রকে নির্মল রাখতে পারবে
iii. দুনিয়ার উপকারিতা থেকে বঞ্চিত হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৬ ও ২৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
জনাব আব্দুল্লাহ বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে নির্দিষ্ট নিয়মাবলি পালনের মাধ্যমে ইসলামের একটি মৌলিক বিধান আদায়ের মনস্থ করেছেন এবং সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছেন। বন্ধু আহমাদ সাহেব দেখা করতে এসে বললেন, 'বছর শেষে তোমার সম্পদের নির্দিষ্ট অংশ নির্ধারিত খাতে ব্যয় করাও তোমার ওপর অবশ্য কর্তব্য।'

২৬. জনাব আব্দুল্লাহ যে বিধান পালনের জন্য মনস্থ করেছেন সেটি কী?
ⓚ সাওম ⓛ হজ
ⓖ জাকাত ⓘ কুরবানি

২৭. বন্ধু আহমাদ সাহেবের বক্তব্যে যে ইবাদতের উল্লেখ করা হয়েছে, তা সঠিক নিয়মে পালনের দ্বারা—
i. ধনী-গরিবের মাঝে সেতুবন্ধন তৈরি হবে
ii. অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে
iii. নেতৃত্বের গুণাবলি বিকশিত হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓛ ii
ⓖ ii ও iii ⓘ i ও ii

২৮. মহান আল্লাহর হক আদায়ে আমাদের করণীয়—
i. সামগ্রিক জীবনে মহান আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্ব স্বীকার করা
ii. আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত সকল প্রকার বিধি-নিষেধ মেনে চলা
iii. সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণকারী হয়ে থাকা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓛ i ও ii
ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৯. সূরা আল-বাকারার প্রথম রুকুতে উল্লেখিত 'অদৃশ্যের উপর বিশ্বাস করা' কাদের বৈশিষ্ট্য?
ⓚ হাফেজগণের
ⓛ মুজাহিদগণের
ⓖ শহিদগণের
ⓘ মুত্তাকিগণের

৩০. পূর্ণ ইমানদার হতে হলে রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে ভালোবাসতে হবে—
i. সন্তান-সন্ততির চেয়ে বেশি
ii. পিতা-মাতার চেয়ে বেশি
iii. সকল মানুষের চেয়ে বেশি
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

উত্তর																														
	১	ক	২	ক	৩	খ	৪	গ	৫	ঘ	৬	খ	৭	গ	৮	খ	৯	গ	১০	ক	১১	খ	১২	খ	১৩	ঘ	১৪	খ	১৫	ক
	১৬	ক	১৭	ক	১৮	গ	১৯	ঘ	২০	গ	২১	গ	২২	খ	২৩	ক	২৪	খ	২৫	ক	২৬	খ	২৭	ঘ	২৮	ঘ	২৯	ঘ	৩০	ঘ

ঢাকা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী ও দিনাজপুর বোর্ড-২০২১

সময় — ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **সৃজনশীল প্রশ্ন** পূর্ণমান — ৭০

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যে কোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১.▶ আল-কুরআনে সব সমস্যার সমাধান রয়েছে। "এই গ্রন্থ মুত্তাকিদের জন্য পথ প্রদর্শক।" কিছু লোক সম্পর্কে বলা হয়েছে, যারা ভালো কথা শুনেও না শোনার ভান করে যেন তাদের অন্তরে শ্রবণযন্ত্রে সীল করা হয়েছে। অপর একটি দল আছে যারা মুমিনদের সাথে একরকম কথা বলে আর তাদের অসৎ বন্ধুদের সাথে অন্যরকম কথা বলে।
ক. اَلْكِتَابُ (আল-কিতাব) অর্থ কী? ১
খ. "আল-কুরআন মুত্তাকিদের জন্য পথ প্রদর্শক"— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত প্রথম দলের ব্যক্তি কারা? তাদের আলামতগুলো বর্ণনা করো। ৩
ঘ. অপর দলের ব্যক্তিদের আচরণে মানব জীবনে কীরূপ প্রভাব পড়ে? বিশ্লেষণ করো। ৪

২.▶ "আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে যদি তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকে, তাহলে এর মতো একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এসো।" তিনি বললেন, "নিশ্চয়ই আমি যা জানি, তোমরা তা জান না"।
ক. 'কুরআন' অর্থ কী? ১
খ. "এটা সেই কিতাব যাতে কোনো সন্দেহ নেই"— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. দ্বিতীয় বাক্যের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বর্ণনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে কোন বিষয়ের চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে? কারো পক্ষে এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা সম্ভব কি না? ব্যাখ্যা করো। ৪

৩.▶ "যারা আল্লাহ তাআলার সাথে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে এবং মহান আল্লাহ যা অক্ষুণ্ণ রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে, আর পৃথিবীর বুকে অশান্তি সৃষ্টি করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।"
"তোমরা কেমন করে আল্লাহ তাআলাকে অস্বীকার করছ? অথচ তোমরা মৃত ছিলে। অতঃপর পুনরায় তোমাদের জীবিত করবেন, পরিশেষে তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।"
ক. খলিফা (خَلِيْفَةٌ) অর্থ কী? ১
খ. وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (তারাই সফলকাম) — ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে ক্ষতিগ্রস্ত কারা? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের দ্বিতীয় আয়াতের আলোকে মানব জীবনের পরিবর্তিত স্তরগুলো ব্যাখ্যা করো। ৪

৪.▶ মহানবি (সা.) বলেছেন "আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যতদিন ৫
তামরা সে দুটিকে আঁকড়ে ধরে থাকবে ততদিন পথভ্রষ্ট হবে না।"
ক. হাদিস (حَدِيْثٌ) কাকে বলে? ১
খ. "তিনি ওহী ব্যতীত কোনো কথাই বলেন না"- ব্যাখ্যা করো। ২
গ. 'দুটি জিনিস'-এর দ্বিতীয়টির গুরুত্ব বর্ণনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উদ্দীষ্ট প্রথম বিষয়টির পরিচয় দাও এবং মানব জীবনে এর গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

৫.▶ জনাব মুহসিন জুমার খুতবা দানকালে বলেন যে, ইমানের সত্তরটিরও বেশি শাখা-প্রশাখা রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট শাখা হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা এবং সর্বনিম্ন শাখা হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা। আর লজ্জাশীলতা ইমানের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।
ক. ইসলাম (اِسْلَامٌ) অর্থ কী? ১
খ. ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ সম্পর্কে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ইমানের সর্বোৎকৃষ্ট শাখাটি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "লজ্জাশীলতা ইমানের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ"— হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৬.▶ ফিলিস্তিনের মুসলিমদের উপর অত্যাচার করার খবরে পাশের দেশের মুসলিমরা সমবেত হয়ে প্রতিবাদ জানায়। সেখানে বক্তারা বলেন— মুসলিমরা একে অপরের ভাই। সে তার ভাইকে সুরক্ষা দেবে এবং প্রয়োজন পূরণ করবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, "মুমিনগণ তাদের পারস্পরিক সহানুভূতি প্রদর্শনের ব্যাপারে একই দেহের মতো"।
ক. মুত্তাফাকুন আলাইহি (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) অর্থ কী? ১
খ. "দুজন ব্যতীত হিংসা (اَلْحَسَدُ) নয়"— বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. "সকল মুসলিম ভাই ভাই"— উদ্দীপকের আলোকে লেখো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে মুমিনগণের পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন হবে? ব্যাখ্যা করো। ৪

৭.▶ সরকার একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে সারা দেশে এক কোটি গাছ লাগানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতে যেমন পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হবে তেমনি বৃক্ষ রোপণকারীরা সওয়াবেরও অংশীদার হবে। কেননা মানুষ বা পশু-পাখি সেখান থেকে ফল খায় বা উপকৃত হয়। হাদিসের ভাষ্যমতে এক শ্রেণির লোক কিয়ামতের দিন শহিদদের সাথে থাকবেন।

ক. মাজলুম (مَظْلُوْمٌ) অর্থ কী? ১

খ. "সে যেন দেখে কার সাথে বন্ধুত্ব করছে"— বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকে সরকারের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিটি কোন ধরনের সওয়াবের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত হাদিসটির আলোকে কারা কিয়ামতের দিন শহিদদের সাথে থাকবেন? তাদের গুণাবলি বিশ্লেষণ করো। ৪

৮.▶ জসিম তার বন্ধু নুমানের সাথে কথা প্রসঙ্গে বলেন যে, 'আমরা যে যা-ই করি না কেন প্রত্যেকটা বিষয়ে জবাবদিহি করতে হবে।' নুমান বললেন, 'এজন্য আমাদেরকে বৈধ উপায়ে উপার্জন করতে হবে কেননা সেটা ফরজের পরে ফরজ।'

ক. মতন কী? ১

খ. "উপরের হাত নিচের হাত থেকে উত্তম"— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. "তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল"— উদ্দীপকের আলোকে বর্ণনা করো। ৩

ঘ. নুমানের উক্তিটি তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৯.▶ ইসলামি আইন-কানুন ও ইবাদত সম্পর্কিত মৌলিক বিষয়সমূহ ব্যতীত সেগুলোর শাখা-প্রশাখাতে মুসলিম আইন বিশারদগণের বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। এরকম একজন আইনবিশারদ ৮০ হিজরি সনে কুফায় জন্মগ্রহণ করেন। সতেরো বছর বয়সে বিশেষভাবে বিদ্যার্জনে মনোনিবেশ করেন। তিনি হাম্মাদের নিকট ১০ বছর যাবত মাসআলা বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন। খলিফা মনসুর তাকে কারাগারে বন্দী করেন এবং সেখানেই ১৫০ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।

ক. ফিকহশাস্ত্রের চারটি উৎসের নাম লেখো। ১

খ. "নেতৃত্ব হাসিল করার পূর্বে তোমরা ফিকহ হাসিল করো"— এ কথা কেন বলা হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকে মুসলিম আইন বিশারদগণের বিভিন্ন মতামত বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে কার কথা বলা হয়েছে? ফিকহশাস্ত্রে তার অবদান মূল্যায়ন করো। ৪

১০.▶ আল্লাহ তাআলা এক বিশেষ উদ্দেশ্যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। কতিপয় মানুষ মহান আল্লাহর নির্দেশমত জীবন-যাপন করে। তারা প্রতিদিন পাঁচবার পবিত্র অবস্থায় এক বিশেষ ধরনের কাজ সম্পাদন করে। এটা ইসলামের এক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হিসেবে বিবেচিত।

ক. জাকাত অর্থ কী? ১

খ. "রোজা ঢালস্বরূপ"— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. আল্লাহ তাআলা 'এক বিশেষ উদ্দেশ্যে' মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে কোন ধরনের ইবাদতের কথা বলা হয়েছে? এ ইবাদতের পরিচয় ও গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

১১.▶ রিফা একটি নির্দিষ্ট মাসে সুবহি সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও অন্যান্য কাজ থেকে বিরত থাকে। আড়ালে-আবডালে গিয়েও কোনো কিছু খায় না। তার বন্ধু নিজা বছর শেষে সম্পদের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশ নির্ধারিত ৮টি খাতে খরচ করে।

ক. 'হজ'-এর আক্ষরিক অর্থ কী? ১

খ. "ইমানের নিদর্শন হলো সালাত"— বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. রিফা যে ইবাদত পালন করে তার পরিচয় ও সামাজিক গুরুত্ব বর্ণনা করো। ৩

ঘ. নিজার কর্মকাণ্ডে কোন ইবাদতের পরিচয় ফুটে উঠেছে? দারিদ্র্য বিমোচনে উক্ত ইবাদতের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

বরিশাল বোর্ড-২০২১

সময় — ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **সৃজনশীল প্রশ্ন** পূর্ণমান — ৭০

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যে কোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১.▶ দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী শাফিন ক্লাস শেষে তার সহপাঠী ফেরদৌসকে বলল, পবিত্র কুরআনের অনেক সূরায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইহুদি ও মুনাফিকদের নানা চক্রান্তের বিষয় যেমন উল্লেখ রয়েছে; তেমনি শান্তি প্রতিষ্ঠায় পারস্পরিক লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিচার-ব্যবস্থা ও দণ্ডবিধি ইত্যাদি বিষয়েরও বর্ণনা করা হয়েছে। তখন ফেরদৌস বলল, কখনো এক বা একাধিক আয়াত, কখনো একটি সূরা অবতীর্ণ হয়ে কুরআনের অবতরণ পূর্ণতা লাভ করেছে। এভাবে পবিত্র কুরআন মানবজাতির নিকট সহজবোধ্য একটি ঐশীগ্রন্থ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

ক. আখিরাত অর্থ লেখো। ১

খ. সূরা আল-বাকারার নামকরণের যথার্থতা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে ফেরদৌসের আলোচনায় পবিত্র কুরআনের কোন প্রকার সূরার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত শাফিনের শেষোক্ত উক্তির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ৪

২.▶ তাজুল ইসলাম তার দুই প্রতিবেশীর মধ্যে কথা লাগালাগি করে প্রচণ্ড ঝগড়া বাঁধিয়ে দিল। সাইফুল এ ধরনের কার্যক্রম থেকে বিরত থাকতে বললে প্রতি উত্তরে তাজুল বলল, আমিতো শান্তি স্থাপনকারী মাত্র। তাদের বন্ধু বিপ্লব সব শুনছিল। সে বলল, রাখ তোর কুরআন, আল্লাহ তাআলা আর পরকাল। আমি এর কোনটাই বিশ্বাস করি না। আমার কোনো চিন্তা নেই। আমার যা মনে আসে তাই করি।

ক. খাতামুন (خَتَمٌ) অর্থ কী? ১

খ. সালাত কায়েম বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সূরা আল-বাকারার আলোকে তাজুলের কার্যক্রম কোন ধরনের অনাচার? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ব্যক্তিজীবনে বিপ্লবের চিন্তাধারার প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

৩.▶ জাওয়াদ সাহেব সকালবেলা তিলাওয়াত করছিলেন–

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ

তিলাওয়াত শেষে চিন্তা করতে লাগলেন ১৪৪২ বছর পার হয়ে গেল। বিজ্ঞান, সাহিত্য এত উৎকর্ষ লাভ করল। অথচ কুরআনের এই আয়াতের মোকাবেলা করার সামর্থ কারো হয়নি। শুকরিয়া আদায় করলেন। আবার তিলাওয়াত করলেন যার মর্মার্থ- "আর যদি তা (কুরআনের মতো একটি সূরা তৈরি করতে) না পার, অবশ্যই তা তোমরা কখনো পারবে না, তাহলে সে দোযখের আগুনকে ভয় করো যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।" এবার তিনি ভাবলেন, এরূপ প্রমাণিত সত্য গ্রন্থের বক্তব্য অবশ্যই সত্যে পরিণত হবে। সুতরাং জাহান্নামের জ্বালানি হওয়া যাবে না।

ক. মানবজাতির আদি পিতার নাম কী? ১

খ. "ইয়ামামার যুদ্ধ কুরআন সংকলনকে ত্বরান্বিত করে"— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত ১ম আয়াতখানিতে কোন বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত দ্বিতীয় আয়াতখানি একজন মানুষকে কীভাবে সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ করে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৪.▶ মাসুদ একজন খুচরা আলুর ব্যবসায়ী। অন্যরা ভালো ভালো আলু সাজিয়ে উপস্থাপন করলেও তিনি ছোট-বড় আলু মিশ্রিত অবস্থায় সামনে রেখেছেন। মেপে দেয়ার সময় খুব সতর্কতার সাথে মাপেন যেন ওজনে কম না হয়। ক্রেতাদের সাথে সুন্দর আচরণ করেন। ক্রেতার ভিড়ও বেশি। মাহতাব সাহেব রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় পথের ওপর পড়ে থাকা আমের ছোলা নিজ হাতে তুলে বাইরে ফেলে দিলেন। হঠাৎ একটি সিনেমার অশ্লীল পোস্টার দেখে মাহতাব সাহেব লজ্জায় দৃষ্টি নিচু করে দ্রুত চলে গেলেন।

ক. সিহাহ সিত্তাহ কী? ১
খ. "আল্লাহ তাআলা ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই"— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. হাদিসের আলোকে মাসুদের কার্যক্রম কাদের সাথে তুলনা করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "মাহতাব সাহেবের অন্তরে ইসলামের বীজ প্রস্ফুটিত"— বিশ্লেষণ করো। ৪

৫.▶ সুমন ও মনির দুজনই এক এলাকার বাসিন্দা। সুমন বলল, পৃথিবীতে এমন একজন শাসক ছিলেন যিনি তার সৈন্য বাহিনী নিয়ে সাগরে ডুবে মারা যান। অপরদিকে মনির বলল, ঐ শাসকের বাড়িতেই একজন প্রসিদ্ধ রাসুল শিশুকালে লালিত পালিত হয়েছিলেন।

ক. ইসলামের স্তম্ভ কয়টি? ১
খ. "আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি গ্রন্থ"— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত সুমন কোন শাসকের প্রতি ইঙ্গিত করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত মনিরের বক্তব্যে যে রাসুলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে তাঁর কর্মকাণ্ড সূরা আল-বাকারার আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৬.▶ ভর দুপুর। রাশেদ সাহেব অফিসে বসে পরিবারের কথা ভাবছিলেন। দশ সদস্যের সংসার। আয় যা করেন কোনোমতে মাস চলে। দুশ্চিন্তা মেয়ের বিবাহ নিয়ে। এমন সময় স্থানীয় বহু জমিজমার এক মালিক জমির খাজনা দিতে আসলেন। কাগজপত্রে বেশ কিছু অসুবিধা থাকায় লোকটি পঞ্চাশ হাজার টাকার খাজনা দেয়ার জন্য বিশ হাজার টাকা অতিরিক্ত দিতে চাইলেন। রাশেদ সাহেব বিনয়ের সাথে তা নিতে অস্বীকার করলেন। বললেন, এ কাজ আমার দায়িত্ব। আপনি বৈধ কাগজ নিয়ে আসুন, আমি দাখিলা কেটে দেব। আমার কাজের বিনিময়ে সরকার যে বেতন দিচ্ছে তাতেই আমি খুশি। সাথী তার বান্ধবী লিজার সাথে দেখা হলে খুব লজ্জাজনক ভাষায় কথা বলে। অন্য আরেক বান্ধবীর সাথেও অনুরূপ আচরণ প্রকাশ করে। এ কারণে বান্ধবীরা সাথীকে এড়িয়ে চলতে শুরু করেছে। ফলে ধীরে ধীরে সাথী একা হয়ে পড়েছে, এতে সে মোটেও বিচলিত নয়।

ক. কোন হাত উত্তম? ১
খ. বন্ধুই বন্ধুর পরিচয়— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. রাশেদ সাহেবের উপার্জন কীরূপ? হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. সাথীর আচরণের পরিণতি বিশ্লেষণ করো। ৪

৭.▶ রিফাত ঈদের টাকা জমিয়ে কিছু গাছের চারা ক্রয় করেছে। বাড়ির নিকট নতুন রাস্তার পাশে চারাগুলো রোপণ করছে। এক পথচারী বলল, এখানে গাছ লাগিয়ে লাভ কী? এর ফল কি তুমি ভোগ করতে পারবে? রিফাত বলল, আমি না খেলেও মানুষ, পশু-পাখি খাবে। তাতেই আমার লাভ হবে। অন্যদিকে, আ. করিম সাহেব বাড়ি নির্মাণের জন্য ব্যাংকে সম্পত্তি বন্ধক রেখে টাকা নিলেন।

ক. ফরজের পরে ফরজ কী? ১
খ. "মুসলমানগণ পরস্পর ভাই ভাই"— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত রিফাতের কার্যক্রমকে হাদিসের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৩
ঘ. আ. করিম সাহেবের কার্যক্রম শান্তি বিনষ্টের কারণ হবে— ব্যাখ্যা করো। ৪

৮.▶ তালহা একটি ইবাদত পালনের জন্য প্রতিদিন পাঁচবার মসজিদে গমন করেন। ইবাদতটি তাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে সহযোগিতা করে। পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। অন্যদিকে রাহিক ওয়াজ শুনতে গিয়ে জানতে পারল ৮০ হিজরিতে একজন ইমাম কুফায় জন্মগ্রহণ করেন। যার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ফিকহশাস্ত্র গড়ে ওঠে। ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদসহ বহু মুজতাহিদ আলেম তার ছাত্র ছিলেন।

ক. ইমাম মালিক (রহ.) কত হিজরিতে জন্মগ্রহন করেন? ১
খ. "মহান আল্লাহর ইবাদত পালনেই শান্তি"— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. রাহিক ওয়াজে কোন ইমাম সম্পর্কে জানতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তালহার কর্মকাণ্ডটি অন্যদের জীবনে কী প্রভাব ফেলতে পারে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৯.▶ মামুন একজন রিকশাচালক। দীর্ঘতম দিন ও প্রচণ্ড গরমের মধ্যে সে আল্লাহ তাআলার একটি হুকুম পালন করতে সুবহে সাদিক হতে রাত পর্যন্ত পানাহার থেকে বিরত আছে। সে জানে এটি একমাত্র ইবাদত, যার পুরস্কার মহান আল্লাহ নিজ হাতে দিবেন। সাকিব একটি বই পড়ে জানতে পারল যে, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত বা মুস্তাহাব নামে কোনো পরিভাষা ছিল না। যদিও কুরআন-হাদিসের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিল শব্দগুলো। পরবর্তীতে ইসলামি সাম্রাজ্যের বিস্তার লাভ করে। তখন শরিয়ত পালন অনেকের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। হিজরি দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যে কিছু মুজতাহিদ আলেম কুরআন-হাদিসের আলোকে এবং কিয়াস ও ইজমার ভিত্তিতে কিছু ফতোয়া বা সিদ্ধান্ত দেন। তা একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রে পরিণত হয়। ইসলামি শরিয়ত পালনও সহজ হয়।

ক. প্রসিদ্ধ মাযহাব কয়টি? ১
খ. হাদিসকে কুরআনের ব্যাখ্যা বলার কারণ কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. সাকিব বই পড়ে কোন শাস্ত্রের উৎপত্তি সম্পর্কে জানতে পেরেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. মামুনের কার্যক্রমের প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

১০.▶ জনাব ইলিয়াস কুরআন এবং হাদিসে গভীর জ্ঞান লাভ করার পর অধ্যাপনা ও ফতোয়াদানে আত্মনিয়োগ করেন। ক্ষমতাসীন শাসকের বিরুদ্ধে ফতোয়া দেওয়ার কারণে তাকে ৭০টি বেত্রাঘাত করা হয়। তিনি কখনো অন্যায়ের সাথে আপস করেননি। অন্যদিকে তার প্রতিবেশী আশরাফ অনেক সম্পদের মালিক কিন্তু তিনি তার জীবনের সকল বিষয়ে আল-কুরআন ও সুন্নাহ থেকে উৎসারিত মাসআলা-মাসায়েলের তোয়াক্কা করেননি।

ক. ইমাম শাফেয়ি (রহ.)-এর মাযহাবের নাম কী? ১
খ. "মুজতাহিদ ভুল করলেও প্রতিদান প্রাপ্ত হবেন"— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত জনাব ইলিয়াসের সাথে কোন বিখ্যাত মনীষীর মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত জনাব আশরাফের কর্মকাণ্ডের শেষ পরিণতি বিশ্লেষণ করো। ৪

১১.▶ কোভিড-১৯ এর প্রেক্ষিতে মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশ বিদেশিদের সে দেশে প্রবেশ নিষিদ্ধ করার কারণে ধনাঢ্য আহসান সাহেব একটি মৌলিক ইবাদত পালনে ব্যর্থ হন। অন্যদিকে তার বন্ধু আফিফ একটি ইবাদত পালনের জন্য সম্পদের হিসাব করে একটি নির্দিষ্ট অংশ দ্বারা রিকশা, ভ্যান, সেলাই মেশিন ইত্যাদি ক্রয় করে এলাকার অভাবী মানুষের মধ্যে বিতরণ করেন।

ক. মুমিনদের জন্য মিরাজস্বরূপ ইবাদতের নাম কী? ১
খ. "সাওম আমার জন্য, আমি এর প্রতিদান দেব"— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত জনাব আহসান কোন মৌলিক ইবাদত পালনে ব্যর্থ হয়েছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত জনাব আফিফের কর্মকাণ্ডের প্রভাব মূল্যায়ন করো। ৪

সকল বোর্ড-২০২২

সেট: ক

ইসলাম শিক্ষা দ্বিতীয় পত্র

বিষয় কোড | ২ | ৫ | ০ |

সময় — ২০ মিনিট

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

পূর্ণমান — ১৫

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: — সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। যে কোনো পনেরোটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১. **'বাকারা' অর্থ কী?**
ⓚ পঠিত ⓚh সন্দেহ
ⓖ গাভী ⓖh অবতরণ

২. **কিতাব দ্বারা বোঝানো হয়েছে—**
ⓚ তাওরাত ⓚh যাবুর
ⓖ ইঞ্জিল ⓖh কুরআন

৩. **মহান আল্লাহ জমিনকে মানুষের জন্য করেছেন—**
ⓚ ছাদ ⓚh বিছানা
ⓖ জীবিকা ⓖh বাসস্থান

৪. **'ফিক্হ (فِقْهٌ) শব্দের অর্থ—**
ⓚ অনুধাবন করা ⓚh অনুমান করা
ⓖ তুলনা করা ⓖh সতর্ক করা

৫. **মানব সৃষ্টির পর মহান আল্লাহ কাকে সিজদা করার নির্দেশ দেন?**
ⓚ হযরত ঈসা (আ.)
ⓚh হযরত মুহাম্মাদ (সা.)
ⓖ হযরত সুলায়মান (আ.)
ⓖh হযরত আদম (আ.)

৬. **ফাসাদ বলতে বোঝায়—**
ⓚ হত্যা ⓚh মারামারি
ⓖ বিশৃঙ্খলা ⓖh হিংসা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৭ ও ৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

ফাতিমা ওয়াজে পবিত্র কুরআনের একখানি আয়াত শুনলেন। যার অর্থ— "তারা বলল, আপনি পূত-পবিত্র মহান। আপনি যা আমাদের শিখিয়েছেন তা ছাড়া আমাদের কোনো জ্ঞান নেই।" অতঃপর তিনি এ আয়াতখানিও শুনলেন—

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ۔

৭. **উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রথম আয়াতখানিতে 'তারা' বলতে কাদেরকে বোঝানো হয়েছে?**
ⓚ আদম (আ.) ⓚh জিবরাইল (আ.)
ⓖ ইবলিশ ⓖh ফিরিশতা

৮. **উদ্দীপকে উদ্ধৃত দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে—**
i. তোমরা আদমকে সিজদা কর
ii. ইবলিশ অমান্য করল এবং অহঙ্কার করল
iii. সে সব বিষয়ের নাম বলে দিন
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚh i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓖh i,ii, ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৯ ও ১০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

মাওলানা আনোয়ার এক ইসলামি সমাবেশ দেখলেন, নামাজে তারা মাইক ব্যবহার করছেন না। কারণ রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে মাইকে নামাজ পড়া হয়নি। তখন মাওলানা আনোয়ার বললেন, মক্কা-মদিনাসহ সারা বিশ্বে মসজিদে মাইকে নামাজ পড়া হয় এবং কোনো মুজতাহিদ আলেম এর বিরোধিতা করেননি।

৯. **মাইকে নামাজ পড়ার বৈধতা শরিয়তের কোন উৎসের ভিত্তিতে গ্রহণীয় হয়েছে?**
ⓚ কুরআন ⓚh হাদিস
ⓖ ইজমা ⓖh কিয়াস

১০. **ইবাদতের মূল লক্ষ্য কী?**
ⓚ সওয়াব অর্জন
ⓚh জান্নাত পাওয়া
ⓖ আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভ
ⓖh জাহান্নাম থেকে মুক্তি

১১. **ইমাম মালিক (রহ.) রচিত গ্রন্থ কোনটি?**
ⓚ কিতাবুল মানাসিক
ⓚh আর রিসালাহ
ⓖ আল মুয়াত্তা
ⓖh কুতুবে হানাফিয়া

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১২ ও ১৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

রাহিক সাহেব রাস্তা হতে কলার খোসা সরিয়ে ফেললেন। তার ভাই রাইয়ান নার্সারি হতে গাছের চারা কিনে বাগানে লাগালেন।

১২. **রাহিক সাহেবের কর্মকাণ্ডে কী প্রকাশ পেয়েছে?**
ⓚ ইজমা ⓚh ইমান
ⓖ শোকর ⓖh তাক্ওয়া

১৩. **রাইয়ানের কার্যক্রমের ফলে—**
i. পরিবেশ রক্ষা পাবে
ii. সদকার সওয়াব পাবে
iii. মুনাফিকি দূর হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚh ii ও iii
ⓖ i ও iii ⓖh i,ii, ও iii

১৪. **রাসুলুল্লাহ (স) এর বাণী— "উপরের হাত নিচের হাত হতে উত্তম।" হাদিসে 'উপরের হাত' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?**
ⓚ গ্রহিতা ⓚh দাতা
ⓖ যাকাত ব্যয় ⓖh ভিক্ষাবৃত্তি

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৫ ও ১৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

মুফাস্সির আব্দুর রশিদ কুরআনুল কারিমের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার জন্য রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনাদর্শের সাহায্য নেন। কেননা তাঁর জীবনাদর্শ ছাড়া ইসলামি শরিয়তের মাসয়ালা উদ্ভাবন বিষয়ে মুসলিম মনীষীদের গবেষণা সম্ভব নয়।

১৫. **মুফাস্সির আব্দুর রশিদ কুরআন কারিমের ব্যাখ্যায় কোন বিষয়টির সাহায্য নেন?**
ⓚ ইজমা ⓚh কিয়াস
ⓖ হাদিস ⓖh ফিক্হ

১৬. **মুসলিম মনীষীদের গবেষণার ফলে—**
i. শরিয়তের বিধান পালন সহজ হয়েছে
ii. মুসলিমদের মাঝে মতপার্থক্য হ্রাস পেয়েছে
iii. ইসলাম ধর্ম মানুষের নিকট সহজবোধ্য হয়েছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚh i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓖh i,ii, ও iii

১৭. **কোন ইবাদতে বিনয় ও আনুগত্যের পূর্ণ প্রকাশ ঘটে?**
ⓚ যাকাত ⓚh সালাত
ⓖ সাওম ⓖh হজ

১৮. **সূরা বাকারার আলোকে সালাত কায়েম ও পরকালে বিশ্বাস কাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য?**
ⓚ আবিদ ⓚh মুজতাহিদ
ⓖ মু'মিন ⓖh মুত্তাকি

১৯. **"তাঁদের অন্তরসমূহের মধ্যে রয়েছে ব্যাধি।"— এখানে কাদের কথা বলা হয়েছে?**
ⓚ মুনাফিক ⓚh কাফির
ⓖ ফাসিক ⓖh জালিম

২০. **দৈহিক ও আর্থিক ইবাদত কোনটি?**
ⓚ সালাত ⓚh সাওম
ⓖ যাকাত ⓖh হজ

২১. 'ইমাম আজম' কার উপাধি?
ⓚ ইমাম মালেক (রহ.)
ⓚ ইমাম শাফেয়ি (রহ.)
ⓖ ইমাম আবু হানিফা (রহ.)
ⓖ ইমাম আহমদ (রহ.)

২২. 'কিতাবুল উম্ম' গ্রন্থ কে সংকলন করেন?
ⓚ ইমাম আবু হানিফা (রহ.)
ⓚ ইমাম মালেক (রহ.)
ⓖ ইমাম শাফেয়ি (রহ.)
ⓖ ইমাম আহমদ (রহ.)

২৩. 'আল-ইজমা' অর্থ—
ⓚ তুলনা করা ⓚ গ্রহণ করা
ⓖ গবেষণা করা ⓖ একমত হওয়া

২৪. 'যাকাত' অর্থ—
ⓚ তুলনা ⓚ একত্রিত
ⓖ বৃদ্ধি ⓖ একমত

২৫. কোনটি ফরজের পর ফরজ?
ⓚ জিহাদ
ⓚ হালাল উপার্জন
ⓖ সত্য কথা বলা
ⓖ সালাত কায়েম

২৬. হজে শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করা হয়—
ⓚ আরাফায় ⓚ মুযদালিফায়
ⓖ মিনায় ⓖ সাফা-মারওয়ায়

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৭ ও ২৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
আব্বাস আল্লাহ তাআলার হুকুম পালনার্থে দিনের বেলা পানাহার থেকে বিরত আছেন। আবুজর প্রতিবছর সম্পদের হিসাব করে শতকরা আড়াই ভাগ অসহায় দরিদ্রসহ নির্দিষ্ট আটটি খাতে ব্যয় করেন।

২৭. আব্বাসের কার্যক্রমটি কোন ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত?
ⓚ সালাত ⓚ সাওম
ⓖ হজ ⓖ যাকাত

২৮. আবুজরের কার্যক্রমের ফলে—
i. নতুন সমস্যার সমাধান হবে
ii. দারিদ্র বিমোচন হবে
iii. সামাজিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓖ i,ii, ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
লিপু তার স্ত্রীকে নিয়ে 'লাব্বাইক' ধ্বনি দিতে দিতে ৯ জিলহজ আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত হলো।

২৯. লিপুর কার্যক্রমে কোন ইবাদত ফুটে উঠেছে?
ⓚ সাওম ⓚ যাকাত
ⓖ সালাত ⓖ হজ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
এ বছর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় স্যাটেলাইট ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে রমজানের চাঁদ দেখা যায়। সবাই পরের দিন সাওম পালন শুরু করে।

৩০. দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে চাঁদ দেখে সাওম পালনে সবার ঐকমত্যের ফলে—
i. ইসলামের পূর্ণতা পেয়েছে
ii. বিভ্রান্তি থেকে সুরক্ষিত
iii. জাতীয় ঐক্য সংরক্ষিত
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ ii ও iii
ⓖ i ও iii ⓖ i,ii, ও iii

উত্তর																														
	১	গ	২	ঘ	৩	খ	৪	ক	৫	ঘ	৬	গ	৭	ঘ	৮	ক	৯	গ	১০	গ	১১	ক	১২	খ	১৩	ক	১৪	খ	১৫	গ
	১৬	ঘ	১৭	খ	১৮	ঘ	১৯	ক	২০	ঘ	২১	গ	২২	গ	২৩	ঘ	২৪	গ	২৫	খ	২৬	গ	২৭	খ	২৮	গ	২৯	ঘ	৩০	ঘ

ঢাকা, ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা বোর্ড-২০২২

সেট-০৩ **ইসলাম শিক্ষা দ্বিতীয় পত্র** বিষয় কোড | ২ | ৫ | ০ |

সময় — ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট **সৃজনশীল প্রশ্ন** পূর্ণমান — ৪০

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যে কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১.▶ "আমার বান্দার প্রতি আমি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে যদি তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকে, তাহলে এর মতো একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এসো।"
ক. 'কলব' অর্থ কী? ১
খ. 'মুত্তাকিদের' গুণাবলি সংক্ষেপে লেখো। ২
গ. 'অ-ইন কুনতুম ফী রইবিন' দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে যে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে, কারও পক্ষে তা গ্রহণ করা সম্ভব কি-না? ব্যাখ্যা করো। ৪

২.▶ জনাব শাকির ও নাহিদ দুজন ব্যবসায় বাণিজ্যের সাথে জড়িত। শাকির সততার সাথে বাণিজ্য করেন। তিনি অদৃশ্যে বিশ্বাস করেন। সালাত কায়েম করেন, যাকাত আদায় করেন ও দান সদকা করেন। তিনি দৃঢ়ভাবে আখিরাতের অনন্ত জীবনেও বিশ্বাস করেন। তবে জনাব নাহিদ ওজনে কম দেন। মালে ভেজাল মেশান। এলাকায় দুষ্টু লোকদের হাতে রেখে নেতা হতে চান ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেন।
ক. 'যালিকাল কিতাব'— অর্থ কী? ১
খ. আদর্শ পরিবার গঠনে আল-কুরআনের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ২
গ. জনাব শাকিরের মধ্যে কাদের গুণাবলি রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. জনাব নাহিদের বাণিজ্যিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করো। ৪

৩.▶ সাকিব সাহেব আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত একজন চাকুরিজীবী। বন্ধু গোফরানের সাথে আলাপচারিতায় বললেন, এ পৃথিবীতে আমাদের আগমন, চলে যাওয়া সবই দুর্ঘটনার মতো। কার খবর কে রাখে? শুনে তার বন্ধু গোফরান বলেন, তুমি কী জাননা মহান আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, "তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। এরপর তিনি মনোনিবেশ করেছেন আকাশসমূহের দিকে। আর সেগুলো বিন্যস্ত করেছেন সাতটি আকাশে।" সে অবাক হলো। গোফরান আরও বললেন, কুরআন না শিখে তুমি জ্ঞান বিজ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার থেকে বঞ্চিত হয়েছো।
ক. 'মুত্তাকিন' অর্থ কী? ১
খ. 'লা-রইবা ফীহ্' আয়াতাংশে কী বোঝানো হয়েছে? ২
গ. সাকিব সাহেবের চিন্তাধারা কুরআনের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৩
ঘ. জনাব গোফরানের উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

৪.▶ প্রফেসর শাফায়েত শ্রেণিকক্ষে একটি আয়াত তেলাওয়াত করে ব্যাখ্যা করলেন। আয়াত: "খাতামাল্লাহু আলা কুলূবিহিম ওআলা সামইহিম ওআলা আবছরিহিম গিশাওতুন অলাহুম আযাবুন অজীম।" এখানে স্রষ্টার প্রতি আস্থাহীনদের পরিণতি ব্যক্ত হয়েছে।

ক. 'গায়েব' শব্দের অর্থ কী? ১
খ. "ওয়া মিম্ মা রাযাকনাহুম ইউনফিকুন"—অর্থ কী? লেখো। ২
গ. "খাতামাল্লাহু আলা কুলূবিহিম" দ্বারা কাদেরকে বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. আয়াতে বর্ণিত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে তাদের করুণ পরিণতি বর্ণনা করো। ৪

৫.▶ অধ্যাপক আফজাল হোসেন শ্রেণিকক্ষে ছোট্ট একটি হাদিস নিয়ে আলোচনা করলেন। "লা ইউমিনু আহাদুকুম হাত্তা আকুনা আহাব্বা ইলাইহি মিন ওলিদিহি ওঅলাদিহি অন্নাসি আজমাঈন।"
ক. ইমানের সর্বোত্তম শাখা কোনটি? ১
খ. "সত্যবাদিতা মানুষকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়"— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের হাদিসটিতে কোন বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে? ৩
ঘ. হাদিসটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ৪

৬.▶ মুফতি আব্দুর রহমান বয়ান করলেন, "বুনিয়াল ইসলামু আলা খামসিন..."। স্বামীহারা রহিমা স্থানীয় সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে ছোট ব্যবসা শুরু করলেন।
ক. মুনাফিক কাকে বলে? ১
খ. "উপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে উত্তম"— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. হাদিসে বুনিয়াদ বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "রহিমার কার্যক্রম তাকে হতাশ ও দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত করবে।"— ব্যাখ্যা করো। ৪

৭.▶ ইমাম সাহেব বয়ান করলেন, ইসলামি শরিয়তের চারটি উৎস। কোনো বিষয়ের সমস্যার সমাধানে প্রথমে আল-কুরআন, তারপর হাদিসে রাসুল। তাতে পাওয়া না গেলে তৃতীয় উৎসে খুঁজবেন। "কুরআন ও হাদিসের পরেই এর স্থান।"
ক. 'আল-হাসাদ' শব্দের অর্থ কী? ১
খ. মৌনতামূলক ইজমা বা ইজমায়ে সুকুতি বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে ইমাম সাহেব কোন উৎসের কথা বলেছেন? সেটির উৎপত্তি বর্ণনা করো। ৩
ঘ. "কুরআন ও হাদিসের পরেই এর স্থান।"— উক্তিটির তাৎপর্য আলোচনা করো। ৪

৮.▶ মুফতি আব্দুল্লাহ সাহেব জুমুআর খুতবায় বললেন, "ইমানের সত্তরটিরও বেশি শাখা-প্রশাখা আছে। সর্বোৎকৃষ্ট শাখা হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলা এবং সর্বনিম্ন শাখা হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা। আর লজ্জাশীলতা ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ একটি শাখা।"
ক. 'ইসলাম' অর্থ কী? ১
খ. "আল-কুরআন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান"—ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে সর্বোৎকৃষ্ট শাখা দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "লজ্জাশীলতা ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ একটি শাখা"— হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

৯.▶ অধ্যাপক আফতাব ইসলাম শিক্ষার পাঠদান কালে বলেন, সাধারণ মানুষের জন্য ইসলামকে সহজ করতে মুজতাহিদগণ এর যাবতীয় বিধি-বিধান কুরআন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াসের আলোকে সংকলন করেন।
ক. আযিমাত কী? ১
খ. "প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল ও রক্ষক।"— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. মুজতাহিদগণের কার্যক্রমের ফলে কোন শাস্ত্রের উদ্ভব হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ইসলামকে কালজয়ী করতে মুজতাহিদগণের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। ৪

১০.▶ আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "ওমা খলাকতুল জিন্না অলইনসা ইল্লা লি য়া'বুদূন"— আমি জ্বিন ও মানুষকে শুধুমাত্র আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি। কতিপয় মানুষ মহান আল্লাহর নির্দেশমতো দিনে পাঁচবার বিশেষ আমল সম্পাদন করে।
ক. 'সাওম' অর্থ কী? ১
খ. যাকাতের নিসাব কী? লেখো। ২
গ. উদ্দীপকে কোন আমলের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকে উল্লিখিত ইবাদত শৃঙ্খলা ও ভ্রাতৃত্ব শেখায়।"—ব্যাখ্যা করো। ৪

১১.▶ নাফিসা একটি নির্দিষ্ট মাসে সপরিবারে সুবহি সাদিক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত একটি ইবাদত পালন করে। তার পিতা বছর শেষে সম্পদের এক নির্দিষ্ট পরিমাণ বিশেষ আটটি খাতের এক বা একাধিক খাতে ব্যয় করেন।
ক. ইমানের শাখা কয়টি? ১
খ. "হজ বিশ্বভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করে।"— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. নাফিসাদের পালন করা ইবাদত কী? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. নাফিসার পিতা কী ব্যয় করেন? ধনি-দরিদ্রের বৈষম্য দূরীকরণে সেটির ভূমিকা আলোচনা করো। ৪

রাজশাহী, দিনাজপুর, চট্টগ্রাম, সিলেট, যশোর ও বরিশাল বোর্ড-২০২২

সেট-০১ **ইসলাম শিক্ষা দ্বিতীয় পত্র** বিষয় কোড | ২ | ৫ | ০ |

সময় — ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট **সৃজনশীল প্রশ্ন** পূর্ণমান — ৪০

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যে কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১.▶ জনাব 'গ' সমাজে নেতৃত্ব দেন। বিভিন্ন সময় মানুষের সাথে ওয়াদা করেন কিন্তু একটিও বাস্তবে পূরণ করেননি। মসজিদের ইমাম সাহেব জুমআ'র খুৎবায় জনাব 'গ' কে উদ্দেশ করে আয়াত পাঠ করে শোনান—

فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ۙ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۢ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ.

ক. خَلِيْفَةٌ (খলিফা) অর্থ কী? ১
খ. اِنِّيْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (আমি যা জানি তা তোমরা জাননা)— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. জনাব 'গ' এর চরিত্রে কাদের সামঞ্জস্যতা রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত আয়াতের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করো। ৪

২.▶ আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরসমূহে এবং শ্রবণশক্তির উপর মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তাদের চোখের সামনে টেনে দিয়েছেন পর্দা, আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।
ক. اَلسُّفَهَاءُ (আসসুফাহা) এর অর্থ কী? ১
খ. 'তারা বধির, বোবা ও অন্ধ'— ব্যাখ্যা লেখো। ২
গ. বর্ণিত আয়াতে কাদের কথা বলা হয়েছে? তাদের কর্মকান্ড উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত আয়াতটির সামাজিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করো। ৪

৩.▶ মহান আল্লাহ একটি জাতিকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি হিসেবে পাঠাতে চাইলেন, কিন্তু ফেরেস্তারা আপত্তি জানালেন। অতঃপর মহান আল্লাহ সেই জাতিকে সৃষ্টি করলেন এবং সব কিছু শিক্ষা দিলেন। অতঃপর ফেরেস্তাদেরকে আদেশ দিলেন সেই প্রতিনিধিকে সম্মানসূচক সিজদা করার জন্য। ইবলিশ ব্যতীত সবাই সিজদা করলেন।

ক. مَلٰٓئِكَةٌ (মালাইকা) শব্দের অর্থ কী? ১
খ. 'তোমরা একসাথে এখান থেকে নেমে যাও'—ব্যাখ্যা লেখো। ২
গ. فَتَلَقّٰٓى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ (অতঃপর আদম (আ.) তার প্রভুর নিকট থেকে কিছু বাক্য শিখলেন) এর প্রেক্ষাপট বর্ণনা করো। ৩
ঘ. 'সে অমান্য করলো এবং অহংকার করলো'—আল-কুরআনের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৪.▶ মসজিদের ইমাম মাওলানা মানসুর মুসল্লিদের উদ্দেশে ইসলামের ভিত্তিসমূহ উল্লেখ করে বক্তব্য দিচ্ছিলেন। এক পর্যায় তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, "হারাম সম্পদে তৈরি মাংস (শরীর) বেহেশতে প্রবেশ করবেনা এবং হারাম সম্পদে তৈরি প্রতি টুকরো মাংসের জন্য দোযখই যথোপযুক্ত আবাস।"

ক. اَلْاِيْمَانُ (ইমান) শব্দের অর্থ কী? ১
খ. ইসলামের পাঁচটি ভিত্তির নাম লেখো। ২
গ. হালাল খাদ্য গ্রহণের গুরুত্ব বর্ণনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত হাদিসের বাস্তব শিক্ষা মূল্যায়ন করো। ৪

৫.▶ একদা মহানবি (সা.) তাঁর স্ত্রীদেরকে ডেকে বললেন, আজ আমি দেখবো তোমাদের মধ্যে কার হাত লম্বা। এতে কেউ কেউ আশ্চর্য হলে তিনি বলেন, লম্বা বলতে দান করার ক্ষেত্রে কে বেশি উৎসাহী সেটাই বুঝাতে চেয়েছি। অন্যত্র তিনি বলেছেন, উপরের হাত নিচের হাত থেকে উত্তম।

ক. يَدُ السُّفْلٰى (ইয়াদুস সুফলা) বলতে কী বোঝায়? ১
খ. 'ঋণ হলো রাতের দুশ্চিন্তা ও দিনের লাঞ্ছনা'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. দান-সাদকার গুরুত্ব হাদিসের আলোকে বর্ণনা করো। ৩
ঘ. দানকারীর মর্যাদা উদ্দীপকের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

৬.▶ বিশ্বে চলমান করোনা মহামারির কারণে ঔষধসহ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। সাধারণ মানুষের হাতের নাগালের বাইরে চলে যায় সব কিছু। এজন্য সরকার ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানান যেন তারা মানবিকতাপূর্ণ কার্যক্রম চালান। মাওলানা আনিস সাহেব তাঁর বক্তব্যে বলেন, বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী মুসলিম ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন শহিদদের সাথে থাকবেন।

ক. মানুষের মধ্যে নিকৃষ্টতম ব্যক্তি কে? ১
খ. 'মুমিন ব্যক্তি পরনিন্দুক হবে না'—ব্যাখ্যা করো। ২
গ. ব্যবসার প্রকৃতি ও পদ্ধতি হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. মাওলানা আনিস সাহেবের বক্তব্যের যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

৭.▶ চিত্রের আলোকে উত্তর দাও:

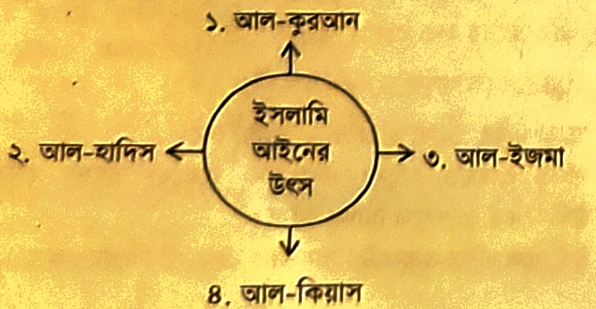

ক. ইজমা'র আহল কারা? ১
খ. আমার উম্মত বিভ্রান্তির উপর একমত হবে না।—বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. চিত্রের ৩নং বিষয়টি কী কী যুক্তি প্রমাণের ভিত্তিতে সংঘটিত হতে পারে? যুক্তি দেখাও। ৩
ঘ. 'কুরআন-সুন্নাহ পরিপন্থি ইজমা গ্রহণযোগ্য নয়'—পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৮.▶ সুলাইমান তার মেয়ের বিয়েতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জিনিস উপহার দিবেন বলে ঘোষণা দেন। কিন্তু সেই শ্রেষ্ঠ জিনিস সম্পর্কে তিনি জানেন না। এ বিষয়ে তিনি খুবই চিন্তায় পড়ে যান। এর সমাধান খুঁজতে তিনি মাওলানা শফিক সাহেবের নিকট গমন করেন। মাওলানা শফিক সাহেব তাকে সান্ত্বনা দেন এবং বলেন, 'কুরআন-হাদিসের গবেষণালব্ধ সমাধান আছে ইলমে ফিক্‌হর মধ্যে।'

ক. ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর পূর্ণ নাম কী? ১
খ. 'আল্লাহ তাআলা যাকে কল্যাণ দেন তাকে দ্বীনের শিক্ষা দেন'—ব্যাখ্যা করো। ২
গ. শরয়ি সমস্যা সমাধানে ইলমে ফিক্‌হর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. মাওলানা শফিক সাহেবের বক্তব্যের যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

৯.▶ মহানবি (সা.) মিরাজ রজনীতে মহান আল্লাহর দিদার লাভ করেন এবং উম্মতের জন্য প্রতিদিন পাঁচবার আদায়যোগ্য একটি ইবাদত নিয়ে আসেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন যে, একমাত্র ইবাদত করার জন্যই তিনি জিন এবং মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। সামাজিক, মানসিক, ধর্মীয় ও আরো অনেক গুরুত্ব রয়েছে এই ইবাদত পালনে।

ক. عِبَادَةٌ (ইবাদাতুন) অর্থ কী? ১
খ. 'সালাত মুমিনের জন্য মিরাজ স্বরূপ'—বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. 'নিশ্চয় সালাত অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে'— পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. সালাতের সামাজিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

১০.▶ রহিম সাহেব দূরদেশে গিয়ে একটি ইবাদত পালনের জন্য অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করেন। কিন্তু করোনা মহামারির কারণে দুইবছর সেই ইবাদতটি সীমিত লোকজন পালন করার কারণে তিনি সেটা করতে পারেন নাই। তবে এবছর সরকার সেই ইবাদত পালনের জন্য অনুমতি দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে।

ক. 'রোজাদারের জন্য দুটি আনন্দ'— আনন্দ দুটির নাম লেখো। ১
খ. যাকাত ইসলামের সেতু বন্ধন— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে কোন ইবাদতের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'বিশ্বের সকল মুসলিমের সাথে যোগাযোগের মাধ্যম হলো এই ইবাদত'—পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

১১.▶ রফিক ও শফিক যৌথভাবে ব্যবসা করেন। একটি বিশেষ মাসে অন্যান্য ব্যবসায়ীরা জিনিসপত্রের দাম বাড়ালেও তারা পূর্বের মূল্যেই পণ্য বেচা-কেনা করেন। একজন খরিদ্দার পণ্য কেনার এক পর্যায়ে মূল্য নিয়ে ঝগড়া করতে উদ্দত হলে রফিক বলে যে, আমি একটি বিশেষ ইবাদত পালন করছি। তাই ঝগড়া বা অতিরিক্ত কথা বলতে পারবোনা।

ক. খুশু ও খুযু কী? ১
খ. اَلصَّوْمُ لِيْ وَاَنَا اَجْزِيْ بِهٖ (আস-সাওমু লী ওয়া আনা আজজী বিহী)— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. রফিকের পালনকৃত ইবাদতের আধ্যাত্মিক গুরুত্ব বর্ণনা করো। ৩
ঘ. আত্মশুদ্ধি অর্জনে উদ্দীপকে বর্ণিত ইবাদতের যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৪

সকল বোর্ড ২০২৩

সেট: খ | **ইসলাম শিক্ষা দ্বিতীয় পত্র** | বিষয় কোড | ২ | ৫ | ০

সময় — ৩০ মিনিট | **বহুনির্বাচনি প্রশ্ন** | পূর্ণমান — ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: — সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১. রুখসাত (رُخْصَةٌ) অর্থ কী?
ক ঐচ্ছিক খ আবশ্যিক
গ মুবাহ ঘ মানদুব

২. ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর রচিত গ্রন্থ কোনটি?
ক ফিকহুল আকবর খ কিতাবুল উম্ম
গ আল-মুয়াত্তা ঘ মুসনাদে আহমদ

৩. সত্যবাদী মুসলিম ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন কার সঙ্গে থাকবেন?
ক আলেমদের খ ইমানদারদের
গ শহিদদের ঘ মুত্তাকিদের

৪. 'সালাত' শব্দটি—
ক ফারসি খ উর্দু
গ আরবি ঘ হিব্রু

৫. ইসলামের সেতুবন্ধন কোনটি?
ক সালাত খ সাওম
গ যাকাত ঘ হজ

৬. ফিকহ-এর ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে—
i. আল-কুরআন ও সুন্নাহর নীতি
ii. পরকালীন কল্যাণ
iii. সংকীর্ণতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৭ ও ৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
"আর মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা বলে, আমরা মহান আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ইমান এনেছি। অথচ আদৌ তারা ইমানদার নয়"।

৭. উক্ত আয়াতে কাদের কথা বলা হয়েছে?
ক কাফির খ ফাসিক
গ মুনাফিক ঘ মুশরিক

৮. উদ্দীপকে নির্দেশিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে—
i. এদের অন্তরে ব্যাধি আছে
ii. এরা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী
iii. এরা বিভ্রান্তকারী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৯ ও ১০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
ফিকহশাস্ত্রের একজন জনপ্রিয় ইমাম ইরাকের কুফায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একটি মাযহাব প্রতিষ্ঠা করেন যা সর্বাধিক জনপ্রিয়। রাজনৈতিক কারণে খলিফা মনসুর তাকে কারাগারে পাঠান এবং সেখানেই তার মৃত্যু হয়।

৯. উদ্দীপকে কার সম্পর্কে বলা হয়েছে?
ক ইমাম আবু হানিফা (রহ.)
খ ইমাম শাফেয়ী (রহ.)
গ ইমাম মালেক (রহ.)
ঘ ইমাম আহমদ (রহ.)

১০. উদ্দীপকে বর্ণিত মাযহাবের বৈশিষ্ট্য হলো—
i. যুক্তিযুক্ত
ii. সহজ-সরল
iii. বাস্তবধর্মী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১১. ফিকহ-এর শাব্দিক অর্থ হলো—
i. অবগত হওয়া ii. অনুধাবন করা
iii. জ্ঞাত হওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২. হজ (اَلْحَجُّ) অর্থ কী?
ক ইচ্ছা করা খ দোয়া করা
গ ক্ষমা করা ঘ দান করা

১৩. সাওম পালনের ফলে—
ক নেতৃত্বের গুণাবলি সৃষ্টি হয়
খ বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়
গ সহানুভূতি ও সহমর্মিতা সৃষ্টি হয়
ঘ ধনি-গরিব বৈষম্য দূর হয়

১৪. আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
ক ফিলিস্তিনে খ কুফায়
গ বাগদাদে ঘ মদিনায়

১৫. মতন (مَتْنٌ) অর্থ কী?
ক হাদিস লিখনের উপকরণ
খ হাদিসের মূল বাণী
গ রাবিগণের বর্ণনা পরম্পরা
ঘ হাদিস সংকলনের পদ্ধতি

১৬. সামাজিক সমস্যা সমাধানের মূল উৎস কোনটি?
ক আল-কুরআন খ আল-হাদিস
গ আল-ইজমা ঘ আল-কিয়াস

১৭. আল-কুরআনে মোট কতটি সূরা রয়েছে?
ক ১১১টি খ ১১২টি গ ১১৩টি ঘ ১১৪টি

১৮. আল-কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি—
i. অধিক সওয়াব লাভ করে
ii. মানসিক উৎকর্ষ সাধন করে
iii. পারলৌকিক মুক্তি লাভ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৯ ও ২০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
আ. রহিম তার সহপাঠী আ. করিমকে আল-কুরআনের বিশুদ্ধতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "এটা এমন কিতাব যার সম্পর্কে কোনোই সন্দেহ নাই।" বরং এটা মুত্তাকিদের জন্য পথপ্রদর্শক।

১৯. আ. রহিমের বক্তব্যটি আল-কুরআনের কোন সূরার অংশ বিশেষ?
ক আল-বাকারা খ আলে-ইমরান
গ আর-রহমান ঘ আল-হুজরাত

২০. মুত্তাকির বৈশিষ্ট্য হলো—
i. অদৃশ্যে বিশ্বাস করা
ii. সালাত প্রতিষ্ঠা করা
iii. সম্পদ গচ্ছিত রাখা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২১. আল-হিকমা (اَلْحِكْمَةُ) অর্থ কী?
ক নিরাময় খ প্রজ্ঞা
গ পার্থক্যকারী ঘ উপদেশ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২২ ও ২৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
শক্তিশালী সেই ব্যক্তি নয়, যে খুব কুস্তি লড়তে পারে। বরং শক্তিশালী হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে ক্রোধের সময় নিজেকে সংযত রাখতে পারে।

২২. উদ্দীপকে বর্ণিত বিধানের উৎস কোনটি?
ক আল-কুরআন খ আল-হাদিস
গ আল-ইজমা ঘ আল-কিয়াস

২৩. ক্রোধ দমনের উপায় হলো—
i. দাঁড়িয়ে থাকা
ii. আউযুবিল্লাহ পাঠ করা
iii. দু'রাকাত নফল সালাত পড়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৪. ইজমার রুকন কয়টি?
ক ২টি খ ৩টি গ ৪টি ঘ ৫টি

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৫ ও ২৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
জনাব শরীফ আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের জন্য এমন একটি ইবাদত পালনে ইচ্ছুক, যার জন্য শারীরিক ও আর্থিক সামর্থ থাকা জরুরি। তার বন্ধু জনাব শাহীন বলেন, যেহেতু আপনার প্রচুর সম্পদ আছে তাই বছরান্তে হিসাব করে সম্পদের নির্দিষ্ট অর্থ দরিদ্রদের মাঝে দান করাও আবশ্যক।

২৫. জনাব শরীফ কোন ইবাদত পালন করতে ইচ্ছুক?
ক যাকাত খ সালাত গ হজ ঘ সাওম

২৬. জনাব শাহীনের বক্তব্যে উল্লেখিত ইবাদত পালনের ফলে—
i. সম্পদের সুষম বন্টন হয়
ii. অর্থনৈতিক ভারসাম্য সৃষ্টি হয়
iii. বিশ্বব্যাপী ঐক্যের সেতুবন্ধন তৈরি হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

২৭. রাতের দুশ্চিন্তা ও দিনের লাঞ্ছনা হিসেবে হাদিসে কোনটিকে উল্লেখ করা হয়েছে?
ক অর্থ খ সম্পদ
গ ঋণ ঘ বংশ মর্যাদা

২৮. ইসলামে মাযহাব কয়টি?
ক ৩টি খ ৪টি গ ৫টি ঘ ৬টি

২৯. "ইমামু দারুল হিজরাত" কার উপাধি?
ক ইমাম আবু হানিফা (রহ.)
খ ইমাম মালিক (রহ.)
গ ইমাম শাফেয়ী (রহ.)
ঘ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)

৩০. যাকাত ব্যয়ের খাত কয়টি?
ক ৬টি খ ৭টি গ ৮টি ঘ ৯টি

উত্তর																														
	১	ক	২	ক	৩	গ	৪	গ	৫	গ	৬	ক	৭	গ	৮	ঘ	৯	ক	১০	ঘ	১১	ঘ	১২	ক	১৩	গ	১৪	গ	১৫	খ
	১৬	ক	১৭	ঘ	১৮	ঘ	১৯	ক	২০	ক	২১	খ	২২	খ	২৩	গ	২৪	ক	২৫	গ	২৬	ক	২৭	গ	২৮	খ	২৯	খ	৩০	গ

ঢাকা, ময়মনসিংহ, দিনাজপুর, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, বরিশাল বোর্ড ২০২৩

সেট: ০৪ | **ইসলাম শিক্ষা দ্বিতীয় পত্র** | বিষয় কোড | ২ | ৫ | ০

সময় — ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট | **সৃজনশীল প্রশ্ন** | পূর্ণমান — ৭০

[বিঃদ্রঃ ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যে কোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১.▶ জনাব সালাম ইসলাম শিক্ষা বিষয়ের অধ্যাপক। শ্রেণিকক্ষে পাঠদানকালে প্রথম দিন তিনি একটি আয়াতের ব্যাখ্যায় মানুষের পাপাচার থেকে আত্মরক্ষার উপায় এবং পরকালের মুক্তির উপায় বর্ণনা করেন। তিনি দ্বিতীয় দিন অন্য একটি আয়াতের ব্যাখ্যায় পরকালিন জবাবদিহিতার প্রতি অনাস্থা ও সৃষ্টিকর্তার প্রতি আস্থাহীনদের করুণ পরিণতির প্রতি আলোকপাত করেন।

ক. মুত্তাকি (مُتَّقِيْ)-এর সংজ্ঞা লেখো। ১

খ. الٓمٓ-এর মর্মার্থ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. অধ্যাপক সালামের প্রথম দিনের বক্তব্যে কাদেরকে চিহ্নিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. অধ্যাপক সালামের দ্বিতীয় দিনের বক্তব্যে ইঙ্গিতপূর্ণ ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে তাদের করুণ পরিণতির কথা বর্ণনা করো। ৪

২.▶

আল্লাহর বান্দাহ

ক অংশ	খ অংশ
i. অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন করা	i. মুমিনদের ধোঁকা দেয়া
ii. সালাত কায়েম করা	ii. অন্তকরণ ব্যাধিগ্রস্ত
iii. দান-সাদকা করা	iii. মিথ্যাচারে নির্লিপ্ততা
iv. কিতাবে বিশ্বাস স্থাপন	iv. সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি
v. পরকালে নিশ্চিত বিশ্বাসী	v. নির্বোধ জনগোষ্ঠী

ক. আল-বাকারাহ (اَلْبَقَرَةُ) কী? ১

খ. মাদানি সূরা কীভাবে চেনা যায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'ক' অংশে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যের বান্দাহদের পরিচয় তুলে ধরো। ৩

ঘ. 'খ' অংশে বর্ণিত লোকদের পরিচয় ও তাদের করুণ পরিণতি বর্ণনা করো। ৪

৩.▶ জনাব মঞ্জুরুল হক একজন বিশিষ্ট শিল্পপতি। তিনি নিয়মিত যাকাত আদায় ছাড়াও এলাকার উন্নয়নে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেন। এতে তার সহযোগী শিল্পপতি জনাব আনোয়ারুল হক ঈর্ষান্বিত ও প্রতিযোগী মনোভাবাপন্ন হয়ে এলাকায় রাস্তা-ঘাট নির্মাণ করেন। তাদের এলাকার একজন ধর্মপ্রাণ চাল ব্যবসায়ী জনাব নুরুল হক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সময় নামমাত্র লাভে চাল বিক্রি করেন। তিনি চিকন চালের সাথে মোটা চাল মিশান না এবং ক্রেতাকে ওজনেও কম দেন না। তিনি ইসলামি পন্থায় ব্যবসা করাকে ফরজের পরে ফরজ মনে করেন।

ক. লজ্জাশীলতা (حَيَاءٌ) কী? ১

খ. "নিশ্চয়ই মুসলমানগণ পরস্পর ভাই ভাই"— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব আনোয়ারুল হকের কর্মকাণ্ডে কোন বিশেষ গুণটি প্রকাশ পায়? হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব নুরুল হকের মনোভাবটি হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৪.▶

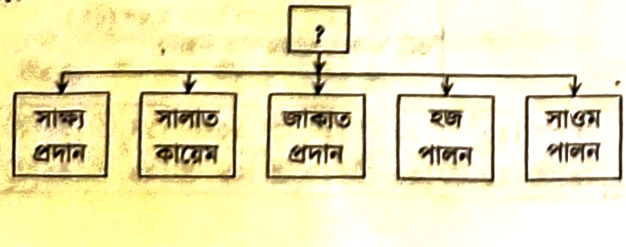

ক. হিংসা (حَسَدٌ) কী? ১

খ. ইমানের শাখা-প্রশাখা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. প্রদত্ত ছকের শূন্যস্থানের হাদিসটি কোন বিষয়ক? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. প্রদত্ত ছকের হাদিসটি মানবজীবনে কী শিক্ষা বয়ে আনে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৫.▶

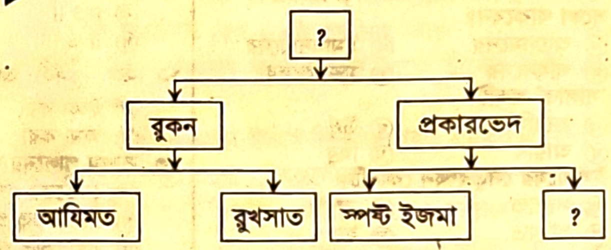

ক. اَلْفِقْهُ (আল ফিকহ) বলতে কী বোঝায়? ১

খ. ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ফিকহশাস্ত্রের পথিকৃৎ— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. প্রথম চিত্রের শূন্যস্থানে কোন বিষয়টি প্রতিস্থাপিত হবে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. শেষ চিত্রের শূন্যস্থানে প্রতিস্থাপিত বিষয়টি চিহ্নিত করে এর গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে আলেমদের মতামত ব্যক্ত করো। ৪

৬.▶ দৃশ্যপট-১: আল্লাহ তাআলা আমাদের আদি পিতা-মাতাকে সৃষ্টি করে সুখ-শান্তির উদ্যানে বসবাস করতে বলেন। কিন্তু তাদেরকে সুখময়স্থান থেকে বের করতে বিশেষ একজন খুবই তৎপর হয়ে ওঠে।

দৃশ্যপট-২: ইসলামে এমন একটি বিধান রয়েছে, যা পবিত্র অবস্থায় সকল মুসলিমকে প্রতিদিন পাঁচ বার সম্পাদন করতে হয়।

ক. ذٰلِكَ الْكِتٰبُ (ইহা সেই কিতাব) বলতে কোন কিতাবকে বোঝানো হয়েছে? ১

খ. কীভাবে মুসলমানগণ পরস্পর ভাই ভাই? বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. আদি পিতা-মাতাকে সুখময় স্থান থেকে বের করতে কে তৎপর হয়ে উঠেছিল? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে কোন ইবাদতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? এর গুরুত্ব ও শিক্ষা বিশ্লেষণ করো। ৪

৭.▶ অধ্যাপক আব্দুল হাকিম ইসলাম শিক্ষা ক্লাসে ইমানের সর্বোত্তম শাখা, সর্বনিম্ন শাখা এবং ইমানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন। চমৎকার এই আলোচনা থেকে সকল শিক্ষার্থী উপকৃত হয়।

যায়েদ অনেক ধন-সম্পদের মালিক। তিনি তার সম্পদ কল্যাণকর কাজে অকাতরে খরচ করেন। অন্যদিকে সাঈদ ইসলামি শিক্ষা বিষয়ে অনার্স, মাস্টার্স ও পিএইচডি সম্পন্ন করেন। তিনি অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী নিজে আমল করেন এবং অন্য মানুষকে তা শেখান। সমাজের কতিপয় মানুষ যায়েদ ও সাঈদের কাজের প্রতি ঈর্ষা পোষণ করেন।

ক. ইসলামের স্তম্ভ কয়টি? ১

খ. হালাল উপার্জন করা ফরয কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. অধ্যাপক আব্দুল হাকিম কর্তৃক আলোচিত ইমানের শাখাসমূহ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. যায়েদ ও সাঈদের কাজের প্রতি সমাজের কতিপয় মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৮.▶

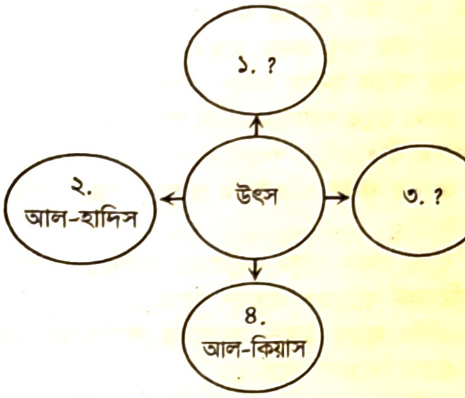

ক. কুস্তি লড়াই (اَلصُّرَعَةُ) কী? ১

খ. চরিত্র বিচারে কোন ব্যক্তি নিকৃষ্টতম? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে ১নং উৎসটি কী? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কেন উম্মতে মুহাম্মাদি কোনো ভুলের ওপর ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না বলে বিবেচিত হয়? উদ্দীপকের ৪নং উৎসের আলোকে বর্ণনা করো। ৪

৯.▶ খলীল: পৃথিবীর কিছু মানুষ আল্লাহ তাআলার নাযিলকৃত কিতাবের প্রতি সন্দেহ পোষণ করে।

আবিদ: সন্দেহ পোষণকারীদের প্রতি আল্লাহ তাআলা চ্যালেঞ্জের ঘোষণা দিয়েছেন।

খলীল: সঠিক বলেছেন, এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারীরা ব্যর্থ হয়েছে।

আবিদ: জি হ্যাঁ, ঐ ব্যর্থ সন্দেহবাদীদের জন্য ভয়ঙ্কর পরিণতি অপেক্ষা করছে।

ক. اَلْحِجَارَةُ (আল-হিজারাহ) অর্থ কী? ১

খ. "আল্লাহ তাআলা কাফিরদের পরিবেষ্টন করে রেখেছেন।"— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. খলীল ও আবিদের সংলাপের বিষয়বস্তু পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে আবিদের বক্তব্যগুলো কুরআন ও হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১০.▶ নিচের ছকটি লক্ষ্য করো:

(ক) ?	(খ) সালাত	(গ) জাকাত	(ঘ) হজ	(ঙ) ?

ক. জাকাত কাকে বলে? ১

খ. হজে মাবরুর কী? ২

গ. 'ক ?' চিহ্নিত স্থানে কোন বিষয়ের কথা বলা হয়েছে? ইসলামে এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'ঙ ?' চিহ্নিত স্থানের বিষয়টি নির্ণয়পূর্বক আল্লাহ তাআলার নৈকট্য হাসিলে এর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ৪

১১.▶ অধ্যাপক আব্দুল আযীয বললেন, মানুষের মাঝে এমন একটি গুণ পরিলক্ষিত হয়, যা তাকে পুণ্যের পথে পরিচালিত করে, আর পুণ্য মানুষটিকে জান্নাতের দিকে ধাবিত করে। অন্যদিকে আরেকটি নিন্দনীয় দিক আছে, যা মানুষকে পাপের পথে পরিচালিত করে। আর ঐ নিন্দনীয় বিষয়টি জাহান্নামের পথনির্দেশ করে।

ক. اَلْحَدِيْثُ (আল-হাদিস) কাকে বলে? ১

খ. "মানুষ তার বন্ধুর জীবনাদর্শের অনুসারি হয়ে থাকে"।— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. অধ্যাপক আব্দুল আযীয কোন গুণের কথা বলেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কোন নিন্দনীয় বিষয়টি জাহান্নামের পথনির্দেশ করে? কীভাবে আমরা তা পরিহার করতে পারি? বিশ্লেষণ করো। ৪

রাজশাহী, সিলেট, যশোর বোর্ড ২০২৩

সেট: ০২ **ইসলাম শিক্ষা দ্বিতীয় পত্র** বিষয় কোড | ২ | ৫ | ০ |

সময় — ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **সৃজনশীল প্রশ্ন** পূর্ণমান — ৭০

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যে কোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১.▶ কলেজ ছাত্র রায়হান প্রতিদিন সকালে একটি ঐশী গ্রন্থের কিছু অংশ অধ্যয়ন করে, যার প্রতিটি বর্ণের বিনিময়ে সে সাওয়াব প্রত্যাশা করে। তার পিতা জনাব আব্দুর রহীম সাহেব একদিন তাকে বললেন, 'বাবা, এটি সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ গ্রন্থ ও সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস এবং এতে কোনো প্রকার ভুল-ত্রুটি ও সন্দেহ নেই।' তিনি আরো বললেন, 'এই গ্রন্থটির প্রধান আলোচ্য বিষয় হলো মানবজাতি'। তাই মানুষের উচিত হলো, তা বেশি বেশি অধ্যয়ন করে এর প্রকৃত শিক্ষা বাস্তব জীবনে যথাযথভাবে প্রয়োগ করা।

ক. 'কিতাব' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. 'আল-কুরআন'কে 'ফুরকান' বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. রায়হান প্রতিদিন কোন গ্রন্থ পাঠ করে? গ্রন্থটির মর্যাদা বিশ্লেষণ করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত গ্রন্থটির শিক্ষা সমাজ জীবনে কী ধরনের পরিবর্তন আনতে সক্ষম? বিশ্লেষণ করো। ৪

২.▶ ইমাম সাহেব জুমুআর খুতবায় বললেন, ইমানের সত্তরটিরও বেশি শাখা-প্রশাখা আছে। সর্বোৎকৃষ্ট শাখা হলো, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" বলা এবং সর্বনিম্ন শাখা হলো, "রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা"। ইদ্রিস সাহেব বড় পদে চাকরি করেন। ইচ্ছা করলে ঘুষ খেতে পারেন কিন্তু মানুষের সামনে তিনি ঘুষ নিতে লজ্জাবোধ করেন। ফলে তিনি ঘুষ নেন না।

ক. 'রাবী' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. হাদিসকে কুরআনের ব্যাখ্যা বলার কারণ কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত, সর্বোৎকৃষ্ট শাখা দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ইদ্রিস সাহেবের কার্যক্রমের ধর্মীয় প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

৩.▶ ইব্রাহিম সাহেব আত্মীয়-স্বজনের নিকট হতে চল্লিশ লক্ষ টাকা ধার নিয়ে বাড়ি নির্মাণ করেন। ঋণের টাকা সময়মতো দিতে না পারায় তিনি দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে লজ্জায় লুকিয়ে লুকিয়ে চলেন। অপরদিকে তার বন্ধু রোহান পাঁচ ছেলেমেয়ের সংসার চালাতে সারাদিন পরিশ্রম করে সবজি বিক্রয় করে। সে বলে আমি সবচেয়ে বড় ফরজ আদায় করার চেষ্টা করছি।

ক. ইসলামি আইনের উৎস কয়টি? ১

খ. 'কুরআন-সুন্নাহ পরিপন্থি ইজমা গ্রহণযোগ্য নয়।'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ইব্রাহিম সাহেবের কার্যক্রম হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত রোহানের কার্যক্রমের ব্যক্তিগত মন্তব্যে শরিয়তের প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

৪.▶ জনাব আব্দুল আওয়াল স্যার শ্রেণিকক্ষে তার ছাত্রছাত্রীদের একজন প্রসিদ্ধ ফিকাহবিদ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বললেন, পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলিম দেশের সর্বাধিক সংখ্যক মুসলমান এ ফিকাহবিদের অনুসারী। কারণ তার উদ্ভাবিত ফিকহি মাসয়ালা অধিকতর গ্রহণযোগ্য। এরূপ একজন প্রখ্যাত ব্যক্তির জীবনাবসান হয়েছিল আব্বাসি খলিফা আল-মনসুরের প্রয়োগকৃত বিষক্রিয়ার মাধ্যমে।

ক. 'বাকারাহ' শব্দের অর্থ কী? ১
খ. "মুজতাহিদগণ ভুল করলেও প্রতিদান প্রাপ্ত হবেন।"— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে কোন মাযহাবকে বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব আব্দুল আওয়াল স্যারের আলোচনার প্রসিদ্ধ ফিকাহবিদের 'জীবন ও কর্ম' সম্পর্কে মূল্যায়ন করো। ৪

৫.▶ আরিফ ও তুহিন দুই বন্ধু। তারা ইসলামের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা করছিল। আরিফ বলল, ইসলামে মানুষের মাঝে সহানুভূতি, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টির জন্য বিশেষ একটি ইবাদত আছে, যা পাপ-পুণ্যের মাঝে ঢাল স্বরূপ। তুহিন বলল, বন্ধু! মানুষের মাঝে আর্থিক সমতা ও ভারসাম্য আনার জন্যও একটি ইবাদত আছে, যাকে ইসলামের 'সেতু বন্ধন' বলা হয়েছে।

ক. 'সালাত' শব্দের অর্থ কী? ১
খ. "তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল বা রক্ষক।"— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত আরিফ কোন ইবাদতের প্রতি ইঙ্গিত করেছে? তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত তুহিন যে ইবাদতের কথা বলেছে তার অর্থনৈতিক প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

৬.▶ প্রফেসর ড. নাছির উদ্দীন স্যার শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বললেন, ইসলামের মূল উৎস হলো 'আল-কুরআন'। এ গ্রন্থের জ্ঞান অর্জন করে বাস্তবজীবনে প্রতিফলন ঘটাতে পারলে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি পাওয়া যায়। তিনি আরও বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, "যে ব্যক্তি তার কোনো মুসলমান ভাইয়ের প্রয়োজনে এগিয়ে আসে, আল্লাহ তাআলা তার প্রয়োজনে এগিয়ে আসেন।"

ক. 'ইসলাম' শব্দের অর্থ কী? ১
খ. "সাওম পালনকারীর জন্য দুটি আনন্দ।"— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ইহকালে শান্তি ও পরকালে মুক্তির উপায় কী? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে প্রফেসর ড. নাছির উদ্দীন স্যার যে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন তার সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

৭.▶ আরমান ও ইমরান দুই সহপাঠী। প্রতিদিন দুপুরে ক্লাসের বিরতিতে আরমান মসজিদে গিয়ে অন্যদের সাথে একটি ইবাদত পালন করে। কিন্তু তার বন্ধু ইমরান উক্ত ইবাদতটি আদৌ পালন করে না। তাকে ডাকলে নানা অজুহাত দেখায়। সে অন্য বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিয়ে সময় নষ্ট করে। আরমান তার বন্ধু ইমরানকে ঐ সকল বন্ধুত্ব ত্যাগ করার উপদেশ দিয়ে বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "মানুষ তার বন্ধুর জীবনাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়।"

ক. 'জাকাত' শব্দের অর্থ কী? ১
খ. "হজ বিশ্বভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করে।"— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত আরমান কোন ইবাদতটি পালন করেছে? তা বিশ্লেষণ করো। ৩
ঘ. ব্যক্তিজীবনে ইমরানের বন্ধু নির্বাচনের প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

৮.▶ প্রতিবছর বর্ষা মৌসুমে পুরাতন ডিসি কোর্ট প্রাঙ্গণে বৃক্ষমেলা শুরু হয়। জনাব হারুন সাহেব উক্ত মেলা থেকে পাঁচ হাজার ফলজ, বনজ ও ঔষুধি গাছ ক্রয় করে নিজ গ্রামের রাস্তার দুই পাশে সেগুলো রোপণ করেন। অন্যদিকে, তার বন্ধু জনাব মামুন সাহেব চিকন চালের সাথে মোটা চাল মিশিয়ে অধিক মুনাফা অর্জন করেন। বিষয়টি জেনে ইমাম সাহেব বলেন, 'এজন্য তাকে পরকালে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।'

ক. 'সিহাহ সিত্তাহ' কী? ১
খ. "মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্টির প্রতি উত্তম আচরণ করা একটি ইবাদত।"— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব হারুন সাহেবের কার্যক্রমে কোন হাদিসের শিক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে? বিশ্লেষণ করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব মামুন সাহেবের কার্যক্রমের ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

৯.▶ মাওলানা নাজমুল হোসাইন এক মিলাদ মাহফিলে বলেন, 'কবিরা গুনাহ জাহান্নামে যাওয়ার কারণ। এমনকি, যারা প্রকাশ্যে কবিরা গুনাহ করে, তারা ইসলামি আদালতে সাক্ষ্যদানের যোগ্যতাও হারায়। এ ব্যাপারে আলেমগণ ঐকমত্য পোষণ করেন। যেমন— 'হযরত আবু বকর (রা.)-এর খলিফা নির্বাচনে সকল সাহাবিগণ একমত হন।' তখন জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, 'এ ধরনের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য না হওয়ার বিষয়ে কুরআন ও হাদিসে কোনো সুস্পষ্ট বক্তব্য নেই। কুরআন ও হাদিসের বাইরে কোনো আমল করা, মুসলমানদের জন্য আবশ্যক নয়।'

ক. 'ইজতিহাদ' শব্দের অর্থ কী? ১
খ. "দুনিয়া আখিরাতের শস্যক্ষেত্র"— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত খলিফা নির্বাচন কোন ধরনের ইজমা? তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত জনৈক ব্যক্তির বক্তব্য তুমি কি সমর্থন করো? তোমার মতামতের সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করো। ৪

১০.▶ মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ.) বলেছেন, "কুরআন বোঝা হাদিস বোঝার উপর নির্ভরশীল। আর হাদিস অনুধাবন করলে মানুষের ব্যাবহারিক জীবনে প্রয়োজনীয় আইন-কানুন তৈরির শাস্ত্র সম্পর্কে জানা যায়।" এ প্রসঙ্গে তিনি একটি হাদিস উল্লেখ করলেন, "মহান আল্লাহ যার মঙ্গল (কল্যাণ) করতে চান, তাকে দ্বীনের সূক্ষ্ম জ্ঞান দান করেন।"

ক. ফিকাহ শাস্ত্রের জনক কে? ১
খ. "আল-কুরআন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান।"— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ.)-এর বক্তব্যে ইসলামের যে বিষয়টির ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তা চিহ্নিতপূর্বক এটি উৎপত্তির কারণ বিশ্লেষণ করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত হাদিসটির যথার্থতা তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১১.▶ ফারিহা গত একমাস ধরে শেষ রাতে পানাহার করে এবং সারাদিন কিছু না খেয়ে সন্ধ্যায় শরবত, পানীয় ও অন্যান্য খাবার খায়। অন্যদিকে, ফারিহার পিতা জনাব ফারুক সাহেব দুই টুকরা সেলাইবিহীন সাদা কাপড়সহ নির্দিষ্ট একটি দেশের নির্দিষ্ট জায়গায় উপস্থিত হয়। এ ক্ষেত্রে ফারিহার চাচা জনাব ফরহাদ সাহেব বললেন, "এ ইবাদত হলো, বিশ্বশান্তি, সংহতি ও বহুসংস্কৃতির মেলবন্ধন। এতে দৈহিক, আর্থিক ও আত্মিক ত্যাগের শিক্ষা রয়েছে।"

ক. 'সাওম' শব্দের অর্থ কী? ১
খ. "যাকাত কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়ক।"— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ফারিহা কোন ইবাদতটি পালন করছে? মুমিনের জীবনে এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় জনাব ফারুক সাহেবের ইবাদতের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। ৪

বি. দ্র. ২০২৪ সালে ইসলাম শিক্ষা দ্বিতীয় পত্র বিষয়টির পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় নি।

সকল বোর্ড-২০২৫

সেট: খ | **ইসলাম শিক্ষা দ্বিতীয় পত্র** | বিষয় কোড ২ ৫ ০

সময় — ৩০ মিনিট | **বহুনির্বাচনি প্রশ্ন** | মান — ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: — সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১. **মানব জীবনে মারাত্মক ঘৃণিত কাজ কোনটি?**
ক অশ্লীলতা খ চুরি
গ হিংসা ঘ ঘৃণা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২ ও ৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
আলম ও কালাম দুই বন্ধু। তারা মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করছিল। আলম বলল, আল্লাহ বলেছেন— إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
কালাম বলল, ফেরেশতাগণ মানুষ সৃষ্টির বিরোধিতা করেছিল। আল্লাহ ফেরেশতাদের পরীক্ষা করলেন। ফেরেশতাগণ ব্যর্থ হয়ে বলল— سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

২. **আলমের উদ্ধৃত আয়াতে خَلِيفَةً দ্বারা কাকে বোঝানো হয়েছে?**
ক আদম (আ.) খ নুহ (আ.)
গ ইবরাহিম (আ.) ঘ ইসমাইল (আ.)

৩. **কালামের বক্তব্যে ফেরেশতাগণ ব্যর্থ হয়ে কী বলল?**
i. আমরা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি
ii. আমাদের কোনো জ্ঞান নাই কেবল আপনি যা দিয়েছেন তা ছাড়া
iii. আপনি মহাজ্ঞানী ও মহাবিজ্ঞানী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪. **ইজমা (الإجماع) শব্দের অর্থ কী?**
ক ঐকমত্য পোষণ করা
খ সংকল্প করা
গ অনুমতি দেওয়া
ঘ সম্মত হওয়া

৫. **ইজমা-এর রুকন কয়টি?**
ক ২ খ ৩
গ ৫ ঘ ৬

৬. **জাকাত প্রদানে সম্পদ—**
i. বৃদ্ধি পায়
ii. হ্রাস পায়
iii. পবিত্র হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭. **"আমরা সবাই এর উপর একমত"। এটি কোন পর্যায়ের ইজমা?**
ক আযিমত খ রুখসাত
গ ফে'লি ঘ তাকরিরি

৮. **আল-ফিকহ (الفقه) শব্দের অর্থ কী?**
ক আইন-কানুন খ অনুধাবন করা
গ বিচার করা ঘ সিদ্ধান্ত নেয়া

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৯ ও ১০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
নোমান নিয়মিত সালাত আদায় করে। সে তার বন্ধু ফাহিমকে বলল, আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে কেউ অপমান করলে আমার সহ্য হয় না। তখন ফাহিম বলল, আমাদের ইসলাম শিক্ষা বইয়ে মহানবি (সা.)-কে ভালোবাসা ঈমান বলা হয়েছে। নোমান বলল, ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আমাদেরকে এ বিষয়টি মনে রাখতে হবে।

৯. **তোমাদের পাঠ্যবইয়ের আলোকে ইসলামের তৃতীয় ভিত্তি কোনটি?**
ক নামাজ খ রোজা
গ হজ ঘ জাকাত

১০. **মুমিন হতে হলে কোন ব্যক্তিদের চেয়ে মহানবি (সা.)-কে বেশি ভালোবাসতে হবে?**
i. পিতা-মাতা
ii. সন্তান-সন্ততি
iii. সমস্ত মানুষ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১. **ইমাম শাফেয়ি (রহ.) কত হিজরিতে ফিকহী মাযহাব প্রতিষ্ঠা করেন?**
ক ১৬৪ খ ১৮৭
গ ১৯৫ ঘ ১৯৮

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
রিফাত একজন ব্যবসায়ী। একদিন তিনি নামাজ সম্পর্কে ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন। ইমাম সাহেব তার প্রশ্নের জবাব দেন এবং এমন একজন ফকিহ সম্পর্কে আলোচনা করেন, যাকে ১৫০ হিজরিতে হত্যা করা হয়।

১২. **উদ্দীপকে উল্লেখিত ফকিহ কে?**
ক ইমাম আবু হানিফা (রহ.)
খ ইমাম শাফেয়ি (রহ.)
গ ইমাম মালিক (রহ.)
ঘ ইমাম আহমদ (রহ.)

১৩. **প্রথমত ইবাদত কত প্রকার?**
ক দুই খ তিন
গ চার ঘ পাঁচ

১৪. **হজ ফরজ হওয়ার শর্ত হচ্ছে—**
i. মুসলিম হওয়া
ii. প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া
iii. স্বাধীন হওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫. **কোন ইবাদত সারা জীবনে একবার ফরজ?**
ক সালাত খ সাওম
গ জাকাত ঘ হজ

১৬. **সূরা আল-বাকারার আয়াত সংখ্যা কত?**
ক ১৭৬ খ ২০০
গ ২৮৪ ঘ ২৮৬

১৭. **"আল্লাহর জিকির দ্বারাই মানবাত্মাসমূহ প্রশান্তি লাভ করে থাকে"— এটি আদর্শ জীবনের কোন পর্যায়ে ঘটে থাকে?**
ক ব্যক্তি জীবনে খ পারিবারিক জীবনে
গ সামাজিক জীবনে ঘ রাষ্ট্রীয় জীবনে

১৮. **কোন মৌলিক ইবাদতটি মানুষকে নেতৃত্ব শেখায়?**
ক সালাত খ জাকাত
গ সাওম ঘ হজ

১৯. **কোন ইবাদতের অনুপস্থিতি মানুষকে কাফির বানায়?**
ক হজ খ সাওম
গ জাকাত ঘ সালাত

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২০ ও ২১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
রসুলপুর গ্রামের আবিদ সাহেব পূর্ণ একমাস দিনের বেলা পানাহার থেকে বিরত থাকেন। তাছাড়া তিনি অন্য একটি ইবাদত করায় তার শারীরিক অবস্থা ভালো থাকে এবং তিনি সর্বপ্রকার অন্যায় ও অশ্লীল কাজ হতে বিরত থাকেন।

২০. **আবিদ সাহেব প্রথমত কোন ইবাদতটি পালন করেন?**
ক হজ খ জাকাত
গ সাওম ঘ সালাত

২১. **জনাব আবিদ সাহেবের দ্বিতীয় ইবাদতের ফলে—**
i. আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা যায়
ii. অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়া যায়
iii. সামাজিক সম্প্রীতি অর্জন করা যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২২. **মানব জীবনে ফিকহশাস্ত্রের প্রয়োজন হওয়ার কারণ হলো, এতে—**
i. জীবনের সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে
ii. কুরআন-হাদিসের অনুসরণ রয়েছে
iii. জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ার সুযোগ রয়েছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৩. **কলেজ ছাত্র ফাহিম তার বন্ধুকে ছুটিতে কক্সবাজার যাওয়ার কথা বলে পিতার সাথে খুলনা চলে যায়। এজন্য ইসলামের দৃষ্টিতে সে বিবেচিত একজন—**
ক কাফির খ মুশরিক
গ মুনাফিক ঘ ফাসিক

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৪ ও ২৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
অধ্যাপক রেজাউল করিম নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করেন— صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ।

২৪. **অধ্যাপক রেজাউল করিমের তেলাওয়াতকৃত আয়াতে কাদের বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে?**
ক কাফির খ মুশরিক
গ ফাসিক ঘ মুনাফিক

২৫. উক্ত আয়াতে বর্ণিত ব্যক্তিদের পরিণতি হলো—
i. তাদের অন্তঃকরণ ব্যাধিগ্রস্ত হবে
ii. তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ আযাব
iii. পরিশেষে তারা মুক্তি পাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৬. কোন ইবাদতকে মুমিনদের মিরাজ বলা হয়?
ক সালাত খ সাওম
গ হজ ঘ জাকাত

২৭. কুরআন বুঝতে হলে কোনটি অধ্যয়ন করতে হয়?
ক ফিকহ খ হাদিস
গ তাজবিদ ঘ সাহিত্য

২৮. মুয়াত্তা গ্রন্থের প্রণেতা কে?
ক ইমাম আবু হানিফা (রহ.)
খ ইমাম তিরমিযী (রহ.)
গ ইমাম মালিক (রহ.)
ঘ ইমাম বুখারী (রহ.)

২৯. কোন দিক দিয়ে মুমিনগণকে একটি দেহের সাথে তুলনা করা হয়েছে?
i. পারস্পরিক করুণা প্রদর্শন
ii. পারস্পরিক প্রেম-ভালোবাসা
iii. পারস্পরিক সহানুভূতি প্রদর্শন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩০. রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী— "উপরের হাত নিচের হাত হতে উত্তম।" উক্ত হাদিসে উপরের হাত বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক গ্রহীতা খ দাতা
গ ব্যয় করা ঘ ভিক্ষাবৃত্তি

উত্তর	১	ক	২	ক	৩	ঘ	৪	ক	৫	ক	৬	খ	৭	ক	৮	খ	৯	ঘ	১০	ঘ	১১	গ	১২	ক	১৩	ক	১৪	ঘ	১৫	ঘ
	১৬	ঘ	১৭	ক	১৮	ক	১৯	ঘ	২০	গ	২১	খ	২২	ঘ	২৩	গ	২৪	ঘ	২৫	ক	২৬	ক	২৭	খ	২৮	গ	২৯	গ	৩০	খ

ঢাকা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, যশোর বোর্ড-২০২৫

সেট: ০২ **ইসলাম শিক্ষা দ্বিতীয় পত্র** বিষয় কোড ২ ৫ ০

সময় — ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **সৃজনশীল প্রশ্ন** মান — ৭০

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যে কোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১.▶ দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র ইকরাম টিফিনের সময় বন্ধুদের নিয়ে ইবাদতগৃহে একসাথে প্রার্থনা করল। এক দরিদ্র বন্ধুর ফরম পূরণের টাকা সংগ্রহের জন্য নিজের টিফিনের টাকা দিয়ে দিল। তার বন্ধু ইঞ্জিল হতে একটি উদ্ধৃতি দিলে সে বলল, কুরআন সত্যায়ন করলে আমি এটা অবশ্যই মেনে নেব। অপরদিকে তার বন্ধু আসলামকে বার বার সত্য মেনে নেয়ার আহ্বান জানালেও সে অস্বীকার করে। সে সত্য শুনেও শোনে না। স্রষ্টার নিদর্শন দেখেও দেখে না।

ক. الْبَقَرَةُ শব্দের অর্থ কী? ১
খ. আদর্শ সমাজ গঠনে কুরআনের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ২
গ. ইকরামের কার্যক্রমে কী ফুটে উঠেছে? সূরা আল-বাকারার প্রথম পাঁচ আয়াতের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. আসলামের পরিণাম পবিত্র কুরআনের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

২.▶ জনাব সোলাইমান দীর্ঘদিন বিদেশে ছিলেন। দেশে ফিরে দেখেন গ্রামের কিছু প্রভাবশালী লোক সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার দাবি করলেও তাদের কার্যকলাপের মাধ্যমে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে। গ্রামের মানুষ বিভ্রান্ত ও বিভক্ত হয়ে পড়ছে। সোলাইমান তাদের এসব কাজ থেকে বিরত থাকতে বললে তারা বলে, আমরাতো গ্রামে শান্তির জন্য কাজ করছি। তার বোন আসমা এক ওয়াজে শুনলেন, আধুনিক বিজ্ঞানে আমরা দেখি, প্রকৃতির ছোট ছোট জিনিস যেমন একটি অণু বা একটি ক্ষুদ্র কীট বিশাল শিক্ষা বহন করে। কিন্তু এগুলোকে কেউ কেউ তুচ্ছ মনে করে। তাই মহান আল্লাহ কুরআনে এরূপ একটি ক্ষুদ্র কীটের কথা বলে বললেন, এতে আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন না।

ক. কুরআন কাদের জন্য হেদায়াত? ১
খ. "আমি যা জানি, তোমরা তা জান না"— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত গ্রামের প্রভাবশালী লোকদের কার্যক্রমে সূরা আল-বাকারায় উল্লেখিত কাদের চরিত্রের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত ক্ষুদ্র কীটের উদাহরণের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ৪

৩.▶ একটি আন্তঃ কলেজ প্রতিযোগিতায় "কুরআনকে কেন আল্লাহর বাণী হিসাবে বিশ্বাস করব?" বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়। এক বিতার্কিক দাবি করেন, কুরআনের ভাষা ও বক্তব্য মানবসৃষ্ট নয়। এর বড় প্রমাণ এর সমতুল্য কিছু রচনা করা অসম্ভব। তার বিপরীতে এক প্রতিযোগী বলেন, "যদি এটি সত্য হয় তবে এমন কোনো চ্যালেঞ্জ থাকা উচিত যা এই দাবিকে যাচাই করতে পারে।" বিতর্ক চলাকালীন সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণের আহ্বান শুনতে পেলেন। মঈনুদ্দীন পবিত্র হয়ে বিশেষ গৃহে গিয়ে অনেকে এক সাথে প্রভুতে সমর্পিত হলো। প্রার্থনা শেষে প্রশান্ত চেহারা নিয়ে বাসায় ফিরল।

ক. আখিরাত শব্দের অর্থ কী? ১
খ. আদর্শ রাষ্ট্র গঠনে কুরআনের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত দুই বিতার্কিকের বক্তব্যের সপক্ষে কুরআনের কোনো চ্যালেঞ্জ আছে কি? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. মঈনুদ্দীনের কার্যক্রম কীভাবে আল্লাহর নৈকট্য লাভে সহায়ক হবে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৪.▶ জনাব আরাফাত কে.এস.এম সরকারি কলেজের অধ্যাপক। নতুন জামা পরে কলেজে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ একটি রিক্সা রাস্তায় জমে থাকা কাদা পানি ছিটিয়ে দিলে জামা নষ্ট হলো। তিনি রিক্সাওয়ালাকে মারতে উদ্যত হলেন। এমন সময় একটি হাদিসের কথা মনে করে নিজেকে শান্ত করলেন। তিনি হারতে চান না। বাসায় ফিরে অন্য জামা পরে বের হলেন। মনে খুব শান্তি পেলেন। মাহফুজা খবরে ফিলিস্তিনের মুসলিম ভাইদের কষ্ট দেখে তার সঞ্চিত অর্থ দান করলেন। প্রতিদিন সে নামাজে তাদের মুক্তির জন্য প্রার্থনা করেন। ওদের কথা ভেবে সে খুবই কষ্ট পায়।

ক. মুনাফিকের লক্ষণ কয়টি? ১
খ. জাকাতই ইসলামের সেতুবন্ধন— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত জনাব আরাফাত সাহেব যে হাদিসের কথা মনে করে নিজেকে শান্ত করলেন তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. মাহফুজার কার্যক্রম হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৫.▶ একটি মুসলিম দেশ আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ইসলামি শরিয়াহ অনুযায়ী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করতে চায়। তারা ভাবল কীভাবে সুদমুক্ত লেনদেন ব্যবস্থা চালু করা যায়? এ নিয়ে দেশের কতিপয় ইসলামি স্কলার একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন 'মুদারাবা' ও 'মুশারাকা' নামে দুটি পদ্ধতিতে বিনিয়োগ ব্যবস্থা চালু করা যায়। তাদের এই সিদ্ধান্তকে দেশের বাকি আলেমগণ পত্রিকায় ঘোষণা দিয়ে সমর্থন জানালো।

ক. 'হজ' শব্দের অর্থ কী? ১
খ. 'রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত ইসলামি স্কলারদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি ইসলামি শরিয়তের কোন উৎসের সাথে সাদৃশ্য রাখে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. দেশের অন্যান্য আলেমগণের ঐকমত্যের পদ্ধতিটি কীভাবে এই সিদ্ধান্তকে ইসলামি শরিয়তের একটি আইনে পরিণত করেছে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৬.▶ শরিফ, সাহেদ ও মকবুল তিন বন্ধু। ইসলামের আইন বিষয়ে আলোচনা করছিলো। শরিফ বলল, মহানবি (সা.)-এর যুগের পর যা কিছু উদ্ভব হয়েছে সবই বিদআত। সাহেদ প্রতিবাদ করে বলে সবকিছুই বিদআত নয়; বরং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কথা, কাজকে ভিত্তি করে পরবর্তীতে এমন একটি জ্ঞানের শাখা তৈরি হয়েছে যা ইসলামি শরিয়াহ পালনকে সহজ করেছে। শরিফ বলল, ৮০ হিজরিতে ইরাকের কুফাতে জন্ম নেন এক শিশু। পিতা-মাতা তার নাম রাখেন নুমান। ব্যবসায়ী পরিবারে জন্ম হলেও তার আগ্রহ ছিল জ্ঞান চর্চায়। তার চিন্তাধারা এবং ফিকহের পদ্ধতি ইসলামি আইন ব্যবস্থায় যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেছে।

ক. 'আল-হায়া' শব্দের অর্থ কী? ১
খ. মাযহাব বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে সাহেদ ইসলামের কোন জ্ঞানের শাখাকে বুঝিয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে শরিফ যে ব্যক্তিত্বের কথা বলেছে ইসলামি শরিয়তের আইন প্রণয়নে তার অবদান মূল্যায়ন করো। ৪

৭.▶ ঝড়ের রাত। অন্ধকার। কিছু লোক পথ চলছিল। হঠাৎ তাদের টর্চের আলো নিভে যায়। কয়েকজন থমকে দাঁড়ালো। আর এগোতে সাহস পেল না। কেউ কেউ পথ খুঁজে নেয়ার চেষ্টা করছে। এমন সময় ভ্রমণ দলের এক সদস্য তালহা বলল, 'যদি আলো জ্বালানো হয় তবে আমরা পথ দেখতে পাব। কিন্তু আমাদের ভেতরকার ইচ্ছা শক্তি না থাকলে জাগতিক আলোও আমাদের বাঁচাতে পারবে না'। অপরদিকে জনাব জাফর সাহেব বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে দুই টুকরা সেলাইবিহীন সাদা কাপড় পরে একটি নির্দিষ্ট শহরে উপস্থিত হয়েছে। ৯ জিলহজ্জ নির্দিষ্ট একটি ময়দানে উপস্থিত হয়ে গুনাহ মাফের জন্য কান্নাকাটি করছেন।

ক. 'আল-কিতাব' অর্থ কী? ১
খ. 'সত্যবাদিতা মানুষকে মুক্তি দেয়।'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. সূরা আল-বাকারার আলোকে তালহার বক্তব্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. জাফর সাহেবের পালনীয় ইবাদত তাকে জান্নাত লাভের উপযোগী করবে।— বিশ্লেষণ করো। ৪

৮.▶ সালমা ও রেহানা দুজন একে অপরের প্রতিবেশী। সালমা এ বছর বৃক্ষমেলা থেকে বেশ কিছু গাছের চারা কিনে রাস্তার পাশে লাগানোর ব্যবস্থা করল। রেহানা বলল, এতে তোমার লাভ কী? উত্তরে সালমা বলল, এটি সাদাকা। পশুপাখিও যদি ফল খায় তাও সাদাকার সাওয়াব। রেহানা বলল, আপা আমি সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে খুব বিপদে আছি। শুধু চিন্তা কীভাবে কিস্তি দিব? রাতে ভালো ঘুমও হয় না।

ক. 'সালাত' শব্দের অর্থ কী? ১
খ. "তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।"— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. হাদিসের আলোকে সালমার বক্তব্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ব্যক্তিজীবনে রেহানার কার্যক্রমের প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

৯.▶ রাফিদ ও সাবিক দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র। রাফিদ এমন একটি ইবাদত করে যা তাকে প্রবৃত্তির তাড়না থেকে রক্ষা করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। হাদিসে যার পুরস্কার আল্লাহ নিজ হাতে দিবেন বলে উল্লেখ আছে। পক্ষান্তরে সাবিক একজন ধনী ব্যবসায়ীর পুত্র। সে কথায় কথায় অশ্লীল বাক্য ব্যবহার করে। এজন্য রাফিদ তাকে এড়িয়ে চলে।

ক. 'জাকাত' শব্দের অর্থ কী? ১
খ. "সাওম ঢালস্বরূপ"— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত রাফিদের কার্যক্রমে কোন ইবাদত পালন প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. সাবিকের কার্যক্রমের পরিণতি হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১০.▶ ওহুদের যুদ্ধে এক পর্যায়ে আক্রমণকারীরা নবিজীকে সরাসরি আঘাত করতে সক্ষম হলো। তাঁর শিরোস্ত্রাণ ভেঙে মাথায় দেবে গেল। রক্তাক্ত নবিজি মাটিতে পড়ে গেলেন। এমন সময় নবিজিকে আক্রমণোদ্যত আমর ইবনে কাসিয়ার মাঝখানে মুসআব ইবনে উমায়ের ঢাল হয়ে দাঁড়ালেন। আমরের আঘাতে শহীদ হলেন মুসআব। মদিনার এক তরুণ। শৈশব থেকেই জ্ঞান চর্চার প্রতি ছিল গভীর আগ্রহ। মদিনার বিখ্যাত মসজিদে শিক্ষা গ্রহণ করতেন যা রাসুলুল্লার (সা.) মসজিদ হিসেবে পরিচিত। তিনি বিখ্যাত হাদিস গ্রন্থ 'মুয়াত্তা' সংকলন করেন।

ক. মানুষকে আল্লাহ কীসের মর্যাদা দিয়েছেন? ১
খ. "সালাত মুমিনের মিরাজ স্বরূপ"— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত গ্রন্থের সংকলক কে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে হযরত মুসআব (রা.)-এর শাহাদাৎবরণ তার ইমানের সত্যায়ন।— হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১১.▶ আব্দুল হাই একজন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী। এবারের রমজান মাসে তিনি তার সমুদয় সম্পদের হিসাব করে শতকরা আড়াইভাগ এতিম মিসকিনদের দান করলেন। দানের সময় তিনি নিজের পরিচয় গোপন রাখলেন। এতে তার মনে একধরনের প্রশান্তি লাভ করলেন। অপরদিকে তার প্রতিবেশী রানা কথা বলার সময় মিথ্যা বলে, তার কাছে কারও গোপন কথা বললে প্রকাশ করে দেয়। তার কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির কথা বলে আবার অস্বীকার করে।

ক. 'ইবাদত' অর্থ কী? ১
খ. সালাত আনুগত্য ও সময়ানুবর্তিতা শিক্ষা দেয়।— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. আব্দুল হাইয়ের কার্যক্রমে কোন ইবাদত পালন ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত রানার কার্যক্রমের পরিণতি হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

দিনাজপুর, সিলেট, বরিশাল বোর্ড-২০২৫

সেট: ০৪ **ইসলাম শিক্ষা দ্বিতীয় পত্র** বিষয় কোড | ২ | ৫ | ০ |

সময় — ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **সৃজনশীল প্রশ্ন** মান — ৭০

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো। এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যে কোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১.▶ ২০০৭ সালে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বজনের শ্রদ্ধার পাত্র এক মহামনীষীর ব্যঙ্গ কার্টুন একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হলে হরিণাহাটি গ্রামের জনাব হাবিব তার অসুস্থ পিতা-মাতা ও এক শিশু পুত্রকে তার প্রতিবেশী জনাব মাহবুবের জিম্মায় রেখে এবং তাদের দেখাশোনা করার জন্য দশ হাজার টাকা দিয়ে রাজধানীতে এসে মিছিলে যোগ দেন এবং শাহাদাত বরণ করেন। কিন্তু জনাব মাহবুব তার কথা রাখেনি এবং তাদের কোনো খোজ-খবরও নেয়নি। এমনকি টাকাগুলোও নিজের কাজে ব্যয় করে।

ক. হাদিস (الحديث) কী? ১
খ. কোন কোন ক্ষেত্রে ঈর্ষা পোষণ করা বৈধ? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. জনাব হাবিবের ভালোবাসা হাদিসের আলোক ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. জনাব মাহবুবের কর্মকাণ্ডের পরিণতি হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

২.▶ এমন একটি গ্রন্থ সম্পর্কে বলা হয়েছে, যাতে কোনো সন্দেহ নেই। যা একাধারে জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল উৎস এবং সঠিক পথের দিশারী। কিয়ামত পর্যন্ত এটা অবিকৃত থাকবে। এ গ্রন্থ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন নিশ্চয় আমিই আল-যিকরা অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষক।

ক. মুত্তাকী কারা? ১
খ. "সালাত মুমিনের জন্য মিরাজস্বরূপ"— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত গ্রন্থের পরিচয় দাও। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত গ্রন্থটি কীভাবে অবিকৃত থাকবে বলে তুমি মনে করো? ইসলামের আলোকে জবাব দাও। ৪

৩.▶ জনাব শফি একজন চাউল ব্যবসায়ী। মাঝে মাঝে তিনি চিকন চাউলের সাথে মোটা চাউল মিশিয়ে সেটা চিকন চাউল হিসেবে বিক্রি করেন। কখনওবা ওজনেও কম দেন। তার বন্ধু রাফি এহেন কর্মকাণ্ড আঁচ করতে পেরে তাদের মধ্যকার বন্ধুত্ব ত্যাগ করেন।

ক. 'মুনাফিক' কারা? ১
খ. 'মানুষ তার বন্ধুর ধর্মে প্রভাবিত হয়'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. শফির ব্যবসা কতটুকু গ্রহণযোগ্য? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'বিশ্বস্ত বন্ধু প্রাচীরসম' উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৪.▶ প্রদত্ত ছকের আলোকে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

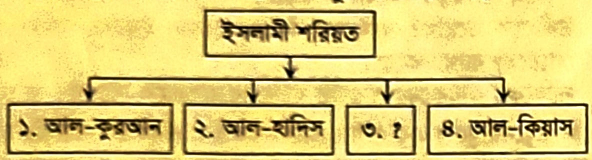

ক. আযিমত কী? ১
খ. 'আমার উম্মত কোনো ভুলের উপর একতাবন্ধ হতে পারে না'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. ছকের ৩ নম্বর উৎসটির প্রয়োজনীয়তা তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের ১ নম্বর উৎসটি হাদিস ছাড়া বোঝা অসম্ভব— বিশ্লেষণ করো। ৪

৫.▶

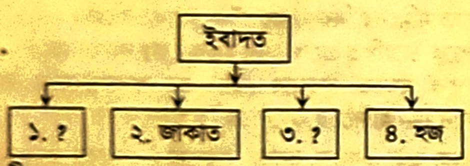

ক. 'হজ' কী? ১
খ. "জাকাত হলো ইসলামের সেতুবন্ধন"— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. প্রদর্শিত ছকের ১ নম্বর প্রশ্নবোধক '?' চিহ্নের বিষয়টি কীভাবে মুমিনের শারীরিক সুস্থতা ও মানসিক প্রসন্নতা এনে দেয়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর যে, ৩ নম্বর প্রশ্নবোধক '?' চিহ্নিত বিষয়টি মুমিন জীবনে আত্মিক উৎকর্ষ সাধন ও আত্মসংযমের জন্য সহায়ক? পাঠ্যবইয়ের আলোকে তোমার মতামত দাও। ৪

৬.▶ তিনি ৮০ হিজরি সনে কুফায় জন্মগ্রহণ করেন। ইসলামি আইনশাস্ত্রে তিনি পুরোধা ছিলেন। তার ফিকাহর বৈশিষ্ট্য ছিল সহজসরল। খলিফা মনসুর তাকে অন্যায়ভাবে কারারুদ্ধ করেন এবং কারাগারে খাবারের বিষক্রিয়ায় সিজদারত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

ক. ফিকাহ সংকলনের যুগ বলতে কী বোঝায়? ১
খ. "প্রতিটি বস্তুরই খুঁটি রয়েছে, আর দীন ইসলামের খুঁটি হলো ফিকাহ"— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে কোন মনীষীর কথা ইঙ্গিতপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত মনীষীর ফিকাহশাস্ত্রে অবদান মূল্যায়ন করো। ৪

৭.▶

প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যু-১৫০ হিজরি	প্রতিষ্ঠাতার জন্ম-১৫০ হিজরি
(ক) অধিকাংশ লোক অনুসারী	(ক) তুলনামূলকভাবে কমসংখ্যক অনুসারী
(খ) হাদিসের অনুসরণ কম করা হয়	(খ) হাদিসই দালিলিক ভিত্তি
(গ) কিয়াস ও ইস্তিহসান গ্রহণযোগ্য	(গ) যথাসম্ভব কিয়াস পরিত্যাজ্য বিষয়
(ঘ) উদার ও বাস্তবধর্মী পন্থা	(ঘ) তুলনামূলকভাবে কঠোর ও গভীরতার প্রতি আকৃষ্ট

ক. হাম্বলি মাযহাব বলতে কী বোঝায়? ১
খ. "মসজিদে নববীতে তিনি ফিকাহ শিক্ষা দিতেন।" উক্তিটিতে কার কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. ১৫০ হিজরিতে জন্মগ্রহণকারী ইসলামি মনীষীর পরিচয় দাও। ৩
ঘ. ১৫০ হিজরিতে মৃত্যুবরণকারী মনীষীর ইসলামে অবদান মূল্যায়ন করো। ৪

৮.▶ একজন রাজনীতিবিদ মহানবি (সা.)-এর চরিত্র নিয়ে কটাক্ষ করলে নারিকেল বাড়ীর জনাব মাকসুদ তা দৃঢ়তার সাথে প্রতিবাদ করেন। তিনি বললেন মহানবি (সা.)-কে কটাক্ষ করলে আমি আমার বাবাকেও ছাড়বনা, আর আমার সন্তান একাজ করলে আমি তাকে ত্যাজ্যপুত্র করবো। পৃথিবীর সব কিছুর উপরে আমি তাকে প্রাধান্য দেই। আবার তার বড় ভাইয়ের কলেজ পড়ুয়া ছেলে রিফাদ তার শিক্ষকদের সালাম দেয় দেখা মাত্রই। সে তার শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর সাথে ভালো ব্যবহার করে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে সে মহানবি (সা.)-এর আদর্শ মেনে চলে। তার ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ।

ক. ٱلظَّالِمُ (জালিম) কে? ১
খ. অশ্লীলতা মানুষের চরিত্র বিনষ্ট করে— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. জনাব মাকসুদের ঘোষণায় কোন হাদিসের শিক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. হাদিসের আলোকে শিক্ষার্থী রিফাদের নৈতিক চরিত্র মূল্যায়ন করো। ৪

৯.▶ শিহাব একটি নির্দিষ্ট মাসে ভোর হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত পানাহার ও যৌন সম্ভোগ থেকে বিরত থাকেন। এ মাসে গরীব অসহায় লোকদের মাঝে অনেক দান-খয়রাত করেন। মাগরিবের সময় মানুষকে খাবার দেন। একটি বিষয়ে ভিন্নমত পোষণকারী তার সাথে তর্কে লিপ্ত হলে শিহাব বলেন আমি একটি বিশেষ ইবাদত পালন করছি তাই বেশি কথা বলতে পারবনা।

ক. ইবাদতের মূল লক্ষ্য কী? ১
খ. 'ইমানের নিদর্শন সালাত'— বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. শিহাব কর্তৃক পালনকৃত ইবাদতের ধর্মীয় গুরুত্ব বর্ণনা করো। ৩
ঘ. আত্মশুদ্ধি ও সংযম কোন ইবাদতের মাধ্যমে অর্জিত হয়? তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১০.▶ জুমআর খুৎবায় ইমাম সাহেব বলেন, একটি ইবাদত আছে যা পালন করলে শরীরের প্রয়োজনীয় যোগব্যায়াম হয়ে যায়। এছাড়া শারীরিক পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা সাধিত হয়। এখানে ধনী-গরীব সকলে সমান। ইমাম সাহেব বক্তব্যের এক পর্যায়ে বলেন এটা ইসলামে প্রধানতম ইবাদত হিসেবে গণ্য।

ক. ইবাদত কী? ১
খ. "হজ একটি সার্বিক ইবাদত"— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে কোন ইবাদতের প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ইমামের মন্তব্যকে তুমি কতটুকু সমর্থন কর? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে জবাব দাও। ৪

১১.▶ জনাব শফিক একটি বিশ্বখ্যাত গ্রন্থে নিম্নে বর্ণিত বিষয় অধ্যয়ন করে:

বিশেষাংশে অধ্যয়ন	সামগ্রিক অধ্যায়ন
(ক) অনুসরণে নৈতিকতা জাগ্রত হয়	(ক) মানসিক প্রশান্তি লাভ হয়
(খ) জান্নাত জাহান্নামের প্রতি বিশ্বাস অর্জিত হয়	(খ) পারিবারিক সৌহার্দ জেগে ওঠে
(গ) জীবন বিধান হিসেবে গ্রহণ করা যায়	(গ) আদর্শ সমাজ গঠন সহজ হয়
(ঘ) শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত পালন করা হয়	(ঘ) বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব জাগ্রত হয়

ক. আল-বাকারা কী? ১
খ. "তারা বধির, মূক ও অন্ধ। সুতরাং তারা ফিরে আসবেনা"— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের জনাব শফিকের 'বিশেষাংশে অধ্যয়ন' দ্বারা কোন লোকদের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের 'সামগ্রিক অধ্যায়ন' দ্বারা ইঙ্গিতপূর্ণ গ্রন্থটি আদর্শ সমাজ গঠনে কীরূপ ভূমিকা রাখতে পারে? বিশ্লেষণ করো। ৪

অক্ষর-পত্র প্রকাশনী প্রকাশিত একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যবইসমূহ

আবশ্যিক বইসমূহ

• বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি • তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

প্রথম পত্রের বইসমূহ

বিজ্ঞান শাখা

• পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্র • রসায়ন প্রথম পত্র • জীববিজ্ঞান প্রথম পত্র • উচ্চতর গণিত প্রথম পত্র
• উচ্চতর গণিত সমাধান প্রথম পত্র • গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্র • গাণিতিক রসায়ন প্রথম পত্র

ব্যবসায় শিক্ষা শাখা

• ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা প্রথম পত্র • হিসাববিজ্ঞান প্রথম পত্র • ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা প্রথম পত্র
• উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন প্রথম পত্র

মানবিক শাখা

• পৌরনীতি ও সুশাসন প্রথম পত্র • সমাজকর্ম প্রথম পত্র • সমাজবিজ্ঞান প্রথম পত্র • ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি প্রথম পত্র
• ভূগোল প্রথম পত্র • ইসলাম শিক্ষা প্রথম পত্র • যুক্তিবিদ্যা প্রথম পত্র • ইতিহাস প্রথম পত্র • অর্থনীতি প্রথম পত্র

ঐচ্ছিক

• মনোবিজ্ঞান প্রথম পত্র • গার্হস্থ্য বিজ্ঞান প্রথম পত্র • কৃষিশিক্ষা প্রথম পত্র • পরিসংখ্যান প্রথম পত্র

দ্বিতীয় পত্রের বইসমূহ

বিজ্ঞান শাখা

• পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র • রসায়ন দ্বিতীয় পত্র • জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র • উচ্চতর গণিত দ্বিতীয় পত্র
• উচ্চতর গণিত সমাধান দ্বিতীয় পত্র • গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র • গাণিতিক রসায়ন দ্বিতীয় পত্র

ব্যবসায় শিক্ষা শাখা

• ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা দ্বিতীয় পত্র • হিসাববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র • ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা দ্বিতীয় পত্র
• উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন দ্বিতীয় পত্র

মানবিক শাখা

• পৌরনীতি ও সুশাসন দ্বিতীয় পত্র • সমাজকর্ম দ্বিতীয় পত্র • সমাজবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র • ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি দ্বিতীয় পত্র
• ভূগোল দ্বিতীয় পত্র • ইসলাম শিক্ষা দ্বিতীয় পত্র • যুক্তিবিদ্যা দ্বিতীয় পত্র • ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র • অর্থনীতি দ্বিতীয় পত্র

ঐচ্ছিক

• মনোবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র • গার্হস্থ্য বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র • কৃষিশিক্ষা দ্বিতীয় পত্র • পরিসংখ্যান দ্বিতীয় পত্র

ব্যবহারিক বইসমূহ

• ব্যবহারিক পদার্থবিজ্ঞান প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র • ব্যবহারিক রসায়ন প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র • ব্যবহারিক জীববিজ্ঞান প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র
• ব্যবহারিক উচ্চতর গণিত প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র • ব্যবহারিক ভূগোল প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র • ব্যবহারিক গার্হস্থ্য বিজ্ঞান প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র
• ব্যবহারিক কৃষিশিক্ষা প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র

অক্ষর-পত্র প্রকাশনী
www.akkharpatra.com

BNS 2507-02-04-1041-4
2507020410414